বাংলা ভাষায় শিক্ষাচিন্তার ক্রমবিকাশ:
অক্ষয়কুমার দত্ত থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(Thoughts for literary enhancement in Bengali language, Akshay Kumar Dutt till Rabindranath Tagore)

তত্ত্বাবধায়ক

আবুল কাসেম ফজলুল হক
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

গবেষকের নাম
মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম
যোগদানের তারিখ- ২৪/০৩/২০০৮
রেজিস্ট্রেশন নম্বর- ১৫৪/ ২০১২-২০১৩ (পুনঃ)
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা ভাষায় শিক্ষাচিন্তার ক্রমবিকাশ:
অক্ষয়কুমার দত্ত থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ. ডি ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ

৮ চৈত্র ১৪২৩ ২২ মার্চ ২০১৭

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা ভাষায় শিক্ষাচিন্তার ক্রমবিকাশ:
অক্ষয়কুমার দত্ত থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে পি এইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ)

তত্ত্বাবধায়ক
আবুল কাসেম ফজলুল হক
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০।

গবেষক
মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম
যোগদানের তারিখ-২৪/০৩/২০০৮
রেজিস্ট্রেশন নম্বর- ১৫৪/ ২০১২-২০১৩ (পুনঃ)
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

৮ চৈত্র ১৪২৩
২২ মার্চ ২০১৭

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, আমার তত্ত্বাবধানে 'বাংলা ভাষায় শিক্ষাচিন্তার ক্রমবিকাশ: অক্ষয়কুমার দত্ত থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' শীর্ষক পিএইচ. ডি. গবেষণা-অভিসন্দর্ভটি রচনা করেছেন। এই অভিসন্দর্ভ সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে এর আগে কোনো ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত হয়নি অথবা এর অংশ বিশেষ অন্য কোথাও ইতোপূর্বে প্রকাশিত হয়নি। রচিত অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা-শাখায় জমা দেওয়ার জন্য অনুমোদিত হল।

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
আবুল কাসেম ফজলুল হক
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০।

Dhaka University Institutional Repository

অঙ্গিকারনামা

আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে 'বাংলা ভাষায় শিক্ষাচিন্তার ক্রমবিকাশ: অক্ষয়কুমার দত্ত থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' অভিসন্দর্ভের কোনো অধ্যায় বা অংশ, পূর্ণ বা আংশিকভাবে, কোথাও মুদ্রিত, গ্রন্থিত বা প্রকাশিত হয়নি। তাছাড়া এ অভিসন্দর্ভের কোনো অধ্যায় বা অংশ, গবেষণা প্রস্তাবের বর্হিভূত নয়। এই অভিসন্দর্ভে ব্যবহৃত সব তথ্য নির্দেশের এবং উদ্ধৃতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষ মনোযোগ ও সর্তকতা অবলম্বন করা হয়েছে। একই সঙ্গে এ অভিসন্দর্ভে ব্যবহৃত তথ্য ও উদ্ধৃতিগুলোর উৎসানুসন্ধান করে ঋণ স্বীকার করা হয়েছে। সেগুলো অভিসন্দর্ভের প্রতিটি অধ্যায় শেষে 'তথ্যসূত্র' হিসেবে এবং উপসংহারের পরে 'গ্রন্থপঞ্জি' হিসেবে সংযোজিত হয়েছে।

গবেষক
মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম
যোগদানের তারিখ-২৪/০৩/২০০৮
রেজিস্ট্রেশন নম্বর-১৫৪/ ২০১২-২০১৩(পুনঃ)
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০।

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

উনিশ শতকের তিরিশের দশক থেকে বিশ শতকের শেষ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় শিক্ষাচিন্তার এক বিশাল ব্যাপ্তি, গভীরতা ও সূক্ষতা লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষাচিন্তার এই ব্যাপকতায় আমরা একদিকে বাংলা ভাষায় আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা প্রসারের জন্য ব্যাকুলতা যেমন লক্ষ্য করি তেমনি সকল স্তরের মানুষকে এ ভাষায় শিক্ষাদানের জন্য গভীর আগ্রহও দেখি। সেইসঙ্গে সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলনের জন্য ঐকান্তিক চেষ্টাও আমাদের দৃষ্টিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। শিক্ষাচিন্তার এই বিশাল আয়োজন ও আন্দোলনের পুরোভাগে আমরা পাই-অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) প্রমুখ ভাবুক ও কর্মযোগীদের। শিক্ষার দর্শন, ইতিহাস, পদ্ধতি, বাংলা ভাষায় শিক্ষার মাধ্যমে সমাজ-মানুষের সামগ্রিক মুক্তি, শান্তি, স্বাধীনতা ও কল্যাণ নিয়ে তাঁরা সুচিন্তিত মত প্রকাশ করেছেন। শিক্ষা বিষয়ে বাঙালি মনীষীদের এই দুর্লভ মহৎ চিন্তা বিভিন্ন কারণে যেমন ফলপ্রসূ হয়নি তেমনি সুলভ হয়নি সাধারণের কাছে। এই মনীষীদের শিক্ষাচিন্তা বিষয়ে গবেষণা অল্পই হয়েছে। অল্প বিস্তর যা হয়েছে তা বিশাল ও ব্যাপকতার তুলনায় বিক্ষিপ্ত মাত্র। এন জি ও-দের কাজও সন্তোষজনক নয়। তাই 'বাংলা ভাষায় শিক্ষাচিন্তার ক্রমবিকাশ: অক্ষয়কুমার দত্ত থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' বিষয়টি আমি গবেষণার জন্য নির্বাচন করি। গবেষণার এরূপ বিষয় নির্বাচনের উদ্দেশ্য ছিল-বাংলা ভাষায় শিক্ষাচিন্তার সামগ্রিক দিক সর্বসমক্ষে প্রকাশ করা, মনীষীদের দুর্লভ চিন্তাগুলোকে সাধারণের কাছে সুলভ করা এবং কাল-পরিসীমার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা-চিন্তার নানা সুফলতা ও অসফলতা সম্পর্কে একটি মূল্যায়ন উপস্থাপণ করা।

আমার এই প্রস্তাব অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়–কে দেখাই এবং তাঁর তত্ত্বাবধানে প্রস্তাবটি বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে যথানিয়মে বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ.ডি, শাখায় আবেদন আকারে প্রেরণ করি। আমার আবেদন পত্রখানি বিশ্ববিদ্যালয় যথাযথ উপায়ে পরীক্ষাপূর্বক গ্রহণ করেন এবং আমাকে উল্লিখিত বিষয়ে গবেষণা করার অনুমতি প্রদান করে চিঠি দেন। আমি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম মেনে যথা সময়ে পিএইচ. ডি. গবেষণায় যোগদান করি এবং গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের কাজে মনোযোগ দেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যেই আমি গবেষণা কর্মটি সুসম্পন্ন করার লক্ষ্য নিয়ে কাজে অগ্রসর হই। এই গবেষণায় তথ্যের প্রাথমিক উৎস হিসাবে অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ লেখকের শিক্ষা বিষয়ক রচনাবলীকে নির্বাচন করি। দ্বৈতীয়ক উৎস হিসাবে এঁদের সম্পর্কে বিশিষ্ট লেখক-সমালোচকদের লেখা রচনাকে গ্রহণ করি। বাংলা ভাষায় শিক্ষাচিন্তা বিষয়ক তথ্য সংগ্রহের কাজে যত এগিয়েছি, ততই নিত্য নতুন তথ্যের সন্ধান পেয়েছি। সেসব তথ্য ও উপাদান প্রায় সবই পণ্ডিত ও গবেষকদের কাছে পরিচিত ও আলোচিত। এই তথ্যগুলো আমি আমার গবেষণায় ব্যবহার করেছি। আমি এমন কোনো তথ্য পরিবেশন করিনি যা গবেষকদের কাছে অজ্ঞাত। তবে যা এতদিন সাধারণ পাঠকদের ছিল অগোচর, গবেষকের কাছে ছিল অনাদৃত ও অবহেলিত, তেমন অনেক তথ্যও আমি নতুন করে সাজিয়ে দিয়েছি, নতুন করে একটা শৃঙ্খলায় বেঁধে নতুন অর্থনির্দেশের চেষ্টা করেছি।

অবশ্য এ কথা বলা ঠিক যে, অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬) থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)-এর সময়কাল পর্যন্ত বাংলা ভাষায় শিক্ষাচিন্তার ক্রমবিকাশের ধারাটি আমি

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্লেষণমূলক ও বিচারমূলক পদ্ধতিতে সম্পন্ন করার চেষ্টা করেছি। এতে উক্ত সময়ে প্রকাশিত শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধ, রিপোর্ট, অনুবাদ, বাংলা ভাষায় শিক্ষাদানের জন্য প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি থেকে যে সমস্ত তথ্য পেয়েছি তার সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখের বাংলা ভাষায় শিক্ষাচিন্তাকে নতুন দৃষ্টি দিয়ে দেখার চেষ্টা করেছি।

আমার এ গবেষণা কাজের শুরু থেকেই বাংলা বিভাগের সম্মানিত শিক্ষকগণ আমাকে নানা পরামর্শ দিয়ে অনুপ্রাণিত করেছেন। তাঁদের প্রত্যক্ষ প্রেরণা না পেলে আমার এ গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করা সম্ভব হতো না। আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক-এর ব্যক্তিগত লাইব্রেরি ছিল আমার জন্য উন্মুক্ত। তিনি আমাকে প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা-পদ্ধতির ব্যত্যয় না ঘটিয়ে গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করার পরামর্শ দিয়েছেন। অধ্যাপক আহমেদ কবির, অধ্যাপক ডক্টর রফিকুল্লাহ খান, অধ্যাপক ডক্টর বিশ্বজিৎ ঘোষ, অধ্যাপক সৈয়দ আজিজুল হক, অধ্যাপক ভীষ্মদেব চৌধুরী, অধ্যাপক মোহাম্মদ গিয়াসউদ্দিন, অধ্যাপক সৌমিত্র শেখর, অধ্যাপক মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া, অধ্যাপক বায়তুল্লাহ কাদেরী, অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, ডক্টর তারিক মনজুর, জনাব রাফাত আলম মিশু, জনাব মো. জসিম উদ্দিন, জনাব কানিজ ফাতেমা, জনাব মুনিরা সুলতানা আমার গবেষণা বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করেছেন। এঁদের প্রতি আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাচিন্তা সম্পর্কে বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান ডক্টর বেগম আক্তর কামাল আমাকে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। ডক্টর ইসরাইল খান, ডক্টর আমিনুর রহমান সুলতান, ডক্টর রেজাউল করিম তালুকদার, ডক্টর তাহা ইয়াসিন, ডক্টর মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম আমাকে পরামর্শ ও তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন। এঁদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। ময়মনসিংহ জিলা স্কুলের সহপাঠী আমার বন্ধু জনাব মোহাম্মদ আবু সাঈদ আমাকে নানাভাবে সহায়তা করেছেন। তার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। আমার সৌভাগ্য কিনা জানি না এই বিশ্বদ্যিালয়ের কোনো অফিসেই কাজের জন্য গিয়ে আমাকে কারো অবহেলায় পড়তে হয়নি, সবাই আমাকে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেছেন। রেজিষ্ট্রার অফিস, বাংলা বিভাগ, পিএইচ.ডি শাখা, হিসাব শাখা, বিশ্ববিদ্যালয় ব্যাংক, বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও কর্মচারি সবাইকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম
পিএইচ.ডি গবেষক
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষাচিন্তা ও অধ্যায় বিভাজন প্রসঙ্গে

শিক্ষা

বাংলা 'শিক্ষা' শব্দটি সংস্কৃত 'শাস' ধাতু থেকে উৎপন্ন হয়েছে। যার অর্থ উপদেশ দেওয়া, নিয়ন্ত্রণ করা, শাসন করা। 'শিক্ষা' দ্বারা 'জ্ঞান আহরণ, দক্ষতা অর্জন ও কৌশল আয়ত্তকরণ, দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন, আচরণের উন্নয়ন, ব্যক্তিসত্ত্বার বিকাশ ইত্যাদি বিষয়কে নির্দেশ করা হয়। শিক্ষা ব্যক্তির বিভিন্ন মুখী চাহিদার উৎকর্ষতা নিশ্চিত করে, তার আত্মোপলব্ধি ঘটিয়ে জীবন যাপন প্রক্রিয়াকে গতিশীল করে। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের চিন্তা, সামাজিক ধ্যান-ধারণা, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও দক্ষতা, ঐতিহ্য, কৃষ্টি, রীতি-নীতি, মূল্যবোধ ইত্যাদি উত্তরসূরীদের কাছে পৌঁছায়। মানুষ যে সমাজের অতীত অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও দক্ষতা, ধর্ম-বিশ্বাস,আচার-সংস্কার ও মূল্যবোধ ইত্যাদির উপযোগী হয়ে গড়ে উঠতে চায় এবং জীবন যাপনে সমাজ-ব্যবস্থার নিরন্তর অগ্রগতি সাধনের চেষ্টা করে তার প্রধান নিয়ামক হিসেবেও কাজ করে শিক্ষা। যার ফলে ব্যক্তি মানুষ, সমাজবদ্ধ মানুষ এবং মানব সভ্যতার বিকাশ ধারায় 'শিক্ষা' শব্দটি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী ও মর্যাদা লাভ করেছে। মানুষের সব রকম সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনে শিক্ষা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। এক কথায় মানুষের দেহ ও আত্মার পূর্ণতার জন্য যা কিছু প্রয়োজন সবই শিক্ষার অন্তর্ভূক্ত। শিক্ষা মানুষকে এক সভ্যতা থেকে অন্য সভ্যতায় উত্তরণে সহায়তা করে। বর্তমান সভ্যতা মানুষের ক্রমাগত শিক্ষার ফলশ্রুতি।

২

শিক্ষার মূল লক্ষ্য মানুষের কল্যাণ সাধন। মানুষ তার চিরচেনা প্রকৃতি, পরিবেশ, পরিবার, প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি থেকে স্বাভাবিক নিয়মে শিক্ষা লাভ করে । জগতে মানুষ ছাড়া অন্য কোনো প্রাণির ভাষাজ্ঞান নেই। ভাষা মানুষের শিক্ষা অর্জনের সর্বাধুনিক উপায় বলে স্বীকৃত। এ ক্ষেত্রে মাতৃভাষাই শিক্ষার সর্বোত্তম মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত। মাতৃভাষায় শিক্ষা অর্জনের বিষয়টি আলো-বাতাস সাপেক্ষে প্রাণের স্বাভাবিক বাঁচার মতো। জন্মের পর শিশুকে মাতৃভাষা শিক্ষা দেওয়া না হলেও বিস্ময়করভাবে শিশু তার মাতৃভাষা শুনে বুঝতে পারে। মাতৃভাষাতেই সে প্রথম কিছু বলার চেষ্টা করে। শিশু এ প্রবণতা গভীর অনুসন্ধানের বিষয়। অনেকের ধারণা প্রত্যেক মানুষই সহজাত সামর্থ্যের দ্বারা ভাষা অর্জন করে। প্রকৃতপক্ষে, একটি শিশু সহজাত সামর্থ্য এবং অভিজ্ঞতার সমন্বয়েই তা করতে পারে। সেক্ষেত্রে স্বদেশের প্রকৃতি শিশুকে তার মাতৃভাষা চিনে নিতে সহায়তা করে। প্রকৃতির নিয়ম পরিবেশ থেকেই মানুষ প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করে। কালক্রমে মানুষ সামঞ্জস্যপূর্ণ সুন্দর জীবন-যাপন উপযোগী করে তুলার ক্ষেত্রে সেই জ্ঞানের পরিচর্চা করে সমাজ-সভ্যতা-সংস্কৃতির যোগ্য হয়ে উঠে এবং প্রকৃতিদত্ত জ্ঞান ব্যবহারের নানা কলা-কৌশল আয়ত্ত করে আত্মবিকাশ ঘটায়। মানুষের এ বিকাশ ঠিক কবে শুরু হয়েছিল তা বলা কঠিন। সভ্যতা ও ভাষা বিকাশের সঙ্গে তা সঙ্গতিপূর্ণ বলে কেবল অনুমান করা যায়। খ্রিষ্টের জন্মের কয়েকশ বছর আগে জন্মানো সক্রেটিস, প্লেটো, এরিষ্টটল প্রমুখের যে দার্শনিক ও তাত্ত্বিক চিন্তার প্রমাণ পাওয়া যায়, তাতে মনে হয় মানুষের চিন্তার বিকাশ এঁদের জন্মেরও বহু বছর আগে শুরু হয়েছিল। সেই অজানা প্রথম থেকে শুরু করে আজকের দিন পর্যন্ত জ্ঞানের সেই বিকাশের ধারা এখনো অব্যাহত ।

বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ধারার বহু গ্রহণযোগ্য তথ্য প্রমাণ পাওয়া গেলেও বাংলা ভাষায় শিক্ষা চিন্তার ক্রমবিকাশ সম্পর্কে তেমন কিছুই পাওয়া যায় না। বাংলার প্রাচীন সভ্যতার মোহেনজোদড়ো, হরপ্পা প্রভৃতি জনপদে আর্যপূর্ব কালের উন্নত সভ্যতার বহু নিদর্শন আছে। কিন্তু সেকালের সাধারণ শিক্ষা সম্পর্কে তেমন কোনো ইতিহাস কেউ লিখেনি। বৈদিক যুগের, রামায়ণ-মহাভারতের যুগের, বৌদ্ধযুগের ও ব্রাহ্মণ্যযুগের ধর্মভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে সূক্ষ্ম ও

Dhaka University Institutional Repository

গভীর রাষ্ট্রচিন্তার প্রকাশ লক্ষ করা যায়। তাতে সরকারি প্রয়োজনে শিক্ষা বিষয়ে কিছু পরোক্ষ কথা আছে। কিন্তু মধ্যযুগের ভারতে সে চিন্তার বিকাশ কোথাও দেখা যায় না। অনুসন্ধানে কেবল সেকালের ধর্মনির্ভর শিক্ষার কিছু নমুনা পাওয়া যায়, যা সেকালে শুধু রাজকাজের প্রয়োজন মিটাত। এ প্রসঙ্গে একজন তথ্যানুসন্ধানী সমালোচক লিখেছেন:

> বৌদ্ধযুগে নালন্দায়, বিক্রমশীলায়, উড্ডীয়ানায় বৌদ্ধধর্মভিত্তিক উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র ছিল এবং সেগু- লোতে চীন, ইন্দোচীনের বিভিন্ন দেশ, তিব্বত, নেপাল, আফগানিস্তান, ইরান, শ্রীলঙ্কা,ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশ থেকে শিক্ষার্থীরা এসে শিক্ষালাভ করত। বৌদ্ধধর্মভিত্তিক উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা পাহাড়পুর, মহাস্থানগড় ও ময়না- মতিতেও ছিল। বৌদ্ধ জ্ঞানসাধক ও মহৎপ্রাণ আচার্য হিসেসে শীলভদ্র ও দীপঙ্করের নাম দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। মধ্যযুগের বাংলায় নৈয়ায়িকেরা ও বৈষ্ণব মহাজনেরাও জ্ঞানসাধনায় অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। ভারতবর্ষে সেই সঙ্গে বাংলার ভূভাগেও তুর্কি,পাঠান,মোগল শাসকদের কালে মুসলমান ও হিন্দুদের শিক্ষা ও শিক্ষাব্যবস্থা নানা ভাবে বিকশিত হয়েছিল। পাঠান আমলের বাংলা সাহিত্যে বাঙালিচিত্তের চমৎকার স্ফূর্তি লক্ষ করা যায়। ....মোহেনজোদড়ো থেকে বাহাদুর শাহ পর্যন্ত সুদীর্ঘ ইতিহাস লক্ষ করলে গতিশীলতাকে স্বীকার না-করে পারা যায় না– গতি যত মন্থরই হোক। ব্রিটিশ শাসনামলে এসে পরিবর্তনের গতি দ্রুত হয় এবং অল্প সময়ে সবকিছু বদলে যায়। মধ্যযুগে শিক্ষার বিষয়ের মধ্যে ছিল সংস্কৃত ভাষা, ব্যাকরণ, অভিধান ও অলঙ্কার; তবে এগুলোর চেয়ে অনেক বড় করে ছিল ঈশ্বর, পরলোক, জন্মান্তর, নির্বাণ, মোক্ষ, পরমার্থ, স্বর্গ-নরক, বেহেশত-দোজখ এবং স্বর্গ বা বেহেশত লাভের উপায়। সেকালে মৃত্যু-পরবর্তী জীবনকেই মনে করা হত আসল জীবন আর পৃথিবীকে মনে করা হত সাময়িক পরীক্ষাক্ষেত্র। শিক্ষার বিষয়ের মধ্যে ইহকালের চেয়ে পরকালকে, পার্থিব জীবনের চেয়ে মৃত্যু-পরবর্তী জীবনকে, দুনিয়াদারির চেয়ে আখেরাতকে, ভোগের চেয়ে সংযম ও ইন্দ্রিয়দমনকে বহুগুণ বড় করে স্থান দেওয়া হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে ধর্মগ্রন্থই ছিল মূল। শিক্ষা ছিল ধর্ম ভিত্তিক। যার যে ধর্মে জন্ম, যোগ্যতা ও আগ্রহ থাকলে সে সেই ধর্ম অধ্যয়ন করত।[১]

বাংলায় ব্রিটিশ-শাসন শুরু হওয়ার অল্প দিনের মধ্যেই এদেশে পাশ্চাত্য দর্শন বিজ্ঞান শিক্ষার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে, প্রাচীন বাংলার ধর্মভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম গতি হারায়। এদেশে ইংরেজি ভাষায় শিক্ষা চালু হয়, বাঙালির দৃষ্টিভঙ্গি ক্রমশ বদলে যায়। বাঙালি মানসের এ পরিবর্তন ধারায় প্রথমেই চোখে পড়ে ঈশ্বর ভাবনার বিষয়টি,পরকালের ভাবনা থেকে সরে এসে মানুষ ইহকাল নিয়ে ভাবতে শুরু করে। এ সময় মানুষের আত্মবিশ্বাস বাড়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাঁদের ধর্মবিশ্বাস কমতে থাকে। তাঁরা পারলৌকিক ভাবনা ছেড়ে, ইহজাগতিক বিষয়ে আগ্রহী হয়। ইহমুখী মনোযোগের কারণে স্বর্গ-নরক, বেহেশত-দোজখ প্রভৃতি নিয়ে তাঁরা ভাববার আর অবকাশ পায় না। সেসবের প্রতি কর্মব্যস্ত মানুষের মোহও কমে আসে । বহুবছর ধরে ধর্মের বৃত্তে বন্দিদশা থেকে মানুষ মুক্তির স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। তবে মানুষ একেবারে ধর্মশূন্য হয় না। তাঁদের ধর্মবোধ থাকে, গৌণ হয়ে ;মূখ্য হয়ে উঠে কাজ। এ প্রসঙ্গে শিক্ষাচিন্তক আবুল কাসেম ফজলুল হক লিখেছেন:

> উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকেই শিক্ষাব্যবস্থায় ও শিক্ষার বিষয়বস্তুতে পারলৌকিক বিষয়াদিকে গৌণ করে দিয়ে লৌকিক বিষয়াদি প্রাধান্য বিস্তার করতে আরম্ভ করে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, আত্মীয়সভা, রামমোহনের স্কুল, হিন্দু কলেজ, ব্রাহ্মসমাজ ইত্যাদির কথা স্মরণ করা যেতে পারে। ১৮৩৫ সনের শিক্ষা কমিশনের সুপারিশে, ১৮৫৭ সনে প্রতিষ্ঠিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে, ১৯২১ সনে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার বিষয়ের মধ্যে পারলৌকিক বিষয়ের স্থান ছিল নিতান্ত গৌণ এবং ধর্মীয় বিষয়কেও অধ্যয়ন করা হয়েছে ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিতে। বাস্তবসম্মত শিক্ষা জীবনমুখী শিক্ষা, হাতে-কলমে শিক্ষা, প্রয়োজনের শিক্ষা, প্রকৃতি ও সমাজের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ শিক্ষা, দেশ-কালের উপযোগী শিক্ষা, মনুষ্যত্ব উদ্বোধন শিক্ষা ইত্যাদি কথা এদেশে উনিশ শতকেই প্রথম উচ্চারিত হয়। ক্রমে শিক্ষার সঙ্গে শিক্ষার্থীর জীবিকার, উপার্জনের ও সমৃদ্ধি অর্জনের চিন্তা এবং জাতীয় উন্নতির পরিকল্পনা যুক্ত হয়। উনিশ শতকের মাঝামাঝিতেই শিশুদের পাঠ্যপুস্তকে এসে যায় : 'লেখাপড়া করে যে গাড়ি-ঘোড়া চড়ে সে।' তবে উনিশ শতকের শিক্ষাব্যবস্থায় নৈতিক শিক্ষার ও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির বিশেষ গুরুত্ব ছিল। পরকাল সংক্রান্ত বিষয়াদিকে গুরুত্ব দেওয়া না হলেও বাস্তব জীবনের–ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের–ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিত, কর্তব্য-অকর্তব্য ও সুন্দর-কুৎসিত ইত্যাদি বিচারের ক্ষেত্রে ধর্মীয় নীতিকে শিক্ষার বিষয়ের মধ্যে অনেক খানি স্থান দেওয়া হয়। তবে মানবীয় নীতি এবং বিবেক ও যুক্তিও ধর্মীয় নীতির পাশাপাশি স্থান করে নিতে থাকে। দেশ-কালের চাহিদা, ঔপনিবেশিক শাসন, ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচয় ইত্যাদির ফলে ব্রিটিশ-শাসিত বাংলার জীবনধারা, শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষা পরিবর্তিত হয়।[২]

ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে বাংলায় প্রচলিত ধর্মভিত্তিক শিক্ষা ম্লান হয়ে আসে। এসময় বাঙালির মন ও মনন গঠনে পাশ্চাত্য শিক্ষা-দর্শনের সঙ্গে ইউরোপের রেনেসাঁস বা নবজাগরণের অনুপ্রেরণা যুক্ত হয়। ইউরোপের উদারনৈতিক চিন্তাধারা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এদেশের সচেতন বাঙালিকে প্রভাবিত করেছিল। স্বপন বসু লিখেছেন:

> পঞ্চদশ শতক থেকে শুরু করে সতের শতকের গোড়া পর্যন্ত ইউরোপে রেনেসাঁস বা নবজাগরণের ফলে মধ্যযুগীয় ইউরোপের তমসাচ্ছন্ন গির্জার পুরোহিত শাসন তথা পুরোহিততন্ত্রের নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে চিন্তার মুক্তি বা ব্যক্তি চেতনার জাগরণ ঘটেছিল। এই নব জাগরণের মূলকথা ছিল ব্যক্তির মন, বোধ, বুদ্ধি পুরোহিততন্ত্রের অচলায়তন থেকে মুক্ত হয়ে যুক্তি ও বিচারের মাধ্যমে সকল কিছুরই নবমূল্যায়ন। ইউরোপের উদারনৈতিক চিন্তাধারা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ, অতীতকে যুক্তি দিয়ে বিচার, রক্ষণশীল কর্তৃক এতদিনের ব্যাখ্যাত শাস্ত্র ও ধর্মের অনুশাসনের নবমূল্যায়ন, ইউরোপ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের সামঞ্জস্য বিধানপূর্বক ভবিষ্যত গড়ার আকাঙ্খাই উনিশ শতকের প্রথম ভাগে বাংলাদেশে নবজাগরণের অনুপ্রেরণা জাগায়। এই নবজাগরণ বাংলাদেশে সামাজিক চিন্তা, সমাজ সংস্কার, সাহিত্য সৃষ্টি, স্বদেশীয় ইতিহাস অন্বেষণ, সাংস্কৃতিক আন্দোলন এক কথায় বৈপ্লবিক পরিবর্তনের এক নব-চেতনা এনে দিয়েছিল।[৩]

উনিশ শতকের শুরু থেকে বিশ শতকের মধ্যদশক পর্যন্ত এদেশে শিক্ষাকে বিচিত্রভাবে অগ্রসর হতে দেখা যায়। এ সময় বাঙালি শিক্ষাকে সঙ্গে নিয়ে আত্মানুসন্ধানের পথে নামে। ইংরেজি শিক্ষার যুগে স্বদেশি শিক্ষা নিয়ে বাঙালি ভাবতে শুরু করে। তাঁরা মাতৃভাষাকে আশ্রয় করে শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের ধারাকে বেগবান করে। মাতৃভাষায় শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে মানুষ ধর্মীয় কুসংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষা গ্রহণে প্রয়াসী হয়। হয় । এখানে স্মরণ রাখা দরকার যে, ধর্ম-বর্ণের বৈষম্যকে পিছনে ফেলে বাঙালি মানবতাবাদে দীক্ষিত হলেও ব্রিটিশ শাসকরা তাঁদের স্বার্থে যে মানবতাবাদ সামনে রেখে শোষণ-শাসন অব্যাহত রেখেছিল, সচেতন বাঙালির মানবতাবোধ সেই ধারায় পরিচালিত হয়নি। তাঁরা সংখ্যায় কম হলেও শাসকের কথার ফাঁক এবং ফাঁকি দুটোই বুঝেছিলেন। এ প্রসঙ্গে ভবতোষ দত্তের বক্তব্যটি স্মরণ করা যায়। তিনি লিখেছেন:

> দুশ বছর আগে ইংরেজ যখন আমাদের দেশে এল, তখন আমাদের সমাজ জীবনে বড়ো একটা পরিবর্তন আরম্ভ হয়েছিল, একথা সকলেই জানে। এই পরিবর্তন কোন কোন দিক দিয়ে এসেছিল, তার নানা তথ্য এবং ইতিহাস সংগৃহীত হয়েছে। টোল-পাঠশালার শিক্ষা তখনও সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয়নি কিন্তু ইংরেজি শিক্ষা শুরু হয়ে গেল। পুরনো আচারমূলক হিন্দুধর্মের সঙ্গে শিক্ষিত নাগরিকদের মধ্যে একেশ্বরবাদী ব্রাহ্মধর্মের অভ্যুত্থান হল, বিজ্ঞান শিক্ষার প্রবর্তন হল, নারীজাতির শিক্ষার অধিকার স্বীকৃত হল, শিক্ষার ক্ষেত্রে জাতিবর্ণ বিচার চলে যেতে লাগল। পূর্ববর্তী নিপীড়নমূলক আচার ধর্ম সতীদাহ ইত্যাদির প্রতি মানুষের বিরাগ সৃষ্টি হল, বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ প্রবর্তন ও বহুবিবাহ এবং বাল্যবিবাহ দূর করতে চেষ্টিত হলেন। রাজকীয় বিচার ব্যবস্থার একটা সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন এল– ইংরেজের আইনে ব্রাহ্মণ শূদ্র হিন্দু মুসলমানের কোনো ভেদ থাকল না, বিশেষত ফৌজদারী আইনের ক্ষেত্রে। আমাদের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় প্রথাগত সমাজ-ব্যবস্থার এইসব পরিবর্তন যে হতে লাগল, তার জন্য কোনো অসন্তোষও দেশে ছিল না। সবাই যেন এই পরিবর্তনকে মেনে নিয়েছে।....এ সব দিক ভাবলে উনিশ শতকের জীবনচাঞ্চল্য ও পরিবর্তনের মূলে মানুষের জীবন ব্যক্তিত্ব ও কীর্তিকে মহিমাময় করে তোলবার একটা সর্বব্যাপী প্রয়াস ও প্রণোদনাই বিশেষ ভাবে চোখে পড়ে। দেবতার ইচ্ছাই সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করছে এ বিশ্বাসটা চলে গিয়েছে। একদিকে মানুষের বুদ্ধি বিবেচনা আর একদিকে তার সুখদুঃখ আবেগকে নিয়ে হৃদয়ধর্ম– এই দুই দিক দিয়েই মানুষেরই একটা নতুন পরিচয় ফুটে উঠল। এর নাম হিউম্যানিজম যার বাংলা আমরা করে নিয়েছি মানবতা বা মানবিকতা। হিউম্যানিজমই ছিল ইতালির বা য়ুরোপের রেনাশাঁসের মর্মসত্য।[৪]

উনিশ শতকে মানবিকতার প্রভাবে প্রচলিত ধর্মে মানুষের আস্থা ও মনোযোগ কমতে থাকে। তাঁরা ভাগ্যের চেয়ে কর্মে বেশি বিশ্বাসী হয়ে উঠে। অক্ষয়কুমার দত্ত এ সময়ের চিন্তানায়ক, আধুনিক মানবতাবাদের বাণী বহনকারী বাঙালি ।

Dhaka University Institutional Repository

৩

উনিশ শতকে মানবিকবোধের জাগরণের ফলে মানুষ একদিকে প্রচলিত ধর্ম থেকে সরতে থাকে, অন্যদিকে তাঁদেরকে ধরে রাখতে সমাজের রীতিনীতি ও ধর্ম রক্ষার আন্দোলন গড়ে ওঠে। যাঁরা সে আন্দোলন পরিচালনা করলেন তাঁরা আশানুরূপ ফল পেলেন না। নতুনের মনে পুরাতন গ্রহণের আগ্রহ জাগাতে তাঁরা ব্যর্থ হলেন। কারণ বিজ্ঞান বুদ্ধি ও বাস্তববোধের কাছে তাঁদের সেই চেষ্টার মূল্য ছিল না। তাঁদের বিপরীত ধারার অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগ প্রমুখের চেষ্টা সফল হলো। এঁরা জগতের নানা দিক থেকে জ্ঞান বিজ্ঞানের নানা কিছু এনে মাতৃভাষার পাত্রে ঢেলে যখন নতুনের সামনে পরিবেশন করলেন তখন তারা তা সানন্দে গ্রহণ করলেন। তখন প্রাচীনরা তাঁদের শাস্ত্রেসহযোগে প্রার্থনা করলেন যে, তাঁদের ছেলেরা পিছনে ফিরে আসুক। কিন্তু অক্ষয়কুমার যখন প্রমাণ করলেন প্রার্থনার বিশেষ মূল্য নেই, তখন ছেলেরা বাপেদের কথা শুনল না । এ প্রসঙ্গে অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনীকার লিখেছেন:

> একবার ...কলিকাতার হিন্দু হষ্টেলে অবস্থিত ভিন্ন ভিন্ন কলেজের বিদ্যার্থিগণ গোয়াড়ি-কৃষ্ণনগর-নিবাসী শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়ের নিকটে অক্ষয় বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।.....ইনি ব্রজনাথ বাবুর সমভিব্যাহারে করিয়া তথায় গিয়া উপনীত হইলে, হষ্টেলের তাবৎ ছাত্র একত্র সমবেত হইয়া ইঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। পরে তাঁহারা ঈশ্বরের সমীপে প্রার্থনা করার প্রয়োজন বিষয়ে কথা উত্থাপন করিয়া তৎসম্বন্ধে ইঁহার মত কি, জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে ইনি প্রার্থনা করিবার আবশ্যকতা বা স্বার্থকতা আদৌ নাই, এই অভিপ্রায় অতি প্রাঞ্জলভাবে প্রমাণ করেন এবং দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলেন, 'কৃষিজীবী লোক পরিশ্রম করিয়া শস্য লাভ করে; কিন্তু জগদীশ্বরের সমীপে প্রার্থনা দ্বারা কোন কৃষাণের কস্মিনকালেও শস্য-লাভ হয় নাই।' ইহাতে কেহ কেহ কহিলেন, 'ভাল কৃষক পরিশ্রম ও প্রার্থনা উভয়ই করুক না কেন?' তৎপরে ইনি বলিলেন, 'বল দেখি, কৃষক যদি প্রার্থনা না করিয়া যথানিয়মে কৃষি-কার্য্যে নিরত থাকে, তবে তাহার কি ফল–লাভ হইবে?' তাঁহারা উত্তর দিলেন, 'কেন, শস্যরাশি? 'তদনন্তর দত্তজ মহাশয় পুনরায় কহিলেন, 'যদি তাহারা প্রার্থনাও করে, কৃষিকার্য্যও করে, তাহা হইলে কি ফল লাভ হয়?' তাঁহারা এই প্রকার জিজ্ঞাসার পর বলিলেন, 'তাহাতেও শস্যরাশি।' তখন ইনি বলিলেন, 'যাহা তোমরা বলিলে, বীজগণিতের সমীকরণ-প্রণালীতে তাহা স্থাপণ করিয়া বল দেখি, প্রার্থনার শক্তি কত ?
>
> পরিশ্রম = শস্য
> পরিশ্রম ও প্রার্থনা = শস্য
> অতএব প্রার্থনার শক্তি কত ?
>
> এই প্রশ্নের পর সকলেই কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ ও নীরব রহিলেন। পরে অপেক্ষাকৃত কোন বয়োজ্যেষ্ঠ যুবক বলিয়া উঠিলেন, 'প্রার্থনার মূল্য শূন্য, অর্থাৎ কিছুই নহে।' ইহা শুনিয়া তখন বড় কৌতুক ও কলরব উপস্থিত হইল।[৫]

অক্ষয়কুমার সাধারণ মানুষের কাছ থেকে 'প্রার্থনা' কেড়ে নিলেন না, তাঁর বৈজ্ঞানিক মন দিয়ে ধর্মের উপযোগীতা বিচার করলেন মাত্র। তবু এ সমীকরণটি অনেকের ভাল লাগল না। অনেকে ক্ষুব্ধ হয়ে অক্ষয়কুমারকে পাপাসক্ত বলতেও দ্বিধা করলেন না।[৬] অথচ সেসময় ধর্মের নামে নারীকে অপমান ও অমর্যাদার পাপে তাঁরা কঠিন দণ্ড পাওয়ার যোগ্য। অক্ষয়কুমার দত্ত ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শিক্ষার মাধ্যমে সমাজের সেই পাপ দূর করতে এগিয়ে এলেন। তাঁরা চিন্তায়, কর্মে ও ব্যক্তিত্ববলে সেকালে ব্যক্তি থেকে এক একটি প্রতিষ্ঠান পরিণত হয়েছিলেন।

৪

উপসংহার ছাড়া অভিসন্দর্ভটিতে ছয়টি অধ্যায় রয়েছে। প্রথম অধ্যায় : বাংলা ভাষায় শিক্ষাচিন্তার উন্মেষ পর্যায়। এই অধ্যায়টি এগারোটি উপ–শিরোনামে ভাগ করে বাংলা ভাষায় শিক্ষাচিন্তার ক্রমবিকাশ ধারায় অক্ষয়কুমার দত্তের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। এই বর্ণনায় মধ্যযুগ থেকেই বাংলায় প্রচলিত পাঠশালা শিক্ষাসহ প্রচলিত অন্যান্য প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে । উনিশ শতকে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাবে এ দেশে শিক্ষা ক্ষেত্রে কী ধরণের পরিবর্তন এসেছিল তা তুলে ধরা

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে। এ অধ্যায়ে মিশনারিদের খ্রিষ্টধর্ম প্রচার প্রসঙ্গে আলোচনা স্থান পেয়েছে। এই অধ্যায়ে 'ডিরোজিও এবং তাঁর অনুসারীদের কর্ম প্রচেষ্টা' উপ–শিরোনামে ডিরোজিও ও তাঁর শিষ্য ইয়ংবেঙ্গলদের যুক্তিধর্মিতা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, তৎকালীন রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের ধর্মীয় অনাচার, সতীদাহ, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, গৌরীদান কুলীনপ্রথা ও সামাজিক মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁদের অবস্থান প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে ডিরোজিও ও তাঁর শিষ্যদের কর্মকা"ণ্ড,একাডেমিক এসোসিয়েসন' জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকা প্রভৃতির ভূমিকা তুলে ধরা হয়েছে। এই অধ্যায়ে 'রামমোহন রায় ও তাঁর চিন্তাধারা' উপ-শিরোনামে রামমোহন রায়ের আধুনিক চিন্তা-চেতনা ও ধর্মীয় সংস্কার প্রতিমা পূজা বা পৌত্তলিকতাবিরোধী আন্দোলন এবং একেশ্বরবাদ ও ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে আলোচনা আছে। ১৮২৯ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেন। এর ফলে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ আরো বেশি আতঙ্কিত হয়ে ওঠে এবং এর প্রতিবাদে ১৮৩০ সালে ১৭ই জানুয়ারি তাঁরা সনাতন হিন্দুধর্ম রক্ষার জন্য 'ধর্মসভা' স্থাপন করে। এ সভার সভ্যরা ধর্ম গেল, জাত গেল বলে কলকাতা শহরকে কাঁপিয়ে তুলেছিল। এসব বিষয়সহ বিজ্ঞানভিত্তিক আধুনিক শিক্ষা পরিকল্পনায় রামমোহন রায়ের গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা ধারা ও কর্মকা"ণ্ড এখানে তুলে ধরা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, অক্ষয়কুমার দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরী, শিবনাথ শাস্ত্রী, কাজী আবদুল ওদুদ, বিনয় ঘোষ, যোগানন্দ দাশ, ড.অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমুখ মনীষীগণ রামমোহন রায়ের অবদান সম্পর্কে যে মতামত দিয়েছেন তার আলোকে তাঁকে মূল্যায়ন করা হয়ছে। এই অংশে রামমোহন রায়ের শিক্ষাদর্শন ও চিন্তাধার একটা পূর্ণাঙ্গ পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

৪.২

দ্বিতীয় অধ্যায়: অক্ষয়কুমার দত্তের শিক্ষাচিন্তা। এই অধ্যায়ে একুশটি উপ-শিরোনামে অক্ষয়কুমার দত্তের শিক্ষাচিন্তা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমে পরিচয় অংশে অক্ষয়কুমার দত্তের চিন্তার সূত্রগুলি উল্লেখ করা হয়েছে। অক্ষয়কুমার দত্তের মানস বৈশিষ্ট্য অংশে তাঁর মানবতাবোধ, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, মাতৃভাষায় বাঙালির শিক্ষাদানের অভিপ্রায়, অসাধারণ কর্মস্পৃহা প্রভৃতি দিক তুলে ধরা হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অসমাপ্ত রেখে তাঁর কর্মে আত্মনিয়োগ, অর্থ-কষ্টের মধ্যেও স্বজাতির সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করার মানসে দুটি পত্রিকা সম্পদনা, দুটি স্কুলে শিক্ষকতা, বাংলা ভাষায় ভূ-গোল বিজ্ঞান শিক্ষা বিষয়ক পাঠ্যপুস্তক রচনা, নারীশিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধ রচনা, সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখের সঙ্গে পরিচয় লাভ প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে 'প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও কর্মজীবন' উপ-শিরোনামে। 'শিক্ষাচিন্তায় আত্মপ্রকাশ' উপ-শিরোনামে তাঁর শিক্ষাচিন্তার সময় প্রেক্ষাপট নির্দেশ করা হয়েছে। এর পর তাঁর শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, শিক্ষানীতি, শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা ভাষার গুরুত্ব, শিশুর মানসিক বিকাশে মাতৃভাষায় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। অক্ষয়কুমার দত্ত মাতৃভাষায় শিক্ষার অন্তরায় সমূহ অনুধাবন করে সেগুলো দূর করার জন্য যে গুরুত্বপূর্ণ মতামত দিয়েছেন তা উল্লেখ পূর্বক শিক্ষা বিষয়ে তাঁর মৌলিক চিন্তা ও শিক্ষাপদ্ধতি আলোচনা করা হয়েছে,'বিশেষ ধরনের শিক্ষার পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি (প্রথম স্তর বা পর্ব: প্রাথমিক শিক্ষা, দ্বিতীয় স্তর বা পর্ব : মাধ্যমিক শিক্ষা, তৃতীয় স্তর বা পর্ব : উচ্চশিক্ষা) উপ-শিরোনামে। এরপর পর্যায়ক্রমে 'নারীশিক্ষা ও শিশুর বিকাশে শিক্ষিত মায়ের ভূমিকা', 'বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষার গুরুত্ব', 'বিজ্ঞান বিষয়ক রচনার ভাষা-বৈশিষ্ট্য', 'বিজ্ঞান শিক্ষায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা', 'শিক্ষার উপকরণ পরিকল্পনা', 'শিক্ষাদানের জন্য উপযুক্ত শিক্ষক নির্বাচন' এবং 'শিক্ষার্থীর শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য ও পরিবেশ' উপ-শিরোনামে বাংলা ভাষায় শিক্ষাচিন্তার ক্রমবিকাশ ধারায় তাঁর চিন্তা তুলে ধরা হয়েছে। উনিশ শতকের প্রধান শিক্ষাচিন্তকদের অন্যতম একজন হিসেবে অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬) বাংলা ভাষায় শিক্ষাদানের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের চিত্তের যে বিকাশ সাধন করতে চেয়েছিলেন এবং শিক্ষাকে গ্রাম্য বর্বরতা ও রক্ষণশীল ধর্মীয় প্রভাব থেকে মুক্ত করার মানসে শিক্ষাচিন্তার যে ধারার সূচনা করেছিলেন তা আলোচনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। সেই সঙ্গে বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি, অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, নীতিতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর গভীর জ্ঞান ও অধ্যাবসায়ের সূত্রগুলো নির্দেশ করা হয়েছে। অক্ষয়কুমার দত্ত শিক্ষার বিভিন্ন দিক নিয়ে লেখনীর মাধ্যমে তৎকালীন পশ্চাদমুখী শিক্ষাচিন্তার কীভাবে বিরোধিতা করেছেন, শিক্ষার

বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করে তা থেকে তিনি উত্তরণের কী উপায় নির্দেশ করেছেন, বাংলা ভাষায় জনশিক্ষা বিস্তারের জন্য কী ধরনের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন, বাংলা গদ্যের কাঠামোগত উন্নতি বিধানে কী ধরনের ভূমিকা নিয়েছেন এসব জিজ্ঞাসার উত্তর অনুসন্ধান করা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

৪.৩

তৃতীয় অধ্যায় : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শিক্ষাচিন্তা। এই অধ্যায়ে এগারটি উপ-শিরোনামে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শিক্ষাচিন্তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। উনিশ শতকের শ্রেষ্ঠ চিন্তকদের একজন হিসেবে শিক্ষা ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের পরিচয় পাওয়া যাবে। এখানে বাংলা গদ্যের জনক বিদ্যাসাগরের জেদ, আত্মমর্যাদাবোধ, বাঙালিত্বের অহংকার, নারীর প্রতি মর্যাদা, সমাজ সংস্কার মনোভাব প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে এই অধ্যায়ের'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মানস বৈশিষ্ট্য উপ–শিরোনামে বর্ণনা করা হয়েছে । সে কালের নিরিখে মানবিক বিদ্যার সাধক হিসেবে তিনি কতটা গুরুত্বপূর্ণ ও উচ্চ মানের মানুষ ছিলেন সেটাও এখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে । শিক্ষার মাধ্যমে তিনি কীভাবে এদেশের মানুষকে কুসংস্কারমুক্ত ও আত্মসচেতন করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, কীভাবে তিনি বাঙালির শিক্ষাচিন্তায় সমন্বয় সাধকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন , শিক্ষানীতিতে তিনি কী ধরণের সংস্কার সাধন করেছেন, বাংলার দক্ষিণাঞ্চলের স্কুলসমূহ পরিদর্শনে গিয়ে কীভাবে গ্রাম- গ্রামান্তরে মডেল স্কুল ও বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন, শিক্ষায় সমন্বয় সাধন করতে গিয়ে তিনি কী উপায়ে ইংরেজি ও সংস্কৃত ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম না করে বাংলা ভাষাকে গ্রহণ করেছেন, এসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে এই অধ্যায়ে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাঙালির শিক্ষার সহায়ক মাধ্যম হিসেবে ইংরেজি কিংবা সংস্কৃত কোনোটির উপরই পূর্ণ আস্থা রাখতে পারেননি। কারণ তিনি বুঝেছিলেন সংস্কৃত শিক্ষার পক্ষে পরিবর্তনশীল সমাজ ব্যবস্থার দাবী মিটানো সম্ভব নয় এবং ইংরেজির মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষাও সাধারণ মানুষের গ্রহণযোগ্য বিষয় নয়। তাই তিনি বাঙালির চিন্তাগঠন ও জ্ঞানার্জনের এ দুটি বিদ্যার সমন্বয়ে এক নতুন শিক্ষাদর্শ গড়ে তুলেছিলেন। এই বিষয়টি বিশিষ্ট লেখক সমালোচকদের মতামতের ভিত্তিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। বিদ্যাশিক্ষার পদ্ধতির ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর কোনো প্রকার মিশ্রণ না ঘটিয়ে কীভাবে আপন চিন্তাবলে অগ্রসর হয়েছিলেন তার সূত্র নির্দেশ করা হয়েছে। তিনি সংস্কৃতের সাহায্যে কীভাবে মাতৃভাষাকে শক্তিশালী এবং ইংরেজির মাধ্যমে পাশ্চাত্যের জ্ঞান আহরণ করে মাতৃভাষাকে কীভাবে সম্পদশালী করেছিলেন সে বিষয়ে আলোচনাও এই অধ্যায়ে পাওয়া যাবে। তিনি বাংলা ভাষায় জনশিক্ষা বিস্তারের জন্য সংস্কৃত কলেজ থেকে বাংলা ভাষায় পরিপূর্ণ দক্ষতাসম্পন্ন মানুষ তৈরি করতে চেয়েছিলেন। যাতে তাঁরা পরবর্তীতে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে মাতৃভাষার মাধ্যমে যুগোপযোগী শিক্ষা সাধারণের কাছে পৌঁছে দিতে পারে। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তিনি বাংলা ভাষায় কী ধরনের গ্রন্থ রচনা ও বিদ্যালয় স্থাপনে ব্রতী হয়েছিলেন সেই বিষয়েও আলোচনা করা হয়েছে।

৪.৪

চতুর্থ অধ্যায় : আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের শিক্ষাচিন্তা। এই অধ্যায়ে তেরটি উপ-শিরোনামে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের শিক্ষাচিন্তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আশুতোষ ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আদর্শে অনুপ্রাণিত। বিদ্যাসাগরের মতো জেদি এবং কথায় কর্মে এক ছিলেন। তিনিও বিদ্যাসাগরের মতো বাঙালি পোশকে নিজেকে ধন্য মনে করতেন। তিনি বাংলা ভাষাকে উচ্চ শিক্ষা গৃহে স্থান দিয়েছিলেন। এ কারণে বাংলা ভাষার পাঠক তৈরির ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন পত্রিকার অবদানকে তিনি বড় করে দেখতেন। এ অধ্যায়ে 'আশুতোষের শিক্ষা পরিকল্পনায় বঙ্কিমচন্দ্রর প্রভাব' উপ–শিরোনামে বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে। এতে বঙ্কিমচন্দ্রের লোকশিক্ষা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ মতামত তুলে ধরা হয়েছে। আশুতোষ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে তাঁর শিক্ষাচিন্তার প্রতিফলন ঘটিয়েছিলেন। বিভিন্ন সমাবর্তন ভাষণের উপর ভিত্তি করে এই অধ্যায়ে সেই চিন্তার একটি পূণাঙ্গ পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে । বাংলা ভাষায় শিক্ষা চিন্তা বিষয়ে আশুতোষ তাঁর স্বপ্নকে 'মাতৃসমা মাতৃভাষায়' সম্পদশালিনী করে জীবন ধন্য করতে চেয়েছিলেন। তিনি বলতেন–'যে জাতির নিজের পরিচয়যোগ্য ভাষা নাই বা নিজের জাতীয় সাহিত্য নাই, সে জাতির বড়ই দুর্ভাগ্য। তাঁ কাছে শিক্ষার উদ্দেশ্য আত্মবিকাশ লাভ করা। দর্পণের ন্যায় বিশ্বের প্রতিবিম্ব গ্রহণে

হৃদয়কে সমর্থ করা। তাঁর লক্ষ্য ছিল মাতৃভাষায় শিক্ষার মাধ্যমে সাধারণের উন্নতি করা এবং তাঁদের অর্থনৈতিক মুক্তির পথ সুগম করা। তিনি উচ্চশিক্ষার বিস্তারকে তিনি 'প্রগতির পথে প্রথম পদক্ষেপ' মনে করতেন। এসব বিষয় অনুসন্ধানী মন নিয়ে বিবেচনা করা হয়েছে আলোচ্য অধ্যায়ে। বিচক্ষণ বিচারক, খ্যাতিমান গণিতজ্ঞ আশুতোষ বাংলা ভাষা–সাহিত্যের মধ্য দিয়ে কীভাবে ভারতের ঐক্য স্থাপন করতে চেয়েছিলেন, কীভাবে সমকালীন শিক্ষাব্যবস্থার দোষ-ত্রুটি, সমস্যা–সংকট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির গলদ প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে কীভাবে ধারণা লাভ করেছিলেন, কীভাবে বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছিলেন, কী অসীম ধৈর্য্য নিয়ে বিজ্ঞান ও আইন কলেজ স্থাপন, স্কুল-কলেজের সিলেবাসে বাংলা পত্র চালু, বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ক্লাস প্রবর্তন প্রভৃতি কাজ করেছিলেন তা এই অধ্যায়ে আলোচনা কওে তাঁর শিক্ষাচিন্তার গভীরতা নির্দেশ করা হয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষায় উচ্চ শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে তিনি দীনেশ চন্দ্রকে দিয়ে বাংলা বই লিখিয়ে 'জমি প্রস্তুত' করেছিলেন। চন্দ্রকুমার দে–কে,মর্যাদা দিয়ে তিনি লোক শিক্ষা ও লোক সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়েছিলেন। বিজ্ঞানশিক্ষার জন্য তিনি দানবীরদের অর্থের যথার্থ ব্যবহার নিশ্চিত করেছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে তিনি সারা বিশ্বের মধ্যে সম্মানের আসনে বসিয়েছিলেন। তিনি নতুন অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি করে, তরুণ শিক্ষক নিয়োগ করে বিজ্ঞান শিক্ষাকে পরিপূর্ণ রূপ দেওয়ার জন্য গভীর মনোযোগ দিয়েছিলেন। এই অধ্যায় থেকে এসব বিষয়ে বিস্তারিত জানা যাবে।

৪.৫

পঞ্চম অধ্যায়: স্বামী বিবেকানন্দ ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর শিক্ষাচিন্তা। এই অধ্যায়ে দশটি উপ-শিরোনামে স্বামী বিবেকানন্দ এবং রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর বাংলা ভাষায় শিক্ষাচিন্তার মূল সূত্রগুলো নির্দেশ করা হয়েছে। রামমোহন রায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখের শিক্ষাচিন্তা এঁদের কীভাবে প্রভাবিত করেছিল সেই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অভাবের মধ্যে বাঙালির ধর্মচর্চাকে বিবেকানন্দ সহ্য করতেন না। তাঁর কাছে ক্ষুধার্ত মানুষের চেয়ে ধর্ম বড় ছিল না। তিনি ধর্মের চেয়ে মানুষের কল্যাণকে গুরুত্ব দিতেন বেশি। তিনি। ধর্মের ক্ষেত্রে তিনি বেদান্ত নিয়ে চিন্তা করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন শিক্ষাদীক্ষায় মানুষ উন্নত চিন্তার অধিকারী হলে বিশেষ কোনো ধর্মে গুরুত্ব দিবে না। এমনকি পৃথিবীতে প্রচলিত শ্রেষ্ঠ ধর্মগুলোর অস্তিত্বও ক্রমশ লোপ পাবে। শিক্ষাচিন্তায় তিনি নারীশিক্ষা, জনশিক্ষা, বিজ্ঞানশিক্ষা প্রভৃতির কথা বলেছিলেন। এই বিষয়গুলো তাঁর শিক্ষাচিন্তা অংশে বর্ণিত হয়েছে। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা বিকাশের ক্ষেত্রে কালে কালে পরিভাষার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। বিক্ষিপ্তভাবে অনেকেই এই পরিভাষা তৈরি করেছেন। এক্ষেত্রে অক্ষয়কুমার দত্ত, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের পরিভাষা গুরুত্ব পেলেও সেটা যথেষ্ট ছিল না। তাই রীতিসিদ্ধ উপায়ে পরিভাষা প্রনয়ণের গুরুত্ব বাড়ে। এক্ষেত্রে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী শিক্ষাচিন্তা আলোচনায় এ বিষয়টিতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই অধ্যায় শেষে দেওয়া হয়েছে উপসংহার।

৪.৬

ষষ্ঠ অধ্যায়: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাচিন্তা। এই অধ্যায়ে তেইশটি উপ-শিরোনামে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাচিন্তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দিবার প্রয়োজন পড়ে না। তিনি বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী কবি ও ভাবুক ছিলেন। মানুষের সব রকম কৌতূহল নিয়ে তিনি গভীরভাবে ভাবতে পারতেন। তাঁর কল্পনাশক্তি এবং অনুভব ছিল মানুষকে কেন্দ্র করে। তিনি শিক্ষার মাধ্যমে মানবকল্যাণ সাধন করতে চেয়েছেন। তিনি বুঝেছিলেন শিক্ষার আলো না হলে ভারতবর্ষের মানুষকে তাঁর কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়া যাবে না। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাকে দেখেছেন মানুষের অস্তিত্ব সংকট মোকাবেলার অব্যর্থ হাতিয়ার হিসেবে । তাঁর শিক্ষাতত্ত্বের মূলমন্ত্র হচ্ছে সত্য দর্শন। বিশ্বকবি খ্যাতির আড়ালে তিনি যে অসামান্য শিক্ষাচিন্তক সেই দিকটি এ অধ্যায়ে প্রতিফলিত হয়েছে। বাংলা ভাষায়

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষাচিন্তার ক্রমবিকাশ ধারায় তাঁর চিন্তাভাবনা সবচেয়ে উজ্জ্বল। তিনি অক্ষয়কুমার দত্তের যোগ্য উত্তরসুরী। তিনি ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার গলদ অনুধাবন করে কঠোর সমালোচনা করেছেন। রবীরন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তায় ভাষা মাধ্যম বিবেচনার অন্যতম প্রধান বিষয় হল শিক্ষায় মাতৃভাষার স্থান, শিক্ষাবিস্তারে মাতৃভাষার অপরিহার্যতা। কারণ মাতৃভাষার সঙ্গে আমাদের প্রাণের যে যোগ, তা অন্য কোনো ভাষায় হবার নয়। জীবনের সঙ্গে শিক্ষার সংগতি-রক্ষা করার জন্য শিক্ষায় মাতৃভাষা অপরিহার্য্য। ইংরেজ-প্রবর্তিত শিক্ষাকে তিনি বলেছেন- 'মানসিকশক্তি-হ্রাস-কারী নিরানন্দ শিক্ষা'। তিনি মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করে পূর্ববর্তী এবং সমকালীন ঘটনা প্রবাহের বিচার করে মানবতাবোধ ও সর্বভারতীয় সমন্বয় সাধন করতে চেয়েছেন। তিনি ইউরোপীয় আদর্শের বিশ্ববিদ্যালয়কে গুরুত্ব দেননি। তিনি যুক্তি দেখিয়ে বলেছিলন যে, সংস্কৃতিই ব্যক্তিজীবনকে নানা মাত্রায় সমৃদ্ধ করতে পারে। এই প্রেক্ষাপটেই নালন্দা ও তক্ষশীলা বিশ্বাবিদ্যালয়কে এদেশের শিক্ষার আদর্শ বলে উল্লেখ করেছেন । ইংরেজি ভাষায় শিক্ষা লাভ আমাদের কতটা সমস্যার সেই বিষয়ে তাঁ বক্তব্য ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট। তিনি বলেছেন–'ইংরেজি আামাদের কাজের ভাষা, ভাবের ভাষা নয়। প্রচলিত শিক্ষায় ইংরেজি ভাষার চর্চায় ভাবের চর্চা হয় না, ভাবের সঙ্গে ভাষার মিল হয় না।' 'এই ব্যবস্থায় আমাদের জীবনের মাহেন্দ্রক্ষণ ইংরেজি ভাষা শিক্ষার চেষ্টায় কেটে যায়।' এ শিক্ষা-বিধিতে আনন্দের স্থান নেই। এতে গ্রহণশক্তি, ধারণশক্তি ও চিন্তাশক্তির স্বাভাবিক বললাভ ঘটে না'। তিনি শিক্ষায় মাতৃভাষাকে মাতৃদুগ্ধের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এসব বিষয়ে এই অধ্যায়ে গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

শিক্ষাচিন্তা ও অধ্যায় বিভাজন প্রসঙ্গে

তথ্যসূত্র :

১. আবুল কাসেম ফজলুল হক, মুখবন্ধ, বাঙলাদেশে উচ্চশিক্ষার দুশো বছর,তপন বাগচী ও মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম সম্পাদিত,ফেব্রুয়ারি ২০০৬, সূচীপত্র, ঢাকা, পৃ ৮-৯
২. ev0jv‡'‡k D"Pwk ÿvi '‡kv eQi পূর্বোক্ত , পৃ ৮-৯
৩. স্বপন বসু, বাংলার নবচেতনা, কলিকাতা, ১৯৮৫ পৃ.
৪. ভবতোষ দত্ত, ev0wj i gvbeag, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ,পৌষ ১৪০৬, কলকাতা পৃ.৩
৫. পূর্বোক্ত, পৃ ৯২-৯৩
৬. রাজনারায়ণ বসু অক্ষয়কুমারের প্রার্থনা বিষয়ক সমীকরণ সম্পর্কে লিখেছেন-
হে পাপাসক্ত ব্যক্তি! নরক স্বরূপ তোমার মনের সহিত সেই পরিশুদ্ধ অপাপবিদ্ধ পরমেশ্বরের সম্মুখে উপস্থিত হইতে কি প্রকারে তোমার ভরসা হয়? সুমধুর স্বরে অতি পরিপাটীরূপে বেদ পাঠই কর আর উপনিষদের ভূরি ভূরি শেণ্ঢাক কণ্ঠস্থই থাকুক, আর সুচারুরূপে জিজ্ঞাসু ব্যক্তি-দিগের সন্দেহ সুতর্ক দ্বারা নিবারণই কর তথাপি অন্তর বিশুদ্ধ না হইলে তাহাতে কি ফল দর্শিতে পারে? বরঞ্চ পরমেশ্বর অজ্ঞ পাপী অপেক্ষা বিদ্বান পাপীর প্রতি অধিক রুষ্ট হয়েন। অন্ধব্যক্তি কূপে পতিত হইলে কোন প্রকারে ক্ষমার যোগ্য হইতে পারে না। বিদ্বান পাপী অপেক্ষা অজ্ঞ সাধু মহত্তর ব্যক্তি। হে বিদ্বান! আমি মানিলাম যে তুমি বিবিধ শাস্ত্রে অতি ব্যুৎপন্ন, জ্ঞানোপদেশ প্রদানে অতি দক্ষ, নানা শাস্ত্র হইতে ভূরি ভূরি সমীচীন শেণ্ঢাক সকল উদ্ধৃত করিয়া লোকদিগকে আশ্চর্য্য করিতে পার কিন্তু যে পর্য্যন্ত তুমি তোমার চরিত্র শোধন না কর, তোমার ব্যাখ্যাত উপদেশ সকল কার্য্যেতে পরিণত না কর, সে পর্য্যন্ত তুমি কেবল এক গ্রন্থবাহক চতুষ্পদতুল্য।.
[দ্র. ZË‡ewabx cwÎKv, ৮০ সংখ্যা, চৈত্র ১৭৭১ শক, পৃ ১৮৮]

Dhaka University Institutional Repository

‘বাংলা ভাষায় শিক্ষাচিন্তার ক্রমবিকাশ:অক্ষয়কুমার দত্ত থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর’

অভিসন্দর্ভ-এর সার সংক্ষেপ

প্রথম অধ্যায় : বাংলা ভাষায় শিক্ষাচিন্তার উন্মেষ পর্যায়

এই অধ্যায়টি এগারোটি উপ–শিরোনামে ভাগ করে বাংলা ভাষায় শিক্ষাচিন্তার ক্রমবিকাশ ধারায় অক্ষয়কুমার দত্তের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত শিক্ষার অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। এই বর্ণনায় মধ্যযুগ থেকেই বাংলায় প্রচলিত পাঠশালা শিক্ষাসহ প্রচলিত অন্যান্য প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে । উনিশ শতকে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাবে এ দেশে শিক্ষা ক্ষেত্রে কী ধরণের পরিবর্তন এসেছিল তা তুলে ধরা হয়েছে। এ অধ্যায়ে মিশনারিদের খ্রিষ্টধর্ম প্রচার প্রসঙ্গে আলোচনা স্থান পেয়েছে। এই অধ্যায়ে ‘ডিরোজিও এবং তাঁর অনুসারীদের কর্ম প্রচেষ্টা’ উপ–শিরোনামে ডিরোজিও ও তাঁর শিষ্য ইয়ংবেঙ্গলদের যুক্তিধর্মিতা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, তৎকালীন রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের ধর্মীয় অনাচার, সতীদাহ, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, গৌরীদান কুলীনপ্রথা ও সামাজিক মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁদের অবস্থান প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে ডিরোজিও ও তাঁর শিষ্যদের কর্মকা ও,একাডেমিক এসোসিয়েসন’ জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকা প্রভৃতির ভূমিকা তুলে ধরা হয়েছে। এই অধ্যায়ে ‘রামমোহন রায় ও তাঁর চিন্তাধারা ’ উপ-শিরোনামে রামমোহন রায়ের আধুনিক চিন্তা-চেতনা ও ধর্মীয় সংস্কার প্রতিমা পূজা বা পৌত্তলিকতাবিরোধী আন্দোলন এবং একেশ্বরবাদ ও ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে আলোচনা আছে। ১৮২৯ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেন। এর ফলে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ আরো বেশি আতঙ্কিত হয়ে ওঠে এবং এর প্রতিবাদে ১৮৩০ সালে ১৭ই জানুয়ারি তাঁরা সনাতন হিন্দুধর্ম রক্ষার জন্য ‘ধর্মসভা’ স্থাপন করে। এ সভার সভ্যরা ধর্ম গেল, জাত গেল বলে কলকাতা শহরকে কাঁপিয়ে তুলেছিল। এসব বিষয়সহ বিজ্ঞানভিত্তিক আধুনিক শিক্ষা পরিকল্পনায় রামমোহন রায়ের গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা ধারা ও কর্মকা ও এখানে তুলে ধরা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, অক্ষয়কুমার দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরী, শিবনাথ শাস্ত্রী, কাজী আবদুল ওদুদ, বিনয় ঘোষ, যোগানন্দ দাশ, ড.অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমুখ মনীষীগণ রামমোহন রায়ের অবদান সম্পর্কে যে মতামত দিয়েছেন তার আলোকে তাঁকে মূল্যায়ন করা হয়েছে। এই অংশে রামমোহন রায়ের শিক্ষাদর্শন ও চিন্তাধার একটা পূর্ণাঙ্গ পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ের উপ– শিরোনামগুলো নিম্নে দেওয়া হলো:

⊙ পরিচয় ⊙ উনিশ শতকের বাঙালির শিক্ষা ব্যবস্থার চিত্র ⊙ বাংলায় ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তন ⊙ মিশনারিদের শিক্ষা বিস্তার ⊙ ডিরোজিও এবং তাঁর অনুসারীদের কর্ম প্রচেষ্টা ◎ গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক ◎ ডিরোজি অনুসারীদের বা ইয়ং বেঙ্গল ◎ হিন্দু ধর্মমত ও আচার-সংস্কারে আঘাত ⊙ রামমোহন রায় ও তাঁর চিন্তাধারা ◎ রামমোহন রায়ের কর্ম পরিচয় ◎ রামমোহন রায়ের শিক্ষাদর্শন।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়: অক্ষয়কুমার দত্তের শিক্ষাচিন্তা

এই অধ্যায়ে একুশটি উপ-শিরোনামে অক্ষয়কুমার দত্তের শিক্ষাচিন্তা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমে পরিচয় অংশে অক্ষয়কুমার দত্তের চিন্তার সূত্রগুলি উল্লেখ করা হয়েছে। অক্ষয়কুমার দত্তের মানস বৈশিষ্ট্য অংশে তাঁর মানবতাবোধ, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, মাতৃভাষায় বাঙালির শিক্ষাদানের অভিপ্রায়, অসাধারণ কর্মস্পৃহা প্রভৃতি দিক তুলে ধরা হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অসমাপ্ত রেখে তাঁর কর্মে আত্মনিয়োগ, অর্থ-কষ্টের মধ্যেও স্বজাতির সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করার মানসে দুটি পত্রিকা সম্পদনা, দুটি স্কুলে শিক্ষকতা, বাংলা ভাষায় ভূ-গোল বিজ্ঞান শিক্ষা বিষয়ক পাঠ্যপুস্তক রচনা, নারীশিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধ রচনা, সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখের সঙ্গে পরিচয় লাভ প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে 'প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও কর্মজীবন' উপ-শিরোনামে। 'শিক্ষাচিন্তায় আত্মপ্রকাশ' উপ-শিরোনামে তাঁর শিক্ষাচিন্তার সময় প্রেক্ষাপট নির্দেশ করা হয়েছে। এর পর তাঁর শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, শিক্ষানীতি, শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা ভাষার গুরুত্ব, শিশুর মানসিক বিকাশে মাতৃভাষায় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। অক্ষয়কুমার দত্ত মাতৃভাষায় শিক্ষার অন্তরায় সমূহ অনুধাবন করে সেগুলো দূর করার জন্য যে গুরুত্বপূর্ণ মতামত দিয়েছেন তা উল্লেখ পূর্বক শিক্ষা বিষয়ে তাঁর মৌলিক চিন্তা ও শিক্ষাপদ্ধতি আলোচনা করা হয়েছে,'বিশেষ ধরনের শিক্ষার পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি (প্রথম স্তর বা পর্ব: প্রাথমিক শিক্ষা, দ্বিতীয় স্তর বা পর্ব : মাধ্যমিক শিক্ষা, তৃতীয় স্তর বা পর্ব : উচ্চশিক্ষা) উপ-শিরোনামে। এরপর পর্যায়ক্রমে 'নারীশিক্ষা ও শিশুর বিকাশে শিক্ষিত মায়ের ভূমিকা', 'বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষার গুরুত্ব', 'বিজ্ঞান বিষয়ক রচনার ভাষা-বৈশিষ্ট্য', 'বিজ্ঞান শিক্ষায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা', 'শিক্ষার উপকরণ পরিকল্পনা', 'শিক্ষাদানের জন্য উপযুক্ত শিক্ষক নির্বাচন' এবং 'শিক্ষার্থীর শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য ও পরিবেশ' উপ-শিরোনামে বাংলা ভাষায় শিক্ষাচিন্তার ক্রমবিকাশ ধারায় তাঁর চিন্তা তুলে ধরা হয়েছে। উনিশ শতকের প্রধান শিক্ষাচিন্তকদের অন্যতম অক্ষয়কুমার বাংলা ভাষায় শিক্ষাদানের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের চিত্তের যে বিকাশ সাধন করতে চেয়েছিলেন এবং শিক্ষাকে গ্রাম্য বর্বরতা ও রক্ষণশীল ধর্মীয় প্রভাব থেকে মুক্ত করার মানসে শিক্ষাচিন্তার যে ধারার সূচনা করেছিলেন তা আলোচনা করা হয়েছে । সেই সঙ্গে বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি, অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, নীতিতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর গভীর জ্ঞান ও অধ্যাবসায়ের সূত্রগুলো নির্দেশ করা হয়েছে। অক্ষয়কুমার দত্ত শিক্ষার বিভিন্ন দিক নিয়ে লেখনীর মাধ্যমে তৎকালীন পশ্চাদমুখী শিক্ষাচিন্তার কীভাবে বিরোধিতা করেছেন, শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করে তা থেকে উত্তরণেতিনি কী উপায় নির্দেশ করেছেন, এসব জিজ্ঞাসার উত্তর অনুসন্ধান করা হয়েছে এখানে। এই অধ্যায়ের উপ– শিরোনামগুলো নিম্নে দেওয়া হলো:

⊙পরিচয়⊙ অক্ষয়কুমার দত্তের মানস বৈশিষ্ট্য⊙ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ⊙ কর্মজীবন : শিক্ষকতা ও পত্রিকা সম্পাদনা◎ বিদ্যাদর্শন পত্রিকা সম্পাদনা◎তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদনা◎ তËবোধিনী পাঠশালায় শিক্ষকতা◎ কলকাতা নর্মাল স্কুলে শিক্ষকতা⊙ শিক্ষাচিন্তায় আত্মপ্রকাশ: জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা⊙ শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ⊙ শিক্ষার মাধ্যম ও শিক্ষানীতি নির্ধারণ⊙ শিক্ষার্থীর মানসিক বিকাশে মাতৃভাষার ভূমিকা⊙ মাতৃভাষায় শিক্ষার অন্তরায় অনুধাবন⊙ বিশেষ ধরনের শিক্ষার পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি:প্রথম স্তর বা পর্ব: প্রাথমিক শিক্ষা, দ্বিতীয় স্তর বা পর্ব : মাধ্যমিক শিক্ষা, তৃতীয় স্তর বা পর্ব : উচ্চশিক্ষা⊙ স্ত্রীশিক্ষা ও শিশুর বিকাশে শিক্ষিত মায়ের ভূমিকা⊙ বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষার গুরুত্ব⊙ বিজ্ঞান বিষয়ক রচনার ভাষা-বৈশিষ্ট্য⊙ বিজ্ঞান শিক্ষায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা⊙ শিক্ষার উপকরণ পরিকল্পনা⊙ শিক্ষাদানের জন্য উপযুক্ত শিক্ষক নির্বাচন ⊙ শিক্ষার্থীর শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য ও পরিবেশ

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায় : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শিক্ষাচিন্তা

এই অধ্যায়ে এগারটি উপ-শিরোনামে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শিক্ষাচিন্তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। উনিশ শতকের শ্রেষ্ঠ চিন্তকদের একজন হিসেবে শিক্ষা ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের পরিচয় পাওয়া যাবে। বাংলা গদ্যের জনক বিদ্যাসাগরের জেদ, আত্মমর্যাদাবোধ, বাঙালিত্বের অহংকার, নারীর প্রতি মর্যাদা, সমাজ সংস্কার মনোভাব প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে এই অধ্যায়ের ' ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মানস বৈশিষ্ট্য উপ–শিরোনামে বর্ণনা করা হয়েছে । সে কালের নিরিখে মানবিক বিদ্যার সাধক হিসেবে তিনি কতটা গুরুত্বপূর্ণ ও উচ্চ মানের মানুষ ছিলেন সেটাও এখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে । শিক্ষার মাধ্যমে তিনি কীভাবে এদেশের মানুষকে কুসংস্কারমুক্ত ও আত্মসচেতন করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, কীভাবে তিনি বাঙালির শিক্ষাচিন্তায় সমন্বয় সাধকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন , শিক্ষানীতিতে তিনি কী ধরণের সংস্কার সাধন করেছেন, বাংলার দক্ষিণাঞ্চলের স্কুলসমূহ পরিদর্শনে গিয়ে কীভাবে গ্রাম- গ্রামান্তরে মডেল স্কুল ও বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন, শিক্ষায় সমন্বয় সাধন করতে গিয়ে তিনি কী উপায়ে ইংরেজি ও সংস্কৃত ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম না করে বাংলা ভাষাকে গ্রহণ করেছেন, এসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে এই অধ্যায়ে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাঙালির শিক্ষার সহায়ক মাধ্যম হিসেবে ইংরেজি কিংবা সংস্কৃত কোনোটির উপরই পূর্ণ আস্থা রাখতে পারেননি। কারণ তিনি বুঝেছিলেন সংস্কৃত শিক্ষার পক্ষে পরিবর্তনশীল সমাজ ব্যবস্থার দাবী মিটানো সম্ভব নয় এবং ইংরেজির মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষাও সাধারণ মানুষের গ্রহণযোগ্য বিষয় নয়। তাই তিনি বাঙালির চিন্তাগঠন ও জ্ঞানার্জনের এ দুটি বিদ্যার সমন্বয়ে এক নতুন শিক্ষাদর্শ গড়ে তুলেছিলেন। এই বিষয়টি বিশিষ্ট লেখক সমালোচকদের মতামতের ভিত্তিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। বিদ্যাশিক্ষার পদ্ধতির ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর কোনো প্রকার মিশ্রণ না ঘটিয়ে কীভাবে আপন চিন্তাবলে অগ্রসর হয়েছিলেন তার সূত্র নির্দেশ করা হয়েছে। তিনি সংস্কৃতের সাহায্যে কীভাবে মাতৃভাষাকে শক্তিশালী এবং ইংরেজির মাধ্যমে পাশ্চাত্যের জ্ঞান আহরণ করে মাতৃভাষাকে কীভাবে সম্পদশালী করেছিলেন সে বিষয়ে আলোচনাও এই অধ্যায়ে পাওয়া যাবে। তিনি বাংলা ভাষায় জনশিক্ষা বিস্তারের জন্য সংস্কৃত কলেজ থেকে বাংলা ভাষায় পরিপূর্ণ দক্ষতাসম্পন্ন মানুষ তৈরি করতে চেয়েছিলেন। যাতে তাঁরা পরবর্তীতে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে মাতৃভাষার মাধ্যমে যুগোপযোগী শিক্ষা সাধারণের কাছে পৌঁছে দিতে পারে। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তিনি বাংলা ভাষায় কী ধরনের গ্রন্থ রচনা ও বিদ্যালয় স্থাপনে ব্রতী হয়েছিলেন সেই বিষয়েও আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ের উপ– শিরোনামগুলো নিম্নে দেওয়া হলো:

⊙পরিচয়⊙ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মানস বৈশিষ্ট্য⊙ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা⊙ কর্মজীবন⊙ শিক্ষাচিন্তায় আত্মনিয়োগ⊙ শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য⊙ শিক্ষা পরিকল্পনা ও পদ্ধতি⊙ আদর্শ বঙ্গ বিদ্যালয় স্থাপন⊙ শিক্ষা বিষয়ক পাঠ্যপুস্তক রচনা⊙ নারীশিক্ষা ও নারীর মর্যাদা⊙ জনশিক্ষা

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায় : আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের শিক্ষাচিন্তা

এই অধ্যায়ে তেরটি উপ-শিরোনামে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের শিক্ষাচিন্তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আশুতোষ ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আদর্শে অনুপ্রাণিত। বিদ্যাসাগরের মতো জেদি এবং কথায় কর্মে এক ছিলেন। তিনিও বিদ্যাসাগরের মতো বাঙালি পোশাকে নিজেকে ধন্য মনে করতেন। তিনি বাংলা ভাষাকে উচ্চ শিক্ষা গৃহে স্থান দিয়েছিলেন। বাংলা ভাষার পাঠক তৈরির ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন পত্রিকার অবদানকে তিনি বড় করে দেখতেন। এ অধ্যায়ে 'আশুতোষের শিক্ষা পরিকল্পনায় বঙ্কিমচন্দ্রর প্রভাব' উপ–শিরোনামে বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে। এতে বঙ্কিমচন্দ্রের লোকশিক্ষা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ মতামত তুলে ধরা হয়েছে। আশুতোষ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে তাঁর শিক্ষাচিন্তার প্রতিফলন ঘটিয়েছিলেন। বিভিন্ন সমাবর্তন ভাষণের উপর ভিত্তি করে এই অধ্যায়ে সেই চিন্তার একটি পূণাঙ্গ পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে । বাংলা ভাষায় শিক্ষা চিন্তা বিষয়ে আশুতোষ তাঁর স্বপ্নকে'মাতৃসমা মাতৃভাষায়'সম্পদশালিনী করে জীবন ধন্য করতে চেয়েছিলেন। তিনি বলতেন–'যে জাতির নিজের পরিচয়যোগ্য ভাষা নাই বা নিজের জাতীয় সাহিত্য নাই, সে জাতির বড়ই দুর্ভাগ্য। তাঁ কাছে শিক্ষার উদ্দেশ্য আত্মবিকাশ লাভ করা, হৃদয়ের মার্জ্জনা করা। দর্পণের ন্যায় বিশ্বের প্রতিবিম্ব গ্রহণে হৃদয়কে সমর্থ করা। তাঁর লক্ষ্য ছিল মাতৃভাষায় শিক্ষার মাধ্যমে সাধারণের উন্নতি করা এবং তাঁদের অর্থনৈতিক মুক্তির পথ সুগম করা।তিনি উচ্চশিক্ষার বিস্তারকে তিনি 'প্রগতির পথে প্রথম পদক্ষেপ' মনে করতেন।এসব বিষয় অনুসন্ধানী মন নিয়ে বিবেচনা করা হয়েছে আলোচ্য অধ্যায়ে। বিচক্ষণ বিচারক, খ্যাতিমান গণিতজ্ঞ আশুতোষ বাংলা ভাষা–সাহিত্যের মধ্য দিয়ে কীভাবে ভারতের ঐক্য স্থাপন করতে চেয়েছিলেন, কীভাবে সমকালীন শিক্ষাব্যবস্থার দোষ-ত্রুটি, সমস্যা–সংকট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির গলদ প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে কীভাবে ধারণা লাভ করেছিলেন, কীভাবে বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছিলেন,কী অসীম ধৈর্য্য নিয়ে বিজ্ঞান ও আইন কলেজ স্থাপন, স্কুল-কলেজের সিলেবাসে বাংলা পত্র চালু, বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ক্লাস প্রবর্তন প্রভৃতি কাজ করেছিলেন তা এই অধ্যায়ে আলোচনা কওে তাঁর শিক্ষাচিন্তার গভীরতা নির্দেশ করা হয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষায় উচ্চ শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে তিনি দীনেশ চন্দ্রকে দিয়ে বাংলা বই লিখিয়ে 'জমি প্রস্তুত' করেছিলেন। চন্দ্রকুমার দে–কে,মর্যাদা দিয়ে তিনি লোক শিক্ষা ও লোক সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়েছেন। বিজ্ঞানশিক্ষার জন্য তিনি দানবীরদের অর্থের যথার্থ ব্যবহার নিশ্চিত করেছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে তিনি সারা বিশ্বের মধ্যে সম্মানের আসনে বসিয়েছিলেন। তিনি নতুন অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি করে, তরুণ শিক্ষক নিয়োগ করে বিজ্ঞান শিক্ষাকে পরিপূর্ণ রূপ দেওয়ার জন্য গভীর মনোযোগ দিয়েছিলেন। এই অধ্যায় থেকে এসব বিষয়ে বিস্তারিত জানা যাবে। এই অধ্যায়ের উপ–শিরোনামগুলো নিম্নে দেওয়া হলো:

⊙ পরিচয় ⊙ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মানস বৈশিষ্ট্য ⊙ প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও কর্মজীবন ⊙ শিক্ষা চিন্তায় আত্মনিয়োগ ⊙ শিক্ষার লক্ষ্য ও শিক্ষানীতি পরিকল্পনা ⊙ আশুতোষের শিক্ষা পরিকল্পনায় বঙ্কিমচন্দ্রর প্রভাব ⊙ জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন ও শিক্ষা সংস্কার প্রস্তুতি ⊙ মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কার ⊙ উচ্চশিক্ষা পরিকল্পনা ও গবেষণা স্থাপন ⊙ শিক্ষক নিয়োগ ও বিজ্ঞান শিক্ষার বিকাশ ⊙ মাতৃভাষায় শিক্ষার মাধ্যমে জাতীয় ঐক্য ⊙ মহীশূর ভাষণে জনশিক্ষার গুরুত ⊙ শিক্ষা সংস্কার ও বিকাশের মৌলিক দিক

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায় : স্বামী বিবেকানন্দ ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর শিক্ষাচিন্তা

এই অধ্যায়ে দশটি উপ-শিরোনামে স্বামী বিবেকানন্দ এবং রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর বাংলা ভাষায় শিক্ষাচিন্তার মূল সূত্রগুলো নির্দেশ করা হয়েছে। রামমোহন রায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখের শিক্ষাচিন্তা এঁদের কীভাবে প্রভাবিত করেছিল সেই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অভাবের মধ্যে বাঙালির ধর্মচর্চাকে বিবেকানন্দ সহ্য করতেন না। তাঁর কাছে ক্ষুধার্ত মানুষের চেয়ে ধর্ম বড় ছিল না। তিনি ধর্মের চেয়ে মানুষের কল্যাণকে গুরুত্ব দিতেন বেশি। ধর্মের ক্ষেত্রে তিনি বেদান্ত নিয়ে চিন্তা করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন শিক্ষাদীক্ষায় মানুষ উন্নত চিন্তার অধিকারী হলে বিশেষ কোনো ধর্মে গুরুত্ব দিবে না। এমনকি পৃথিবীতে প্রচলিত শ্রেষ্ঠ ধর্মগুলোর অস্তিত্বও থাকবে না। শিক্ষাচিন্তায় তিনি নারীশিক্ষা, জনশিক্ষা, বিজ্ঞানশিক্ষা প্রভৃতির কথা বলেছিলেন। এই বিষয়গুলো তাঁর শিক্ষাচিন্তা অংশে বর্ণিত হয়েছে। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা বিকাশের ক্ষেত্রে কালে কালে পরিভাষার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। বিক্ষিপ্তভাবে অনেকেই এই পরিভাষা তৈরি করেছেন। এক্ষেত্রে অক্ষয়কুমার দত্ত, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের পরিভাষা গুরুত্ব পেলেওসেটা যথেষ্ট ছিল না। তাই রীতিসিদ্ধ উপায়ে পরিভাষা প্রনয়ণের গুরুত্ব বাড়ে। এক্ষেত্রে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী শিক্ষাচিন্তা আলোচনায় এ বিষয়টিতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই অধ্যায় শেষে দেওয়া হয়েছেউপসংহার।এই অধ্যায়ের উপ–শিরোনামগুলো নিম্নে দেওয়া হলো:

স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাচিন্তা:○ পরিচয় ○স্বামী বিবেকানন্দের মানস বৈশিষ্ট্য○প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও কর্ম ○শিক্ষাচিন্তায় আত্মনিয়োগরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর শিক্ষাচিন্তা:○পরিচয়○রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মানস বৈশিষ্ট্য○প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও কর্ম○বাংলা ভাষায় অনুরাগ ও ইংরেজি শিক্ষার বিরোধীতা○বাংলা ভাষায় শিক্ষা বিস্তারে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা○পরিভাষা চর্চায় ভূমিকা

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাচিন্তা

এই অধ্যায়ে তেইশটি উপ-শিরোনামে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাচিন্তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দিবার প্রয়োজন পড়ে না। তিনি বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী কবি ও ভাবুক ছিলেন। মানুষের সব রকম কৌতূহল নিয়ে তিনি গভীরভাবে ভাবতে পারতেন। তাঁর কল্পনাশক্তি এবং অনুভব ছিল মানুষকে কেন্দ্র করে। তিনিশিক্ষার মাধ্যমে মানবকল্যাণ সাধন করতে চেয়েছেন। তিনি বুঝেছিলেন শিক্ষার আলো না হলে ভারতবর্ষের মানুষকে তাঁর কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়া যাবে না। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাকে দেখেছেন মানুষের অস্তিত্ব সংকট মোকাবেলার অব্যর্থ হাতিয়ার হিসেবে । তাঁর শিক্ষাতত্ত্বের মূলমন্ত্র হচ্ছে সত্য দর্শন। বিশ্বকবি খ্যাতির আড়ালে তিনি যে অসামান্য শিক্ষাচিন্তক সেই দিকটি এ অধ্যায়ে প্রতিফলিত হয়েছে। বাংলা ভাষায় শিক্ষাচিন্তার ক্রমবিকাশ ধারায় তাঁর চিন্তাভাবনা সবচেয়ে উজ্জ্বল। তিনি অক্ষয়কুমার দত্তের যোগ্য উত্তরসুরী। তিনি ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার গলদ অনুধাবন করে কঠোর সমালোচনা করেছেন। রবীরন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তায় ভাষা মাধ্যম বিবেচনার অন্যতম প্রধান বিষয় হল শিক্ষায় মাতৃভাষার স্থান, শিক্ষাবিস্তারে মাতৃভাষার অপরিহার্যতা। কারণ মাতৃভাষার সঙ্গে আমাদের প্রাণের যে যোগ, তা অন্য কোনো ভাষায় হবার নয়। জীবনের সঙ্গে শিক্ষার সংগতি-রক্ষা করার জন্য শিক্ষায় মাতৃভাষা অপরিহার্য্য। ইংরেজ-প্রবর্তিত শিক্ষাকে তিনি বলেছেন- 'মানসিকশক্তি-হ্রাস-কারী নিরানন্দ শিক্ষা'। তিনি মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করে পূর্ববর্তী এবং সমকালীন ঘটনা প্রবাহের বিচার করে মানবতাবোধ ও সর্বভারতীয় সমন্বয় সাধন করতে চেয়েছেন। তিনি ইউরোপীয় আদর্শের বিশ্ববিদ্যালয়কে গুরুত্ব দেননি। তিনি যুক্তি দেখিয়ে বলেছিলন যে, সংস্কৃতিই ব্যক্তিজীবনকে নানা মাত্রায় সমৃদ্ধ করতে পারে। এই প্রেক্ষাপটেই নালন্দা ও তক্ষশীলা বিশ্বাবিদ্যালয়কে এদেশের শিক্ষার আদর্শ বলে উল্লেখ করেছেন । ইংরেজি ভাষায় শিক্ষা লাভ আমাদের কতটা সমস্যার সেই বিষয়ে তাঁ বক্তব্য ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট। তিনি বলেছেন–'ইংরেজি আামাদের কাজের ভাষা, ভাবের ভাষা নয়। প্রচলিত শিক্ষায় ইংরেজি ভাষার চর্চায় ভাবের চর্চা হয় না, ভাবের সঙ্গে ভাষার মিল হয় না।' 'এই ব্যবস্থায় আমাদের জীবনের মাহেন্দ্রক্ষণ ইংরেজি ভাষা শিক্ষার চেষ্টায় কেটে যায়।' এ শিক্ষা-বিধিতে আনন্দের স্থান নেই। এতে গ্রহণশক্তি, ধারণশক্তি ও চিন্তাশক্তির স্বাভাবিক বললাভ ঘটে না'। তিনি শিক্ষায় মাতৃভাষাকে মাতৃদুগ্ধের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এসব বিষয়ে এই অধ্যায়ে গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।এই অধ্যায়ের উপ– শিরোনামগুলো নিম্নে দেওয়া হলো:

⊙ পরিচয় ⊙ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মানস বৈশিষ্ট্য ⊙ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও কর্ম ⊙ শিক্ষাচিন্তায় আত্মনিয়োগ ⊙ শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ⊙ শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষা ⊙ মাতৃভাষায় শিক্ষা বিকাশের অন্তরায় ⊙ শিক্ষা পরিকল্পনা ও বিধি-পদ্ধতি ⊙ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন ◎ শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ◎ বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা ⊙ বিদ্যালয় পরিচালনা প্রসঙ্গে বিশেষ চিঠি ◎ ছাত্রদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ◎ বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের জাগরণ প্রত্যাশা ◎ শিক্ষা প্রশাসন পরিকল্পনা ◎ শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য ◎ ছাত্র–শিক্ষক সম্পর্ক ⊙ নারীশিক্ষা ⊙ জনশিক্ষা ও পল্লি উন্নয়ন ⊙ স্বদেশপ্রেম ও সমাজ উন্নয়ন ⊙ শিক্ষায় ঐক্যসাধন ও বিজ্ঞানশিক্ষা ⊙ শিশু শিক্ষায় প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রভাব ⊙ শিক্ষাচিন্তা গঠনে পারিবারিক প্রভাব ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা।

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায় : বাংলা ভাষায় শিক্ষাচিন্তার উন্মেষ পর্যায় পৃষ্ঠা ১ - ২৮

○ পরিচয় ○ উনিশ শতকের বাঙালির শিক্ষা ব্যবস্থার চিত্র ○ বাংলায় ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তন ○ মিশনারিদের শিক্ষা বিস্তার ○ ডিরোজিও এবং তাঁর অনুসারীদের কর্ম প্রচেষ্টা ◎ গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক ◎ ডিরোজি অনুসারী বা ইয়ং বেঙ্গল ◎ হিন্দু ধর্মমত ও আচার-সংস্কারে আঘাত ○ রামমোহন রায় ও তাঁর চিন্তাধারা ◎ রামমোহন রায়ের কর্ম পরিচয় ◎ রামমোহন রায়ের শিক্ষাদর্শন

দ্বিতীয় অধ্যায় : অক্ষয়কুমার দত্তের শিক্ষাচিন্তা পৃষ্ঠা ২৯ - ৭৭

○ পরিচয় ○ অক্ষয়কুমার দত্তের মানস বৈশিষ্ট্য ○ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ○ কর্মজীবন : শিক্ষকতা ও পত্রিকা সম্পাদনা ◎ বিদ্যাদর্শন পত্রিকা সম্পাদনা ◎ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদনা ◎ তËবোধিনী পাঠশালায় শিক্ষকতা ◎ কলকাতা নর্মাল স্কুলে শিক্ষকতা ○ শিক্ষাচিন্তায় আত্মপ্রকাশ: জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ○ শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ○ শিক্ষার মাধ্যম ও শিক্ষানীতি নির্ধারণ ○ শিক্ষার্থীর মানসিক বিকাশে মাতৃভাষার ভূমিকা ○ মাতৃভাষায় শিক্ষার অন্তরায় অনুধাবন ○ বিশেষ ধরনের শিক্ষার পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি: প্রথম স্তর বা পর্ব: প্রাথমিক শিক্ষা, দ্বিতীয় স্তর বা পর্ব : মাধ্যমিক শিক্ষা, তৃতীয় স্তর বা পর্ব : উচ্চশিক্ষা ○ নারীশিক্ষা ও শিশুর বিকাশে শিক্ষিত মায়ের ভূমিকা ○ বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষার গুরুত্ব ○ বিজ্ঞান বিষয়ক রচনার ভাষা-বৈশিষ্ট্য ○ বিজ্ঞান শিক্ষায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ○ শিক্ষার উপকরণ পরিকল্পনা ○ শিক্ষাদানের জন্য উপযুক্ত শিক্ষক নির্বাচন ○ শিক্ষার্থীর শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য ও পরিবেশ ।

তৃতীয় অধ্যায় : বিদ্যাসাগরের শিক্ষাচিন্তা পৃষ্ঠা ৭৮ - ১১২

○ পরিচয় ○ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মানস বৈশিষ্ট্য ○ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ○ কর্মজীবন ○শিক্ষাচিন্তায় আত্মনিয়োগ ○ শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ○ শিক্ষা পরিকল্পনা ও পদ্ধতি ○ আদর্শ বঙ্গ বিদ্যালয় স্থাপন ○ শিক্ষা বিষয়ক পাঠ্যপুস্তক রচনা ○ নারীশিক্ষা ও নারীর মর্যাদা ○ জনশিক্ষা

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায় : আশুতোষের শিক্ষাচিন্তা পৃষ্ঠা ১১৩ - ১৪৯

○ পরিচয় ○ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মানস বৈশিষ্ট্য ○ প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও কর্মজীবন ○ শিক্ষা চিন্তায় আত্মনিয়োগ ○ শিক্ষার লক্ষ্য ও শিক্ষানীতি পরিকল্পনা ○ আশুতোষের শিক্ষা পরিকল্পনায় বঙ্কিমচন্দ্রর প্রভাব ○ জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন ও শিক্ষা সংস্কার প্রস্তুতি ○ মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কার ○ উচ্চশিক্ষা পরিকল্পনা ও গবেষণা স্থাপন ○ শিক্ষক নিয়োগ ও বিজ্ঞান শিক্ষার বিকাশ ○ মাতৃভাষায় শিক্ষার মাধ্যমে জাতীয় ঐক্য ○ মহীশূর ভাষণে জনশিক্ষার গুরুত ○ শিক্ষা সংস্কার ও বিকাশের মৌলিক দিক

পঞ্চম অধ্যায়: স্বামী বিবেকানন্দ ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর শিক্ষাচিন্তা পৃষ্ঠা ১৫০ - ১৬৯

স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাচিন্তা: ○ পরিচয় ○ স্বামী বিবেকানন্দের মানস বৈশিষ্ট্য ○ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও কর্ম ○ শিক্ষাচিন্তায় আত্মনিয়োগ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর শিক্ষাচিন্তা: ○ পরিচয় ○ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মানস বৈশিষ্ট্য ○ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও কর্ম ○ বাংলা ভাষায় অনুরাগ ও ইংরেজি শিক্ষার বিরোধীতা ○ বাংলা ভাষায় শিক্ষা বিস্তারে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ○ পরিভাষা চর্চায় ভূমিকা

ষষ্ঠ অধ্যায়: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাচিন্তা পৃষ্ঠা ১৭০ - ২১৭

○ পরিচয় ○ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মানস বৈশিষ্ট্য ○ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও কর্ম ○ শিক্ষাচিন্তায় আত্মনিয়োগ ○ শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ○ শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষা ○ মাতৃভাষায় শিক্ষা বিকাশের অন্তরায় ○ শিক্ষা পরিকল্পনা ও বিধি-পদ্ধতি ○ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন ◎ শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ◎ বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা ○ বিদ্যালয় পরিচালনা প্রসঙ্গে বিশেষ চিঠি ◎ ছাত্রদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ◎ বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের জাগরণ প্রত্যাশা ◎ শিক্ষা প্রশাসন পরিকল্পনা ◎ শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য ◎ ছাত্র–শিক্ষক সম্পর্ক ○ নারীশিক্ষা ○ জনশিক্ষা ও পল্লি উন্নয়ন ○ স্বদেশপ্রেম ও সমাজ উন্নয়ন ○ শিক্ষায় ঐক্যসাধন ও বিজ্ঞানশিক্ষা ○ শিশু শিক্ষায় প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রভাব ○ শিক্ষাচিন্তা গঠনে পারিবারিক প্রভাব ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা

উপসংহার পৃষ্ঠা ২১৮ - ২২৫

গ্রন্থপঞ্জি

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

বাংলা ভাষায় শিক্ষাচিন্তার উন্মেষ পর্যায়

প্রফুল্লচন্দ্রের শিক্ষা চিন্তা:

১. পরিচয়
২. উনিশ শতকের বাঙালির শিক্ষা ব্যবস্থার চিত্র
৩. বাংলায় ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তন
৪. মিশনারিদের শিক্ষা বিস্তার
৫. ডিরোজিও এবং তাঁর অনুসারীদের কর্ম প্রচেষ্টা
৫.২ গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক
৫.৩ ডিরোজি অনুসারী বা ইয়ং বেঙ্গল
৫.৪ হিন্দু ধর্মমত ও আচার-সংস্কারে আঘাত
৬. রামমোহন রায় ও তাঁর চিন্তাধারা
৬.২ রামমোহন রায়ের কর্ম পরিচয়
৬.৩ রামমোহন রায়ের শিক্ষাদর্শন

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

বাংলা ভাষায় শিক্ষাচিন্তার উন্মেষ পর্যায়

পরিচয়

উনিশ শতকে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাবে বাংলার প্রাচীন সমাজব্যবস্থা কতগুলো নতুন জিজ্ঞাসার সম্মূখীন হয়। সে জিজ্ঞাসা ছিল সচেতন বাঙালির আত্মজিজ্ঞাসা। আর তা গড়ে উঠেছিল সেকালে বাংলায় প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস, সামাজিক রীতিনীতি এবং রাজনৈতিক দাবিদাওয়াকে ভিত্তি করে। আত্মসচেতন বাঙালির এ জিজ্ঞাসা বিস্তার লাভ করে প্রথমত কলকাতা শহরকে কেন্দ্র করে। নতুন যুগের নতুন শহরের প্রতিনিধি হয় কলকাতা। বিভিন্ন ধর্ম বর্ণের নানা লোকের ভিড়ে, তাঁদের চিন্তাচেতনায় এবং শাসক ইংরেজের যুগোপযোগী পরিকল্পনায় কলকাতা আধুনিক শহরের রূপ পরিগ্রহ করে। তখন একদল সুযোগসন্ধানী লোক বিকাশমান শহর কলকাতায় এসে 'দেওয়ানি বা মুচ্ছদ্দিগিরি' করে প্রচুর অর্থ-বিত্তের মালিক হন। এঁদের মধ্যে আধুনিক বাংলার প্রথম চিন্তানায়ক হিসেবে স্বীকৃত রামমোহন রায়ও ছিলেন। তাঁর অন্তরঙ্গ দ্বারকানাথ ঠাকুর দু'বছর কলকাতার সল্টবোর্ডের দেওয়ান ছিলেন। এ সময় 'কলকাতার রথচাইল্ড' হিসেবে পরিচিত বিখ্যাত ধনী মতিলাল শীল 'বিদেশাগত জাহাজের মুচ্ছদ্দিগিরির কাজ করতেন। তখন ধর্মসভা'র একনিষ্ঠ সম্পাদকও বহু জায়গায় দেওয়ানির কাজ করেছেন। এঁরা শাসক ইংরেজের পদস্থ ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন করে চলতেন। এসব বিত্তবান শিক্ষিত দেওয়ানরা বা বাংলার প্রথম জিজ্ঞাসার বাহকেরা ছিলেন আপসপন্থী– ব্যক্তিস্বার্থ ও গোষ্ঠীস্বার্থের কারণে। ফলে একটি নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্তই তাঁরা এ জিজ্ঞাসাকে ভাষা দিয়েছিলেন। দেশীয় ঐতিহ্য সচেতন এবং অধিকাংশ দেশীয় প্রথা সম্পর্কে ভক্তির পাশাপাশি পাশ্চাত্য শিক্ষা ও আধুনিক যুক্তিবাদের প্রতি কিছুটা মোহও তাঁদের ছিল। সেকারণে তাঁদের জীবনে ও আচার-আচরণে দেখা দিয়েছিল বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্তির বিরোধ। তার মধ্যে বাংলায় ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তন, মিশনারিদের ধর্ম প্রচার, বাংলা ভাষায় বই ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশ, স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা এবং বাঙালি শ্রেষ্ঠ মনীষীদের শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারমূলক বিভিন্ন কর্মতৎপরতা প্রভৃতি লক্ষ করা যায়। এ অধ্যায়ে আমরা বাংলা ভাষায় শিক্ষাচিন্তার উন্মেষ পর্যায়টি কয়েকটি উপ–শিরোনামে ভাগ করে আলোচনা করার প্রয়াস পাবো।

২

উনিশ শতকের বাঙালির শিক্ষা ব্যবস্থার চিত্র

শিক্ষার ক্রমবিকাশ ধারায় দেখা যায় যে, মধ্যযুগ থেকেই জনগণ কর্তৃক সমর্থিত এবং জনগণের চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যেই নিয়োজিত বাংলায় এক ধরনের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। এই প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই পাঠশালা নামে পরিচিত। আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্কুল থেকে এর চরিত্র ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। চিরাচরিত রীতিতে, যা সহজবোধ্য উপায়ে ব্যবহারিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। উনিশ শতকের শেষের দিকে সরকার এ দেশীয় প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা 'সংস্কার' করার চেষ্টা করে; এ প্রতিষ্ঠানের উপর নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি করতে প্রয়াসী হয়। সরকারের উদ্দেশ্য ছিল প্রতিষ্ঠানকে নিজ স্বার্থে ব্যবহার করা। সেই লক্ষ্যে পাঠশালার শিক্ষাদান পদ্ধতিতে নানা ধরনের পরিবর্তন এনে এদের উন্নয়নে সরকার সচেষ্ট হয়।

এ যুগে বাংলায় দেশীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান 'পাঠশালা'-র পাশাপাশি 'মকতব'ও ছিল। পাঠশালা মূলত হিন্দুদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত ছিল এবং শিক্ষাদান কার্যক্রম ছিল ব্যবহারিক ও পার্থিব। তাই পাঠশালায় যারা শিক্ষা গ্রহণ করতো তাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল হিন্দু; তবে কিছু মুসলমানও ছিল। পাঠশালাগুলোর শিক্ষাব্যবস্থায় ব্যতিক্রমহীনভাবে ব্যবহৃত হতো দেশীয় ভাষা, উদাহরণস্বরূপ বাংলা ভাষাভাষী এলাকায় বাংলা। অন্যদিকে মকতবগুলো মূলত প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত ছিল মুসলমানদের দ্বারা এবং এখানে

কুরআন পাঠ শিক্ষা দেওয়া হতো। এই মকতবগুলোর চরিত্র ধর্মীয় হওয়ায় বাইরের প্রভাব এর মধ্যে অনুপ্রবেশ করা কঠিন ছিল। ফলে এর মধ্যে কোনো পরিবর্তন আনাও সম্ভব ছিল না। এই দু'ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পাঠশালাগুলো বেশি প্রভাবশালী ও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে সমাজের ব্যবহারিক প্রয়োজন মিটাতে থাকে। চারিত্রিক দিক থেকে প্রার্থিব হওয়ার কারণে পাঠশালাগুলো বাইরের প্রভাব বিস্তারের জন্য বেশি উন্মুক্ত ছিল এবং এ প্রতিষ্ঠানকেই সরকার শিক্ষা সংস্কারের পরিকল্পনায় প্রথম গ্রহণ করে। উনিশ শতকের শেষদিকে বাংলা সরকার মকতবগুলোকে বিভাগীয় সংস্কারাধীন করতে চাপ প্রয়োগ করেছিল। তবে সরকারের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পাঠশালার উপর নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি এবং এই প্রতিষ্ঠাণের উন্নতিসাধন। সরকার পাঠশালাকে অগ্রগণ্য বিবেচনা করে তা সরকারি আদলে নতুন রূপ দেবার প্রচেষ্টা চালায়। এ জন্য উল্লেখ্য যে, উনিশ শতকের প্রথম দশকে দেশীয় প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়াও ভিন্নধর্মী প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও এদেশে কার্যকর ছিল। এই প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো মিশনারি এবং অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়েছিল।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে পাঠশালা শিক্ষা সম্পর্কে বিশ্বাসযোগ্য চিত্র পুনর্গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান অত্যন্ত সীতিম। ড. ফ্রান্সিস বুকাননের জরিপ (১৮০৭-১৮১৪) ও উইলিয়াম এডামের রিপোর্ট (১৮৩৫-১৮৩৮) ছাড়া তেমন কোনো প্রত্যক্ষ সূত্র পাওয়া যায় না। দেশীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার উপর উভয় রিপোর্টই অত্যন্ত মূল্যবান এবং সমসাময়িক শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়।

১৮০৭ থেকে ১৮১৪ সালের মধ্যে বাংলা, বিহার এবং আসামের কয়েকটি জেলার পরিসংখ্যান সংগ্রহের জন্য জরিপ পরিচালনা করা এবং তারই ভিত্তিতে রচিত হয়েছিল বুকাননের রিপোর্ট। বাংলার জেলাসমূহের মধ্যে কেবল রংপুর ও দিনাজপুরে এই জরিপ পরিচালিত হয়েছিল।[১] বুকাননের রিপোর্টে কেবল শিক্ষা সম্পর্কে নয়, এতে জেলার ভৌগোলিক অবস্থা এবং ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনাও স্থান পেয়েছে।[২] শিক্ষা বিষয়ে এই রিপোর্টে কেবল একটি অধ্যায় আছে যাতে পাঠশালা সম্পর্কে একটি সাধারণ চিত্র পাওয়া যায়। এতে যে তথ্য রয়েছে তার ভিত্তিতে দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য চিত্র পুনর্গঠন কষ্টসাধ্য। তবে এডামের রিপোর্টের সম্পূরক হিসেবে বুকাননের রিপোর্ট গুরুত্বপূর্ণ।

লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের নির্দেশে উইলিয়াম এডাম, স্কটল্যান্ডের একজন মিশনারি ১৮৩৫ থেকে ১৮৩৮ সালের মধ্যে বাংলার শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে এক জরিপ করেন। দেশের শিক্ষার প্রকৃত অবস্থা নির্ধারনই ছিল এই জরিপের উদ্দেশ্য। তিন খণ্ডের এই রিপোর্টে বাংলার শিক্ষার মূল্যবান ও চিত্তাকর্ষক চিত্র পাওয়া যায়।[৩] প্রথম রিপোর্টে সংকলিত হয়েছে ঐ সময় পর্যন্ত শিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্য। দ্বিতীয় রিপোর্টে রয়েছে রাজশাহী জেলার নাটোর মহকুমার শিক্ষা-বিষয়ক বিস্তারিত তথ্য। মুর্শিদাবাদ শহর ও জেলাসহ বাংলার বীরভূম, বর্ধমান এবং মেদিনীপুর জেলা ছাড়াও দক্ষিণ বিহার, এবং তীরহুত জেলার শিক্ষাদান কার্যক্রম সম্পর্কে মতামত স্থান পেয়েছে এডামের তৃতীয় রিপোর্টে। ফলে, এডাম ও বুকাননের রিপোর্টদ্বয়ে বাংলার দিনাজপুর, রংপুর, রাজশাহী, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমান ও মেদিনীপুর জেলার তথা বাংলার উত্তর ও পশ্চিমাংশের শিক্ষা সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়।

উনিশ শতকের প্রথমদিকে গ্রাম বাংলায় শিক্ষাদান কার্যক্রমের জন্য যেসব প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল সেগুলো পাঠশালা নামে পরিচিত ছিল। প্রায় সব অঞ্চলেই পাঠশালা ছিল, তবে অঞ্চল বিশেষে তাদের সংখ্যায় তারতম্য ছিল।[৪] পাঠশালার সঠিক সংখ্যা নির্ধারণ সম্ভব নয়। এডাম অনুমান করেছিলেন যে, প্রতি তিনটি গ্রামের মধ্যে দু'টিতে পাঠশালা ছিল। সুতরাং বাংলা ও বিহারের ১,৫০,৭৪৬ টি গ্রামে (সরকারিভাবে এই সংখ্যা নির্ধারিত হয়েছিল) প্রায় ১,০০,০০০ টি পাঠশালা ছিল বলে এডাম মনে করেন।[৫] যদিও এডামের এই অনুমান প্রশ্নাতীত নয়। তবে, এ কথাও বলা ঠিক হবে না যে, গ্রামাঞ্চলে বিপুল সংখ্যায় পাঠশালা বিরাজমান ছিল।[৬] ১৮১৩ সালের চার্টার আইনে সর্বপ্রথম ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে ভারতীয়দের শিক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয় । ঘোষণা করা হয়:

> It shall be lawful for the Governor General in Council to direct that … a sum of one lac of rupees in each year shall be apart and applied to the revival and improvement of literature and the encouragement of the learned natives in

> India, and for the introduction and promotion of a knowledge of Sciences among the inhabitants of the British territories if India.[৭]

হিন্দু-মুসলমানদের শিক্ষার যৎসামান্য পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া ১৮১৩ সালের পূর্বে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এ দেশে শিক্ষার জন্য তেমন কোনো পদক্ষেপই গ্রহণ করেনি। ১৮১৩ সালের চার্টার আইনে শিক্ষাক্ষেত্রে অধিক তৎপর হওয়ার নির্দেশ ছিল এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনেরও ইঙ্গিত ছিল।[৮] পরবর্তী ২২ বৎসরে এই নির্দেশ বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় এবং এই উদ্দেশ্যে যে নীতি প্রবর্তিত হয় তাকে এক কথায় হিন্দু ও ইসলামি শিক্ষা পদ্ধতির উপর পাশ্চাত্য শিক্ষাকে সংযোজন করার আশা বলে আখ্যায়িত করা যায়।[৯] এই প্রচেষ্টার সমাপ্তি ঘটে ১৮৩৫ সালে বেন্টিকের কেবল ইংরেজির মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষার সরকারি পৃষ্ঠপোষকতাদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে।[১০]

উনিশ শতকের প্রথমদিকে শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নয়নের প্রচেষ্টায় তিনটি গোষ্ঠীর ভূমিকা ছিল। কিছু ইংরেজ কর্মচারী, ব্যবসায়ী ও সামরিক কর্মকর্তা ভারতীয়দের শিক্ষাক্ষেত্রে এ সময় বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করে। দেশীয় শিক্ষার প্রতি সহানুভূতি থাকলেও তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ইংরেজি শিক্ষার প্রসার। ডেভিড হেয়ার, ইউলিয়াম বাটারওয়ার্থ এবং বাংলার তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি স্যার এডওয়ার্ড হাইড ইষ্ট এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। কলিকাতার ধনী ব্যক্তিবর্গ ছিলেন দ্বিতীয় গোষ্ঠীভুক্ত যাঁরা পাশ্চাত্য শিক্ষা সমর্থন করতেন, পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের পক্ষে ছিলেন। এই গোষ্ঠীর মধ্যে একদিকে ছিলেন ধর্ম ও সামাজিক ক্ষেত্রে উদারপন্থী ব্যক্তিবর্গ, যেমন রামমোহন রায়, অন্যদিকে ছিলেন রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গির ব্যক্তিবর্গ, যেমন রাধা কান্তদেব। এদের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব ছিল ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা। শিক্ষা উন্নয়নের তৃতীয় গোষ্ঠী ছিল খ্রিষ্ট ধর্ম প্রচারক মিশনারিগণ। এদেশে ধর্ম প্রচারের মাধ্যমরূপে মিশনারিরা শিক্ষাকে ব্যবহার করতো।[১১] এই তিন গোষ্ঠীর সহযোগিতার ফলে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি' (মে, ১৮১৭) এবং 'ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি' (সেপ্টেম্বর, ১৮১৮)। স্কুলে ব্যবহারোপযোগী পুস্তক ও প্রকাশনা এবং সুলভে বা বিনামূল্যে তা সরবরাহই ছিল বুক সোসাইটির মুখ্য উদ্দেশ্য।[১২] বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় পুস্তক প্রণয়ন এই সোসাইটির প্রধান কাজ ছিল। তবে সংস্কৃত, আরবি ও ফারসি পুস্তকও এই সংস্থার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছে। ইতিহাস, ভূগোল, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে বাংলা পুস্তক এই সোসাইটি প্রকাশ করে এবং এসব পুস্তকের সুলভ প্রাপ্তি সনাতনী পাঠশালা শিক্ষা কার্যক্রমকে প্রসারিত করে।[১৩] ক্যালকাটা বুক সোসাইটির উদ্দেশ্য ছিল প্রধানত তিনটি :

১. কলিকাতার দেশীয় স্কুলগুলোকে সাহায্য প্রধানের মাধ্যমে ঐসব প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন:
২. কয়েকটি ইংরেজি এবং বাংলা মডেল স্কুল প্রতিষ্ঠা এবং
৩. দেশীয় এবং মডেল স্কুলে অধ্যায়নকারী ছাত্রদের মধ্যে যারা কৃতিত্ব প্রদর্শন করবে তাদের জন্য উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করা।[১৪]

হাতে লেখা পুঁথির পরিবর্তে মুদ্রিত পুস্তক ব্যবহার এবং ভূগোল ও ইতিহাসের মতো উপেক্ষিত বিষয়ে পাঠদানের ব্যবস্থা করতে প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করে। ছাত্রদের দক্ষতা ও কৃতিত্বের ভিত্তিতে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করার ব্যবস্থা চালু করা হয়। বিদ্যালয়ে গিয়ে শিক্ষকদের পাঠ্যক্রমের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। বাৎসরিক, ষান্মাসিক বা ত্রৈমাসিক পরীক্ষা গ্রহণের পদ্ধতি প্রথমবারের মতো চালু করা হয়। কৃতি-শিক্ষকদের পুরষ্কার, কৃতি ছাত্রদের পুস্তক উপহার এবং সবার ব্যবহারের জন্য পুস্তক প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়।[১৫]

মিশনারিগণ প্রাথমিক শিক্ষার তিন মূল ভিত্তি তথা তিন 'আর'ঃ রিডিং, রাইটিং এর (এ) রিথ্‌মেটিক গড়ে তোলার লক্ষ্যে[১৬] বাংলার অবস্থার প্রেক্ষাপটে লাইনক্রাস্টার ও বেল প্রণীত 'মনিটোরিয়াল' পদ্ধতিকে গ্রহণ করেন।[১৭] মার্শম্যান বাংলা বর্ণমালা, শব্দ, ক্রিয়া-বিশেষ্য-সর্বনামের উদাহরণমালা, বাক্য, সংখ্যা ও পাটিগণিতের উদাহরণ সম্বলিত একটি 'টেবিল' (সারণি) প্রনয়ন করেন। মার্শম্যানের এই সারণি শ্রীরামপুরে প্রেসে মুদ্রিত হয় এবং স্কুলের প্রতিটি শ্রেণীকক্ষে তা ঝুলিয়ে রাখা হতো। মনিটরের তত্ত্বাবধানে পঠন-পাঠনে এই সারণি ব্যবহৃত হতো।[১৮] পাঠ্যপুস্তকসমূহের বিভিন্ন অংশ থাকতো এবং পর্যায়ক্রমে শিক্ষার জন্য অংশসমূহ বিন্যস্ত হতো। পাঠ্যপুস্তকে 'এ্যসপ্‌স ফেবল্‌স' (জীবজন্তুর আচরণ ও কথাবার্তার মাধ্যমে নীতিকথা তুলে ধরার উদ্দেশ্যে রচিত কল্পকাহিনি) এবং ঐতিহাসিক কাহিনি পাঠ্যবিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

এসব কাহিনি ন্যায়বিচার, আনুগত্য, সততা ও মানবতা সম্বন্ধে উদাহরণ স্বরূপ ছিল। পাটিগণিত অন্তর্ভুক্ত করা হয় জমিদারি সংক্রান্ত বিষয়াদি যেমন, হিসাব রক্ষণের স্থানীয় পদ্ধতি, ভুসম্পত্তি হস্তান্তরের দলিল রচনা প্রভৃতি। সংস্কৃত গ্রন্থাকারদের নাম ও লেখনীয় সারাংশ পাঠ্যবিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বিবিধ সত্য ঘটনা সম্বলিত কাহিনি সংকলন 'দিগদর্শন' পাঠ্য বিষয়ে স্থান পায়। পাঠ্য বিষয়ে আরো অন্তর্ভুক্ত হয় সৌরজগৎ সম্পর্কে ধারণা, মানচিত্রসহ ভূগোল, কালানুক্রমিক ইতিহাস এবং প্রযুক্তিগত শব্দের ব্যাখ্যা সম্বলিত তালিকা।[১৯] মিশনারিগণ তাদের শিক্ষা কার্যক্রমে মাতৃভাষার দৃঢ় ভিত্তি গড়ে তোলার উপর গুরুত্বারোপ করেন। মার্শম্যান স্পষ্টভাষায় ঘোষণা করেন যে, জনগণকে তাদের নিজের ভাষার পরিবর্তে অন্য কোনো ভাষায় উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করার আশা সম্পূর্ণভাবে ভ্রান্তিকর।[২০]

উশিন শতকের প্রথমদিকে বাংলা সরকার পাঠশালা ব্যবস্থার প্রতি উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। এর কারণ ১৮১৩ সালের আইনের পর থেকে ১৮৩৫ পর্যন্ত সময়ে সরকার দ্বিধায় পড়েঃ সনাতনী ভারতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থাকে সমর্থন দিবে, নাকি, পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন করবে। শেষ পর্যন্ত সনাতনী দেশীয় শিক্ষা সরকারের বিবেচনায় স্থান পায়নি এ কারণে যে দেশীয় ভাষার তেমন কোনো অগ্রগতি ঘটেনি, যার মাধ্যমে নতুন ধ্যান-ধারণার শিক্ষা দেওয়া চলে। তখন বাংলার শিক্ষাব্যবস্থা জরিপ করার জন্য এডামকে দায়িত্ব অর্পণই ছিল দেশি শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারের একমাত্র পদক্ষেপ। আশা করা হয়েছিল এডামের রিপোর্টের ভিত্তিতে দেশীয় শিক্ষার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন সম্ভব হবে।[২১] ভবিষ্যতের জাতীয় শিক্ষা সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়নের বাংলার দেশীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করার পক্ষে এডাম তাঁর চূড়ান্ত রিপোর্টে যুক্তি প্রদর্শন করেন।[২২] শিক্ষা সমাজের উপরের স্তরে শুরু হবে এবং পর্যায়ক্রমে নিচের দিকে জনগণ পর্যন্ত পৌঁছাবে-এই মতবাদের তিনি তীব্র নিন্দা করেন। বিদ্যমান দেশীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে ভবিষ্যতের জাতীয় শিক্ষার উপযুক্ত বাহন হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ঐসব প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন প্রয়োজন বলে এডাম প্রস্তাব করেন। ঐসব প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়নের জন্য এডাম নিম্নলিখিত চারটি সংস্কার সুপারিশ করেন। যথা-

১. বিভিন্ন বিষয়ে স্কুলে ব্যবহারের উপযোগী পাঠ্যপুস্তকমালা প্রণয়ন ও প্রকাশনা;
২. দেশীয় স্কুলগুলোতে ঐসব পুস্তকের ব্যবহার প্রবর্তন;
৩. ঐসব পুস্তকে অন্তর্ভুক্ত বিষয়াদি সম্পর্কে শিক্ষকদের জ্ঞান যাচাই করার উদ্দেশ্যে সময়ে সময়ে পরীক্ষা গ্রহণ; এবং
৪. পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে শিক্ষকদের মধ্যে পুরষ্কার বিতরণ, যার ফলে তাঁদের মধ্যে উদ্দীপনা জন্মাবে।[২৩]

তখনকার বাংলা সরকার এডামের প্রস্তাবাগুলি বাস্তবায়নের কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। সরকার তাঁর পরিকল্পনা অনেকটা অবাস্তব বলে মনে করছে, আবার বিরাট অঙ্কের অর্থ ব্যয়ের কথা ভেবেও সরকার বাস্তবায়ন থেকে বিরত থাকে।[২৪] এর পরিবর্তে সরকার 'পরিশ্রুতকরণ প্রক্রিয়া মতবাদ' (Filtration theory) গ্রহণ করে। এই মতবাদের প্রবক্তারা বিশ্বাস করতো যে সমাজের উচ্চশ্রেণির মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের প্রচেষ্টা নিবদ্ধ রাখলেই উপর দিক থেকে নিচের দিকে স্বাভাবিকভাবেই তা পরিশ্রুত হবে।[২৫]

৩

বাংলায় ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তন

রামমোহন বা দ্বারকানাথ বা প্রসন্নকুমার যে কারোরই জীবন এবং কর্ম বিশ্লেষণ করলে আমাদের এ কথার স্পষ্ট সমর্থন মিলবে।'[১] উনিশ শতকের বাংলার নবজিজ্ঞাসার দ্বিতীয় পর্ব নিয়ন্ত্রণ করেছে বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণি, আগেই আমরা জেনেছি। এই মধ্যবিত্ত হচ্ছে ইংরেজ সৃষ্ট মধ্যবিত্ত। মেকলের ভাষায়:

> 'Indian inblood and colour, but English in tastes,in opinions, in morals and intellect.' [২]

ইংরেজের প্রতিকৃতজ্ঞতা রেখেই এই মধ্যবিত্ত শ্রেণি পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রভাবজাত যুক্তিবাদ এবং উদার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আত্মসমীক্ষার পথে নামে। নব্যবঙ্গ বা ইয়ংবেঙ্গলের নায়ক ডিরোজিও এবং তাঁর শিষ্যরা এ মধ্যবিত্ত

স্তরভূক্ত। সেকালে অতি জিজ্ঞাসা ও পাশ্চাত্যমোহ তাঁদেরকে উচ্ছৃঙ্খলতার পর্যায়ভূক্ত করেছিল। কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্ত ও বিদ্যাসাগরের বেলায় তা ঘটেনি। কারণ তাঁরা দু'জনই ছিলেন বড়মাপের ভদ্রলোক। এ দু'জন ইতিহাস, সমাজ, ধর্ম,দর্শন-বিজ্ঞান সম্পর্কে গভীর জ্ঞানে সমৃদ্ধ ছিলেন। তাঁদের আত্মপ্রকাশের বাহন হয়েছিল কতগুলো সাময়িকপত্র। সেগুলোতে প্রচলিত ধর্ম,সামাজিক রীতিনীতি, সাহিত্য, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ে তাঁদের নানা জিজ্ঞাসা, তর্কবিতর্ক, বিচার-বিশ্লেষণ প্রকাশ হয়ে ব্যক্তির সীমা ছাড়িয়ে সমাজে ছড়িয়ে পড়েছিল। ফলে বাংলার সমাজ ব্যবস্থায় কিছু প্রত্যক্ষ পরিবর্তন সূচিত হয়। মানুষ আগের চেয়ে একটু বেশি আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠে, সাহিত্যে দেবদেবী নির্ভরতা অনেকটা হ্রাস পায়, মানুষের প্রতি মমতা বৃদ্ধি পায়, এক কথায় মানুষ পুরোপুরি দেবমুখি না থেকে কিছুটা মানবমুখি হতে শুরু করে। তবে তা অনেক বিস্তৃত পরিসরে নয়, কলকাতা শহরের সীমানায়, ক্ষীণ ধারায়। আমরা দেখি যে, অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর প্রমুখ লেখনি ধারণ পূর্বপর্যন্ত সে ধারার পরিবর্তন খুব একটা চোখে পড়েনা। তবে রামমোহন,ডিরোজিও প্রমুখের চেষ্টায় নারী অধিকার এবং অদৃষ্টবাদের বিপরীতে যুক্তিবাদের কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া কষ্টকর নয়। আর একটু পরে যুক্তিবাদ মানুষকে অনেকটাই ইহমুখী করে তুলে। এ প্রসঙ্গে স্বপন বসু তাঁর বাংলার নব চেতনার ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন:

> 'একান্ত অদৃষ্ট নির্ভরতা ছিল যার স্বভাবধর্ম, এইসময় থেকে সে নিজের অদৃষ্ট নিজেই নির্মাণ করতে চাইল, সহায়ক হল সমকালীন পরিবেশ। নবকৃষ্ণ, গঙাগোবিন্দ,'ব্ল্যাক জমিদার গোবিন্দরাম মিত্র, রাম দুলাল দে ইত্যাদিরা হঠাৎ যেন কুবেরে ধন হাতে পেলেন। এ বিষয়ে দু'একটা দৃষ্টান্ত যথেষ্ট। ১৭৫৭-য় যে নবকৃষ্ণের মাসমাইনে ছিল ৬০ টাকা, সেই লোক পরবর্তীকালে মাতৃশ্রাদ্ধে ৯ লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করেন। যে রামদুলালের কর্মজীবনের সুত্রপাত ৫ টাকা মাইনেয়, সেই লোকই মৃত্যুকালে ১ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা রেখে যান।এই ইহমুখীনতা হঠাৎ নবাবাদের প্রাণিত করেছিল প্রমোদে গা ঢেলে দিতে। ভোগেই জীবনের স্বার্থকতা–এই মন্ত্রে বিশ্বাসী হওয়ায় বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যেমন দুর্গোৎসব, পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধ, বিবাহ ইত্যাদি উপলক্ষে তাদের এই ভোগবাদী জীবনের চিত্রটা স্পষ্ট ফুটে উঠত। অন্যদিকে এই যুক্তিবাদের প্রভাবে আবার সমাজদেহে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল, ধর্মক্ষেত্রে এসেছিল চাঞ্চল্য।'[৩]

বাংলায় এই নবজিজ্ঞাসার সূত্রপাতের প্রধান দুটি কারণ হচ্ছে-১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধে বাঙালি জাতিকে পরাজিত করে, বাংলায় ইংরেজের কর্তৃত্ব স্থাপন এবং খ্রিষ্টান মিশনারিদের চেষ্টায় বাংলায় পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার প্রয়াস। আমরা জানি যে, 'ইংরেজ অধিকারের পরও কিছুদিন মুসলমানি রাজভাষা ফারসির ব্যবহার ও প্রভাব ছিল অব্যাহত। কিন্তু ধীরে ধীরে আইন আদালত ও ভদ্র সম্প্রদায়ের যোগাযোগরক্ষী ভাষা ফারসির স্থান দখল করে নতুন অর্থকরী বিদ্যা ইংরেজি। তখন ইংরেজ আগমন এদেশে একদলকে অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য এনে দেওয়ায় নিজেদের আগ্রহেই কিছুসংখ্যক বাঙালি নতুন রাজভাষা ইংরেজি শিক্ষায় উৎসুক হয়ে উঠল।'[৪]

আঠারো শতকের শেষ ও উনিশ শতকের শুরুতে বাংলা ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে সমাজে নানা পরিবর্তন সূচিত হয়। এই পরিবর্তন ধারায় ইংরেজি শিক্ষার প্রভাব লক্ষ করা যায়। খ্রিষ্টান মিশনারিদের প্রচেষ্টায় প্রথম এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার সূত্রপাত ঘটে। ১৭১৯ সালে 'The Society for Promoting Christian Knowledge' নামে একটি সমিতি কলকাতায় আসেন। তাঁদের উদ্যোগে ১৭৩১ সালে এখানে একটি ইংরেজি স্কুল স্থাপিত হয়। বাংলাদেশে এটিই ছিল পাশ্চাত্য জাতীয় প্রথম স্কুল।[৫] ১৭৫৮ সালে Zacharich Kierhander নামে সুইডেনের এক পাদরি কলকাতায় অন্য একটি ইংরেজি স্কুল স্থাপন করেন। এ স্কুলে ইউরোপীয় ও ভারতীয় গরিব ছেলেরা বিনামূল্যে শিক্ষালাভ করত। তবে তাদের সেই শিক্ষা সাধারণ নীতি ও উপদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ১৭৮০ সালে বালকদের জন্য অন্য একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন মি. আর্চার। পরবর্তীকালে বালক-বালিকা উভয়েই ঐ স্কুলে ভর্তির সুযোগ পায়। ইয়র্কশায়ারের এক কৃষক সন্তান মি. ব্রাউন কলকাতায় আরেকটি স্কুল স্থাপন করেন।[৬] এ স্কুলে হিন্দু ছাত্ররা লেখাপড়ার জন্য বেশি সুযোগ পেত। এসব স্কুলের অধিকাংশই পরিচালিত মিশনারিদের দ্বারা হতো । আর মিশনারিদের শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্য ছিল উপমহাদেশে খ্রিষ্টধর্মের প্রসার ঘটানো। এদেশের জনসাধারণের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের পথ ধরেই পরবর্তীতে বাংলা ভাষায় শিক্ষাচিন্তার বিকাশ ঘটে। তার আগে মুসলিম শাসনামলে এদেশে শিক্ষার মাধ্যম ছিল ফারসি। তখন ফারসি ছিল সরকারি ভাষা। তবে শিক্ষা পরিকল্পনার ক্ষেত্রে আরবিও ভাষা সর্বোচ্চ গুরুত্ব পেয়েছিল। সতের শতকের দিকে এদেশে উর্দু ভাষার উৎপত্তি ঘটে। উর্দুকে ফারসির প্রসূতি হিসেবে গণ্য করা হয়। 'অভিজাত মুসলিম এবং শাসকশ্রেণির মৌখিক ভাষা হিসেবে উর্দু

Dhaka University Institutional Repository

আরবি-ফারসির পাশে স্থান করে নেয়।[৭] মুসলিম আমলে বাংলায় ফারসি শিক্ষার একটি ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল। সেই সময়ে এদেশে প্রচুর ফারসি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মিত হয়। স্কটিশ মিশনারি উইলিয়াম অ্যাডামের রিপোর্ট (১৮৩৫-১৮৩৮) থেকে জানা যায়, শুধু মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমান, দক্ষিণ বিহার ও ত্রিহুত জেলায় ফারসি মাদ্রাসার সংখ্যা ছিল ৭৪২ টি।[৮] মুসলিম শাসনামলে ফারসির গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় এটি হিন্দুদের মধ্যেও বিশেষ জনপ্রিয় ছিল।[৯] এছাড়া, মুসলমানগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত গৌড়, পাণ্ডুয়া, রংপুর, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, ঢাকা, সোনারগাঁওসহ অনেক স্থানে উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলোতে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের নিকট শিক্ষালাভ করতে বাংলা তথা ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চল, এমনকি ভারতের বাইরে থেকেও জ্ঞান-পিপাসু ছাত্ররা ভিড় জমাত।

১৭৫৭ সালে পলাশীর পটপরিবর্তনের পর বাংলার এই শিক্ষাব্যবস্থায় পরিবর্তনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। এই পরিবর্তন স্পষ্ট হয়ে উঠে ''ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি'' ক্ষমতা লাভের পর।'ফিলিপ ফ্রান্সিস' ভারতবর্ষে আসেন ১৭৭৪ সালের ১৯ অক্টোবর । এ দেশে আসার চৌদ্দ মাসের মধ্যেই (১৭৭৬ সালের ২২ জানুয়ারি) তিনি এক মিনিটে (Minute) বাংলাদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রস্তাব পেশ করেন। এর উপর ভিত্তি করে ১৭৮৯-৯০ সালে দশসালা বন্দোবস্ত প্রবর্তন করা হয় এবং ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ঘোষণা করা হয়।[১০] এ ধরনের সিদ্ধান্তের ফলে জমিদারিচ্যুত হন মুসলিম জমিদাররা ; পুরনো হিন্দু জমিদাররা হন ক্ষতিগ্রস্ত । এ সময় (১৭৯৩ সাল থেকে ১৮২৮ সাল পর্যন্ত) লাখেরাজ সম্পত্তি সম্পর্কে অনেক আইন তৈরি হয়। কিন্তু সেসব আইনে জনসাধারণের গোচরীভূত করার কোনো ব্যবস্থা রাখা হয়নি। যে কারণে নিজের অজান্তেই তাঁরা ভূ-সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। নতুন আইন অনুযায়ী বাংলার কোনো কোনো জেলার শতকরা ৯৮ জনের নিষ্কর ভূ-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়। লাখেরাজ আইনের ফলে অভিজাত মুসলিম পরিবারগুলো ধ্বংসের মুখে পড়ে। ফলে তাঁদের সাহায্যপুষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ হয়ে যায় ।

১৮৩৫ থেকে ১৮৩৮ সাল পর্যন্ত উইলিয়াম অ্যাডাম বাংলা ও বিহারের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে সরজমিনে তদন্ত করে 'যে রিপোর্ট পেশ করেন, তাতে এদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর দুর্দশার কথা আছে। দেশের গ্রামে গ্রামে যে অসংখ্য আরবি-ফারসি মক্তব-মাদ্রাসা এবং বাংলা পাঠশালা ছিল তা ভেঙ্গে পড়ার করুণ ও মর্মান্তিক চিত্র ঐসব রিপোর্টে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ফলে বাংলায় কোম্পানি শাসনের শুরু থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত শিক্ষা সম্পর্কে দেশবাসীকে উদাসীন থাকতে দেখা যায়। তখন 'এদেশের লোককে কোনো রকম শিক্ষা দেওয়া কোম্পানির স্বার্থের পরিপন্থী ও সাম্রাজ্যের পক্ষে বিপদজনক বলে মনে করা হতো। বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে 'কোম্পানির উদ্দেশ্য ছিল' এদেশ থেকে অধিক পরিমাণে মুনাফা অর্জন করা। তারা মনে করে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তন করলে দেশীয় সমাজ ও প্রচলিত ধর্মে আঘাত লাগবে এবং জনগণ এতে ব্রিটিশ বিরোধী হয়ে পড়বে। এছাড়া শিক্ষার প্রসার ঘটলে ভারতীয়রা আত্মসচেতন হবে এবং তাদের মধ্যে স্বাধীন মতামত গড়ে উঠবে। ফলে ব্রিটিশ শাসনক্ষমতা হুমকির সম্মুখীন হবে।[১১] এমন ধারণার বশবর্তী হয়ে কোম্পানি খ্রিস্টান মিশনারিদের ধর্ম ও শিক্ষা প্রচারে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।

মি. ব্রাউন ১৭৮৭ সালে কলকাতায় আসার পর একটি Orphan Institute-এর শিক্ষক নিযুক্ত হন। ধর্মযাজক হিসেবে কাজ করছেন এই অভিযোগে অল্প দিনের মধ্যেই কর্তৃপক্ষ তাকে অপসারিত করেন।[১২] ব্রিটিশ শিক্ষাবিদ চার্লস গ্রান্ট (১৭৪৬-১৮২৩) ধর্ম প্রচারে সরকারের সহযোগিতা কামনা করলে সরকার তা প্রত্যাখ্যান করেন।[১৩] তিনি ১৭৯০ সালে ভারত ত্যাগ করে ইংল্যান্ড গমন করেন। এ সময় জন থমাস নামে এক ডাক্তার চিকিৎসার পাশাপাশি শিক্ষা ও ধর্মপ্রচারের চেষ্টা করলে কোম্পানি তাকেও কলকাতা ত্যাগে বাধ্য করেন। এরপর ১৭৯২ সালে মি. উইলভার ফোর্স নামক কোম্পানির একজন সদস্য ভারতে শিক্ষা ও খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের প্রস্তাব ব্রিটিশ পার্লামেন্টে উত্থাপন করেন। 'একই ধর্ম প্রবর্তনে মানুষের উদ্দেশ্যাবলী এক ও অভিন্ন হয়ে যায়' এই যুক্তি দেখিয়ে কোম্পানি তাঁর বিরোধিতা করেন। কোম্পানির বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, তাতে ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজ প্রাধান্য বিলুপ্ত হবে। 'কারণ শিক্ষা বিস্তৃতির ফলেই আমেরিকা ব্রিটিশ হস্তচ্যুত হয়েছে'।[১৪] এভাবে শুরু থেকেই ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বিদ্যমান আরবি-ফারসি শিক্ষাব্যবস্থা গুড়িয়ে দেওয়ার নানারূপ চেষ্টা চালায়। সেই সঙ্গে এদেশে খ্রিষ্টান মিশনারিদের শিক্ষা বিস্তারেরও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

Dhaka University Institutional Repository

৪

মিশনারিদের শিক্ষা বিস্তার

ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নানা বাধা-নিষেধ উপেক্ষা করে কোম্পানির কিছু প্রশাসক, মিশনারি এবং শিক্ষাবিদ ব্যক্তিগতভাবে ভারতে শিক্ষা বিস্তার ও দেশীয় সংস্কৃতি চর্চায় আগ্রহ দেখান। এদের মধ্যে ওয়ারেন হেস্টিংস (১৭৩২-১৮১৮), জনাথন ডানকান (১৭৫৬-১৮১১) স্যার উইলিয়াম জোনস (১৭৪৬-১৭৯৪), ওয়েলেসলি (১৭৬০-১৮৪২), উইলিয়াম কেরী (১৭৬১-১৮৩৪), চার্লস গ্রান্ট (১৭৪৬-১৮২৩), ডেবিড হেয়ার (১৭৭৫-১৮৪২), জন ক্লার্ক ম্যার্শম্যান (১৭৯৪- ১৮৭৭), আলেকজান্ডার ডাফ (১৮০৫-১৮৭৮) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এদের সমর্থন ও সহযোগিতায় এদেশে খ্রিষ্টান মিশনারিরা পুনরায় তাদের কার্যক্রম শুরু করেন। কোম্পানির বিরোধিতা সত্ত্বেও তাঁদের মধ্যে কোনো হতাশা আসেনি। তাঁরা ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সদস্য উইলভার ফোর্স প্রমুখের নেতৃত্বে নব ধারার আন্দোলন শুরু করেন। শিক্ষাবিদ মিশনারিগণ হিন্দু সম্প্রদায়ের সতীদাহ, শিশু সন্তান হত্যা প্রভৃতি কুসংস্কার দূর করতে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তার ও খ্রিষ্টধর্মের প্রয়োজনীয়তা দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেন। এই শিক্ষাবিদ মিশনারিরা Bfvb‡Rwj÷ (*Evangelist*) নামে পরিচিত ছিল। Bfvb‡Rwj÷MY খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের মাধ্যমে ভারতবাসীর নৈতিক উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার কথা ব্রিটিশ সরকারের নিকট তুলে ধরেন এবং এ ব্যাপারে ভারতে কোম্পানি সরকারের নিষ্ক্রিয় নীতির তীব্র নিন্দা করেন। ফলে আগের তুলনায় বহুগুণ বৃদ্ধি পায় তাদের কর্মতৎপরতা। তাঁরা সরকারি ও বেসরকারি ব্যক্তিগণের সহায়তায় দেশের বিভিন্ন স্থানে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন।

১৮১৮ সাল পর্যন্ত খ্রিষ্টান মিশনারিগুলো কর্তৃক কলকাতা, ঢাকা, হাওড়া, ২৪ পরগনা, চুঁচূড়া, যশোরসহ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ১৮০ টি স্কুল স্থাপিত হয়। যেগুলোর মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৩,৩৪৭ জন।[১৫] খ্রিষ্টান মিশনারিদের এই শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রমে এদেশীয় জনগণের আগ্রহ লক্ষ করা যায়। বিশেষ করে বাঙালি হিন্দু সমাজের বিত্তশালী[১৬] ব্যবসায়িরা ইংরেজি শিক্ষার প্রতি অনুরাগী হন। যদিও ইংরেজদের সঙ্গে ব্যবসাসূত্রে বনেদি বড়লোক হওয়ার গরজেই হিন্দুগণ ইংরেজি ভাষায় প্রথম শিক্ষা নেন। রামপ্রসাদ মিত্র, জয়নারায়ণ ঘোষ (১৭৫২-১৮২০), মহারাজ নবকৃষ্ণ (১৭৩৩-১৭৯৭) প্রমুখ কোম্পানির বেনিয়ারাই প্রথম ইংরেজি জানা বাঙালি।[১৭] ইংরেজি শিখে, ইংরেজকে তুষ্ট করে 'নানা প্রকার মর্যাদা' লাভ করার সুযোগ সৃষ্টির কারণেও হিন্দুরা ইংরেজি শিক্ষার চর্চা শুরু করেছিল। যার ফলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে একদল হিন্দুর স্বার্থ অভিন্ন হয়ে পড়ে। ইংরেজগণ এ দেশে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বাঙালি হিন্দুদের বন্ধুত্ব লাভে সমর্থ হয়। এ প্রসঙ্গে এম. এন. রায় (১৮৮৭-১৯৪৪) বলেছেন:

> It is a historical fact that a very large section of the Hindu community welcomed the advent of the English power.[১৮]

বাঙালি হিন্দুগণকে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের পাশাপাশি এ দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। বিশেষ করে রামজয় দত্ত, শিবু দত্ত, ভুবন দত্ত, রামলোচন ঘোষ , কৃষ্ণমোহন বসু, আনন্দীরাম দাস প্রমুখ ঊনিশ শতকের গোড়ার দিকে এদেশে বেশকিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এ সময় বাঙালি সমাজে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে হিন্দু কলেজ। 'মূলত সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারের সন্তানদেরকেই ভারতীয় ও পাশ্চাত্য শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।[১৯] এর ফলে বাংলায় ইংরেজি শিক্ষিত হিন্দুদের সংখ্যা বৃদ্ধি[২০] পেতে থাকে। এ ছাড়া ঐ সময়ে স্কুল বুক সোসাইটি (১৮১৭) ও স্কুল সোসাইটি (১৮১৮) বাঙালি হিন্দু সমাজে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।[২১] পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারে হিন্দু সমাজে প্রধান ভূমিকা পালন করেন রামমোহন রায়, হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও এবং ইয়ং বেঙ্গলের ন্যায় মনীষীগণ। তাঁদের সমসাময়িক কালেই শহর কলকাতা গড়ে ওঠে নাগরিক কেন্দ্র হিসেবে। মূলত কলকাতার নাগরিক রূপায়ণের[২২] পথ প্রশস্ত ও বাধামুক্ত করার মধ্য দিয়ে ওয়ারেন হেস্টিংস (১৭৩২-১৮১৮) এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারে প্রয়াস পান । আঠারো শতকের চতুর্থ পর্বে তাঁর শাসনকালে কলকাতা শহরের সমৃদ্ধি ও জনপ্রিয়তা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ঢাকা ও মুর্শিদাবাদ থেকে বাংলার রাজধানী তাঁর চেষ্টায় কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়। হেস্টিংসের আগে পর্যন্ত মুর্শিদাবাদই ছিল বিচার ও রাজস্ব সংক্রান্ত প্রধান কর্মকেন্দ্র। তিনি মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় বিচারালয় ও অন্যান্য প্রশাসনিক

বিভাগলোকে স্থানান্তরিত করার পরিকল্পনা করে কলকাতাকে ব্রিটিশ আমলের প্রথম রাজধানী শহরে পরিণত হওয়ার ঐতিহাসিক সুযোগ করে দেন। কলকাতার সিদ্ধান্ত জানিয়ে হেস্টিংস ডিরেক্টরদের লিখেছেন:

> Another good consequence will be the great increase of inhabitants and of wealth in Calcutta. Which will not only add to the consumtion of our most valuable manufactures imported from home? But will be the means of conveying to the natives a more intimate knowledge of our customs and manners and of conciliating them to our policy and government.[২৩]

তাঁর মতে 'রাজস্ববিভাগ ও বিচারবিভাগ মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় স্থানান্তরিত হলে ফলাফল ভালোই হবে। কলকাতার জনসংখ্যা ও সম্পদ অনেক বৃদ্ধি পাবে এবং ইংল্যান্ডের শিল্পজাত পণ্যদ্রব্যের ভোগেচ্ছাও অনেক বৃদ্ধি পাবে । শুধু তাই নয়, হেস্টিংস পরিষ্কার ইঙ্গিত করেছেন যে, কলকাতা শহর রাজধানী হলে এদেশীয় লোকদের ইউরোপীয় রীতিনীতি ও আচারব্যবহার শিক্ষা দিতে এবং ব্রিটিশ শাসননীতির পক্ষপাতী করে গড়ে তুলতে অনেক সুবিধা হবে।'[২৪] হেস্টিংস কলকাতা শহরকে পাশ্চাত্য রীতিনীতি ও ভাবধারার প্রাণকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তাঁর সে ইচ্ছা অপূর্ণ থাকেনি। ফার্মিঙ্গার এ প্রসঙ্গে লিখেছেন :

> If Job Charncok is to be considered the founder of Calcutta as a seat of trade, Hasting may be regarded as the founder of Calcutta as the political capital of the British Empire.[২৫]

হেস্টিংসের আমলে কলকাতায় শাসনবিভাগ ও বিচারালয় স্থাপিত হওয়ার পর প্রকৃত ইংরেজি শিক্ষা না হলেও, ইংরেজি ভাষাচর্চার সূত্রপাত হয়। দেওয়ান রামকমল সেন তাঁর ইংরেজি-বাংলা অভিধানে (১৮৩৪ সালে প্রকাশিত) লিখেছেন :

> In 1774 the Supreme Court was established here. And from this period knowledge of the English language appeared to be desirable and necessary. [২৬]

বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাসের দিক থেকে রামকমল সেনের এই ইংরেজি শিক্ষার'[২৭] বিবরণের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার আগে পর্যন্ত বাংলাদেশে নতুন ইংরেজি শিক্ষার বাস্তব চিত্রটি রামকমল সেন অল্পকথায় সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।তিনি লিখেছেন:

> নবযুগের বাংলায় নতুন নগরকেন্দ্রিক বিদ্বৎসমাজে সামাজিক রূপের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি এর মধ্যে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। তখনকার দিনে মাসিক ৪ টাকা থেকে ১৬ টাকা বেতন দিয়ে কারা তাদের ছেলেদের শিবু দত্ত, ভবানী দত্ত, রামলোচন নাপিত অথবা তাদের সমসাময়িক ফিরিঙ্গি আরাতুন পিক্রশ, শেরবোর্ন, ড্রামন্ড, হুটেম্যান প্রভৃতির স্কুলে ইংরেজি শিক্ষার জন্য পাঠাতেন, কলকাতা শহরের অভিজাত সমাজের লোকেরা। হেস্টিংসের ভবিষ্যদ্বাণী যে সত্য হয়েছিল তা এদেশীয়দের ইংরেজি চর্চার এই কাহিনী থেকেই বোঝা যায়।[২৮]

হেস্টিংস নিজে বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। প্রাচ্যবিদ্যা অনুশীলনে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। তিনি ১৭৮০ সালে কলকাতার কিছু শিক্ষিত ও বিশিষ্ট ব্যক্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে 'কলকাতা মাদ্রাসা' স্থাপন করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল আরবি-ফারসি শিক্ষা তথা মুসলমানদের শিক্ষা-সংস্কৃতি চর্চা ও প্রসার ঘটানো এবং মুসলমানদের সরকারি কাজের জন্য যোগ্য করে গড়ে তোলা।[২৯] সংস্কৃতি ও ফরাসি চর্চায় তাঁর শাসনকালে চার্লস উইলকিনস, উইলিয়াম জোনস, কোলব্রুক-এর মতো ইংরেজি পণ্ডিতেরা সংস্কৃত চর্চায় উৎসাহী হয়েছিলেন। তাঁর অনুপ্রেরণায় স্যার উইলিয়াম জোনস (১৭৪৬-১৭৯৪) ১৭৮৪ সালে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানানুসন্ধান ও বিদ্যানুশীলনের জন্য কলকাতা শহরে 'এশিয়াটিক সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করেন। এর ফলে আঠারো শতকের মধ্যেই কলকাতা শহর বাংলাদেশ ও ভারতের অন্যতম সংস্কৃতিকেন্দ্রে পরিণত হয়। শুধু তাই না আঠারো শতকের শেষদিকে বিদেশি ব্রিটিশ পণ্য আমদানিরও সবচেয়ে বড় বন্দর ও বাজার হয়ে উঠে শহর কলকাতা। ১৭৭০ থেকে ১৭৭৪ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরে ৫৯৯ টি জাহাজ কলকাতায় এসেছে এবং তাতে পণ্য বহন করেছে ১,৫৬,০৫৭ টন।[৩০] এভাবে হেস্টিংস যেমন দেখতে চেয়েছিলেন তেমনি উন্নতির নানা চিহ্ন নিয়েই কলকাতা শহর তাঁর সামনে দৃশ্যমান হয়েছে। অর্থনীতি ও সংস্কৃতি উভয়েরই প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠেছে কলকাতা। শিক্ষা সংস্কৃতির প্রতি হেস্টিংসের এ ধরনের আগ্রহ ও গভীর মনোযোগ কোম্পানির অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেই সময় জনাথন ডানকান (১৭৫৬-১৮১১) ছিলেন কাশীর প্রশাসক। তিনি

Dhaka University Institutional Repository

১৭৯২ সালে সংস্কৃত শিক্ষার উন্নতি কল্পে কাশীতে 'বারাণসী সংস্কৃত' কলেজ স্থাপন করেন। এখানে বহুলোক সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা লাভ করেছেন।

কোম্পানির বিরোধিতা সত্ত্বেও মিশনারিরা ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সদস্য মি. উইলভার ফোর্স প্রমুখের নেতৃত্বে আন্দোলন চালিয়ে যান। শিক্ষাবিদ মিশনারিগণ তৎকালে ভারতে হিন্দু সমাজে বর্তমান সতীদাহ, শিশু সন্তান হত্যা প্রভৃতি দূর করতে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তার ও খ্রিস্টধর্মের প্রয়োজনীয়তা দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেন। উইলিয়াম কেরী (১৭৬১-১৮৩৪), চার্লস গ্রান্ট প্রমুখকে নিয়ে ১৭৯৩ সালের অক্টোবরে e¨wÞ÷ wgkb †mvmvBwU নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন।[৩১] এরই ধারাবাহিকতায় '১৮০০ সালে ওয়েলেসলি (১৭৬০-১৮৪২) ইউরোপীয় সিভিলিয়ানদের ভারতীয় ভাষা-সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহার ইত্যাদিতে শিক্ষিত করে এদেশের প্রশাসনিক কাজকর্মের উপযুক্ত করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কলকাতায় 'ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ' স্থাপন করেন।[৩২] কিন্তু এই সীমিত লক্ষ্য এবং শিক্ষাসূচি নিয়ে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের কোনো দিন প্রাচ্যবিদ্যাশিক্ষার মধ্যমণি হয়ে উঠবে– এইরূপ আশা করা যুক্তিযুক্ত ছিল না। ইংল্যান্ডে ওয়েলেসলির উপরওয়ালারা অবশ্য শাসকজাতির দৃষ্টিভঙ্গি যাতে প্রশাসকদের আচারে-ব্যবহারে প্রতিফলিত হয়, তার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভব হয়ে উঠেনি। কারণ ইংরেজদের আর যাই থাকুক প্রশংসা করার মতো মহৎ কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। 'আধুনিক সভ্যতার প্রতিভূ ইংরেজরা এ দেশে এসেছিল মূলত দুটি উদ্দেশ্য চরিতার্থতায়। প্রথমত: এ দেশ শাসন ও অবাধ সম্পদ লুণ্ঠন, দ্বিতীয়ত: খ্রিষ্টধর্ম প্রচার'।[৩৩]

৫

ডিরোজিও এবং তাঁর অনুসারীদের কর্ম প্রচেষ্টা

হেনরি লুইস ডিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১) হিন্দু কলেজের তরুন শিক্ষক। সেকালে প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতি ও হিন্দু ধর্মের নানা আচার সংস্কার দূর করার চেষ্টা করে তিনি আলোচিত এবং তাঁর অনুসারী ইয়ংবেঙ্গলদের গুরু হিসেবে তিনি সর্বাধিক পরিচিত। তিনি ছাত্রদের মুক্ত পরিবেশে স্বাধীনভাবে শিক্ষা দিতে পছন্দ করতেন। তাঁর অনুসৃত শিক্ষা-পদ্ধতি ছিল জ্ঞানের প্রতি কৌতূহল জাগানো। তিনি চেয়েছিলেন বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে ছাত্রদের শিক্ষাঙ্গনের সংকীর্ণ গন্ডীর বাইরে এনে অপার দিগন্তের দ্বার উন্মোচন করে শিক্ষা দিতে। শিক্ষকতা ছিল তাঁর জীবনদর্শন ও আদর্শ প্রচারের সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম। হিন্দু কলেজে তিনি পাশ্চাত্য ইতিহাস, সাহিত্য-দর্শন প্রভৃতি বিষয় পড়াতেন। তাঁর মাধ্যমে এই কলেজের ছাত্ররা 'বেকন', 'লক', বার্কলে, হিউম রীড, স্টুয়ার্ড প্রমুখ পাশ্চাত্য দার্শনিকদের শ্রেষ্ঠ রচনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করেছিল। বাংলা ভাষায় শিক্ষাচিন্তায় তাঁর প্রত্যক্ষ কোনো অবদান নেই। তবু তাঁকে আমরা আলোচনায় টানবো দুই কারণে। এক. তিনি গুরু শিষ্যের ব্যবধান ঘুচিয়ে জ্ঞান চর্চায় সৃজনশীলতা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিজাত শিক্ষার চিন্তা করেছিলেন, এবং দুই.তিনি তৎকালীন ভারতবর্ষের প্রচলিত ধর্মমত ও আচার-সংস্কারে আঘাত করার মতো সাহস দেখিয়েছিলেন।

ডিরোজিও'র কর্মতৎপরতার প্রতিফলন ঘটেছে ১৮১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হিন্দু কলেজকে কেন্দ্র করে, তাঁর শিক্ষাদান পদ্ধতি ও কলা-কৌশলের উপর ভিত্তি করে। শিক্ষকতা সূত্রে তিনি এ কলেজে যে দার্শনিক চিন্তা ও মতাদর্শ প্রচার করেছিলেন তখনকার দিনে তা ছিল ব্যতিক্রম। শিক্ষকতা পেশায় আসার পূর্বে তিনি শিক্ষা, সাহিত্য ও সমাজ, প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর যথেষ্ট চিন্তা ছিল। তিনি সেকালের ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে 'ইডোকেশন ইন ইন্ডিয়া'[১] শীর্ষক প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। তাতে ভারতবর্ষের তখনকার শিক্ষাব্যবস্থার সমস্যার কতিপয় দিক স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। ডিরোজিও হিন্দু কলেজের শিক্ষক হয়েছিলেন সতেরো বছর বয়সে। ঐ বয়সেই তিনি ছাত্রদের ওপর যতটা প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, সেকালের অন্য কোনো শিক্ষক ততটা পারেননি। হিন্দু কলেজের অন্য শিক্ষকদের সঙ্গে তাঁর বিদ্যার পার্থক্য তেমন ছিল না। পার্থক্য ছিল বিদ্যাদানের কৌশলে দিক থেকে। তাঁর বিশেষ ব্যক্তিত্ব ও ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষা পদ্ধতি কলেজের তরুণ ছাত্রদের আকৃষ্ট করেছিল। 'ছাত্রদের মাথায় পাঠ্যবস্তু ঠেসে দিয়ে তিনি তাঁদের কৃতী পরীক্ষার্থীতে পরিণত করার পক্ষপাতী ছিলেন না, তার পরিবর্তে তাঁদের মনে জ্ঞানার্জনের স্পৃহা জাগিয়ে দিতেন, এবং মানুষ জীবন ও সমাজ সম্বন্ধে উদার চিন্তার পথ খুলে দিতেন।'[২] 'দ্বিস্তর বিশিষ্ট শিক্ষাক্রম'[৩] নিয়ে পরিচালিত হিন্দু কলেজের

উদ্দেশ্যে ছিল ইউরোপিয় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা। এ উদ্দেশ্যের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। শ্রেণিকক্ষের গতানুগতিক শিক্ষা-পদ্ধতিতে তাঁর বিশেষ ভক্তি ছিল না। তিনি শিক্ষক হিসেবে হিন্দু কলেজে যোগ দেওয়ার পর, সে কলেজে একটা নতুন মাত্রা যোগ হয়। 'তিনি ছাত্রদের জ্ঞান চর্চার জন্য এখানে 'পাঠচক্র, বিতর্কসভা' প্রভৃতির আয়োজন করতেন।[৪]

৫.২

গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক

ডিরোজিওর মতো সহানুভূতিশীল স্নেহপ্রবণ শিক্ষক তখনকার দিনে বাস্তবিকই দুর্লভ ছিল। কোনো বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার আগে তিনি ঐ বিষয় পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিতেন। শুধু বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে বাস্তব জীবনে এবং সমাজে ঐ বিদ্যার প্রত্যক্ষ প্রয়োগ-প্রতিষ্ঠার আকাঙ্খাও ছাত্রদের মনে জাগিয়ে তুলতেন। সেকালে অন্য কোনো শিক্ষক ছাত্রদের মনে অনুরূপ প্রেরণা জাগাতে পারতেন না। তিনি ছাত্রদের শুধু পুঁথিগত বিদ্যাতে সীমাবদ্ধ রাখতেন না। তার বাইরে মানুষের জীবনের সবচেয়ে যে মহৎ শিক্ষা সত্যের প্রতি নিষ্ঠা, অন্যায়ের প্রতি ঘৃনা, সেই শিক্ষাও তিনি তাঁদের দিতেন। এ প্রসঙ্গে কিশোরীচাঁদ মিত্র লিখেছেন:

> He felt it his duty as such to teach not only words but thins, to touch not only the head but the heart. He sought not to cram the mind but to inoculate it with large and liberal ideas.[৫]

ডিরোজিওর শিক্ষাদর্শনের মূলে ছিল মানবকল্যাণ। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে তিনি বাস্তবসত্যকে সামনে রেখে ন্যায়ের শিক্ষা দিতে চেয়েছেন। তাঁর শিক্ষাদর্শন সম্পর্কে প্যারীচাঁদ মিত্র বলেছেন:

> তিনি ছাত্রদের স্বাধীন চিন্তার পবিত্র কর্তব্য সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন করে দিতেন। যাতে তারা কোনোরকমেই বেকন কথিত কোনো মায়া বিগ্রহ দ্বারাই প্রভাবিত না হয়, সত্যের জন্য জীবনধারণ ও মৃত্যুবরণ করে এবং সর্বপ্রকার পাপ বর্জন করে চলে- সেই জীবন সম্বন্ধে তাদের মনে বিশেষভাবে ছাপ দিয়ে দিতেন। প্রায়ই তিনি প্রাচীন ইতিহাস থেকে ন্যায়বিচার, দেশপ্রেম, মানবকল্যাণ এবং আত্মত্যাগের উদাহরণ পড়ে শোনাতেন। যেভাবে তিনি এই বিষয়গুলো বুঝিয়ে বলতেন তার ফলে ছাত্রদের মনে সেগুলো গভীর প্রভাব বিস্তার করতো। কোনো ছাত্র হয়তো ন্যায় বিচারের মহিমায় মুগ্ধ হতো, কেউবা সত্যনিষ্ঠার পরম গুরুত্ব সম্বন্ধে অবহিত হতো, কেউবা মানবকল্যাণের মন্ত্রে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠতো।"[৬]

রবীন্দ্রনাথ শিক্ষান্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত যে ক'জন ইংরেজ অধ্যাপক শিক্ষকের শিক্ষাচিন্তাকে গুরুত্ব দিতেন তাঁদের মধ্যে ডিরোজিও অন্যতম। ডিরোজিওর শিক্ষা কৌশলের প্রশংসা করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন:

> ডিরোজিয়েন,কাপ্তেন রিচার্ডসন, ডেভিড হেয়ার, ইঁহারা শিক্ষক ছিলেন; শিক্ষার ছাঁচ ছিলেন না,নোটের বোঝার বাহন ছিলেন না। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যূহ এমন ভয়ংকর পাকা ছিল না; তখন তাহার মধ্যে আলো এবং হাওয়া প্রবেশের উপায় ছিল; তখন নিয়মের ফাঁকে শিক্ষক আপন আসন পাতিবার স্থান করিয়া লইতে পারিতেন।[৭]

৫.৩

ডিরোজিও অনুসারী বা ইয়ং বেঙ্গল

আমরা জানি যে, ১৮২৭ সালে কতগুলো 'মৌলিক বিষয়'[৮] বাস্তবায়নের লক্ষ্যকে সামনে রেখে ডিরোজিও 'একাডেমিক এসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[৯] তাঁর এ প্রতিষ্ঠানের সদস্যরা 'ইয়ং বেঙ্গল' বা নব্যবঙ্গ নামে পরিচিত।[১০] হিন্দু করেজের নবীন ছাত্ররা তাঁদের প্রিয় শিক্ষক ডিরোজিওর সাহচর্যে এসে এবং তাঁর একাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের আলোচনা সভায় যোগ দিয়ে যথার্থই যোগ্য হয়ে উঠেন। তাঁরা পাশ্চাত্য সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে ভারতীয় সমাজের ঐতিহ্যক কাঠামোতে পরিবর্তন নিয়ে আসেন। তাঁরা পরিচিত হন ইউরোপের রেঁনেসাস-উত্তর দার্শনিক, শিল্পী, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানীদের সৃষ্টি কর্মের সঙ্গে। যাঁদের মধ্যে বেকন, লক, হিউম, মিল, কান্ট, রুশো, ভলতেয়র, দান্তে, ট্যাসো, বায়রণ, ডারউইন,

Dhaka University Institutional Repository

লেমার্ক প্রমুখ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁদের চিন্তা-চেতনা প্রভাবিত এ সভার সদস্যদের বক্তৃতায় শ্রোতারা মুগ্ধ হতেন। ফলে অল্পদিনের মধ্যেই একাডেমিক এসোসিয়েশন তখনকার কলকাতার বিদ্বৎসমাজ , বিকাশমান শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির সুদৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ সভার নবীন সদসস্যদের বক্তৃতা শোনতে বিচক্ষণ প্রবীণরাও আসতে শুরু করে। উচ্চ শ্রেণির ইউরোপিয়রাও সে যাত্রা থেকে বাদ যেতেন না। এঁদের মধ্যে ডেভিড হেয়ার, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি এডওয়ার্ড রায়ান,ডা.উইলসন,ডেপুটি গভর্নর মি.বার্ড, লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের ব্যক্তিগত সচিব কর্ণেল বেনসন, অ্যাডজুটেন্ট জেনারেল কর্ণেল বেটসন, বিশপস কলেজের অধ্যক্ষ ডা. মিলস প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। একাডেমিক এসোসিয়েশনের কর্মকান্ড প্রসঙ্গে ডিরোজিওর জীবনীকার এডওয়ার্ডস বলেছেন:

> Free will, free ordination, fate, faith, the sacredness of truth, the high duty of cultivating virtue and the meanness of vice, the nobility of patriotism, the attributes of God and the arguments for and against the existence of the deity as these have been set forth by Hume on the one side, and Reid, Dugald Stewart and Brown on the other, the hollowness of idolatry and the shames of the priesthood, were subjects which stirred to their very depths the young, fearless, hopeful hearts of the leading Hindu youths of Calcutta.[11]

ইউরোপের বিভিন্ন সামাজিক ও একাডেমিক সভা-সমিতির মূলনীতির সঙ্গতিপূর্ণ ছিল ডিরোজিওর 'একাডেমিক এসোসিয়েশন'-এর মূলনীতি;'চিন্তার স্বাধীনতা' 'আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা' এবং 'পরস্পর মিলনের স্বাধীনতা। হিন্দু কলেজের সঙ্গে একাডেমিক এসোসিয়েশন ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের কঠিন ও কঠোর প্রাচীরঘেরা বদ্ধসমাজে জ্ঞানের আলো যে কিছুটা হলেও ছড়িয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। ডিরোজিও অনুসারী হিন্দু কলেজের ছাত্ররা- ভল্টেয়ার, হবস, স্পিনোজা, লক, হিউম প্রভৃতি পড়ে নিজেদের স্বাধীন সত্ত্বা বিকাশে তৎপর হয়ে ওঠে। আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম ও ফরাসি বিপ্লবে উদ্বুদ্ধ টম পেইনের 'rights of man' Ges 'The Age of Reason' তাঁদের তারুণ্যে নতুন গতি সঞ্চার করে। ফলে তাঁরা ('ইয়ং বেঙ্গল'রা) প্রাচীন ধর্মীয় অনুশাসনের বাইরে এসে আধুনিক জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন। তাঁদের খাওয়া -পরা, চলাফেরায় এ আধুনিকতার ছাপ পড়ে। তাঁরা প্রকাশ্যে পরিবার ও সমাজের ঐতিহ্যিক আচার-রীতি ভাঙ্গতে শুরু করেন। ডিরোজিওর 'একাডেমিক এসোসিয়েশন'-ছিল সমাজ, ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা ও তর্ক-বিতর্কের জন্য ভারতের প্রথম সংঘ। অল্প দিনের ব্যবধানেই এটি রেডিক্যালদের একটি কার্যকর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পরিণত হয়।

৫.৪

হিন্দু ধর্মমত ও আচার-সংস্কারে আঘাত

ডিরোজিওর এ ধরণের শিক্ষাকার্যক্রম প্রাচীনপন্থী অভিভাবকদের অনেকের কাছেই স্বাভাবিক বলে মনে হয়নি। তাঁরা এটিকে তরুণ শিক্ষকের তারুণ্যের অস্বাভাবিক আচরণ বলে মনে করেছে। ফলে অনেকেই হিন্দু কলেজে তাঁদের সন্তান পাঠাতে অনীহা প্রকাশ করেছে। ডিরোজিওর চিন্তা জগতে ফরাসি বিপ্লবের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। এ প্রসঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন:

> এই নবীনে অতিরিক্ত আসক্তির আরও একটু কারণ ছিল। ফরাসি বিপ্লবের আন্দোলনের তরঙ্গ সকল ভারতক্ষেত্রেও আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। ১৮২৮ সালে যাঁহারা শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন ও যে যে কবি ও গ্রন্থকারের গ্রন্থাবলী অধীত হইত, সেই সকল শিক্ষকের মন ও উক্ত গ্রন্থাবলী ফরাসি বিপ্লবজনিত স্বাধীনতা-প্রবৃত্তিতে সিক্ত ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বঙ্গীয় যুবকগণ যখন ঐ সকল শিক্ষকের চরণে বসিয়া শিক্ষালাভ করিতে লাগিলেন এবং ঐ সকল গ্রন্থাবলী পাঠ করিতে লাগিলেন তখন তাঁহাদের মনে এক নব আকাঙ্খা জাগিতে লাগিল। সর্বপ্রকার কুসংস্কার, উপধর্ম্ম ও প্রাচীন প্রথা ভগ্ন করিবার প্রবৃত্তি তাঁহাদের মনে প্রবল হইয়া উঠিল। ভাঙ্গ ভাঙ্গ ভাঙ্গ, এই তাহাদের মনের ভাব দাঁড়াইল। ফরাসি-বিপ্লবের এই আবেগ বহুবৎসর ধরিয়া বঙ্গসমাজে কার্য্য করিয়াছে; তাহার প্রভাব এই সুদূর পর্য্যন্ত লক্ষ্য করা গিয়াছে।[১২]

ডিরোজিওর প্রতিষ্ঠান 'একাডেমিক এসোসিয়েশন'সেকালে মুক্ত সামাজিক মঞ্চে পরিণত হয়। এ সংঘের সদস্যরা ভারতের নানা ধর্মের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নেয়। তাঁরা প্রাণহীন নানা আচার-অনুষ্ঠান, পৌত্তলিকতা, দেবতা বিশ্বাস প্রভৃতির বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ জানায়। এ প্রসঙ্গে বিনয় ঘোষ বলেছেন:

> ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে, নৈতিক ভন্ডামি ও সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, বিচারবুদ্ধিহীন মাস্ত্রবচনের বিরুদ্ধে, প্রাণহীন আচার-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে, জাতিভেদ ও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে, রাজনৈতিক অর্থনেতিক ও মানসিক জড়তার বিরুদ্ধে, নিয়তিবাদ ও দেবতা-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে অ্যাকডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের বৈঠকে তরুণরা নিয়মিত তর্কবিতর্ক করতেন।[১৩]

'ইয়ং বেঙ্গল'রা একাডেমিক এসোসিয়েশন সভায় দর্শন, ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি ও নৈতিকতা প্রভৃতি বিষয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা করতেন। তাঁরা তৎকালীন ভাতবর্ষের সামাজিক-ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিভিন্ন সমস্যা সংকট নিয়ে বিভিন্ন যুক্তি দিতেন। এ ক্ষেত্রে মত প্রকাশে তাঁরা পূর্ণ স্বাধীনতা পেতেন। সেকালে বাংলার যুবসমাজের চিন্তা- চেতনার বিকাশ প্রসঙ্গে ব্রাডলি-বার্ট-এর কথাটি গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেছেন:

> The Association was the fit platform for ventilating the excess enquring spirits of the young minds.[১৪]

'ইয়ং বেঙ্গল'রা সেকাল ভারতের বর্ণব্যবস্থাকে একটি অস্বাভাবিক সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁদের কাছে এটি একটি অযৌক্তিক ব্যবস্থা বলে মনে হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আলেকজান্ডার ডাফ তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে আমাদের জানিয়েছেন:

> Students, who joined the deliberations of the Association, regarded caste as an unnatural institution alienating man form man since it was contrary to the spirit of rationalism and the new society.[১৫]

একাডেমির সদস্যরা এই বর্ণব্যবস্থাকে সমাজ জীবনে ব্যক্তির জন্য অবমাননাকর হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং এর প্রতিকারে তাঁদের যুক্তি ও মতামত তুলে ধরেন। তাঁরা সমাজদেহ থেকে এই অমানবিক ব্যবস্থার অবসান কল্পে এগিয়ে আসেন। আলেকজান্ডার ডাফ এ সম্পর্কে বলেছেন:

> The radicals looked forward to the period in which knowledge, by its transforming power, would elevate the lowest of the low, make feel himself a member of the great society of which he is an integral part, he is at one with the highest in respects of position and privilege.[১৬]

সেকালে এই প্রতিষ্ঠানের আলোচনা ও জ্ঞানচর্চা সেকালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। একদিন সিলেক্ট কমিটির সামনে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য মি. লুসিংটন ডিরোজিওর 'একাডেমিক এসোসিয়েশন' সম্পর্কে বলেছেন:

> debating societies where they discussed topics of considerable importance in the English language and read lectures and essays of their own composition upon various scientific subjects. At one of the meeting.... the question of discussion was whether posthumous fame be a rational principle of human action or not. it is true that the debates soon branched off into a consideration of the possibility of human perfection but the orators spoke with remarkable fluency, quoting Gibbon, Hume, Reid, Bolingbroke, voltaire, Shakespeare, Milton etc. The members were so revolutionary minded that one of the young Hindus in question being called upon at the police to swear, as usual, on the waters of the Ganges, declined that he should just as soon swear by the water of the Nile."[১৭]

ইয়ংবেঙ্গল দল সম্পর্কে বিনয় ঘোষ বলেছেন-'ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে, নৈতিক ভণ্ডামি ও সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, বিচারবুদ্ধিহীন শ্রাস্ত্রবচনের বিরুদ্ধে, প্রাণহীন আচার-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে, জাতিভেদ ও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে, রাজনৈতিক আর্থনীতিক ও মানসিক জড়তার বিরুদ্ধে, নিয়তিবাদ ও দেবতা-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের বৈঠকে তরুনরা নিয়মিত তর্কবিতর্ক করতেন।'[১৮] নীহাররঞ্জন রায়ের বক্তব্যেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন :

> ইয়ংবেঙ্গল-এর নেতা বিদ্রোহী ডিরোজিও ও তাঁর তদধিক বিদ্রোহী শিষ্যবর্গের আন্দোলনও ..... সংক্ষিপ্ত একটি চরমপন্থী অধ্যায়, এবং সে অধ্যায় অর্থহীন নয়। ...., রামমোহনেরা কেউই সমাজের কাঠামোটাকে

> একেবারে ভেঙে-চুরে সম্পূর্ণ নূতন কাঠামো তৈরি করতে চাননি। ইয়ং বেঙ্গল তা-ই চেয়েছিলেন; ভারতীয় পরম্পরার উত্তরাধিকারের খোল-নলচে সবটাকেই এঁরা অস্বীকার ও বর্জন করে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। ক্রোধপরবশে কেউ কেউ নিজের পরম্পরাগত ধর্ম ও সমাজকে পরিত্যাগ করে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং য়ুরোপীয় খ্রিস্টসমাজে প্রবেশাধিকার চেয়েছিলেন। ভারতবর্ষে বসবাস করছেন বরং য়ুরোপীয় ও ইংরেজ খ্রিস্টসমাজ তাঁদের সে প্রবেশাধিকার দেয়নি। ভারতীয় পরম্পরার সবটাকেই অস্বীকার ও বর্জন এবং খ্রিস্টধর্ম গ্রহণই শুধু নয়; পাশ্চাত্য শিক্ষা, জীবনাচরণ ও সংস্কৃতির সবটাকেই তাঁরা গ্রহণ করবার জন্য একান্ত উৎসুক ছিলেন, প্রচুর প্রকাশ্য-মদ্যপান এবং গোমাংসভক্ষণ-সহ।[১৯]

ইয়ংবেঙ্গলদের বিদ্রোহের কথা বলতে গিয়ে বিনয় ঘোষ লিখেছেন:

> তরুণের বিদ্রোহ পরিপূর্ণ বিদ্রোহ, মনে হয় যেন তার কোন দিগন্তরেখা নেই। তরুণ ডিরোজীয়ানদের বিদ্রোহের প্রথম উল্লাসে ঠিক তাই মনে হয়েছিল। উনিশ শতকের তিরিশের দশক নবযুগের বাংলার তরুণদের প্রথম বিদ্রোহকাল এবং তার ফেনোচ্ছ্বসিত প্রবল প্রকাশ তিন-চার বছরের মধ্যে স্তিমিত হয়ে যায়, যদিও চল্লিশের দশক পর্যন্ত তার প্রতিক্রিয়ার ঢেউ বইতে থাকে।[২০]

ইয়ংবেঙ্গলদের এই বিদ্রোহের পরিণতি হয়েছিল ভয়াবহ। তার কারণ তখন পর্যন্ত ভারত এতটা আধুনিক হয়ে উঠেনি, যতটা আধুনিকতার কথা তাঁরা বলেছিলেন। এ সম্পর্কে নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন - 'তাঁদের বিদ্রোহের বাণী ও আচরণ তাঁদের বিরুদ্ধে এত শত্রু সৃষ্টি করেছিল যে, সে-শত্রুদলের সঙ্গে লড়াই করতেই তাঁদের সমস্ত উষ্মা ও উত্তাপ ও শক্তি ব্যয়িত হয়ে গেল; নিজেদের আগুনে নিজেরাই তাঁরা পুড়ে মরলেন। কালের পরিপ্রেক্ষিতে ও সমসাময়িক সামাজিক অবস্থায় ইয়ং বেঙ্গলদের বিদ্রোহের ব্যর্থতা ছাড়া আর কোনো পরিণতিই কল্পনা করা যায় না।'[২১] ফলে তাঁরা নিজেদের আগুনে পুড়েই ধ্বংস হলেন। তাঁদের চিন্তা-চেতনাও একইভাবে ম্লান হয়ে গেল। তা আর উত্তর প্রজন্মের জন্য সত্যকার কোনো আলো হয়ে থাকল না। তাঁদের পরে মধুসূদন, অক্ষয়কুমার, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ স্রষ্টারা বাংলা সাহিত্যে ও চিন্তায় নবযুগের যে বার্তাবহন করে এনেছিলেন সেটাই ছিল উত্তর প্রজন্মের জন্য যথার্থ আলো। ভবতোষ দত্ত লিখেছেন:

> উনিশ শতকে যাদের আমরা 'নব্যবঙ্গ' বলি, বাংলার ইতিহাসে তাহারা সুখ্যাত অথবা কুখ্যাত ইংরেজিয়ানার প্রবর্তক বলে। নব্যবঙ্গ নামের যুবকরা ছিল হিন্দু কলেজের ছাত্র। ১৮২৬ থেকে ১৮৪০ পর্যন্ত মোটামুটি সময়টা ছিল বাংলার নব্যবঙ্গের আন্দোলনের সময়। হেনরি লুই ভিভিয়ানর ডিরেজিও ছিলেন তাঁদের আদর্শ শিক্ষক যিনি তাঁর ছাত্রদের শিখিয়েছিলেন স্বাধীন ভাবে চিন্তা করতে। বহুকালাগত প্রথাবদ্ধ শাস্ত্রের নির্দেশ না মেনে বাস্তব পরিপ্রেক্ষিকায় কার্যকারণসূত্র অবলম্বনে নীতিগত সিদ্ধান্ত নিতে ডিরোজিও শিখিয়েছিলেন তাঁর ছাত্রদের। পরবর্তী কালে হিন্দু কলেজের এই সব জ্যোতিষ্কতুল্য ছাত্রের দল আধুনিক বাংলার সংস্কতির নানা ক্ষেত্রে পুরোভাগে আসে। হিন্দু কলেজের এই ছাত্রেরা পড়াশুনা করেছিল নতুন শিক্ষানীতির আদর্শে। পাশ্চাত্য দেশগুলির শিক্ষায়তনে যে-শিক্ষার আদর্শ তৈরি হয়ে উঠেছিল রেনাশাঁসের পর, সেই আদর্শই প্রচলিত হয়েছিল আমাদের শিক্ষালয়ে। এরই মধ্যে দিয়ে সঞ্চারিত হয়ে এসেছে আধুনিক মানবিক ভাবধারা।[২২]

সত্য অপেক্ষা প্রিয় ইয়ংবেঙ্গলদের কাছে আর কিছুই ছিল না। অসত্য যেখানে সেখানেই তাঁরা তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। 'ডিরোজিও ও তাঁর শিষ্যদের চিন্তা ও চেতনায় এবং মন-মানসিকতায় সবচেয়ে বেশি সক্রিয় ছিল এদেশের স্বাধীনতা, আর যুক্তি, মুক্তবুদ্ধি ও আত্মপ্রত্যয়। এইজন্যই বলা হয়-ইয়ংবেঙ্গলদের দুই উপস্যদেবতা ছিলেন স্বাধীনতা ও যুক্তিবাদ'।[২] ইংরেজরা এদেশকে সাধারণত একটি অসভ্য, বর্বর ও অন্ধকারাচ্ছন্ন দেশ বলে ঘৃনা করত। এ প্রসঙ্গে তখনকার দিনের একটি ইংরেজি মাসিক পত্রে চিঠির মাধ্যমে হিন্দু কলেজের এক ছাত্র জানতে চান-'কোন অধিকার বলে ইংরেজরা এদেশকে বর্বর ও অসভ্য বলে? শুধু ইংরেজদের এদেশ জয় করার আগে থেকেই নয়-সুপ্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষ ছিল শিল্পসমৃদ্ধ ও উন্নত সভ্যতার অধিকারী একটি দেশ। আমেরিকা যেমন দাসত্বের শিকল ছিঁড়ে আজ উন্নত একটি দেশ, ভারতবাসীও তার পরাধীনতার বন্ধন ছিন্ন করতে পারলেই এদেশের চিত্তমুক্তি ও আত্মমুক্তি ঘটবে এবং সমস্ত গ্লানি ও দুর্গতির অপনোদন হবে।[৩]

ইয়ংবেঙ্গলদের মধ্যে রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও রামগোপাল ঘোষ এই চারজনকে বলা হতো 'আগুনের ফুলকি' । এঁদের পরের সারিতে ছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী প্যারীচাঁদ নানা কারণে আজো বিখ্যাত হয়ে আছেন। ছিল তাঁর। তিনি ডিরোজিওর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে ছিলেন, তাঁর কাছে লকের দর্শনের পাঠ নিয়েছিলেন। আর লকের দর্শনের প্রভাবিত হয়েই তিনি বলেছিলেন -'ব্যক্তিগত সম্পত্তি থেকে সরকারের সৃষ্টি হয় কিন্তু সরকার থেকে ব্যক্তিগত

সম্পত্তির সৃষ্টি হয় না'।[৪] প্যারীচাঁদ মিত্র ডিরোজিও পন্থীদের বলতেন 'ইয়ং ক্যালকাটা'। এঁদের কেউ কেউ দলের প্রবীণতম সদস্য তাঁরাচাঁদ চক্রবর্তীর নামানুসারে 'চক্রবর্তী ফিকশন' বলতো। স্বয়ং ক্যাপ্টেন রিচার্ডসন সাহেব ইয়ংবেঙ্গলদের 'চক্রবর্তী ফিকশন' বলতেন। এ ক্ষেত্রে হরমোহন চট্টোপাধ্যায়ে কথাটিই সবচেয়ে অর্থবহ মনে হয়।

তিনি বলেছেন-'ওরা, সকলেই সত্যের উপাসক বলে বিবেচিত হয়'।[৫] যদিও তাঁরা বিভিন্ন প্রেক্ষিতে নানা কথা বলেছেন। এখানে সূত্রাকারে সেগুলোর কয়েকটি দেওয়া যায়। যেমন:

১. 'অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আমরা হিন্দু ধর্মকে ঘৃনা করি'।[৬]
২. 'আমি গঙ্গার পবিত্রতায় বিশ্বাস করি না'।[৭]
৩. 'পূজোর ঘরে মন্ত্রোচ্চারণের নামে ইলিয়াডের অংশ বিশেষ আবৃত্তি'। [৮]
৪. 'দেবীর সামনে মন্ত্রোচ্চারণের পরিবর্তে হেলেনের রূপবর্ণনা'।[৯]
৫. 'কালীদেবীর সামনে মাথা নিচু করে প্রণামের পরিবর্তে এড়ড়ফ সড়ৎহরহম সধফধস বলে কালীকে নমস্কার জানানো'।[১০]

এসব কারণে 'সংবাদ প্রভাকর' ও 'সমাচার চন্দ্রিকা' হিন্দু কলেজের ও ডিরোজিওর শিষ্যদের প্রচন্ড ক্ষোভে বলেছে 'বেকার ফিরিঙ্গিদের অনুকরণ প্রিয় ঈশ্বরে অবিশ্বাসী পশু'।[১১]

৬

রামমোহন রায় ও তাঁর চিন্তাধারা

রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩) আধুনিক ভারতের স্বপ্নদ্রষ্টা হিসেবে পরিচিত। তিনি বাংলার নবজাগরণের সূচনা পর্বের প্রধান চিন্তক। রামমোহন ইউরোপের নবচেতনার উদারনৈতিক চিন্তা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির ধারা প্রভাবিত ছিলেন। ভারতে বিজ্ঞানভিত্তিক পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনে সর্বোচ্চ ভূমিকা তাঁর। এ দেশে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসারপূর্বক সমস্ত কুসংস্কার দূর করে ইউরোপের ন্যায় প্রগতিশীল ধ্যান ধারণায় ভারতবাসীকে উদ্বুদ্ধ করাই ছিল তাঁর শিক্ষাচিন্তার প্রধান লক্ষ্য। সেকালে সরাসরি ইংরেজ শাসনের বিরোধীতা না করে বাঙালির আত্মজাগরণে যেসব মনীষী বিশেষ কৃতিতের পরিচয় দিয়েছেন রামমোহন রায় তাঁদের অন্যতম প্রধান। তিনি সমাজ সংস্কারক ও বাংলা গদ্য চর্চার অগ্রদূত হিসেবে সাধারণের কাছে সুপরিচিত। বাংলা গদ্যের সূচনা পর্বে তিনি গদ্য রচনা করে এর পথ নির্দেশ করেছেন । রামমোহন বাংলা ভাষায় 'বেদান্ত গ্রন্থ' অনুবাদ এবং বিজ্ঞান শিক্ষা দানের জন্য ভূগোল, খগোল ও জ্যামিতি শাস্ত্র বাংলায় রচনা করেছেন। তিনিই প্রথম বাংলা ভাষায় 'বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন।

৬.২

রামমোহন রায়ের কর্ম পরিচয়

আঠার শতকের শেষের দিক থেকে উনিশ শতকের প্রথম পাদ পর্যন্ত আমেরিকা-ইউরোপের ইতিহাসে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে। আমেরিকায় স্বাধীনতা সংগ্রাম, ফ্রান্সে গণবিপ্লব, ইংল্যান্ডে শ্রমিক অভ্যুত্থান প্রভৃতির ফলে সেখানে পুরানো চিন্তাভাবনার স্থলে প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশ ঘটে। এসবের প্রভাবে ভারতীয় সমাজেও আত্মোন্নয়নের সূচনা হয়। ভারতের ব্রিটিশ বাণিজ্য এবং কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠা হলে মাধ্যমে অর্থনৈতিক পরিবর্তনে দেশে ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার আন্দোলন দেখা দেয়। স্বপন বসু লিখেছেন:

> পঞ্চদশ শতক থেকে শুরু করে সতের শতকের গোড়া পর্যন্ত ইউরোপে রেনেসাঁস বা নবজাগরণের ফলে মধ্যযুগীয় ইউরোপের তমসাচ্ছন্ন গির্জার পুরোহিত শাসন তথা পুরোহিততন্ত্রের নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে চিন্তার মুক্তি বা ব্যক্তি চেতনার জাগরণ ঘটেছিল। এই নব জাগরণের মূলকথা ছিল ব্যক্তির মন, বোধ, বুদ্ধি পুরোহিততন্ত্রের অচলায়তন থেকে মুক্ত হয়ে যুক্তি ও বিচারের মাধ্যমে সকল কিছুরই নবমূল্যায়ন।

> ইউরোপের উদারনৈতিক চিন্তাধারা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ, অতীতকে যুক্তি দিয়ে বিচার, রক্ষণশীল কর্তৃক এতদিনের ব্যাখ্যাত শাস্ত্র ও ধর্মের অনুশাসনের নবমূল্যায়ন, ইউরোপ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের সামঞ্জস্য বিধানপূর্বক ভবিষ্যত গড়ার আকঙ্খাই ঊনিশ শতকের প্রথম ভাগে বাংলাদেশে নবজাগরণের অনুপ্রেরণা জাগায়। এই নবজাগরণ বাংলাদেশে সামাজিক চিন্তা, সমাজ সংস্কার, সাহিত্য সৃষ্টি, স্বদেশীয় ইতিহাস অন্বেষণ, সাংস্কৃতিক আন্দোলন এক কথায় বৈপ্লবিক পরিবর্তনের এক নব- চেতনা এনে দিয়েছিল।[১]

–এই সংস্কার আন্দোলনের প্রথম দার্শনিক ও নায়ক ছিলেন রামমোহন রায়। 'রামমোহন রায়ের ধর্ম ও কর্ম–জীবন এ দেশে মাত্র পনেরো বছরের–১৮১৫ থেকে ১৮৩০ পর্যন্ত,অর্থাৎ রংপুর থেকে এসে কলকাতায় বসতি আরম্ভ ও বিলাত যাত্রার পূর্ব পর্যন্ত।'[২] এই সময়ের মধ্যে তিনি হিন্দু ধর্মের নানা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে ব্রাহ্মসমাজের ভিত্তি স্থাপন করেন। রামমোহনের ধর্মীয় বোধ,সমাজ সংস্কার, শিক্ষাব্রত, সংগীত প্রতিভা ও লেখক হয়ে উঠবার সমগ্র প্রচেষ্টা রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করেছিল। পরবর্তীতে রামমোহন তাঁর কাছে এক আদর্শ ব্যক্তিপুরুষ হয়ে উঠেছিলেন । তিনি লিখেছেন: 'কী রাজনীতি, কী বিদ্যাশিক্ষা, কী সমাজ, কী ভাষা, আধুনিক বঙ্গদেশে এমন কিছুই নাই স্বহস্তে যাহার সূত্রপাত করিয়া যান নাই।'[৩] তিনি অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় তাঁর বক্তব্য সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরতেন। তাঁর গদ্য রচনার ভাষা বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখেছে-'দেওয়ানজী জলের ন্যায় সহজ ভাষা লিখতেন, তাহাতে কোন বিচার ও বিবাদঘটিত বিষয় লেখায় মনের অভিপ্রায় ও ভাবসকল অতি সহজে স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইত, এই জন্য, পাঠকেরা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করিতেন।'[৪] পাশ্চাত্যের শিক্ষা সংস্কৃতি ও জীবনধারার প্রেক্ষাপটে ভারতীয় সমাজকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে রামমোহন ছিলেন দৃঢ় সংকল্প। তাঁর চিন্তাশীল রচনায় এবং কর্মতৎপরতায় তার প্রমাণ স্পষ্ট হয়ে আছে। এ কারণেই ভারতবর্ষের জাগরণের ইতিহাসে তিনি অগ্রপথিকের মর্যাদায় আসীন। পারিবারিকভাবেও তিনি ছিলেন মর্যাদাবান। তাঁর পিতৃপুরুষ ছিলেন পুরাতন জমিদার বংশ। তাঁর পরিচয় সম্পর্কে কাজী আবদুল ওদুদ লিখেছেন:

> 'অল্প বয়সেই রামমোহনের প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল বলে জীবনীকাররা জানিয়েছেন। গ্রামের পাঠশালায় বাংলা শুভঙ্করী আর কিছু ফার্সী শিক্ষার পর তিনি পাটনায় যান ফার্সী ও আরবী বিদ্যায় আরো পারদর্শী হতে– সেদিনে সেইটেই ছিল উচ্চতর শিক্ষা। পাটনা থেকে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে, আরবী, ফার্সীতে তিনি একটি বই লেখেন, সম্ভবত তারই নাম ছিল 'মনজেরাতুল আদিয়ান' অর্থাৎ বিভিন্ন ধর্ম বিষয়ে আলোচনা। তাঁর 'তুহ্ফাতুল মুত্তহিদীন' এ এই গ্রন্থের উল্লেখ আছে। ধর্ম বিষয়ে তাঁর প্রচলিত সংস্কারবিরোধী মত জানতে পেরে তাঁর পিতা এবং আত্মীয়-স্বজন অপ্রসন্নতা জ্ঞাপন করেন। কতকটা তার ফলে আর কতকটা ধর্ম বিষয়ে আরো জ্ঞানলাভের জন্য তিনি গৃহত্যাগ করে পনের বৎসর বয়সে তিব্বত পর্যন্তভ্রমণ করেন। এই ভ্রমণ থেকে বছর তিনেক পরে দেশে ফিরলে পিতা তাঁকে গ্রহণ করেন, আর তারপর কাশীতে তিনি দীর্ঘকাল হিন্দুশাস্ত্রের চর্চা করেন।[৫]

১৮০৩ সালে পিতার মৃত্যুর কিছুকাল পর রামমোহন ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে চাকরি গ্রহণ করেন। ১৮০৯ সাল থেকে ১৮১৪ সাল পর্যন্ত তিনি ইংরেজ সিভিলিয়ান ডিগবির অধীনে রংপুরের কয়েকটি জেলায় দেওয়ান হিসেবে কাজ করেন। এই চাকরি সূত্রেই ডিগবির সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয়। ডিগবির সহায়তায় তিনি ইংরেজি ভাষা–সাহিত্যে এবং সমসাময়িক ইউরোপীয় রাজনীতিতে বুৎপত্তি লাভ করেন। ১৮১৫ সালে রংপুর ত্যাগ করে তিনি একজন বিত্তশালী ও পণ্ডিত হিসেবে কলকাতায় বসবাস শুরু করেন। এ সময় তিনি পুস্তক-পুস্তিকা রচনা ও প্রকাশ, পত্রিকা সম্পাদনা এবং বিভিন্ন সভা-সমিতি গড়ে তুলেন। এসব কর্মকাণ্ডে তাঁর উন্নত চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়।

রামমোহন রায় কলকাতায় এসে ফার্সী, ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় বিভিন্ন পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশনার মাধ্যমে এদেশিয়দের মধ্যে নব জাগরণের সূচনা করেন। এই জাগরনের ফলে শিক্ষিত সচেতন বাঙালি আত্মমর্যাদার সঙ্গে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে শিখে। তাঁর মতাদর্শের অনুকূলে জনমত গঠনের জন্য যেসব পত্রিকা প্রকাশিত হয়,তার মধ্যে Brahmunical Mazazine ইংরেজি ভাষায় এবং 'ব্রাহ্মণ সেবধি' ও 'সম্বাদ কৌমুদী' বাংলা ভাষায় (১২৮১) উল্লেখযোগ্য। ১৮২২ সালে তিনি সীরতুল আখবার', নামে ফারসী ভাষায় একটি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। বাংলা সংবাদপত্রের ইতিহাসে এগুলো প্রথম স্বদেশীয় উদ্যোগে প্রকাশিত পত্রিকা, যা সমাজ সংস্কারের তাগিদ এবং বুদ্ধিবৃত্তিক রচনা প্রকাশের প্রথম বাহনের ভূমিকা পালন

করে। তিনি সংবাদপত্রের স্বাধীনতার এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে আধুনিক রূপদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

উনিশ শতকের বাংলায় রামমোহন রায় ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক হিসেবেই বেশি পরিচিত। সমকালীন ভারতবর্ষে তিনি মধ্যযুগের নিগড় থেকে মুক্ত করে হিন্দু সমাজকে সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি আচারসর্বস্ব হিন্দুধর্মকে সমসাময়িক তুচ্ছতার হাত থেকে উদ্ধার করার জন্য বেদান্তগ্রন্থ ও উপনিষদের অনুবাদ, পৌত্তলিকতা বিরোধী মতামত প্রকাশ করে প্রচলিত অর্থহীন অনুষ্ঠানের সমালোচনা করেন। সমাজ সংস্কারের জন্য প্রতিষ্ঠিত তাঁর সংগঠন 'আত্মীয় সভার' কার্যক্রমও ছিল সেকালের আলোচনার অন্যতম বিষয়। এক কথায় 'আত্মীয় সভার' সেকালে একটি বিরাট সংগঠনরূপে প্রতিভাত হয়। ভারতবর্ষের ইতিহাসে সমজসংস্কারের মাইলফলক হিসাবে রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত আত্মীয় সভার নাম উজ্জ্বল হয়ে আছে। এ প্রসঙ্গে স্বপন বসু লিখেছেন:

> তাঁর আত্মীয় সভায় ১৮১৬-তে অনুরাগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল পাঁচশতাধিক। আত্মীয়সভা কেবল সতীদাহই নয়, গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন, জগন্নাথের চাকার নীচে আত্মাহুতি ইত্যাদি ধর্মীয় কুসংস্কারগুলির বিরুদ্ধে জনমত গঠন করে এবং পৌত্তলিকতাকে রামমোহন অযৌক্তিক আচার হিসেবে বর্ণনা করেন।[৬]

–এসব কারণে রামমোহন রায় সেকালের হিন্দু সমাজপতিদের বিরাগভাজন হন। সমাজপতিরা তাঁর বিরুদ্ধে নানারকম কুৎসা রটনা করে এবং তাঁকে প্রাণনাশের হুমকি দেন। তিনি ইসলাম ও খ্রিষ্টধর্মের অনেক গভীর তাত্ত্বিক বিষয় নিয়ে আলোচনা সমালোচনা করেছেন। ইসলামি একেশ্বরবাদ, খ্রিষ্টের মানবপ্রেম, নৈতিক আদর্শ এবং বৈদান্তিক ভাবধারা এই তিনের সমন্বয়ে তার ধর্মভাবনা গড়ে উঠেছিল। তাঁর বৈদান্তিক মতামত গোঁড়া হিন্দুদের উত্তেজিত করে তুলেছিল। তিনি ভারতীয় হিন্দু সমাজে প্রচলিত সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন। তাঁর চেষ্টায় ১৮২৯ সালের ৪ ডিসেম্বর এই বর্বর ধর্মীয় প্রথা রহিত হয়। সেকালের সমাজ ব্যবস্থায় তাঁর এ ধরণের কর্মতৎপরতা ও সাফল্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। যা পরবর্তীতে বহু সামাজিক সংস্কার আন্দোলনে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে।

৬.৩

রামমোহন রায়ের শিক্ষাদর্শন

সমাজ সংস্কার এবং বাঙালির আত্মজাগরণ ছাড়া রামমোহন রায় শিক্ষা ক্ষেত্রেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর এই শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে সহযোগী হিসেবে বিশেষ সহায়তা করেছিলেন ডেভিড হেয়ার (১৭৭৫-১৮৪২)। সেকালে যেসব মহানুভব ইংরেজ ভারতের উন্নতি সাধনে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ডেভিড হেয়ার ছিলেন অন্যতম। ১৮০০ সালে তিনি এদেশে এসেছিলেন একজন ঘড়ি প্রস্তুতকারক হিসেবে । কালক্রমে আধুনিক শিক্ষাবিস্তারের উদ্যোগই তাঁর জীবনের প্রধান কর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রায় চারদশক ধরে তিনি বাংলায় শিক্ষাবিস্তারের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। ডেভিড হেয়ার ছাড়া তাঁকে যাঁরা শিক্ষাবিস্তারের কাজে উৎসাহিত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬) ছিলেন অন্যতম। ১৮৩১ সালে 'রিফর্মার' পত্রিকা প্রকাশ করে তিনি সমাজ সংস্কারমূলক অনেক কাজ করেন। রামমোহনের চিন্তা ও কর্মের বিপক্ষে যে কেউ ছিলেন না তা নয়। চিরায়ত সাহিত্য ও দর্শনে সুপণ্ডিত রাধাকান্তদেব (১৭৮৩-১৮৬৭) সতীদাহপ্রথা আন্দোলনের বিরোধীতা করেছিলেন। ইনি ছাড়াও গোঁড়াপন্থী গৌরীকান্তভট্টাচার্য, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭৮৭–১৮৪৮) প্রমুখ রামমোহনের কাজকর্মের বহু নেতিবাচক সমালোচ না করেছেন। গৌরীকান্তভট্টাচার্য রংপুর জজ আদালতের দেওয়ান ছিলেন। রামমোহন রায় রংপুরে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার শুরু করলে তিনি ১৮২১ সালে রামমোহনের বিরোধিতা করে 'জ্ঞানাঞ্জন' গ্রন্থ রচনা করেন। ভবানীচরণ রামমোহনের সংস্কারের বিরুদ্ধে 'সম্বাদ চন্দ্রিকা' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু রামমোহনের বিরুদ্ধ পক্ষ সেদিন দাঁড়াতে পারেনি। তার কারণ শাসক এবং মানুষের কল্যাণচিন্তক উভয়ের কাছ থেকে তিনি সমর্থন লাভ করেছিলেন। ড.সুনীল কান্তি দে লিখেছেন:

> শিক্ষা বিস্তারে রামমোহনের উৎসাহ ও উদ্যম স্মরণ রাখার মত। তিনি ভারতে ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসারপূর্বক কুসংস্কার দূরীকরণ এবং বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা দিয়ে ইউরোপের ন্যায় প্রগতিশীল ধ্যান ধারণায় বাংলা তথা ভারতবাসীকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। তিনি ধর্ম ও সমাজ সংস্কারকে তাঁর জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে দেশের মানুষকে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্পর্কে সচেতন করা অতি জরুরি। আর এজন্য প্রয়োজন শিক্ষা বিস্তার। সে কালে টোল, চতুষ্পাঠী ও মাদ্রাসা শিক্ষায় দেশের মানুষই শুধুমাত্র অতীত সম্পর্কে সচেতন হয়ে অতীতকে আঁকড়ে ধরার শিক্ষাই পেয়েছিল। যা বর্তমানকে বুঝে ভবিষ্যত রচনার অন্তরায় ছিল। তাই তিনি ইউরোপের চিন্তাধারার আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঙ্গে দেশের মানুষকে পরিচিত করে ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কার এবং অজ্ঞতা থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। এর ফলে একদিকে যেমন মানুষ কুসংস্কারমুক্ত হবে অন্যদিকে তেমনি অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবে তেমনি রাজনৈতিকভাবে সচেতন হবে।[৭]

১৮১৩ সালে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সনদ নবায়নের সময় শিক্ষা সম্পর্কিত প্রস্তাবনায় উল্লেখ করা হয়েছিল যে কোম্পানী প্রতি বছর ভারতে শিক্ষার জন্য এক লক্ষ টাকা ব্যয় করবেন। কিন্তু শিক্ষা খাতের এই পরিমাণ অর্থ কীভাবে ব্যয় করা হবে তাঁর স্পষ্ট ব্যাখ্যা ছিল না। ফলে এই বিষয়টি নিয়ে তখন বিতর্কের সৃষ্টি হয়। বিতর্কে 'একদল আরবি ও সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে প্রাচ্যবিদ্যার প্রসার ও অন্যদল ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের উপর জোর দেন।'[৮] বিতর্কের অবসান কল্পে 'সরকার প্রাচ্যবিদ্যা ও কৃষ্টি পুনরুজ্জীবন ও প্রসারের জন্য কলিকাতায় মাদ্রাসা ও বারানসীতে সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করে প্রাচ্যবিদ্যার পক্ষে সরকারি নীতির ভিত্তি স্থাপন করেন অর্থাৎ সরকার এদেশের প্রচলিত শিক্ষাধারাই অনুসরণ করেন।'[৯] তখন এদেশের রক্ষণশীলদের একটি বিরাট অংশ সরকারের এই শিক্ষানীতিকে সমর্থন জানান। সেই শিক্ষানীতিকে রামমোহন সমর্থন জানাতে পারেননি। কারণ তিনি এদেশের উন্নতির জন্য পাশ্চাত্য শিক্ষা-ইংরেজি ভাষা, আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। তাই ভারতের শিক্ষানীতি কিরূপ হওয়া উচিত, শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, এক্ষেত্রে কোম্পানীর দায়–দায়িত্ব কী হওয়া উচিত প্রভৃতি উল্লেখ করে তিনি তৎকালীন বড়লাট লর্ড আমহার্ষ্টকে এক দীর্ঘ পত্র প্রেরণ করেন । সেই পত্রে তিনি এদেশের শিক্ষা বিস্তার সম্পর্কে তাঁর মতামত তুলে ধরেন। তিনি লিখেন:

> ভারতের বর্তমান শাসকরা বহু হাজার মাইল দূর থেকে এদেশে এসে এমন একটি জাতিকে শাসন করছেন যাদের ভাষা, সাহিত্য, আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি ও ভাবধারা তাদের কাছে প্রায় সম্পূর্ণ নুতন ও অপরিচিত; তারা তাদের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে এদেশীয় লোকেরা যতোখানি পরিচিত, ততো ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হতে সহজে পারেন না। সুতরাং আমরা যদি এ মুহূর্তে প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে তথ্য না জানাই, তবে আমরা নিজেদের কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হব এবং আমাদের শাসকদের আমাদের নিজেদের মঙ্গলামঙ্গল সম্পর্কে ঔদাসীন্যের অভিযোগ করবার সুযোগ দেব। কলিকাতায় সরকারের একটি নূতন সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের ইচ্ছা প্রশংসনীয়। কিন্তু যখন ভারতীয় প্রজাদের শিক্ষার জন্য প্রতি বৎসর কিছু পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হলো, তখন আমরা আশা করেছিলাম যে, এই অর্থ এদেশীয় লোকদের গণিত, প্রকৃতিবিজ্ঞান, রসায়ন, শরীরতত্ত্ব ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার জন্যে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের নিয়োগ করা হবে। কিন্তু আমরা দেখছি যে, সরকার ভারতে ইতিপূর্বে যে বিদ্যা প্রচলিত আছে তাই হিন্দু পণ্ডিতদের দ্বারা শিক্ষাদানের জন্য একটি সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপন করছেন। ঐ ধরনের বিদ্যালয় (লর্ড বেকনের পূর্বে ইউরোপে যে ধরনের বিদ্যালয় ছিল) বালকদের মনকে ব্যাকরণ ও দর্শনের কচকচিতে ভারাক্রান্ত করে দেবে, বা শিক্ষা গ্রহণকারী বা সমাজ কারো কোনও ব্যবহারিক কাজে আসবে না। ছ'হাজার বছর আগে যে জ্ঞান পরিজ্ঞাত ছিল, সেই জ্ঞানই মাত্র তারা সেখানে লাভ করবে।[১০]

সরকারি অর্থ ব্যয়ে কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের যে উদ্যোগ নেওয়া হয় তিনি তার প্রতিবাদ করেন এবং

এরূপ কলেজ স্থাপনের অপ্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন–'আর যদি ঐ বিদ্যা শেখাতেই হয়, তাহলে সে জন্য নূতন সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার কোনও প্রয়োজন নেই; দেশে অসংখ্য সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক আছেন ও সংস্কৃত শিক্ষালয় আছে,...সেগুলিকে সাহায্যদানের দ্বারাই সে উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে।[১১] ইউরোপে যেভাবে প্রাচীন গ্রীক-ল্যাটিন শিক্ষার স্কুলে আধুনিক শিক্ষার প্রবর্তন করা হয়েছিল সেভাবে এদেশে আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তনের কথা ভেবেছিলেন তিনি। এদেশে শিক্ষা বিস্তার ও উন্নতি সাধনে তাঁর চিন্তার পক্ষে তিনি যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। তিনি লিখেছেন:

Dhaka University Institutional Repository

> যদি ইংরাজ জাতিকে প্রকৃত জ্ঞান বিষয়ে অজ্ঞ রাখা উদ্দেশ্য হইত তাহা হইলে প্রাচীন স্কুলমেনদিগের অসার বিদ্যার পরিবর্তে বেকনের প্রবর্ত্তিত জ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত হইতে না দিলেই হইত, কারণ প্রাচীন জ্হানই অজ্ঞতাকে বহাল রাখিত। সেইরূপ এদেশীয়দিগকে অজ্ঞতার অন্ধকারে রাখা যদি গবর্ণমেন্টের আকাঙ্খা ও নীতি হয়, তাহা হইলে প্রাচীন সংসঋত ভাষাতে শিক্ষা দেওয়ার ন্যায় তাহার উৎকৃষ্টতর উপায় আর নাই। তৎ-পরিবর্তে এদেশীয়দিগের উন্নতিবিধান যখন গবর্ণমেন্টের লক্ষ্য, তখন শিক্ষা বিষয়ে উন্নত ও উদার রীতি অবলম্বন করা আবশ্যক, যাদ্বারা অপরাপর বিষয়ের সহিত, গণিত, জড় ও জীব বিজ্ঞান, রসায়নতত্ত্ব, শারীরস্থান-বিদ্যা ও অপরাপর প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানাদির শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। যে অর্থ এখন প্রস্তাবিত কার্য্যে ব্যয় করিবার অভিপ্রায় করা হইয়াছে, তদ্বারা ইউরোপে শিক্ষিত কতিপয় প্রতিভাশালী ও জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিলে ও ইংরাজি শিক্ষার জন্য একটি কলেজ স্থাপন করিলে ও তৎসঙ্গে পুস্তকালয়, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার যন্ত্রাদি প্রয়োজনীয় পদার্থ সকল দিলেই পূর্বোক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে।[১২]

রামমোহন রায় তাঁর স্বজাতির জন্য আধুনিক শিক্ষা ও সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে গিয়ে সেকালের রক্ষণশীল হিন্দুদের চক্ষুশূল হয়েছিলেন। তারা একেশ্বরবাদী রামমোহনের কাছ থেকে চাঁদা গ্রহণ সমীচীন নয় বলে বিবেচনা করতো। তাদের নেতিবাচক সমালোচনা ও প্রতিক্রিয়ার মাত্রা বিবেচনা করে তিনি কলিকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা আলোচনা সভায় উপস্থিত থাকতে পারেননি। স্যার হাইড ইস্ট তাঁকে সেই কলেজ পরিচালনা কমিটিতে রাখতে চাইলে তারা কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য সাহায্য সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসবেন না এবং এই কলেজের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখবেন না বলে জানিয়ে ছিলেন। হেয়ার রামমোহনকে এ সিদ্ধান্তের কথা জানালে তিনি বললেন–কলেজ প্রতিষ্ঠাই তাঁর লক্ষ্য। যে কোন ত্যাগ স্বীকার করতে তিনি রাজী। এ বিষয়ে শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ' গ্রন্থে লিখেছেন, তিনি (ডেভিড হেয়ার) গিয়া রামমোহন রায়কে এই কথা বলিবামাত্র তিনি বলিলেন, 'সে কি কথা! কমিটিতে আমার নাম থাকা কি এতই বড় কথা যে, সে জন্য একটা ভাল কাজ নষ্ট করিতে হইবে'।[১৩] ১৮১৬ সালের ১৭ মে তারিখে স্যার হাইড ইস্ট এক চিঠি লিখে রামমোহনকে এ বিষয়টি অভিহিত করেছিলেন। তিনি লিখেছেন:

> The meeting was accordingly held at my house on the 14th of May, 1816 at which 50 and upwards of the most respectable Hindu inhabitants of rank or wealth attended, including also the principal Pandits.... I found that one of them in particular, a Brahmin of good caste, and a man of wealth and influecne, was mostly set against Rammohun Roy ... He expressed a hope that no subscription woul be received from Rammohun Roy. I asked why no?..Because he had chosen to separate himself us and to attack our religion. .. I do not know what Rammohun's religion is .. but I hope that my being a Christian and a sincere one to the best of my ability will be no reason for your refusing my subscription to your undertaking.... he answered readily.... æNo not at all; we shall he glad of your money: but it is different thing with Rammohan who is a Hindu and yet has publicly reviled us and written against us and our religion. [১৪]

হিন্দু কলেজে রামমোহনের না থাকার পক্ষে যারা ছিলেন তাদের মধ্যে–বর্ধমানের মহারাজা, শোভা বাজারের রাজ পরিবারের গোপীমোহন দেব, রাধাকান্ত দেব, ধনশালী রক্ষণশীল রাধামাধব, রামকমল সেন, রসময় দত্ত প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। তারা কেউ নবযুগের হিউম্যানিষ্ট আদর্শের সমর্থক ছিলেন না । এমন কি যাঁরা তা সমর্থন করতেন তাঁদেরকেও সহ্য করতেন না। কারণ সেই আদর্শ উপলব্ধি করার মতো মানসিক গড়ন তাদের ছিল না। 'অথচ এরাই হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালকের মধ্যে প্রধান ছিলেন।[১৫] রামমোহনকে হিন্দু কলেজ পরিচালনা পরিষদ থেকে দুরে সরিয়ে রাখলেও এদেশে শিক্ষা বিস্তার থেকে দূরে সরাতে পারেননি। তিনি আপন শক্তিতে এদেশের মানুষকে শিক্ষিত করার শিক্ষা সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। ১৮২১ সালের ৪ ডিসেম্বর 'সম্বাদ-কৌমুদী' প্রকাশ করে রামমোহন দরিদ্র মধ্যবিত্ত হিন্দু বালকদের শিক্ষার জন্য সরকারকে অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য অনুরোধ জানান । প্রসঙ্গে রামমোহন ও ব্রাহ্ম আন্দোলন গ্রন্থের লেখক যোগানন্দ দাশ লিখেছেন–'দরিদ্রদের জন্য বিনা বেতনে শিক্ষার কথা ইহার পূর্বে ইংরেজ আমলে কোন দেশীয় ব্যক্তি বলিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই।'[১৬] এ সম্পর্কে নিমাই বোস লিখেছেন:

> রামমোহন দরিদ্র মধ্যবিত্ত হিন্দু বালকদের শিক্ষার জন্য সরকারকে বিদ্যালয় স্থাপনের অনুরোধ জানিয়ে তাঁর কর্তব্য শেষ করেন নি। ১৮২২ সালে ইংরেজি শিক্ষার জন্য সুদি পাড়ায় 'এ্যাংলো হিন্দু স্কুল' নামে নিজ অর্থ ব্যয়ে একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। উক্ত স্কুলে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্য শিক্ষা দেওয়া হত। এই স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন অন্যতম।[১৭]

Dhaka University Institutional Repository

রামমোহন নিজ ব্যয়ে সেই বিদ্যালয় স্থাপনের মমধ্য দিয়ে ইংরেজি ভাষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার ববস্থা করেছিলেন। তিনি এ দেশে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান বিস্তারের জন্য স্কুল কলেজ স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের জন্য উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক রচনায়ও উৎসাহ দেখিয়েছেন । তিনি নিজেও স্কুল পাঠ্যপুস্তক রচনায় মনোযোগী হন। তিনি বাংলা ও ইংরেজিতে ভূগোল বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছিলেন। তিনি ফাগুর্সনের Introduction to Astronomy এর বাংলা অনুবাদ কর্মে মি: গর্ডনকে সহযোগিতা করেছিলেন। ইংরেজি শিক্ষার্থীদের জন্য তিনি ইংরেজিতে বাংলা ভাষার একটি ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন । এটি ১৮২৬ সালে প্রকাশিত হয়েছিল।'পরে তিনি বাঙালি শিক্ষার্থীদের জন্য এর অনুবাদ করেছিলেন এবং 'স্কুল বুক সোসাইটি' থেকে প্রকাশিত হয়েছিল।[১৮] তাঁর পরবর্তী অগ্রসর চিন্তার মানুষ অক্ষয়কুমার দত্ত রামমোহন রায়কে যেসব কারণে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। তার প্রথমটি ছিল রামমোহন রায়ের 'জবজ-ই-তুহফাৎ-উল-মুয়াহহিদীন' (১৮২০?) গ্রন্থ।[১৯] অন্য দুটি কারণের মধ্যে 'সতীদাহ প্রথা নিবারণ; এবং লর্ড আমহার্স্টকে লেখা তাঁর ঐতিহাসিক চিঠি। রামমোহন রায় এসব কাজের ভিতর দিয়ে নারীশিক্ষা, বাংলা গদ্যের সংস্কার, বিজ্ঞানচর্চার প্রতি আগ্রহ, সংবাদপত্র ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা প্রভৃতি বিষয়ে যে উৎসাহী ছিলেন এবং এসবের জন্য তিনি অসামান্য পরিশ্রম স্বীকার করেছিলেন। তাঁর হাতে বাংলা গদ্য শক্তি পায় তাঁর বলিষ্ঠ চিন্তাভাবনার জন্য। বলা চলে কতকগুলো নতুন চিন্তার উদ্ভব ঘটে রামমোহন রায়ের সময় থেকেই। সেকালের সামাজিক অবস্থা বিবেচনায় তাঁর এসব প্রচেষ্টার ভূমিকা সন্দেহাতীতভাবে প্রগতিশীল। প্রমথ চৌধুরী লিখেছেন:

> পৃথিবীতে যে-সকল লোককে আমরা মহাপুরুষ বলি, তাঁরা প্রত্যেকেই জাতীয় মন ও জাতীয় জীবনকে এমন একটা নতুন পথ ধরিয়ে দেন, যে পথ ধরে মানুষ মনে ও জীবনে অগ্রসর হয়। যে পথে অগ্রসর হয়ে অতীত ভারতবর্ষ বর্তমান ভারতবর্ষে এসে পৌঁছেছে সে পথের তিনিই হচ্ছেন সর্বপ্রথম দ্রষ্টা এবং প্রদর্শক। আমাদের জীবনে যে নবযুগ এসেছে তিনিই হচ্ছেন সে যুগের আহবায়ক। ..... ইংরেজের হাতে পড়ে আমাদের জীবনে ও মনের যে আমূল পরিবর্তন ঘটবে, ভারত-সভ্যতা যে নবকলেবর ধারণ করবে, এ সত্য সর্বাগ্রে রাজা রামমোহন রায়ের চোখেই ধরা পড়ে। সে যুগে তিনি ছিলেন একমাত্র লোক, যাঁর অন্তরে ভারতের ভবিষ্যৎ সাকার হয়ে উঠেছিল। তাঁর সমসাময়িক অপরাপর বাংলা লেখকের লেখা পড়লে দেখা যায় যে, এক রামমোহন রায় ব্যতীত অপর কোনো বাঙালির এ চৈতন্য হয় নি যে, নবাবের রাজ্য কোম্পানির হাতে পড়ায় শুধু রাজার বদল হল না, সেই-সঙ্গে জাতীয় জীবনের মহা পরিবর্তনের সূত্রপাত হল। ইংরেজের সঙ্গে সঙ্গে দেশে এমন সব নবশক্তি এসে পড়ল যার সমবায়ে ও সংঘর্ষে ভারতবর্ষে একটি নতুন সমাজ ও নতুন সভ্যতা গঠিত হল। এবং সে-সকল শক্তি যে কি এবং তার ভিতর কোন্ কোন্ শক্তি আমাদের জাতিগঠনে সহায় হতে পারে, সে বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ সজ্ঞান ছিলেন। তাঁর দৃষ্টিকে দিব্যদৃষ্টি ছাড়া আর কিছু বলা চলে না, কেননা দেড়শো বৎসর ইংরেজের রাজ্যে বাস করে এবং প্রায় একশো বৎসর ইংরেজি শিক্ষা লাভ করেও আমাদের মধ্যে আজ খুব কম লোক আছেন, শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে শিক্ষা সম্বন্ধে সমাজ সম্বন্ধে যাঁদের ধারণা রাজা রামমোহন রায়ের তুল্য স্পষ্ট।[২০]

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন–'তিনি যখন আপন ভাষায় বাঙালির আত্মপ্রকাশের উপাদানকে বলিষ্ঠ করবার জন্য প্রবৃত্ত ছিলেন তখন বাংলা গদ্য ভাষার অনুদ্ঘাটিত পথ তাঁকে প্রায় প্রথম থেকেই কঠিন প্রয়াসে খনন করতে হয়েছিল।'[২১] রামমোহন রায় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্য 'যথার্থ' ধরে বদরুদ্দীন উমর লিখেছেন:

> আত্মপ্রকাশের যে পথ তিনি কঠিন প্রয়াসে এইভাবে খনন করেছিলেন সে পথ ছিলো মূলতঃ ধর্মপথ। তাঁর বাংলা রচনার প্রায় সমস্তই ধর্মবিষয়ক। বাংলা গদ্যকে গুরুতর বিষয় আলোচনার মাধ্যম হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ও প্রগতিশীল ভূমিকা অনস্বীকার্য। কিন্তু অন্যদিকে, তাঁর বাংলা রচনা ধর্মপথ ধরে অগ্রসর হয়ে বেদান্ত উপনিষদের গণ্ডীর মধ্যেই ঘোরপাক খেতে থাকার ফলে শেষ পর্যন্ত তাঁর ধর্মসংস্কার আন্দোলন ও ব্রাহ্মধর্ম রক্ষণশীলতার একটি প্রশ্রয়কেন্দ্রেই পরিণত হয়।[২২]

উনিশ শতকের ভারতবর্ষের বাংলায় আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষায় এবং ইউরোপীয় সভ্যতার অভিঘাতে মনুষ্যত্বের যে আদর্শ লক্ষ করা যায়, তাকে অতি সহজেই পূবর্তন ভারতবর্ষের বা বাংলার সংস্কৃতি থেকে আলাদা করা যায়। এই পার্থক্য আজ আজ সর্বজন স্বীকৃত। ১৮৭৮ সালে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে অক্ষয়কুমার রামমোহন রায় সম্পর্কে লিখেছিলেন :

> তুমি বিজ্ঞানের অনুকূলপক্ষে যে সুগভীর রণবাদ্য বাদন করিয়া গিয়াছ, তাহাতে যেন এখনও আমাদের কর্ণকুহর ধ্বনিত করিতেছে। সেই অত্যুন্নত গম্ভীর তুবড়িধ্বনি অদ্যাপি বার বার প্রতিধ্বনিত হইয়া এই অযোগ্য দেশেও জয় সাধন করিয়া আসিতেছে। তুমি স্বদেশ ও বিদেশব্যাপী ভ্রম ও কুসংস্কার সংহার-উদ্দেশে আততায়ীস্বরূপে রণদুর্মদ বীরপুরুষের পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছ, এবং বিচার-যুদ্ধে সকল বিপক্ষ পরাস্ত করিয়া

> নিঃসংশয়ে সম্যকরূপে জয়ী হইয়াছ। তোমার উপাধী রাজা। জড়ময় ভূমিখণ্ড তোমার রাজ্য নয়। তুমি একটি সুবিস্তর মনোরাজ্য অধিকার করিয়া রাখিয়াছ। তোমার সমকালীন ও বিশেষত উত্তরকালীন সুমার্জিত-বুদ্ধি শিক্ষিত সম্প্রদায়ে তোমাকে রাজমুকুট প্রদান করিয়া তোমার হর্ষধ্বনি করিয়া আসিতেছে। যাঁহারা আবহমান কাল হিন্দুজাতির মনোরাজ্যে নির্বিবাদে রাজ্যত্ব করিয়া আসিয়াছেন, তুমি তাঁহাদিগকে পরাজয় করিয়াছ। অতএব তুমি রাজার রাজা।[২৩]

অক্ষয়কুমার এই কথা বলে রামমোহন রায়কে আধুনিকতার পথিকৃৎ-এর সম্মান দিলেন। হয়তো সেই কারণে কাজী আবদুল ওদুদ ১৮১৫ সনে রামমোহন রায়ের কলকাতায় বসবাস থেকেই 'বাংলার জাগরণ' কাল বলে উল্লেখ করেন।[২৪] কেউ কেউ রামমোহনকে ইংরেজি শিক্ষার প্রডাক্ট (Product) একটি বা ইউরোপীয় বিদ্যার বিশেষ অনুরাগী হিসেবে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। যাঁরা তা বলেছেন তাঁরা ভেবে বলেননি, কিংবা তাঁর চিন্তা ধারাকে না বুঝে বলেছেন । কারণ রামমোহন তেমনটি ছিলেন না । তিনি স্বাধীনভাবে চিন্তা করেছেন এবং আধুনিক মন গঠনে স্বাধীনভাবে বই-পত্র পড়ে সমকালের উৎকৃষ্ট জ্ঞান আহরণ করেছেন। রামমোহন রায় সম্পর্কে এই ধারণাকে প্রমথ চৌধুরী একটি লৌকিক ভুল ধারণা বলে অভিহিত করেছেন। তিনি লিখেছেন:

> আমি আজ থেকে বছর তিনেক আগে এই মত প্রকাশ করি যে-
>
> Bengal producted in the last century a man of colossal intellect and marvelous clairvoyance- Rajah Ram Mohan Roy…. British India up to now has not produced a greater mind, and he remains for all time the supreme representative of the spirit of the new age and the genius of our anciant land. He looked at European civilization from the pinnacle of Indian culture and saw and welcomed all that was livng and life-giveng in it.
>
> আমি অতঃপর আপনাদের কাছে যা কিছু নিবেদন করব, তা সবই স্বমত সমর্থন করবার অভিপ্রায়ে। রামমোহন রায় যে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা করবার পূর্বে একমাত্র ন্যায় এবং যুক্তির সাহায্যে ধর্মবিচারে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, তার দলিল আছে। এ বিষয়ে তিনি কতক আরবি এবং কতক ফারসি ভাষায় যে পুস্তিকা প্রকাশ করেন তাতেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, আজকালকার ভাষায় যাকে স্বাধীন চিন্তা বলে তা তিনি কোনো বিলেতি গুরুর কাছে শিক্ষা করেন নি। নির্ভীকতায় চিন্তাশীলতায় তাঁর হাতের এই প্রথম রচনা Mill –এর *Three Essays on Religion* প্রভৃতি গ্রন্থের সঙ্গে এক আসন গ্রহণ করবার উপযুক্ত।..... অতএব আমি জোর করো বলতে পারি যে, রামমোহনের cosmic consciousness ছিল ষোল-আনা ভারতবর্ষীয়। সত্য কথা বলতে গেলে তিনি এ যুগে বাংলা- দেশে প্রাচীন আর্য মন নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সে মনের পরিচয় আমি এখানে দু কথায় দিতে চাই। আপনারা সকলেই জানেন যে কান্টের দর্শন তিন ভাগে বিভক্ত: প্রথম pure reason, দ্বিতীয় practical reason, আর তৃতীয় aesthetic reason। আমার বিশ্বাস, ভারতবর্ষীয় আর্যেরা যার বিশেষভাবে চর্চা করেছিলেন, সে হচ্ছে এক pure reason আর-এক practical reason; এবং রামমোহনের অন্তওে এই দুই reason ই পূর্ণমাত্রায় প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছিল। তিনি অলংকারশাস্ত্রকে কখনো দর্শনশাস্ত্র বলে গ্রাহ্য করেন নি, রসতত্ত্বকে আত্মতত্ত্ব বলে ভুল করেন নি, অর্থাৎ মানুষের মনে aesthetic অংশের তাঁর কাছে বিশেষ কিছু মর্যাদা ছিল না। বেদান্তের ধর্ম spiritual কিন্তু emotational নয়; মীমাংসার ধর্ম ethical, কিন্তু emotational নয়। অপর পক্ষে খৃষ্টান বৈষ্ণব মুসলমান প্রভৃতির ধর্মে emotational অংশ অতি প্রবল এবং সকল মুর্তিপূজার মূলে মানুষের সৌন্দর্যবোধ আছে।[২৫]

পৃথিবীতে আমরা যাঁদের মহাপুরুষ হিসেবে মানি, তাঁরা প্রত্যেকেই মানুষের জাতীয় মন গঠন করে তাদেরকে কল্যাণ পথে অগ্রসর হওয়ার জন্র অনুপ্রাণিত করেছেন। তাঁর অতীতের অভিজ্ঞতাকে সামনে রেখে বর্তমানকে সচেতন করে আলোকিত ভবিষ্যত নির্মাণে ব্রতী হয়েছেন। তাঁরা স্বজাতির অজ্ঞতা, দূর্বলতা, ভয়, হতাশা , জড়তা প্রভৃতি সমস্যা সমাধানের পথ অনুসন্ধান করেছেন। রামমোহন রায়কে আমরা অনুরূপ অনুসন্ধানী বাঙালি চিন্তক হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। তাঁর সম্পর্কে আমাদের সমস্ত ভুল ধারনার অবসান করতে পারি প্রমথ চৌধুরীর বক্তব্যকে শিরোধার্য করে। তিনি লিখেছেন:

> জাতীয় মনকে এই অবিদ্যার মোহ থেকে উদ্ধার করবার জন্য রামমোহন রায় এ দেশে ইউরোপীয় শিক্ষাকে আবাহন করে দিয়েছিলেন। যে জ্ঞান সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় কিন্তু ছেরেপ কল্পনামূলক, সে জ্ঞান মানুষকে মুক্তি দিতে পারে না। রামমোহন রায় আবিষ্কার করেন যে, ইউরোপীয়দের অন্তত দুটি শাস্ত্র আছে, সত্য যার ভিত্তি: এক বিজ্ঞান, আর- এক ইতিহাস। এই বিজ্ঞানের প্রসাদে এ বিশ্বের গঠন ও ক্রিয়ার যথার্থ জ্ঞান লাভ করা যায়, আর ইতিহাসের কাছ থেকে মানবসমাজের উত্থান-পতন-পরিবর্তনের যথার্থ জ্ঞান লাভ করা যায়; অন্তত ্ দুইয়ের চর্চার ফলে মানুষের মন মানুষ স্বন্ধে ও বিশ্ব সম্বন্ধে 'বড়াই বুড়ির কথা'র প্রভুত্ব হতে নিষ্কৃতি

> লাভ করে। যে-কোনো ক্ষেত্রেই হোক -না কেন, অবিদ্যার হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার নাম মুক্তিলাভ করা এবং মুক্তপুরুষই যথার্থ শক্তি মান পুরুষ। কিন্তু যথার্ত মুক্তি সাধনাসাপেক্ষ। রামমোহন রায় দেশের লোককে এই সত্যমূলক ইউরোপীয় শাস্ত্রমার্গে সাধনা করতে শিখিয়ে গিয়েছিলেন। তারই ফলে বর্তমান ভারতবর্ষ বাঙালি জাতির স্থান সবার উপরে। কি সাহিত্যে, কি আর্টে, কি বিজ্ঞানে, কি রাজনীতির ক্ষেত্রে, বাঙালি যে আজ ভারতবর্ষেও আদর্শ, বাঙালি যে এ যুগে মানসিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সমগ্র ভারতবর্ষেও যূগপৎ শিক্ষা ও দীক্ষা গুরু, তার কারণ একটি বাঙালি মহাপুরুষের প্রদর্শিত মার্গে বাঙালির মন, বাঙালির জীবন আজ একশো বৎসর ধরে অগ্রসর হয়েছে। এক কথায় আমাদেও জাতীয় প্রতিভা রামমোহন রায়ের মনে ও জীবনে সম্পূর্ণ সাকার হয়ে উঠেছিল ।
>
> সুতরাং রামমোহন রায়ের মনে ও বাঙালি জাতি ইচ্ছা করলে তার নিজের মনের ছবি দেখতে পারে। বাঙালি জাতির মনে যে-সকল শক্তি প্রচ্ছন্ন ও বিক্ষিপ্ত ছিল, রামমোহন রায়ের অন্তরে সেই সকল শক্তি সংহত ও প্রকট হয়ে উঠেছিল।[২৬]

রাজা রামমোহন রায়ের শিক্ষাদর্শন পরে হলেও মর্যাদা লাভ করেছিরল। ১৮২৪ সালে সরকার কলিকাতা মাদ্রাসায় ইংরেজী বিষয় সংযোজন করেছিল। ১৮২৭ সালে সংস্কৃতি কলেজেও ইংরেজি বিষয় চালু করা হয়। ১৮৩৫ সালে জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশনের সভাপতি মেকলে তার বিখ্যাত 'মিনিটস'–এ ভারতে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের জোর সুপারিশ করেন। এই সুপারিশের ফলে বড়লার্ট লর্ড বেন্টিঙ্ক ঘোষণা করেন যে, এদেশে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে এবং শিক্ষার জন্য বরাদ্দকৃত নির্দিষ্ট টাকা এই উদ্দেশ্যেই ব্যয় করা হবে।[২৭] এভাবে তাঁর ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে বাঙালিকে কুসংস্কারমুক্ত ও বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষা স্বপ্ন পূরণের পথ পেয়েছিল। তাঁর চিন্তাধারাকে কয়েকটি সূত্রাকারে দেখানো যায়। যেমন:

১. সর্বাপেক্ষা বীভৎস ও পাশবিক সতীদাহ-প্রথা বন্ধের আন্দোলন এবং সফলতা অর্জন।
২. সর্বপ্রথম স্ত্রী শিক্ষা ও স্ত্রী পুরুষের সমান অধিকারের কথা প্রচার।
৩. মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার আন্দোলন সূচনা।
৪. কৃষকের করভার লাঘবের জন্য যুক্তি প্রদান ও চেষ্টা।
৫. সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা দাবী।
৬. বিজ্ঞান-ভিত্তিক আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তন।
৭. বিশ্বের শান্তিকামী দেশ ও মানুষের প্রতি সমর্থন ও আবেগ প্রকাশ।
৮. ধর্ম সংস্কার আন্দোলন পরিচালনা।

রামমোহন ১৮৩০ সালে ইংল্যান্ডে চলে যান এবং তিনবছর পর ১৮৩৩ সালে ব্রিস্টলে দেহত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ (১৮১৭–১৯০৫) ব্রাহ্মসমাজের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং অক্ষয়কুমার দত্তের (১৮২০–১৮৮৬) সহায়তায় 'তত্ত্ববোধিনী' সভা (১৮৩৯), 'তত্ত্ববোধিনী' পাঠশালা (১৮৪০) এবং 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা (১৮৪৩) প্রকাশ করেন। তাদের বিচরণ এ আন্দোলনকে অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে যায়। রামমোহন প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজে তাঁর জীবনকালে যেমন লোকসমাগম হত তাঁর মৃত্যুর পরে অল্পদিনের মধ্যেই ব্রাহ্মসমাজ বা ব্রহ্মসভা কর্মকাণ্ড ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে আসে। তখন নতুন করে মানবতাবোধের জাগরণ দেখা দেয়। সেই পথে আমরা পাই অক্ষয়কুমার দত্ত, ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ কর্মযোগী মহাপুরুষদের।

প্রথম অধ্যায় : বাংলা ভাষায় শিক্ষাচিন্তার উন্মেষ পর্যায়

তথ্যসূত্র :

উনিশ শতকের বাঙালির শিক্ষা ব্যবস্থার চিত্র

১. কেবল দিনাজপুরের রিপোর্ট আমার পক্ষে দেখা সম্ভব হয়েছে। রংপুর সম্পর্কে রিপোর্টটি পাওয়া যায় নি। এমন কি এডামের রিপোর্টেও উল্লেখিত হয়েছে যে রংপুর সম্পর্কে বুকাননের রিপোর্টটি নিখোঁজ।
২. ডব্লিউ, ফ্রান্সিস বুকানন, এজিওগ্রাফিক্যাল, ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল এ্যান্ড হিষ্টোরিক্যাল ডেসক্রিপশন অফ্ দি ডিষ্ট্রিক্ট অর জিলা অফ দিনাজপুরর ইন দি প্রভিন্স অব সুবাহ্ অফ বেঙ্গল, কলিকাতা, ব্যাপ্টিষ্ট মিশন প্রেস।
৩. বিভিন্ন সময় এডাম তাঁর রিপোর্ট পেশ করেন। প্রথমটি ১ জুলাই ১৮৩৫, দ্বিতীয়টি ২৩ ডিসেম্বর, ১৮৩৫ এবং তৃতীয়টি এপ্রিল, ১৮৩৮।
৪. এডামের প্রথম রিপোর্ট। পূর্ববঙ্গেও পাঠশালা ছিল বলে উল্লেখিত হয়েছে। পৃ. ৮২ -৯২ দ্রষ্টব্য।
৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭।
৬. এডামের প্রাক্কলন পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি করে। কেউ কেউ মনে করেন যে এডামের ১,০০,০০০ পাঠশালা ভিত্তিহীন কল্পনামাত্র, আবার কেউ কেউ এই সংখ্যাকে অমূলক মনে করেন নি। বিতর্কের জন্য দেখুন ঃ ফিলিপ হার্টগ, সাম অ্যাস্এপক্টস অফ্ ইন্ডিয়ান এডুকেশন, পাস্ট এ্যান্ড প্রেজেন্ট, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি, প্রেস, ১৯৩৯; আর, ভি, পারুলেকার, লিটারেসি ইন ইন্ডিয়া ইন প্রি-বৃটিশ ডেজ, বোম্বে, ১৯৪০; অনাথনাথ বসু, লিটারেসি ইন বেঙ্গল ইন আর্লি বৃটিশ পিরিয়ড, মর্ডান রিভিউ, স্বাগষ্ট, ১৯৩৯।
৭. এইচ. শার্প (সম্পা), সিলেকশনস্ ফ্রম এডুকেশনাল রেকর্ডস, প্রথম খণ্ড, গভর্ণমেন্ট অফ্ ইন্ডিয়া প্রেস, নিউ দিল্লী, ১৯৬৫, পৃ.১৯।
৮. এম. এ. লেয়ার্ড, দি কন্ট্রিবিউশন অফ্ মিশনারিজ, টু এডুকেশন ইন বেঙ্গল ডিউরিং দি এ্যাডমিনিস্টেশন অফ্ লর্ড হেস্টিংস, ১৮১৩-১৮২৩; বেঙ্গল পাস্ট এ্যান্ড প্রেজেন্ট, ভলিউম্-৮৬, নং -১৬২ (জুলাই-ডিসেম্বর ১৯৬৭), পৃ. ৬৮। (এরপর কেবল লেয়ার্ড বলে উল্লেখ করা হয়েছে)।
৯. বি.কে. বোহ্ম্যান-বেহরাম, এডুকেশন কন্ট্রোভার্সিস ইন ইন্ডিয়া, বোম্বে, ১৯৪৩, পৃ.৩০-৩১।
১০. লেয়ার্ড, পৃ. ৬৮।
১১. ঐ।
১২. এন. এল. বসাক, অরিজিন এ্যান্ড রোল অফ্ দি ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি ইন প্রোমোটিং দি কজেস অফ্ এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া, স্পেশিয়ালি ভার্ণাকুলার এডুকেশন ইন বেঙ্গল (১৮১৭-১৮৩৫); বেঙ্গল পাস্ট এ্যান্ড প্রেজেন্ট, ভলিউম্-৭৮, নং-১৪৫ (জানুয়ারি-জুন, ১৯৫৯), পৃ. ৩৬।
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩।
১৪. জে. সি. বগল, প্রাইমারী এডুকেশন ইন ক্যালকাটা (১৮১৮-১৮৩৫); বেঙ্গল পাষ্ট এ্যান্ড প্রেজেন্ট, ভলিউম্-৮১, নং-১৫২, (জুলাই-ডিসেম্বর, ১৯৬২), পৃ. ৮৫।
১৫. স্কুল সোসাইটি কর্তৃক উন্নয়নমূলক ব্যবস্থাদির জন্য দেখুনঃ এডাম, পৃ. ৯-১০।
১৬. লেয়ার্ড, পৃ. ৭২।
১৭. ১৭৯০ তে জোসেফ লান্কেস্টার ও এন্ড্রুবেল 'মনিটোরিয়াল' পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। মাদ্রাজে এই পদ্ধতির উদ্ভব ঘটে; 'সর্দার, পোর্দো' পদ্ধতির অনুরূপ। জ্যেষ্ঠ ছাত্রদেও, যাদেরকে 'মনিটর' বলা হোত, ব্যবহার করা হোত কনিষ্ট ছাত্রদের পড়ানোর জন্য। মিশনারি স্কুলসমূহে 'মনিটর' পদ্ধতি বৈশিষ্ট অর্জন করে এবং গুরুর অধীনের 'সর্দার পোর্দোদেয় চাইতে তাদের অধিকতর ভূমিকা ছিল। যেহেতু মিশনারি স্কুলে ছাত্র সংখ্যা পাঠশালার চাইতে অনেক বেশী ছিল, তাই শিক্ষকের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় সহযোগী মনিটর দেয় প্রয়োজন ছিল।
১৮. জে. মার্শম্যান, হিন্টস্ রিলেটিভ টু নেটিভ স্কুলস্, শ্রীরামপুর, ১৮১৬; ফার্স্ট শ্রীরামপুর স্কুলস্ রিপোর্ট, পৃ. ২০। উভয়ই উল্লেখিত হয়েছে লেয়ার্ড, পৃ. ৭২।
১৯. ফার্স্ট শ্রীরামপুর স্কুলস্ রিপোর্ট, পৃ. ২০-২৯, লেয়ার্ড-পৃ. ৭২-৭৩।
২০. এ. মুখার্জী, 'মিশনারিজ এ্যান্ড দি নিউ এডুকেশন ইন বেঙ্গল (১৭৫৭-১৮২৩)' ক্যালকাটা রিভিউ, অক্টোবর ১৮৬৪, পৃ. ৬০।
২১. এডাম, পৃ. (ভূমিকা) ১৭।
২২. দেশীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কেবল পাঠশালাই নয়-টোল, মক্তব এবং মাদ্রাসাও অন্তর্ভুক্ত ছিল।
২৩. এডাম. পৃ. ৩৭৫-৩৮৫।
২৪. রিপোর্ট অফ্ জেনারেল কমিটি অফ্ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন, ১৮৩৮-৩৯, কলিকাতা, ১৮৪০, পৃ. ২৮৬।
২৫. জে. এ. রিচি (সম্পাদিত), সিলেকশন্স ফ্রম এডুকেশনাল রেকর্ডস্ পার্ট-২, ১৮৪০-৫৯, গভর্ণমেন্ট অফ্ ইন্ডিয়া প্রেস, নিউ দিল্লী-১৯৬৫, পৃ. ৬৫।

বাংলায় ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তন

১. স্বপন বসু: evsjvi be †PZbvi BwZnvm, পুস্তক বিপণি, কলকাতা অক্টোবর ২০০০, পৃ. ২০
২. মধ্যবিত্ত শ্রেণির ইতিহাসকারের দৃষ্টিতে ‘ The Indian middle class which the British aimed at creating was to be a class of imitators, not the originators of new values and methods *The Indian Middle Class*, Dr. B.B.Misra (Re-print,1978,p.11).’
৩. স্বপন বসু, c‡ev³, পৃ. ২২
৪. স্বপন বসু, c‡ev³, পৃ. ২৩
৫. কাজী আব্দুল মান্নান, AvaywbK evsjv mvwn‡Z¨ gymwjg mvabv, প্রথম খণ্ড, রাজশাহী, ১৯৬১, পৃ.৮.
6. *Fazlur Rahman, The Bengali Muslims and English Education (1765-1855), Dacca, 1973, p.30*
৭. ড. ওয়াকিল আহমদ, Dwbk kZ‡K evOvjx gmjgv‡bi wPšÍv †PZbvi aviv, ঢাকা, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৮৩, পৃ.৯৬
8. . J. Long. *Adam's Reports on Vernacular Education in Bengal & Bihar. Submitted to Government in 1835, 1838,* Calcutta, 1868, pp.153-160
৯. উনিশ শতকের প্রথম দিকেও অনেক ফারসি স্কুলে মুসলিম ছাত্রের চেয়ে হিন্দু ছাত্র বেশি ছিল। যেমন, শুধু মুর্শিদাবাদ,বীরভূম ও বর্ধমান জেলায় ফারসি স্কুলে হিন্দু ছাত্র ছিল ৭৫৪ জন এবং মুসলিম ছাত্র ছিল ৭৩২ জন। [দ্র. Bgivb †nv‡mb, evOwj gmwjg ew×Rxex : wPšÍv I Kg©, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ.৩১]
১০. বিনয় ঘোষ, evsjvi mvgwRK BwZnv‡mi aviv, 1800-1900, পঞ্চম খণ্ড, ঢাকা, ১৯৬৭,পৃ.১৮
১১. Syed Mahmood, *A History of English Education in India (1781- 1893)*, MAO College, Aligarh1895.p.2
১২. J.C. Marshman, *Life and Times of Carry, Marshman and Ward,*' Vol. II, London, 1859, p.27
১৩. Ibid., p.32
১৪. মৌলানা নূর মোহাম্মদ আযমী, ÔBsivRx wk¶vi †Mvovi K_vÕ, মোহাম্মদী, ২২শ বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৮, পৃ. ৪৫৮
১৫. সুনীল কুমার চ্যাটার্জী, evsjvi beRvMi‡Y DBwjqvg †Kix I Zvi cwiRb,KwjKvZv, 1974, পৃ. ২০
১৬. উমিচাঁদ (মৃ. ১৭৫৮), গোপীনাথ শেঠ, রামকৃষ্ণ শেঠ, শোভারাম বসাক, লক্ষীকান্ত প্রমুখ ব্যবসায়ীগণ পলাশীর যুদ্ধের আগেই কোম্পানির দাদনি ও দালালি করে বিখ্যাত হয়েছিলেন। [দ্র.মোঃ আব্দুল্লাহ আল-মাসুম উদ্ধৃত, evsjvi gmwjg mgv‡R AvaywbK wk¶vi AMMwZ (1885-1921), ঢাকা, ২০০৭, পৃ.৭]
১৭. কাজী আব্দুল মান্নান, AvaywbK evsjv mvwnZ¨ I gmwjg mgvR, প্রথম সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ.৬৬
১৮. M. N. Roy, Indian Transition, Calcutta, 1941, p. 17
১৯. Rules Approve by the Subcribes and General Meeting, held on 27 August, 1816', Calcutta *Christian Observer, July*, 1832, p. 32.
২০. ১৮১৯ সালে হিন্দু কলেজে ছাত্র সংখ্যা ছিল ৭০, '২৫ সালে ১১০, '২৬ সালে ২২৩, '২৭ সালে ৩০০ ও ১৮৩০ সালে এর ছাত্রসংখ্যা দাঁড়ায় ৪০৯ -এ। [দ্র. সুশীল কুমার গুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬২, ১৬৬, ১৬৭]
২১. যোগেশচন্দ্র বাগল, বাংলার জনশিক্ষা ১৮০০-১৮৫৬, কলিকাতা, ১৩৫৬, পৃ. ২২
২২. বিনয় ঘোষ, উদ্ধৃত, evsjvi mvgwRK BwZnv‡mi aviv, ঢাকা , বুক ক্লাব, নভেম্বর ১৯৬৮, পৃ. ৫৮
২৩. Firminger: Fift Report, intro: CCXXXI., বিনয় ঘোষ উদ্ধৃত, evsjvi mvgwRK BwZnv‡mi aviv, ঢাকা , বুক ক্লাব, নভেম্বর ১৯৬৮, পৃ.৬৩
২৪. বিনয় ঘোষ, evsjvi mvgwRK BwZnv‡mi aviv, ঢাকা, বুক ক্লাব, নভেম্বর ১৯৬৮, পৃ.৬৩
২৫. Firminger: op.cit: CCXXX.
২৬. বিনয় ঘোষ, উদ্ধৃত, evsjvi mvgwRK BwZnv‡mi aviv, ঢাকা, বুক ক্লাব, নভেম্বর ১৯৬৮, পৃ.৬৪
২৭. Rev.Lal Behari Day: *Recollections of Alexander Duff, London 1879, p .22* ও George Smith: *The Life of Alexander Duff, 2* vols. London 1879, Vol.1, p.96.
২৮. বিনয় ঘোষ, evsjvi mvgwRK BwZnv‡mi aviv, ঢাকা, বুক ক্লাব, নভেম্বর ১৯৬৮, পৃ. ৬৪
২৯. Abdul Karim, *Muhammadan Eduction in Bengal*, Cultta, 1900, p.1-2. H. Sharp, Selections from Educational Records (1777-1839), Part-1, Calcutta, 1920, pp.7-9.
৩০. সাল ভিত্তিক জাহাজের সংখ্যা ও মোটপণ্য (টন) আলাদা আলাদা হিসাব বিনয় ঘোষ, evsjvi mvgwRK BwZnv‡mi aviv, ঢাকা, বুক ক্লাব, নভেম্বর ১৯৬৮, পৃ.৬৫
৩১. J.C.Marshman, *Life and Times of Carey, Marshman and Ward,*' Vol.II, London, 1859, p.16
৩২. সুশীল কুমার গুপ্ত, Ebwesk kZvãx‡Z ev½jvi beRvMiY, কলিকাতা, ১৯৭৭, পৃ. ১৫৫
৩৩. সুশান্ত সরকার, DBwjqvg †Kix t Rxeb I mvabv, উইলিয়াম কেরী দ্বিশত বর্ষপুর্তি উদযাপন, ঢাকা, ১৯৯৩, ভূমিকা

Dhaka University Institutional Repository

ডিরোজিও এবং তাঁর অনুসারীদের কর্ম প্রচেষ্ঠা

১. ডিরোজিও'র Education in India' শীর্ষক প্রবন্ধটি হিন্দু কলেজে শিক্ষক হিসেবে যোগদানের পূর্বে (১৮২৬ খ্রি.) 'Calcutta Monthly Journal'-এ প্রকাশিত হয়।

২. বিনয় ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১২

৩. হিন্দু কলেজ স্থাপিত (১৮১৭ খ্রি.) হয় ইউরোপিয় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে । এ কলেজের শিক্ষাক্রম ছিল দ্বিস্তর বিশিষ্ট। প্রথম স্তরটি 'জুনিয়র' তথা 'পাঠশালা' এবং দ্বিতীয় স্তরটি 'সিনিয়র' তথা 'মহাপাঠশালা' নামে ভিহিত হয়। এটি প্রথমে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত 'ব্যবস্থাপনা কমিটি' বা 'অধ্যক্ষসভা'র অধীনে পরিচালিত হতো। পরে রকারি সাহায্য গ্রহণের ফলে কলেজে একজন 'পরিদর্শক' বা 'ভিজিটর' নিযুক্ত করা হয়। এ কলেজের প্রথম 'পরিদর্শক' বা 'ভিজিটর' নিযুক্ত হন (১৮২৪) প্রাচ্যবিদ্যাবিদ এইচ.এইচ. উইলসন। উইলসনের রিপোর্টে (১৮২৫ খ্রি.) হিন্দু কলেজের শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানা যায়। এ সম্পর্কে বিনয় ঘোষ, তাঁর 'বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা' গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন-'' উইলসন লিখেছেন- The general result of the operations of the Hindu College is to give the Students a considerable command of the English language, to extend their knowledge of History, Geography and to open to them a View of the object of means of Science." আর এর উদ্যোক্তাদের উদ্দেশ্য ছিল- 'হিন্দু কলেজ হবে, The main Channel by which real knowledge may be transferred from its European sources into the intellect of Hindustan.

৪. ডিরোজিওর হিন্দু কলেজে শিক্ষক হিসেবে যোগদানের পরের বছর প্রকাশিত (১৮২৭ খ্রিস্টাব্দের) কলেজ বার্ষিক রিপোর্টেও তথ্য অনুসারে দেখা যায় হিন্দু কলেজের ছাত্রদের অংশ গ্রহণে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রদের বিতর্কের বিষয় ছিল যথাক্রমে The Consequence resulting to Europe and Asia by the discovery of the passage round the cape of Good Hope' এবং 'The preference given to the public distinction or to private happiness.' তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রদের জন্য বিতর্কের বিষয়গুলো ছিল যথাক্রমে 'The Conduct of Coriolanus','The preferable claims to the administration of different Grecian states'. এবং 'Consequence of the Britons from the Roman conquest.'। বিতর্ক ছাড়াও কলেজে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নিয়ে ডিরোজিওর নেতৃত্বে তাঁর ছাত্রেরা প্রবন্ধ রচনা করেছে এবং ১৮২৯ সালে হিন্দু কলেজের বার্ষিক উৎসবে নিমন্ত্রিক অতিথিদের সামনে সেগুলোর কয়েকটি পাঠ করেছে। এগুলোর শিরোনাম ছিল- যথাক্রমে 'রাজতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রের কোনটি শ্রেষ্ঠ শাসন?, মানুষের সদবৃত্তিসমূহের প্রকৃতি নির্ণয়কারী কে? দুর্ভাগ্য না সৌভাগ্য?, ইতর জন্তুর নিধন কি নীতিসঙ্গত?, এবং ইউরোপীয় বা হিন্দু বিবাহ পদ্ধতির মধ্যে কোনটি মানব জীবনে সুখ ও সমৃদ্ধির পক্ষে প্রকৃষ্টতর? ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু কলেজ থেকে ডিরোজিওর পদত্যাগের পূর্বে কলেজের বার্ষিক উৎসবেও ছাত্ররা তিনটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এগুলোর বিষয়বস্তু ছিল যথাক্রমে ' উত্তরাঞ্চলে বর্বরদের আকস্মিক অভ্যুদয় এবং সেই কারণে রোমক সাম্রাজ্যের বিন্যাস, সভ্যতার অগ্রগতিতে এ দুটো ঘটনার প্রভাব';' বিজ্ঞান অনুশীলন অপেক্ষা ভদ্র সাহিত্য অনুশীলন ব্যক্তিবিশেষের ও জাতিবিশেষের কাছে অধিকতর সুখকর, হিতকর ও সম্মানজনক নয়;' এবং ' সামাজিক সন্তোষ উৎপাদনে ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও সামাজিক দায়িত্ব পালন সমপ্রয়োজনীয়।'

৫. Kisory Chand Mitra, OP. cit. pa .29

৬. উদ্ধৃতি, সফিউদ্দিন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২-২৩

৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিক্ষাবিধি,রবীন্দ্র রচনাবলী, ষড়বিংশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, পুনরমুদ্রণ, বৈশাখ ১৩৯৪, কলিকাতা, পৃ. ৫৭১

৮. রামমোহন রায় সংস্কারাচ্ছন্ন বাঙালির মানসলোকের বরফপিণ্ডে আলোক সম্পাদ করলেও তিনি সে বরফ পিণ্ডকে গলিয়ে তেমন কোনো প্রবাহের প্লাবন সৃষ্টি করতে পারেননি। এ অর্থে ডিরোজিও প্রথম বাঙালির চিত্তলোকে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আধুনিক অর্থে দেশপ্রেম, সাহিত্য,সংস্কৃতি ও দর্শনে বাংলার রেনেসাঁর প্রবর্তক এবং এখানেই তিনি যথার্থভাবে আধুনিকতার অগ্রদূত ও যুগ প্রবর্তক। অধ্যাপনা পেশা নয়। ছিল এক গভীর নেশা। আর এ অধ্যাপনায় ছিল তাঁর মৌলিক দৃষ্টি, যেমন- ১. যুগমানসের চিন্তা ও চেতনায় অধীত বিষয়কে সৃজনশীল করে তোলা। ২. দেশপ্রেম এবং বাঙালির চিত্ত জাগরণ ও আত্মজাগরণে নিবেদিত প্রাণ। ৩. ছাত্রদের মনে আন্তর্জাতিক চিন্তা ও ধ্যানধারণার আবহ তৈরি করা। ৪. ছাত্রদের বুদ্ধিবৃত্তিকে জাগ্রহ করা ও আত্মশক্তিকে উদ্বোধিত করা। ৫ অন্যায়ের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ এবং ছাত্রদের দৃঢ় ব্যক্তিত্ব, প্রত্যয়ী ও সত্যনিষ্ঠ হওয়া। ৬. ছাত্রদের সাথে ভাবের আদান-প্রদানে গভীর হৃদ্যতা । ৭. জ্ঞান চর্চায় মননশীলতা প্রতীচীর জ্ঞান-বিজ্ঞান,সাহিত্য ও দর্শনে গভীর অনুরাগ। ৮. সংস্কার, রক্ষণশীলতা, রুগ্নচিন্তা ও সংস্কৃতির প্রতি বিরাগ। ''[দ্র.সফিউদ্দিন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ.২৩]

৯. ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে 'একাডেমিক এসোসিয়েশন'-এর যাত্রা শুরু হয়। ডিরোজিও এর সভাপতি এবং উমাচরণ বসু হন সম্পাদক। এ সভার উল্লেখযোগ্য সদস্য ছিলেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ ও দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। দু'বছরের মধ্যেই 'একাডেমিক এসোসিয়েশন' ব্যাপক পরিচিতি ও খ্যাতি লাভ করে। 'একাডেমিক এসোসিয়েশন' সভার সদস্যরা 'ইয়ং বেঙ্গল' বা 'ইয়ং ক্যালকাটা' নামে বিশেষ পরিচিত হন।

Dhaka University Institutional Repository

১০. নব্যবঙ্গ নামের যুবকরা ছিল হিন্দু কলেজের ছাত্র। ১৮২৬ থেকে ১৮৪০ পর্যন্ত মোটামুটি সময়টা ছিল বাংলার নব্যবঙ্গের আন্দোলনের সময়। হেনরি লুই ভিভিয়ানর ডিরেজিও ছিলেন তাঁদের আদর্শ শিক্ষক যিনি তাঁর ছাত্রদের শিখিয়েছিলেন স্বাধীন ভাবে চিন্তা করতে। হুকালাগত প্রথাবদ্ধ শাস্ত্রের নির্দেশ না মেনে বাস্তব পরিপ্রেক্ষিকায় কার্যকারণসূত্র অবলম্বনে নীতিগত সিদ্ধান্ত নিতে ডিরোজিও শিখিয়েছিলেন তাঁর ছাত্রদের। পরবর্তী কালে হিন্দু কলেজের এই সব জ্যোতিষ্কতুল্য ছাত্রের দল আধুনিক বাংলার সংস্কতির নানা ক্ষেত্রে পুরোভাগে আসে। হিন্দু কলেজের এই ছাত্রেরা পড়াশুনা করেছিল নতুন শিক্ষানীতির আদর্শে। পাশ্চাত্য দেশগুলির শিক্ষায়তনে যে-শিক্ষার আদর্শ তৈরি হয়ে উঠেছিল রেনাশাঁসের পর, সেই আদর্শই প্রচলিত হয়েছিল আমাদের শিক্ষালয়ে। [দ্র.ভবতোষ দত্ত-বাঙালির মানব ধর্ম, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা, পৌষ ১৪০৬, পৃ-১২]

১১. Thomas Edwards ABiographical Sketch of Henry Derozio, Calcutta, 1884, p. 37)

১২. শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫-৯৬)

১৩. বিনয় ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১২-২১৩)

১৪. Bradley-Birt, Twelve Men of bengal in the Nineteenth Century, Calucutta, 1910 P. xxx)

১৫. Alexander Duff, Op. cit, Appendix)

১৬. Alexander Duff, Ibid, Appendix)

১৭. Quoted in S. Pal, OP. cit, p. 65-66)

১৮. বিনয় ঘোষ, evsjvi mvgvwRK BwZnv‡mi aviv, কলকাতা, পাঠভবন, নভেম্বর ১৯৬৮, পৃ ২৫৪-২৫৫

১৯. নীহাররঞ্জন রায়, fvi‡ZwZnvm wRÁvmv, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০০৩, পৃ ১৩৬-১৩৭

২০. বিনয় ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ ২৫৩

২১. পূর্বোক্ত, পৃ ১৩৭

২২. ভবতোষ দত্ত-বাঙালির মানব ধর্ম, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা, পৌষ ১৪০৬, পৃ-১২

২৩. সমাজ বিজ্ঞানী নির্মল কুমার বসুর উক্তি। গৌতম চট্টোপাধ্যায়-এর প্রবন্ধ নতুন যুগের ভোরে প্রবন্ধ হতে উদ্ধৃত; পৃ. ১৬৬

২৪. সুশোভন সরকার, ডিরোজিও ও ইয়ংবেঙ্গল পৃ. ২৮ [দ্র. ক্যালকাটা মান্থলি জার্নাল, ফেব্রুয়ারি ১৮৩১]

২৫. শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ

২৬. ডিরোজিওর পৃষ্ঠপোষণায় ইয়ংবেঙ্গলরা 'পার্থিনেন' নামে একটি পত্রিকা বের করেন। এই পত্রিকায় হিন্দুধর্মেও অনাচারকে আক্রমণ করে মধাবচন্দ্র মল্লিক একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এই প্রবন্ধের এক জায়গায় তাঁর উক্তি ছিল- IF THERE IS ANYTHING THAT WE HATE FROM THE BOTTOM OF OUR HEART, IT IS HINDUISM.

২৭. এরূপ জনশ্রুতি, কলেজে পাঠকালে নিম্নলিখিত ঘটনাটি ঘটে। তৎকালে কলিকাতা সুপ্রিমকোর্টে হিন্দু সাক্ষীদিগকে তামা, তুলসী ও গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া শপথপূর্ব্বক সাক্ষ্য দিতে হইত। তামা তুলসী গঙ্গাজল আনিবার জন্য একজন উড়িয়া ব্রাহ্মণ নিযুক্ত ছিল। আমরা প্রথমে কলিকাতাতে আসিয়া তাহাকে যখন দেখিয়াছি, তখন তাহার বৃদ্ধাবস্থা। ঐ উড়িয়া ব্রাহ্মণ একখানি তাম্রকুণ্ডে করিয়া তুলসি ও গঙ্গাজল লইয়া সাক্ষীদের সম্মুখে আনিয়া ধরিত, তাহা স্পর্শ করিয়া হিন্দু সাক্ষীদিগকে শপথ করিতে হইত। যখন এই নিয়ম ছিল, তখন একবার কোনও মোকদ্দমাতে সাক্ষী হইয়া বালক রসিককৃষ্ণকে সুপ্রিমকোর্টে উপস্থিত হইতে হয়। তিনি সাক্ষ্য দিতে দাঁড়াইলে উড়িয়া ব্রাহ্মণ প্রথম তাম্রকুণ্ড লইয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু মধ্যে এক বিষম সংকট উপস্থিত। রসিককৃষ্ণ তামা তুলসী গঙ্গাজল স্পর্শ করিতে চাহিলেন না; স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। আদালত সুদ্ধ লোক বিস্ময়ে মগ্ন হইলেন। বিচারপতি কারণ জিজ্ঞাসা করাতে রসিক বলিলেন-"আমি গঙ্গা মানি না। যখন ইন্টারপ্রিটার উচ্চৈঃস্বরে ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়া জজকে শুনাইলেন-I do not believe in the sacredness of the Ganges. তখন একেবারে চারিদিকে ইস্ ইস্ শব্দ উঠিয়া গেল; হিন্দু শ্রোতাগণ কানে হাত দিলেন। অর্দ্ধ দণ্ডের মধ্যে এই সংবাদ সহরে ছড়াইয়া পড়িল। 'মল্লিকদের বাটির ছেলে প্রকাশ্যে আদালতে দাঁড়াইয়া বলিয়াছে গঙ্গা মানি না; ঘোর কলি উপস্থিত, দেখ কলেজের শিক্ষার কি ফল!' সম্প্রতি কুমারী কলেজের শিক্ষিত যে রামমোহন রায়ের জীবনচরিত বাহির হইয়াছে, তাহাতে রামমোহন রায়ের একজন শিষ্যের বিষয়ে এইরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ আছে। বালক রসিককৃষ্ণই বোধহয় সেই শিষ্য। রসিককৃষ্ণের বিষয়ে এইরূপ গল্প লাহিড়ী মহাশয়ের ও ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে শোনা গিয়াছে। রসিককৃষ্ণের যে রামমোহন রায়ের প্রতি প্রাগাঢ় আস্থা ছিল তাহার প্রমাণও আছে। রাজার মৃত্যুর পর ১৮৩৪ সালে তাঁহার স্মরণার্থ কলিকাতাতে এক সভা হয়। তাহাতে বাঙালি বক্তার মধ্যে তিনিই ছিলেন। [দ্র. শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পৃ. ১২০]

২৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২০

২৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২০

৩০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২০

৩১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২০

৩২. সংবাদ প্রভাকর, আগস্ট ১৮৩১

Dhaka University Institutional Repository

১. ড.সুনীল কান্তি দে, রাজা রামমোহন রায়ের শিক্ষাদর্শন ও তাঁর শিক্ষা–সংগ্রাম (প্রবন্ধ), wk ÿ wi kZ eQi ivg‡gvnb †_‡K bRiæj, শোয়াইব জিবরান সম্পাদিত, শিক্ষাচিন্তা, মার্চ,২০০৯, পৃ.৯ [দ্র. স্বপন বসু, evsjvi be‡PZbv, কলিকাতা, ১৯৮৫]
২. প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, রামমোহন রায়ের জীবনী (প্রবন্ধ) ড. তাহা ইয়াসিন সম্পাদিত, beRvMi‡Yi AM'Z ivg‡gvnb ivq, শোভা প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৬, ঢাকা, পৃ-১৯২
৩. ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, evsjv mvwn‡Z¨i m¤úY BwZeË, নতুন পরিবর্ধিত সংস্করণ, মর্ডান বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড কলকাতা, ২০০৮ পৃ-২৯৪
৪. রামমোহন রায় রংপুরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ান ছিলেন। ফলে ঈশ্বর গুপ্ত তাঁকে †'lqvbRx, বলে সম্বোধন করতেন। [দ্র. ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, evsjv mvwn‡Z¨i m¤úb BwZeË, নতুন পরিবর্ধিত সংস্করণ, মর্ডান বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড কলকাতা, ২০০৮ পৃ-২৯৪]
৫. কাজী আবদুল ওদুদ, evsjv RvMiY, প্রথম প্রকাশ, ১৯৫৬, কলকাতা, পৃ.৪
৬. স্বপন বসু, evsjvi be‡PZbvi BwZnvm, পুস্তক বিপণি, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯, তৃতীয় সংস্করণ–২০০০, পৃ.৭২
৭. ড.সুনীল কান্তি দে, রাজা রামমোহন রায়ের শিক্ষাদর্শন ও তাঁর শিক্ষা–সংগ্রাম, c‡ev³,পৃ.৯
৮. N. D. Basak, History of vernacular Education in Bengal Culcutta. December 1974, pp. 258-262
৯. Ibid
১০. Letter from Rammohan Ray to Lord Amherst, Dated 11 December 1823 প্রবীর মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, বাঙালির শিক্ষাচিন্তা, কলিকাতা, মাঘ ১৪০৩, পৃ. ৯-১১
১১. Ibid.
১২. শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, কলিকাতা, ১৯৮৩, পৃ. ৬৩-৬৪
১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১
১৪. ঊনিশ শতকের বাংলা নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেছেন তারা উল্লেখ করেছেন যে স্যার হাইড ইস্ট পত্রটি বিচারপতি হ্যারিংটনকে লিখেছেন। অধ্যাপক এ এফ সালাহউদ্দীন আহমেদ লন্ডন আরকাইভস থেকে স্যার হাইড ইস্ট লিখিত original পত্রটি উদ্ধার করেন। তাতে দেখা যায় পত্রটি Earl of Buckinghamshire President of the Board of Control কে লিখেছিলেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন, A.F. Salahuddin Ahmed On the origin of the Hindu College: A review Nineteenth century studies No. 9 January, 1975.
১৫. বিনয় ঘোষ, বাংলার বিদ্যাসমাজ, কলিকাতা ১৯৮৭, পৃ. ১৪১
১৬. যোগানন্দ দাশ, রামমোহন ও ব্রাহ্ম আন্দোলন, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, কলিকাতা (সন উল্লেখ নেই), পৃ. ১০১
১৭. Nimai Sudhar Bose, Indian awakening and Bengal Culcutta, 1990, p. 44.
১৮. ঋষি দাস, রাজা রামমোহন, কলিকাতা, ১৩৯৫, পৃ- ১৪৬-১৪৭
১৯. অক্ষয়কুমার রামমোহন রায়ের এ গ্রন্থে প্রতিফলিত যুক্তিবাদকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন। এবং সেটাই রামমোহন রায়ের প্রকৃত মনোভাব বলে দাবি করেছিলেন। অক্ষয়কুমার বলেন, 'তিনি ঐ পুস্তকে ['তুহফাৎ'] একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরে অবিচলিত ভক্তি প্রকাশ করিয়া সর্বপ্রকার প্রচলিত শাস্ত্রের শিরে এতাদৃশ দণ্ডাঘাত করিয়া গিয়াছেন যে তদীয় যাতনা হইতে তাহাদিগের পরিত্রাণ পাইবার উপায় নাই।' [দ্র. দিলীপকুমার বিশ্বাস উদ্ধৃত, ivg‡gvnb mgx¶v, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৪, পৃ ৮২] অক্ষয়কুমার এখানে বলতে চেয়েছেন রামমোহন রায় শাস্ত্রকে প্রামাণ্য হিসেবে গ্রহণ করেননি। কিন্তু রামমোহন-গবেষক দিলীপকুমার বিশ্বাস বলেন, 'জীবনের পরবর্তী অধ্যায়ে রক্ষণশীল হিন্দু ও খ্রীষ্টীয় প্রতিপক্ষগণের সঙ্গে বিচার প্রসঙ্গে রচিত গ্রন্থগুলিতে শাস্ত্রের প্রতি রামমোহনের যে দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিফলিত—তা 'তুহফাৎ' পর্বের অকৃত্রিম যুক্তিবাদ থেকে আপাতদৃষ্টিতে কিছু পৃথক। দেখা যায় উভয়ত্র তিনি যথাক্রমে হিন্দু ও খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রের প্রামাণ্য স্বীকার করে নিয়েই বিচারে অগ্রসর হয়েছেন। এর থেকে স্বভাবত মনে হতে পারে 'তুহফাৎ'-এ তাঁর যে পরিপূর্ণ যুক্তিবাদী মানসের পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল উত্তরপর্বে তার পরিবর্তন হয়েছে এবং পরবর্তী গ্রন্থগুলিতে সেই প্রখর যুক্তিবাদ খানিকটা সংশোধন করে তিনি শাস্ত্রপ্রমাণকে স্বীকৃতি দিয়েছেন।' [দ্র. পূর্বোক্ত, পৃ ৬৩] এমনকি 'তুহফাৎ'-এর যুক্তিবাদকে 'উগ্র মতবাদ' বলে দিলীপকুমার বিশ্বাস অক্ষয়কুমারের উল্লিখিত মতামতের কঠোর সমালোচনা করেছেন। দিলীপকুমার বিশ্বাসের মতে, রামমোহন 'প্রত্যাদেশ বা revelation মেনেছেন এবং শাস্ত্রের যে সকল অংশে ঋষি, মহাপুরুষ বা প্রবক্তাগণের ঐশী প্রেরণাজাত বাণী সঞ্চিত আছে সেগুলির প্রামাণ্য স্বীকারেও আপত্তি করেননি।' [দ্র. পূর্বোক্ত, পৃ ৮২] এর থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, রামমোহন রায় ও অক্ষয়কুমার দত্তের মধ্যে পার্থক্য মৌলিক। কাজেই অক্ষয়কুমারকে রামমোহন রায়ের 'ভাবশিষ্য' মনে করাটা হচ্ছে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণার ফল।
২০. প্রবন্ধ সংগ্রহ -প্রমথ চৌধুরী, সম্পাদনা -অতুল গুপ্ত, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ৭ আগস্ট ১৯৫২, পৃ-১৬০ ও ১৬১
২১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, fviZc_K ivg‡gvnb ivq, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৯০, পৃ ৭৪
২২. বদরুদ্দীন উমর, CkiP›' we'¨vmvMi I Ewbk kZ‡Ki evOvjx mgvR, ঢাকা, সুবর্ণ প্রকাশন, জুলাই ১৯৭৪পৃ ২৩

Dhaka University Institutional Repository

২৩. অক্ষয়কুমার দত্তের †kô ceÜ (মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম সম্পাদিত), ঢাকা, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, জানুয়ারি ২০০৫, পৃ ১৫৫
২৪. কাজী আবদুল ওদুদ : ewsjvi RvMiY, কলকাতা, বিশ্বভারতী, ডিসেম্বর ১৯৫৬, পৃ ৩
২৫. প্রবন্ধ সংগ্রহ -প্রমথ চৌধুরী, সম্পাদনা -অতুল গুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ-১৫৮ ও ১৫৯
২৬. পূর্বোক্ত, পৃ-১৬৬ ও ১৬৭
২৭. কাউন্সিল ৭ মার্চ ১৮৩৫ তারিখে মেকলে এর নিম্নবর্ণিত প্রস্তাব অনুমোদন করে। The great objective of the British Government ought to be the promotion of European literature and science amongst the natives of India and all the funds appropriated for the purposes of education would be best employed on Enghsh education alone" N.S. Bose. p. 114. N. 1. Basak. History of Vermacular Education in Bengal Calcutta 1974, p. 262: সুখময় সেনগুপ্ত, বঙ্গদেশে ইংরেজী শিক্ষা: বাঙ্গালীর শিক্ষাচিন্ত, কলিকাতা, মার্চ ১৯৮৫, পৃ. ৬-৭

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

অক্ষয়কুমার দত্তের শিক্ষাচিন্তা

১. পরিচয়
২. অক্ষয়কুমার দত্তের মানস বৈশিষ্ট্য
৩. প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা
৪. কর্মজীবন : শিক্ষকতা ও পত্রিকা সম্পাদনা
৪.২ বিদ্যাদর্শন পত্রিকা সম্পাদনা
৪.৩ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদনা
৪.৪ তËবোধিনী পাঠশালায় শিক্ষকতা
৪.৫ কলকাতা নর্মাল স্কুলে শিক্ষকতা
৫. শিক্ষাচিন্তায় আত্মপ্রকাশ: জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা
৬. শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
৭. শিক্ষার মাধ্যম ও শিক্ষানীতি নির্ধারণ
৮. শিক্ষার্থীর মানসিক বিকাশে মাতৃভাষার ভূমিকা
৯. মাতৃভাষায় শিক্ষার অন্তরায় অনুধাবন
১০. বিশেষ ধরনের শিক্ষার পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি:
    প্রথম স্তর বা পর্ব: প্রাথমিক শিক্ষা
    দ্বিতীয় স্তর বা পর্ব : মাধ্যমিক শিক্ষা
    তৃতীয় স্তর বা পর্ব : উচ্চশিক্ষা
১১. স্ত্রীশিক্ষা ও শিশুর বিকাশে শিক্ষিত মায়ের ভূমিকা
১২. বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষার গুরুত্ব
১৩. বিজ্ঞান বিষয়ক রচনার ভাষা-বৈশিষ্ট্য
১৪. বিজ্ঞান শিক্ষায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা
১৫. শিক্ষার উপকরণ পরিকল্পনা
১৬. শিক্ষাদানের জন্য উপযুক্ত শিক্ষক নির্বাচন
১৭. শিক্ষার্থীর শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য ও পরিবেশ

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

অক্ষয়কুমার দত্তের শিক্ষাচিন্তা

পরিচয়

অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬) বাংলা ভাষার প্রধান শিক্ষাচিন্তকদের একজন। শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে তিনি মাতৃভাষাকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন। বাংলা ভাষায় সাধারণ মানুষের চিত্তের বিকাশ প্রথম তাঁর চেষ্টাতেই ঘটে। তিনি বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা বিস্তারের পথপ্রদর্শক। শিক্ষাকে গ্রাম্য বর্বরতা ও রক্ষণশীল ধর্মীয় প্রভাব থেকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অসামান্য। সেকালের বাংলায় শিক্ষাক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছাড়া তাঁর তুল্য দ্বিতীয় কাউকে পাওয়া যায় না। বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি, অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, নীতিতত্ত্ব, শিক্ষাতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে ছিল তাঁর গভীর জ্ঞান ও অধ্যাবসায়। অক্ষয়কুমার দত্ত শিক্ষার বিভিন্ন দিক নিয়ে লেখনীর মাধ্যমে তৎকালীন পশ্চাদমুখী শিক্ষাচিন্তার বিরোধিতা করেছেন। শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করে তা থেকে তিনি উত্তরণের পথ দেখিয়েছেন। বাংলা ভাষায় সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি এক বিশেষ ধরনের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এ দিক থেকে তাঁর কর্মপ্রচেষ্টা বিদ্যাসাগর অপেক্ষাও অগ্রসর। বাংলা গদ্যের কাঠামোগত উন্নতি বিধানে যতিচিহ্নের প্রবর্তন, শব্দবিন্যাস রীতির প্রচলন, বিজ্ঞান শিক্ষার উপযুক্ত পরিভাষা তৈরি ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কাজে তাঁর গভীর মনোযোগ ছিল। অক্ষয়কুমার বাংলা ভাষায় শিক্ষাবিষয়ক বহু প্রবন্ধ ও স্কুলপাঠ্য পুস্তক রচনা করেছেন। এ অধ্যায়ে আমাদের লক্ষ্য বাংলা ভাষায় শিক্ষা বিস্তারে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পর্যালোচনা। এ উদ্দেশ্য সাধনে উনিশ শতকের একজন প্রধান চিন্তক হিসেবে তাঁর সামগ্রিক পরিচয়টি আমরা জানার চেষ্টা করব, যা তাঁর শিক্ষাচিন্তাকে বুঝতে সহায়তা করবে। এটা সত্য যে, আমাদের মতো সাধারণের পক্ষে তাঁর মতো অসাধারণকে বোঝা মোটেও সহজ কাজ নয়। সেকালে চিন্তাশক্তি ও ব্যক্তিত্ববলে তিনি যে উচ্চতায় পৌঁছেছিলেন, সে উচ্চতায় দৃষ্টি নিয়ে যাওয়ার মতো দ্রষ্টা ছিলেন খুব কম। শিক্ষাসচেতন মাত্রেই এ কথা স্বীকার করবেন যে, অক্ষয়কুমার দত্তের চিন্তা খাপে ভরা বা ফ্রেমে আটকানোর মতো বিষয় ছিল না। কারণ উনিশ শতকের চিন্তার জগতে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয় পুরুষ। তাই তাঁকে বুঝতে হলে তাঁর সৃষ্টির প্রতি গভীর মনোযোগ দিতে হয়। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিসহ আধুনিক মন নিয়ে তাঁকে অধ্যয়ন করতে হয়। অক্ষয়কুমারের উত্তরসাধকদের কেউ কেউ সে চেষ্টা করছেন। তাঁদের মতামত ও মূল্যায়নকে সামনে রেখে আমরা তাঁর সামগ্রিক চিন্তার স্বরূপ অনুধাবনপূর্বক বাংলা ভাষায় তাঁর শিক্ষাচিন্তার অবদান নির্ণয় করব।

২

অক্ষয়কুমার দত্তের মানস বৈশিষ্ট্য

অক্ষয়কুমার দত্তের চিন্তা আমাদের জীবনে প্রতিফলিত হতে শুরু করে we‘¨v‘kb cwÎKv প্রকাশের সময় থেকে। এর পরে পর্যায়ক্রমে ZË‡ewabx cwÎKv সম্পাদনা, তত্ত্ববোধিনী পাঠশালায় শিক্ষকতা, নর্মাল স্কুলের দায়িত্ব গ্রহণ প্রভৃতি কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে তা সামনে অগ্রসর হয়েছে। তাঁর প্রভাবে আধুনিক চিন্তার সেই ধারা তাঁর মৃত্যুর পরও অব্যাহত ছিল। শুধু তাই নয়, কালের চাহিদা মেটাতে তাঁর সেই চিন্তাধারা বহুমুখী হয়ে উঠেছিল। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথাটি স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন–“আমাদের বাল্যকালে আমরা একটি নূতন যুগের অবতারণা দেখেছি। প্রাচীন পাণ্ডিত্যের সঙ্গে য়ুরোপীয় বিচার-পদ্ধতির সম্মিলনে এই যুগের আর্বিভাব। অক্ষয়কুমার দত্তের মধ্যে তার প্রথম সূত্রপাত দেখা দিয়েছিল।”[১] অক্ষয়কুমার দত্ত ইংরেজি গ্রন্থাদি পাঠের মাধ্যমে আধুনিক সভ্যতা ও মানবজাতির প্রাচীন সভ্যতাগুলোর সঙ্গে পরিচিত

Dhaka University Institutional Repository

ছিলেন। যে কারণে এ দুইয়ের বিচারে তাঁর ভুল হয়নি। তিনি নতুন ও পুরনোর সমন্বয় সাধনে উদার ও নিপেক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। পরমাণুর আবিষ্কার সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি লিখেছেন :

> ইয়ুরোপের মধ্যে পরমাণুবাদ এখন সর্ব্ববাদি-সম্মত। শ্রীমান ডেলটন ইদানীং ইহার পুনরুদ্ভাবন করেন এবং রসায়নবিদ্যা সংক্রান্ত বিচারক্রমে একরূপ সপ্রমাণ অথবা অতিমাত্র সম্ভাবিত করিয়া তুলেন। তাহার দুই সহস্র বৎসর অপেক্ষাও অধিককাল পূর্ব্বে ভারতবর্ষে মহর্ষি কণাদ এই মত প্রবর্তিত করেন তাহার সন্দেহ নাই। পূর্ব্বকালে গ্রীসদেশে শ্রীমান ডেমক্রিটস এইরূপ পরমাণুবাদ প্রকাশ করিয়া যান। কণাদের সহিত তাহার কিরূপ সম্বন্ধ, স্থির করা কঠিন। এই উভয়ের মধ্যে কেহ কাহার নিকট ঋণবন্ধনে বদ্ধ আছে কি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেশে নিজ নিজ মত প্রচলিত করেন, নিশ্চয় বলা যায় না। ডেমক্রিটস গ্রীসদেশীয় কণাদ এবং কণাদ ভারতবর্ষীয় ডেমক্রিটস।[২]

আবার 'fviZelxq DcvmK-m¤c'vq (দুই ভাগ), cvPxb wn›'w'‡Mi mg'hvÎv I ewYR¨ we¯Ívi MŠ লিখে (তিনি) ভারতীয় সভ্যতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকেছেন।'[৩] প্রাচীন ও আধুনিক সভ্যতার শ্রেষ্ঠ ফল আস্বাদে তাঁর কোনো অসুবিধা হয়নি। অক্ষয়কুমার দত্তের চিন্তার স্বরূপ নির্দেশ করতে গিয়ে ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন:

> অক্ষয়কুমার বৈজ্ঞানিক, তাত্ত্বিক, দার্শনিক ও সমাজতত্ত্ববিৎ। সত্যিকথা বলতে কি, অক্ষয়কুমার দত্তকে আবেগব্যাকুল বাঙালীসমাজের ব্যতিক্রম বলেই মনে হয়। সারাজীবন তিনি শুদ্ধ জ্ঞানের সাধনা করেছেন, বিশুদ্ধ ও নির্মোহ বুদ্ধির চর্চা করেছেন। পাশ্চাত্ত্য যুক্তিবাদী দর্শন ও জ্ঞানবিজ্ঞানের সাধনায় মগ্ন থেকে এই জ্ঞানতাপস বুদ্ধিজীবী বাঙালী-মানসের এক আশ্চার্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। বুদ্ধি ও আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ বিবেক ছাড়া তিনি আর কারো দাসত্ব করেননি– এমন কি, ঈশ্বরেরও না।[৪]

–এখানে বিবৃত 'আবেগব্যাকুল বাঙালীসমাজের ব্যতিক্রম' এবং 'কারো দাসত্ব করেননি–এমন কি, ঈশ্বরেরও না' এ বিষয় দুটি অনুধাবনে আমরা আরও দুটি কথা স্মরণ করতে পারি। এর একটি অক্ষয়কুমার দত্তের নিজের কথা, অন্যটি তাঁকে উদ্দেশ করে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন । অক্ষয়কুমার কথাটি বলেছিলেন তাঁর পিতার মৃত্যুর খবর দিতে আসা তাঁর চাচাত ভাই হরমোহন দত্তকে কাঁদতে দেখে। তখন তিনি ওরিয়েন্টাল সেমিনারির দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র, আজকের দিনে সেটা অষ্টম শ্রেণির সমমান। পীতাম্বর দত্তের মৃত্যুর সংবাদ দিয়ে হরমোহন দত্তকে কান্নায় ভেঙে পড়তে দেখে তিনি বললেন– 'দাদা, এ জন্য আর দুঃখ করিয়া লাভ কী–কাপড় পুরনো হইলে আমরা যেমন তাহা পরিত্যাগ করি–পিতারও তেমনি সময় হইয়াছে, তিনিও পুরাতন শরীর ছাড়িয়া দিয়াছেন–সেজন্য আর দুঃখ কেন?'[৫] এ ঘটনা থেকেই অনুমান করা যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত আবেগব্যাকুল বাঙালিসমাজের কতটা ব্যতিক্রম ছিলেন। এ প্রসঙ্গে সমালোচক লিখেছেন :

> মাত্র ষোল বছর বয়সের কোনো কিশোর মানব-বোধির এত সূক্ষ্ম ও মৌল কথা যে এমন অনায়াসে বলতে পারে, তথা উপলব্ধি করতে পারে– এ আমার পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন ছিল। কেননা কিঞ্চিৎ বড় হয়ে বাংলা তরজমায় গীতা পড়ে দেখি, ও- কথা গীতার। ....অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনী পড়ে জানা যায়,খুব কম বয়সে তিনি সংস্কৃত-আরবি-ফারসি-ফরাসি-জার্মান-ইংরেজি প্রভৃতি ভাষা শিখেছিলেন। এবং প্রচুর বই পড়ে প্রভূত জ্ঞান লাভ করেছিলেন। বোধ নয়- বোধি দিয়েই তিনি জেনেছিলেন প্রকৃত শোক নীরব।[৬]

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথাটি আরও গুরুত্বপূর্ণ। তিনি নিজের সঙ্গে অক্ষয়কুমারকে তুলনা করে বলেছিলেন–"আমি কোথায়, আর তিনি কোথায়! আমি খুঁজিতেছি, ঈশ্বরের সহিত আমার কি সম্বন্ধ; আর, তিনি খুঁজিতেছেন, বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির কি সম্বন্ধ; আকাশ পাতাল প্রভেদ!'[৭] তাঁর ক্ষোভ মিশ্রিত এ উক্তিতে অক্ষয়কুমার দত্তের দৃষ্টিভঙ্গি এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রকৃত পরিচয় আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 'দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা সংক্ষিপ্ত, কিন্তু অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই সংক্ষিপ্ত কথায় একই সঙ্গে একটি যুগের এবং দু'জন ব্যক্তির মানস-বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রথমত, এই বাক্য দুটিতে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথমে নিজের পরিচয় দিয়েছেন ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের 'সম্বন্ধ' কি, সেটা তালাশ করা তাঁর জীবনের সর্বপ্রধান আরতি। দ্বিতীয়ত, অক্ষয়কুমার দত্তের অনুরাগ এর সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে। 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির কি সম্বন্ধ' এই হচ্ছে অক্ষয়কুমার দত্তের অনুসন্ধানের বিষয়। তৃতীয়ত, এই দুয়ের দ্বন্দ্ব এবং দ্বান্দ্বিক বিকাশই হচ্ছে উনবিংশ শতাব্দীর প্রধান বৈশিষ্ট্য।'[৮] দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এ বক্তব্যকে বিশ্লেষণ করলে আমরা সেকালের চিন্তার প্রধান দুটি ধারার সঙ্গে পরিচয় লাভ করি। এর একটি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অধ্যাত্মবাদী বা রক্ষণশীল ধারা'[৯] যার মূলে রয়েছে বেদ-বেদান্তের অনুসরণ; এবং অন্যটি অক্ষয়কুমার দত্তের আধুনিক প্রগতিবাদী ধারা, যাতে ইউরোপীয় চতুর্দশ থেকে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত রেনেসাঁসের প্রায় সব লক্ষণ স্পষ্ট। 'evn¨e¯i mwnZ

Dhaka University Institutional Repository

gvbe cKwZi m¤Ü wePvi গ্রন্থের মাধ্যমে বাঙালি যুবকেরা ক্রমশ অক্ষয়কুমারের আধুনিক চিন্তাভাবনার দিকেই আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে ভবতোষ দত্ত লিখেছেন-

> অক্ষয়কুমার দত্ত ছিলেন বাংলা সাহিত্যের প্রথম চিন্তাশীল প্রবন্ধকার যিনি মানুষের জীবন ও অস্তিত্ব নিয়ে ভাবতে শুরু করেছিলেন। দীর্ঘ নিবন্ধে আলোচনা করে তিনি দেখালেন এ জীবন কীভাবে পরিচালিত হয়, বস্তুজগতের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কি। তাঁর মনে এই জিজ্ঞাসা ও কৌতূহল দেখা দিয়েছিল যে সময়ে, তখন সেটা ছিল অভিনব, কারণ মানবপ্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ বিচার করার কোনো প্রয়োজন আছে, এ কথা আমাদের দেশে পূর্বে কখনও কারও মনে হয়নি। বরং আমাদের স্মৃতিশাস্ত্র থেকে মনে হয় এ জগৎ অপরিশুদ্ধ, একে নানাভাবে শুদ্ধ করে নিয়ে বাঁচতে হবে। অক্ষয়কুমার দেখালেন বাহ্যজগতের রীতিনিয়মকে যথাযথভাবে জানতে হবে, তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মানুষকে বাঁচতে হবে। এই নীতিনিয়ম স্থির করে মানুষ তার বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে। বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি প্রয়োগ করে মানুষকে সুস্থভাবে জীবনযাপনের আদর্শ নির্ণয় করতে হয়। অক্ষয়কুমার প্রখর যুক্তি প্রয়োগ করলেন বাহ্যজগৎ ও মানবপ্রকৃতির মধ্যে সামঞ্জস্য করতে এবং তার দ্বারাই সুখী হবার পথ নির্দেশ করতে। তার পূর্বে আমাদের দেশে এ চেষ্টা হয়নি। অধ্যাত্ম-সুখের সন্ধান হয়েছে, কিন্তু মানবজীবনের সুখের সন্ধান হয়নি।'[১০]

অক্ষয়কুমার দত্ত বহুবার জগদীশ্বরের নিয়মের কথা বলেছেন। তিনি দেখেছেন যে, প্রত্যেক স্তরে প্রত্যেক পর্যায়েই নিয়ম আছে। আর সেই নিয়মগুলি মানুষ যতই জানতে পারবে ততই তারা জীবনধারণের অন্তরায়গুলি অতিক্রম করে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করতে পারবে। নিয়মগুলি জানাই মানুষের পক্ষে যথেষ্ট, জগদীশ্বরকে জানার চেষ্টা অর্থহীন। তিনি আরও বলেছেন যে-নিয়ম জগদ্বীশ্বর করে দিয়েছেন, সে নিয়ম তিনি নিজেও আর ভাঙতে পারবেন না। প্রাকৃতিক নিয়মিগুলিকে মানুষ পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার দ্বারা কেবল নির্ণয় করে নেয়। এই নির্ণয় করাতেই মানুষের মানবত্ব। এই জানা এবং সেই অনুসারে জীবন ধারণই মানুষের ধর্ম। মানুষ ছাড়া আর কোনো জীবের পক্ষে এ কাজ সম্ভব নয়। কারণ তা সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির কাজ। এতে কোনো অলৌকিকতাও নেই, অস্পষ্টাতও নেই। এখানে লক্ষ্য করবার বিষয়, অক্ষয়কুমার নিয়মের কথা বলতে গিয়ে প্রায় প্রতিপদেই ঈশ্বরের কথা বলছেন, কিন্তু ঈশ্বরকে জানা বা তাঁর কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করার-কথা কখনো বলেননি। মানবচেতনার এই দিকটা তিনি এড়িয়ে গেছেন,এই ছিল তাঁর মানসিক গড়ন।

৩

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা

অক্ষয়কুমার দত্তের জন্ম ১৮২০ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ জুলাই (১ শ্রাবণ ১২২৭ সনে), নবদ্বীপের পাঁচ মাইল উত্তরে চুপী গ্রামে, রক্ষণশীল কায়স্থ পরিবারে। তাঁর বাবা পীতাম্বর দত্ত ছিলেন অল্পশিক্ষিত, উদ্যমহীন, উচ্চাশাহীন, নিরীহ বাঙালি। 'কোনোরকমে দিনগত পাপক্ষয় করে অবশেষে বাণপ্রস্থ নিতে পারলেই তাঁর শান্তি।'[১১] তাঁর মা দয়াময়ী ছিলেন ধর্মভীরু পরোপকারী;'অসুস্থ মানুষকে ওষুধ-পথ্য দেওয়া ছিল তাঁর প্রধান ব্রত।'[১২] বাংলা ভাষায় সমান্য অক্ষরজ্ঞান নিয়ে পীতাম্বর দত্ত, কলকাতায় কুতঘাটের (বর্তমান কুঁতঘাট) পুলিশ-কার্যালয়ে প্রথমে কোষাধ্যক্ষ, পরে সাব-ইন্সপেক্টরের চাকরি করতেন। সেই আয় দিয়েই তাঁর সংসার চলত। অক্ষয়কুমারের শৈশব এবং কৈশোরের দিনগুলো কষ্টে কেটেছে। তাঁর সেই জীবনের ইতিহাস তিনি লিখে যাননি। তাই তাঁর জীবনীকারদের সাক্ষ্যের উপর আমাদের নির্ভর করতে হয়।'[১৩] অক্ষয়কুমার দত্তের শিক্ষা শুরু হয় সাতবছর বয়সে। শিক্ষাগুরু 'গুরুচরণ সরকার' শিক্ষার্থীর বাড়িতে গিয়ে শিক্ষার্থীকে সে-কালের 'পাঠশালা'র সব বিষয়ে শিক্ষা দিতেন।[১৪] তখন রাজভাষা ফারসি হওয়ায় অক্ষয়কুমার আমিউদ্দীন মুনসির কাছে ফারসি'[১৫] এবং টোলের সংস্কৃত পণ্ডিত গোপীনাথ তর্কালঙ্কারের কাছে সংস্কৃত ভাষা শিখতেন।'[১৬] এ সময় তিনি তাঁর শিক্ষাগুরুদের কাছে নানা বিষয়ে প্রশ্ন করে জানতে চাইতেন। অল্প বয়সে অক্ষয়কুমারের এত বিদ্যানুরাগ দেখে তাঁর শিক্ষকরাও বিস্মিত হতেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর অন্যতম জীবনীকার মহেন্দ্রনাথ রায় লিখেছেন :

> ইনি এক দিবস বৈকালে ইঁহাদের পূজার বাটির অঙ্গনে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় বসিয়া কদলীপত্রে কাঠাকালি অথবা বিঘাকালী লিখিতেছিলেন, এমন সময়ে ইঁহার মনে এইরূপ ভাবের উদয় হইল যে, পৃথিবী কত বিঘাই হইবে? পৃথিবী কতই বড়? পৃথিবীর সীমাই বা কোথায় ও তাহার পরেই বা কি? যদি তার পরে আকাশ হয়,

Dhaka University Institutional Repository

> আকাশই বা কতদূর? আকাশের সীমাই বা কিরূপ? তার পরেই বা কি? উপরে যে আকাশ দেখা যায়, তাহাই বা কতদূর? তাহার সীমা আছে কি না? সীমা থাকিলে তাহার পরেই বা কি? গুরুমহাশয় ভয়ানক বস্তু।[১৭] তাঁহাকে একথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না। পরে পাঠশালার ছুটি হইলে, বাটি যাইয়া আপনার মাতা ঠাকুরাণীকে ঐ সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।[১৮]

অভিভাবকরা অক্ষয়কুমারকে ফারসি শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে চাইলেন। কিন্তু তিনি রাজি হলেন না। তিনি জেদ ধরলেন 'কলকাতার হিন্দু কলেজ' অথবা 'ভবানীপুরের ইউনিয়ন স্কুল' এ দুটির একটিতে পড়তে। তাঁর উদ্দেশ্য সাধনে চাচাত ভাই হরমোহন দত্তের সঙ্গে তিনি খিদিরপুরে চলে আসলেন।'[১৯] সেখানে দু'জন ইংরেজি শিক্ষক জয় মাস্টার (জয়কৃষ্ণ সরকার) ও গঙ্গানায়রণ মাস্টার (গঙ্গানায়রণ সরকার) নিকট তাঁর ইংরেজি পড়ার ব্যবস্থা করা হলো। অল্প দিনের মধ্যেই অক্ষয়কুমারের মনে হল, ঐ শিক্ষকদ্বয় তাঁকে ভালো করে ইংরেজি শিখাতে পারছেন না। আরও ভালো ইংরেজি শিখতে তিনি হরমোহন দত্তকে অনুরোধ করলেন মিশনারি–স্কুলে ভর্তি করে দিতে। কিন্তু হরমোহন কিছুতেই রাজি হলেন না, সেখানে পড়ে খ্রিষ্টান হয়ে যাওয়ার ভয়ে।

অক্ষয়কুমার ভর্তি ছাড়াই অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে মিশনারি স্কুলে যেতে লাগলেন। হরমোহন দত্ত তা পছন্দ করলেন না। তিনি তাঁকে ডেকে বলেন– ''তুমি এখনই আমার কথা শুনিতেছ না, আর কিছুদিন ঐ স্কুলে পড়িলে, তুমি কোনরূপেই আমাদের মতানুসারে চলিবে না।''[২০] অক্ষয়কুমার দত্ত চাচাতো ভাই হরমোহন দত্তকে মিশনারি স্কুলে যাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করলেন। তিনি বললেন :

> প্রথমে আপনি আমাকে জয় মাস্টারের নিকট পড়িতে দেন, তথায় রীতিমত শিক্ষাই হয় নাই, একথা আপনাকে অবগত করিয়া আমাকে কোন স্কুলে নিযুক্ত করিয়া দিতে বলিলাম; তাহাতেও আপনি আমাকে কোন বিদ্যালয়ে না দিয়া নিজে অতি অপরাহ্নে কিছু কিছু পড়া বলিয়া দিতেন; সে সময়ে আপনি আপিস হইতে শ্রান্ত হইয়া আসিতেন; তখন আপনার আবশ্যকমত অবসর হইত না; এবং সকল দিনও শিক্ষা দেওয়া ঘটিত না; ইহাতে, আমার প্রার্থনাক্রমে আপনার নিকটে আমার জন্য অনেকে অনুরোধ করেন; তাহাতেও আপনি মনোযোগ না করাতে, আমি ব্যাকুল হইয়া আপনার আপিসের ভবানী বাবু দ্বারা আপনাকে বিশেষরূপ অনুরোধ করাই, তাহাতেও আপনি আমাকে কোন বিদ্যালয়ে না পাঠাইয়া আপনার আপিসের কেরাণির নিকট পড়িতে দেন; তিনি বিদ্বান লোক বটেন, কিন্তু আপনার বিষয়কর্ম্মেই সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতেন; দিনান্তে একবার মাত্র কিছু পড়া বলিয়া দিতেন; ইহাতে আমার কিছুই মনের তৃপ্তি হইত না, কেবল কষ্টই যাইত; মধ্যে মধ্যে চুপীর বাটিতে গিয়া একাদিক্রমে অনেক মাস অবস্থিতি করাতে বৃথা কালক্ষেপ হইয়াছে, সে সামান্য ক্লেশের বিষয় নহে; পরে ভবানীপুরের ইউনিয়ন স্কুলের পারিতোষিক-বিতরণ দেখিতে গিয়া আমার মনে স্থির হইল, আমার কিছুই লেখাপড়া হইতেছে না; এই মনঃকষ্টের সময় এখানে মিশনরি স্কুল সংস্থাপনের সংবাদ শুনিলাম এবং অবগত হইলাম, তথায় পড়িলে বেতনও লাগিবে না ও পুস্তকও ক্রয় করিতে হইবে না; বিনা ব্যয়ে শিক্ষা হইবে শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম ও নিজেই তথায় গিয়া শিক্ষা করিতে লাগিলাম; তাহাও যদি আপনি নিষেধ করিবেন, কোনরূপেই যাইতে দেবেন না, তবে আমার কি কিছুই লেখা পড়া হইবে না? [২১]

অক্ষয়কুমারের এসব কথা হরমোহন দত্তের কাছে যুক্তিসঙ্গত মনে হলো। তিনি বিরক্ত হলেন না। তাঁকে কলকাতার গৌরমোহন আঢ্যের ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে অক্ষয়কুমারের ভর্তির ব্যবস্থা হলো।'[২২] গৌরমোহন বাবু অক্ষয়কুমারকে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি করতে চাইলেন, তিনি রাজি হলেন না; প্রমোশন নিয়ে উচ্চতর শ্রেণিতে ভর্তি হলেন।[২৩] হরমোহন দত্তের অর্থ সহায়তায় পিসতুতো ভাই রামধন বসুর বাসায় আশ্রয় নিয়ে তাঁর লেখা-পড়া চলতে থাকল। রামধনের আর্থিক অবস্থা মোটেও ভালো ছিল না। স্কুল থেকে ফিরে অনেক সময় তাঁকে অনাহারে থাকতে হতো। সংসারের অভাবের কথা চিন্তা করে তিনি পিতাকেও কিছু জানাতেন না। মহেন্দ্রনাথ রায় লিখেছেন :

> রামচাঁদ নামে একজন ফিরিওয়ালা জলখাবার বিক্রয় করিবার জন্য ঐ বাসায় প্রতিদিন আসিত। একদিবস অক্ষয় বাবু নীচের ঘরের রোয়াকে বসিয়া ঐ ফিরিওয়ালাকে বলিলেন,'তুমি আমাকে নিত্য নিত্য জলখাবার দেও; আমার কর্ম্মকাজ হইলে তোমাকে সুদসমেত একেবারেই পরিশোধ করিয়া দিব।' যখন এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছিল, তখন রামধন বাবু উপরের গৃহে ছিলেন; ঐ কথা শুনিতে পাইয়া তিনি তথা হইতে রামচাঁদকে বলিলেন, 'তুমি অক্ষয়কে এক পয়সার করিয়া জলখাবার দিও।' যখন অক্ষয়বাবু জলখাবার খাইতেন, তখন ইঁহার নিকটে অনেকগুলি কাক আসিয়া জুটিত। ইনি আপনিও খাইতেন এবং সেই সঙ্গে-সঙ্গে কাক সকলকেও কিছু-কিছু দিতেন। সেই অবস্থা স্মরণ করিয়া এখনও ইনি ভোজনান্তে স্বহস্তে কতকগুলি কাককে প্রতিদিবস অন্ন দিয়া থাকেন, ইহা আমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি।[২৪]

অক্ষয়কুমার দত্ত এমন সমস্যা সংকটের মধ্য দিয়ে তাঁর লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হতে থাকলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শেষ বাধা তিনি অতিক্রম করতে পারলেন না। অক্ষয়কুমারের বাবা অবসর নেওয়ার কিছুদিন পর 'কাশীতে-যাত্রা' করেন।'[২৫] সেখানেই তাঁর মৃত্যু (১৮৩৯) হয়। পীতাম্বর দত্তের মৃত্যুতে পরিবারে আর্থিক সংকট আরও ঘনীভূত হয়। তখন বাধ্য হয়ে কিশোর বয়সেই তাঁকে সংসারের হাল ধরতে হয়।'[২৬] অক্ষয়কুমার তাঁর জীবনে কোনো কষ্টকেই কষ্ট মনে করেননি। আবার ভাগ্যের নির্মম পরিহাস বলেও কিছু মেনে নেননি। তাঁর জীবনকে তিনি কর্ম দিয়ে জয় করতে চেয়েছেন।

৪

কর্মজীবন : শিক্ষকতা ও পত্রিকা সম্পাদনা

অক্ষয়কুমার ওরিয়েন্টাল সেমিনারির পড়া ছেড়ে দিয়ে উপার্জনের পথে পা বাড়ালেন। কিন্তু আয় রোজগারের একটা পথ পাওয়া তাঁর পক্ষে সহজ ছিল না। কারণ তিনি যে বিদ্যা অর্জন করেছেন, তা কোনো কর্মমুখীবিদ্যা ছিল না। ফলে কাজের চেষ্টা করতে গিয়ে তাঁকে নানা জনের নানা পরামর্শ, উপদেশ শুনতে হয়েছে। কেউ বলেছেন কেরানিগিরি করতে, কেউ 'সওদাগরের হাউসের কার্য্যাদি শিক্ষা' করতে, আবার কেউ কেউ 'ব্যবসায়' করতে পরামর্শ দিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত তিনি কারও কথাই রাখেননি, কারও দেখানো পথেই যাননি। কষ্টের দিনে ধৈর্য না হারিয়ে তিনি জ্ঞানের অর্জনের পথে থেকেছেন, স্বজাতির কল্যাণ সাধনে নিজেকে যোগ্য করে গড়ে তুলতে চেয়েছেন। হরমোহন দত্ত তাঁকে আইন পড়ে উকিল হওয়ার পরামর্শ দিলে তিনি বলেছেন- 'যে নিয়ম নিত্য নিত্য পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা শিক্ষা করিয়া আমার কি ফল লাভ হইবে? আমি জগতের অপরিবর্ত্তনীয় স্বাভাবিক নিয়ম শিক্ষা করিতে চাই। তদ্দ্বারা আমার নিজের ও অপর সাধারণের হিত-সাধন হইতে পারিবে। যাহাতে নিজের ও অপরের জ্ঞানোন্নতি ও সাধারণের হিত-সাধন না হয়, এমন কোন বিষয় শিক্ষা করিয়া ও তাহা লইয়া আমি জীবন অতিবাহিত করিতে পারিব না।'[২৭] অক্ষয়কুমার দত্ত এরই মধ্যে দ্বারকানাথ ঠাকুরের ছোট ছেলে নগেন্দ্রমোহন ঠাকুরকে ইংরেজী শেখানোর দায়িত্ব পেলেন। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা তিনি সেখান পড়াতে যেতেন।'[২৮] এ সময় কবি ঈশ্বরগুপ্তের সম্পাদনায় তখন 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা প্রকাশ হতো। সুপ্রিমকোর্টের বিজ্ঞাপন সংগ্রহের কাজে হরমোহন দত্তের কাছে যাওয়া-আসার সুবাদে কবি ঈশ্বরগুপ্তের সঙ্গে অক্ষয়কুমার দত্তের পরিচয় হয়। সে সময় তিনি সে পত্রিকায় তখন লিখতেও চেয়েছিলেন। কিন্তু কী লিখবেন; তা ঠিক করতে পারছিলেন না। তিনি ভাবতেন—'পদ্য রচনায় লোকের বিশেষ উপকার হইতে পারে? নাকি গদ্যে' [২৯] এক পর্যায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের বিশেষ অনুরোধে তিনি msev' cfvKi পত্রিকায় গদ্য লিখতে শুরু করলেন। অল্পকিছু গদ্য লিখেই তিনি কবি ঈশ্বর গুপ্তের দৃষ্টি কাড়লেন। এ প্রসঙ্গে নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস লিখেছেন:

> সুপ্রীমকোর্টের বিজ্ঞাপনাদি প্রায় সমস্ত কার্য্য বাবু হরমোহন দত্তের হস্তে ন্যস্ত ছিল। প্রভাকর পত্রিকার জন্য ঐ সমস্ত বিজ্ঞাপন হস্তগত করিবার মানসে তাঁহার সকাশে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের গতিবিধি ছিল। বরাবর যাতায়াতে ইঁহার সহিত তাঁহার বন্ধুতা জন্মে। এই বন্ধুতা নিবন্ধন অক্ষয় বাবুও ইঁহার নিকট পরিচিত হন। এতদ্ভিন্ন রামধন বসুর বাটীর সন্নিকট নরনারায়ণ দত্তের বাটীতে 'বাঙ্গালা ভাষানুশীলন সভা' হইত। এই সভায় ইঁহারা উভয়ে উপস্থিত থাকিতেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে ইনি কবি মহোদয়ের স্নেহভাজন হন।[৩০]

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মতো msev' cfvKi-এর বহু পাঠকও তাঁর লেখায় মুগ্ধ হলেন। তিনি প্রভাকর পাঠকের মনে একটা নতুন স্বাদ এনে দিলেন। সেই ব্যতিক্রমধর্মী স্বাদে সেকালের রুচিবান ও বিবেকী পাঠক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও অক্ষয়কুমার দত্তের লেখার একজন গুণগ্রাহী হয়ে উঠলেন এবং তাঁর সঙ্গে পরিচিত হতে চাইলেন। কেদারনাথ মজুমদার লিখেছেন:

> অক্ষয় বাবু তখন গুপ্ত কবির 'প্রভাকরে' প্রবন্ধ লিখিতেন....। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'প্রভাকরে' অক্ষয় বাবুর প্রবন্ধ পাঠ করিয়া তাঁহার সহিত পরিচয় করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, এই সময় একদিন ঈশ্বর গুপ্ত অক্ষয় বাবুকে তত্ত্ববোধিনী সভায় আনিয়া দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। পরিচয়ের পরই (১৭৬১ শকের ১১ই পৌষ) অক্ষয় বাবু তত্ত্ববোধিনী সভার একজন সভ্য মনোনীত হন। এই সময় অক্ষয় বাবুর বয়স মাত্র উনিশ বৎসর।[৩১]

সংবাদ প্রভাকরে লেখার সূত্র ধরেই দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে অক্ষয়কুমার পরিচয় হলো। দেবেন্দ্রনাথ তখন 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র অন্যতম প্রধান।'[৩২] অক্ষয়কুমারের সঙ্গে এ পরিচয়ের কথা দেবেন্দ্রনাথ তাঁর AvZ¥Rxebxতে স্বীকার করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'এই সময় (১৮৩৯ সালের শেষ ভাগে) অক্ষয়কুমার দত্তের সহিত আমার সংযোগ হয়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ইঁহাকে আনিয়া আমার সহিত পরিচয় করিয়ে দেন। অক্ষয় বাবু তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হন।'[৩৩] অক্ষয়কুমার দত্তের বুদ্ধিমত্তা এবং গঠনমূলক কর্মে তাঁর উদ্যমশীলতার প্রতি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্রদ্ধা ও আস্থা ছিল। ফলে এতদিন ব্রাহ্মসমাজের যে-সমস্ত কাজ করার জন্য তিনি যে স্বপ্ন দেখতেন, তা বাস্তবে রূপ দিতে চাইলেন; অক্ষয়কুমারের সহায়তা নিয়ে। অক্ষয়কুমার দত্তের উপর তাঁর এত ভরসা করার প্রধান কারণ সম্ভবত সেকালে অক্ষয়কুমারের মতো বাস্তবজ্ঞান সম্পন্ন দ্বিতীয় ব্যক্তির সন্ধান না পাওয়া। দেবেন্দ্রনাথ 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা' (১৩ জুন, ১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দে, ১৭৬২ সনের ১ আষাঢ়) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ব্রাহ্মসমাজের সমাজকল্যাণমূলক কাজের সূচনা করেন। কলকাতার শিমলা পল্লির দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি ভাড়া করে তাতে শুরু হয় 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা'র কার্যক্রম। অক্ষয়কুমার দত্ত এ প্রতিষ্ঠানে মাসিক আট টাকা বেতনে শিক্ষক নিযুক্ত হন। পরে দুই ধাপে তাঁর বেতন বেড়ে হয় চৌদ্দ টাকা। 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা'র শিক্ষকতার মধ্য দিয়েই অক্ষয়কুমার দত্তের কর্মজীবনের সূচনা। এর পর তিনি কলকাতা নর্মাল স্কুলে শিক্ষকতা এবং দুটি সাময়িক পত্রিকা সম্পাদনা করেছে। 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা'য় শিক্ষকতা পেশায় থাকাকালেই তিনি টাকী-নিবাসী প্রসন্নকুমার ঘোষের সহায়তায় ১৮৪২ সনের জুন মাসে we‘¨v‘kb পত্রিকা প্রকাশ করেন।

৪.২

বিদ্যাদর্শন পত্রিকা সম্পাদনা

অক্ষয়কুমার কতগুলো মৌল বিষয় সামনে রেখে we‘¨v‘kb পত্রিকা সম্পাদনার কাজে ব্রতী হন। এগুলো হলো– ইংরেজির চাপে মৃতপ্রায় বাংলা ভাষার পুনর্জাগরণ,ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার নতুন অবস্থান তৈরি, বাংলা লিপির উন্নতি সাধন, যথোপযুক্ত যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা সেকালের সমাজে প্রচলিত ক্ষতিকর নানা রীতির অবসান এবং বাংলা ভাষায় নীতি, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে বিদ্যার প্রসার ঘটানো। আর এসব ইচ্ছা পূরণের পথে তিনি আমন্ত্রণ জানান শিক্ষার্থীদের। তাঁর প্রথম জীবনের এসব কাজের পরিকল্পনার কথা তিনি আমাদের Ôwe‘¨v‘kbÕ পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই বলেছেন। Ôwe‘¨v‘kbÕ পত্রিকার সূচনা-প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন :

> যখন যে জাতির মধ্যে সভ্যতা প্রবেশ করে, তখন পূর্ব্বেই এই প্রকার প্রকাশ্য পত্রের সৃষ্টি হইয়া বিদ্যার পথ মুক্ত হইতে থাকে। এই পরমপ্রিয়কর নিয়মের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া আমরাও বঙ্গদেশের মৃতপ্রায় ভাষার পুনরুদ্দীপনে যত্ন করিতে অভিলাষ করিয়াছি, কিন্তু পাঠকগণকে কি প্রকারে তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিব, এই চিন্তা এইক্ষণে কেবল সংশয়ে পরিপূর্ণ রহিল, যেহেতুক আমাদিগের এবম্প্রকার উদ্যোগের ন্যায় এতদ্দেশে পূর্ব্বে এরূপ কোন কল্পনার সৃষ্টি হয় নাই, যে তাহার অনুগামী হইয়া আমরাও আমারদিগের অভিপ্রেত ব্যাপারে তত্তুল্য রচনাদি করিতে উদ্যত হই, সুতরাং এ প্রকার নূতন বর্ত্মে আমরা অতিশয় ভীতচিত্তে অগ্রসর হইলাম, এবং সংশয়াপন্ন হইয়া বিদ্যার্থিগণকে এই পথকে অবলম্বন করিতে নিমন্ত্রণ করিতেছি।....সম্প্রতি এই পত্রের বিশেষ তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিবার জন্য ইহার সংক্ষেপ বিবরণ নিম্নদেশে প্রকাশ করিতেছি। এতৎপত্রে এমত সকল বিষয়ের আলোচনা হইবেক, যৎদ্বারা বঙ্গভাষায় লিপি বিদ্যার বর্ত্তমান রীতি উত্তম হইয়া সহজে ভাব প্রকাশের উপায় হইতে পারে। যত্নপূর্ব্বক নীতি ও ইতিহাস, এবং বিজ্ঞান প্রভৃতি বহুবিদ্যার বৃদ্ধি নিমিত্ত নানা প্রকার গ্রন্থের অনুবাদ করা যাইবেক, এবং দেশীয় কুরীতির প্রতি বহুবিধ যুক্তি ও প্রমাণ দর্শাইয়া তাহার নিবৃত্তির চেষ্টা হইবেক। তদ্ভিন্ন রূপকাদি লিখনে এক-এক প্রকাশ নূতন নিয়ম প্রস্তুত করা যাইবেক। এইক্ষণে কবিতার রীতি আমারদিগের ভাষায় উত্তম নাই, অতএব তাহার প্রতি অধিক যত্ন করা অত্যন্ত প্রয়োজন বোধে সর্ব্বদাই সাধারণ লেখকদিগকে তর্কদ্বারা সাবধান করিব, এবং উত্তম২ কবিতা লিখিয়া যিনি প্রেরণ করিবেন তাহা অবশ্য আমারদিগের বিচারের সহিত প্রকাশ করিতে ত্রুটি করিব না।[৩৪]

অক্ষয়কুমারের উল্লিখিত বক্তব্য থেকে we‘¨v‘kb-এ আলোচনার বিষয় সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়; তা হলো বিজ্ঞান, দর্শন, সমাজ, সাহিত্য প্রভৃতি জাগতিক বিষয়। কিন্তু অক্ষয়কুমারের এসব ইহমুখী চিন্তাভাবনাকে গ্রহণ করার জন্য তখনকার সমাজ এবং সমাজের মানুষ মোটেও প্রস্তুত ছিল না। অন্যদিকে তাঁর এসব উদ্দেশ্যের প্রতিফন ঘটাতে পারে এমন কোনো মাধ্যমও বর্তমান ছিল না। তখন পত্রিকা বলতে যা ছিল তা মানুষের মানস গঠনের বিপরীত, সমাজ ধ্বংসের মহা ঔষধস্বরূপ। মহেন্দ্রনাথ রায় লিখেছেন- ‘যে সময়ে দুর্জ্জনদমন, মহানবমী, রসরাজ ও অন্যান্য অশ্লীলতাপূর্ণ কুরুচিকর অযোগ্য সংবাদপত্র সকল বঙ্গদেশে আগ্রহ ও উৎসাহপূর্ব্বক প্রতিপালিত হইত, সেরূপ সময়ে এরূপ সুরুচিময় পত্রিকার সম্মান হওয়া সম্ভব মনে করিতে পারি না।’[৩৫] ‘এই সময়ে প্রভাকর ও ভাস্কর ব্যতীত ‘রসরাজ’, ‘সুজনরঞ্জন’, ‘কাব্যরত্নাকর’ প্রভৃতি অশ্লীলতাপূর্ণ আরও কয়েকখানা পত্রিকা পরিচালিত হইতেছিল। সেগুলি শিক্ষিত ভদ্রসমাজে সাদরে গৃহীত হইত না।’[৩৬] গৃহীত না হলেও ঐ পত্রিকাগুলো পাঠক রুচি নষ্ট করে, পাঠক সংখ্যা হ্রাস করে সমাজের ব্যাপক ক্ষতি করেছিল। এসব কারণে we‘¨v‘kb তখন প্রত্যাশিত পাঠক থেকে বঞ্চিত হয়েছে। অসুস্থ সমাজে কোনো সুস্থ চিন্তা, কোনো উন্নত বিষয় প্রচার করা সহজ কাজ নয়। নানামুখী বিপরীত স্রোত এসে তাকে থামিয়ে দেয়। we‘¨v‘kbকেও অনুরূপ স্রোতের বিরুদ্ধে গিয়ে থামতে হয়েছিল। পত্রিকাটি বেশি দিন চলেনি। তবে ‘মাত্র ছয়’ মাসের জন্য প্রকাশিত হলেও অক্ষয়কুমার দত্তের প্রত্যক্ষ সংযোগের জন্য সামাজিক বিষয়বস্তুর আলোচনার দিক থেকে পত্রিকাখানির বিশেষ গুরুত্ব আছে।’[৩৭] এ পত্রিকা উচ্চশ্রেণীর সাময়িক পত্রিকার একটি সুন্দর আদর্শ স্থাপন করেছিল।’[৩৮] ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘ইহা (we‘¨v‘kb) একখানি সুপরিচালিত পত্রিকা ছিল।’[৩৯] মহেন্দ্রনাথ রায়’[৪০] ও কেদারনাথ মজুমদার’[৪১] মনে করেন, পরবর্তীকালে এই আদর্শ গ্রহণ করেছে e½‘kb, Avh¨‘kb, wn›‘‘kb প্রভৃতি পত্রিকা যেমন চিন্তা ও রুচিতে, তেমনি নামকরণেও।

we‘¨v‘kb-প্রকাশিত ছয়টি সংখ্যায় যথাক্রমে-প্রাণীবর্গের বৃত্তান্ত, হিন্দুস্ত্রীদিগের বিদ্যাশিক্ষা, হিমালয় পর্বত, সমুদ্র সম্বন্ধে, বহুবিবাহ, অধিবেদন বা কুলীন প্রথা, এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের ব্যভিচারের কারণ, কৃষিকাজ, হিন্দুস্ত্রীদিগের দুঃখমোচনীয় সম্বাদ, বিদ্যাবুদ্ধির সৎপরামর্শ, বঙ্গদেশের বিদ্যাবৃদ্ধি বিষয়ক প্রস্তাব, স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাভ্যাস, নবীন ও প্রবীণ প্রভৃতি লেখা প্রকাশিত হয়েছে। অক্ষয়কুমার নিজের লেখা এসব প্রবন্ধে শিক্ষা, সমাজ, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর মৌলিক চিন্তার প্রতিফলন লক্ষ করা যায় । we‘¨v‘kb-এ তিনি ‘মাতৃভাষার অনাদর, নারীর প্রতি অমানবিকতা, উচ্চবিত্তের উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন প্রভৃতিকে সেকালের সমাজ ব্যবস্থার ত্রুটি হিসেবে তুলে ধরেছিলেন। অক্ষয়কুমার দত্ত সেকালে সমাজে নারীর প্রতি অমানবিক আচরণ মেনে নেননি। তিনি তাঁর বিচার-বুদ্ধি নিয়ে we‘¨v‘kb-এ প্রবন্ধ লিখে সে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। সমাজে প্রচলিত বহুবিবাহের জনমত গঠনে তিনি কলম ধরেছেন। কৌলিন্যপ্রথা ও বহুবিবাহের পক্ষে সনাতনপন্থীদের যুক্তির অসারতা প্রমাণে ‘বহুবিবাহ’ শীর্ষক প্রবন্ধ লিখেছেন।’[৪২] ‘রাজনিয়ম’-করে বহুবিবাহের মতো জঘন্য প্রথা উচ্ছেদের পক্ষে তিনিই প্রথম যুক্তি দেখান।

অক্ষয়কুমার we‘¨v‘kb পত্রিকার অগ্রহায়ণ ১৭৬৪ সনে প্রকাশিত সংখ্যায় ‘বড়মানুষ’ শিরোনামের একটি রোজনামচা লিখে কলকাতার উচ্চসমাজের জীবনধারা তুলে ধরেন।’[৪৩] এই বড়মানুষটিকে সমাজে বিশেষ ‘পরিহাসের পাত্র’ করে তুলার মানসে তাঁর এ লেখায় সে-কালের উচ্চবিত্তের জীবনের ভোগ-বিলাস ও আলস্যকে নির্দেশ করেছে। বাঙালি কল্যাণ চিন্তক রামমোহন রায়ের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল। বাঙালি সমাজ যখন রামমোহন রায়ের অবদানকে ভুলতে বসেছে, তখন রামমোহনের জীবনী প্রকাশ করে তিনি সেই ঋণ কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেছেন। we‘¨v‘kb পত্রিকা প্রকাশ করে অক্ষয়কুমারই প্রথম এদেশে বাংলা ভাষায় রামমোহন-চর্চার সূত্রপাত করে তাঁকে সম্মানিত করলেন। we‘¨v‘kb-Gi প্রকাশনা বন্ধ হলেও কর্মবীর অক্ষয়কুমার দত্ত অবসর পেলেন না।

৪.৩

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদনা

we‘¨v‘kb পত্রিকার প্রকাশ যখন বন্ধ হয়ে গেলে, এর মতো একটা উচ্চ মানসম্পন্ন পত্রিকা প্রকাশ করবার সংকল্প করেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।[৪৪] তাঁর সঙ্কল্প বাস্তব রূপ লাভ করে ১৮৪৩ সনের ১৬ আগস্ট। মাসিক তিরিশ টাকা বেতনে অক্ষয়কুমার দত্ত ZË‡ewabx cwÎKvi সম্পাদক পদে নিযুক্ত হন। ‘ZË‡ewabx cwÎKv’

সম্পাদনায় এলেন সমাজের বৃহত্তর কল্যাণ সাধনের ব্রত নিয়ে। বাড়তি আয় বা অর্থ-কড়ির বিষয় মুখ্য ছিল না ব্রাহ্মসমাজের কঠোর রক্ষণশীল দলভুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ প্রসঙ্গে বলেছেন :

> অক্ষয়কুমার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাকে এত স্নেহ চক্ষে দেখতেন যে পরে তিনি পত্রিকার কারণে দেড়শত টাকা বেতনের পদও গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন ....তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদনা দ্বারা অক্ষয়বাবুর আয় কিছুই অধিক হত না। কিন্তু তিনি তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে কার্যান্তর পরিহারপূর্বক নিয়তই এর উন্নতিবর্ধনার্থ চেষ্টা করতেন। ঐ চেষ্টা সফল করণাশয়ে স্বয়ং নানাবিধ ইংরেজি গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন, ফরাসি ভাষা শিক্ষা করেন এবং মেডিক্যাল কলেজে গমন করে দুই বৎসর কাল রসায়ন ও উদ্ভিদশাস্ত্রে উপদেশ গ্রহণ করেন।[৪৫]

ZË‡ewabx cwÎKv তখনকার বাঙালি হৃদয়ে অভাবনীয় পরিবর্তনের যে ঝড় তুলেছি,তার মূলে অক্ষয়কুমারের সম্পাদনার বিশেষ গুণ। এমন কি নব্যবঙ্গের সদস্যদের কেউ কেউ তা সাদরে গ্রহণ করেছিলেন।'[৪৬] এ প্রসঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রীর মন্তব্যটি স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি লিখেছেন :

> তত্ত্ববোধিনী বঙ্গদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ পত্রিকা হইয়া দাঁড়াইল। তৎপূর্বে বঙ্গসাহিত্যের বিশেষতঃ দেশীয় সংবাদপত্র সকলের অবস্থা কি ছিল অক্ষয়কুমার দত্ত সেই সাহিত্য-জগতে কি পরিবর্তন ঘটাইয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিলে, তাঁহাকে দেশের মহোপকারী বন্ধু না বলিয়া থাকা যায় না।[৪৭]....'রসরাজ', 'যেমন কর্ম তেমনি ফল' প্রভৃতি অশ্লীলভাষী কাগজগুলি ছাড়িয়া দিলেও 'প্রভাকর' ও 'ভাস্করের' ন্যায় ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজের জন্য লিখিত পত্র সকলেও এমন সকল ব্রীড়াজনক বিষয় বাহির হইত, যাহা ভদ্রলোকের নিকট পাঠ করিতে পারিত না। এই কারণে রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি ডিরোজিওর শিষ্যগণ ঘৃণাতে দেশীয় সংবাদপত্র স্পর্শও করিতেন না। কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদিত তত্ত্ববোধিনী যখন দেখা দিল, তখন তাঁহারা পুলকিত হইয়া উঠিলেন। রামগোপাল ঘোষ একদিন লাহিড়ী মহাশয়কে বলিলেন-'রামতনু! বাঙ্গালা ভাষার গম্ভীর ভাবের রচনা দেখেছ? এই দেখ', বলিয়া তত্ত্ববোধিনী পাঠ করিতে দিলেন।[৪৮]

ZË‡ewabx cwÎKv প্রকাশের মাস চারেক পরে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা [বাংলা ১২৫০ সনের ৭ পৌষ ২১ ডিসেম্বর ১৮৪৩] নিলেন। তখন থেকেই ZË‡ewabx cwÎKv দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র হয়ে উঠল। ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে ZË‡ewabx cwÎKv ভূমিকা প্রসঙ্গে বিনয় ঘোষ লিখেছেন :

> ব্রাহ্মধর্মের ও ব্রাহ্মসমাজের এই নবরূপান্তরিত পর্বের একমাত্র ও অন্যতম ধারক-বাহক হয় 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'। পত্রিকার জন্ম ও দেবেন্দ্রনাথের দীক্ষা গ্রহণের মধ্যে সময়ের ব্যবধানও মাত্র চার মাস কয়েকদিনের। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের প্রতিজ্ঞাপত্র ও ব্রহ্মোপাসনা প্রণালী প্রবর্তনের ফলে ব্রাহ্মসমাজ ঠিক পুনর্জীবন নয়, এক 'নবজীবন' লাভ করে। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র জন্ম থেকেই এই নবজীবনের সূচনা হয়। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র পৃষ্ঠায় এই রূপান্তরের প্রতিটি পর্বের পদাঙ্ক অঙ্কিত আছে। এরপর ব্রাহ্মসমাজের জীবনে এক বিপুল উৎসাহের সঞ্চার হয়। ১৮৪১ থেকে ১৮৪৯ সালের মধ্যে এবং তার পরে ১৮৫০ থেকেক ১৮৫৯ সালের মধ্যে কলকাতার ব্রাহ্মসমাজের আদর্শে বাংলাদেশে সর্ব্বত্র ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হতে থাকে। আদর্শের প্রচারে ব্যবস্থা না থাকলে নিশ্চয় তার এরকম প্রসার কখনই সম্ভব হত না। এই প্রচারের ব্রত প্রধানত গ্রহণ করেছিল 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'। এই পত্রিকা না থাকলে শুধু ব্রাহ্মধর্মের প্রচারকদের দ্বারা এ কাজ তখন সম্ভব হত কি না সন্দেহ।[৪৯]

ZË‡ewabx cwÎKvর প্রকৃত মর্যাদা ধর্মপ্রচারণার জন্য নয়, সে মর্যাদা অক্ষয়কুমারের জন্য। দেবেন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য সাধনের পাশাপাশি সম্পাদক অক্ষয়কুমার তাঁর নিজের চিন্তার জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্রও এখানে প্রস্তুত করছিলেন। তাঁর এই প্রস্তুতি এবং সেই লক্ষ্যে কাজে অগ্রসর হওয়ার বিষয়টিই এ পত্রিকার জনপ্রিয়তার নেপথ্যে কাজ করেছিল। সেই বিবরণ দিতে গিয়ে মহেন্দ্রনাথ রায় লিখেছেন:

> রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করিয়া ধর্ম্ম-সংস্কারের পথ প্রদর্শন করিয়া যান, কিন্তু ঐ সমাজকে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের গ্রহণীয় ও অবলম্বনীয় করিবার জন্য একটি অক্ষয়কুমারের উদ্ভব হওয়ার আবশ্যক ছিল। ইনি এদেশে জন্মগ্রহণ ও এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করিলে ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অগ্রাহ্য ও অকিঞ্চিৎকর পদার্থ হইয়া থাকিত। যদি বেদ, বেদান্ত ও পুষ্প, চন্দন, নৈবেদ্যাদি ব্রাহ্মসমাজ অধিকার করিয়া থাকিত, তাহা হইলে অধুনাতন সুশিক্ষিত ব্যক্তিরা ঐ উভয়ের প্রতি একবার বাম নেত্রেও কটাক্ষপাত করিতেন না।[৫০]

অক্ষয়কুমার মেধার জোরে যে মনিবের সঙ্গে বেতনভোগী কর্মচারীর ভাবটা বন্ধুত্বের পর্যায়ে উন্নীত করেছিলেন শুধু তা-ই নয়, পত্রিকায় দেবেন্দ্রনাথের রক্ষণশীল মনোভাবকে প্রাধান্য দিয়ে নিজের স্বাতন্ত্র্যও রক্ষা করেছিলেন। সেই স্বাতন্ত্র্যই ছিল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সবার দৃষ্টি আকর্ষণের সবচেয়ে বড় দিক।

Dhaka University Institutional Repository

সমকালের সামাজ-রাষ্ট্রের নানা সমস্যা সংকট এবং পাশ্চাত্যের আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি গভীর মনোযোগ ছিল অক্ষয়কুমারের। সেকালে 'অক্ষয়বাবুর মতো সম্পাদক না পেলে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা শিক্ষিতসমাজে নিজ শক্তি প্রতিষ্ঠিত করতে পারত কি না সন্দেহ।'[৫১] দেবেন্দ্রনাথ যখন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ধর্মকেন্দ্রিক আলোচনাকে প্রধান করে তুলতে চেয়েছেন, অক্ষয়কুমার তখন নীরব থেকেছেন। কারণ দেবেন্দ্রনাথের রক্ষণশীল মনোভাবের দৌড় তাঁর জানা ছিল।

অক্ষয়কুমার মুগ্ধ হতেন দেবেন্দ্রনাথের গভীর দেশপ্রেম দেখে। কিন্তু একটা ভ্রান্ত ধারণার মধ্য দিয়ে তার প্রতিফলন ঘটুক সেটা তিনি চাইতেন না। এ ক্ষেত্রে দেবেন্দ্রনাথের ওপর অক্ষয়কুমার আস্থা হারাননি। তিনি বিশ্বাস করতেন একদিন তাঁর ভুল ভাঙবেই, সেদিন দেশ একজন বড় মানুষকে আপন করে পাবে। মানুষের প্রতি এই শ্রদ্ধাবোধ তাঁকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত জ্ঞান-চর্চায় অক্লান্ত রেখেছে। যার ফলে তিনি সমকালীন মনের উপযোগী চিন্তা সাফল্যের সঙ্গেই প্রচার করতে পেরেছিলেন। ZË‡ewabx cwÎKv'য় প্রকাশিত তাঁর চিন্তামূলক রচনা পাঠের জন্য সেকালের পাঠক-সম্প্রদায় অধীর হয়ে থাকতেন। এ পত্রিকার মাধ্যমে বাঙালি তাঁর আধুনিক চিন্তাধারায় সঙ্গে পরিচয় লাভ করে আপন তেজে জেগে উঠেছিল। অক্ষয়কুমার এ কাজ কীভাবে করলেন, সেই বিষয়ে অন্যান্য পত্রিকার সঙ্গে তার তুলনা করে রমেশচন্দ্র দত্ত লিখেছেন :

> Scientific articles, moral instructions, accounts of different nations and tribes, stories of the animate and inanimate creation, all that could enlighten the expanding intellect of Bengal and dispel darkness and prejudices, found a convenient vehicle in the Tatwabodhini Patrika. The great Prabhakar, conducted with all the ability and wit of the veteran Iswar Chandra Gupta, continued to be a favourite with orthodox Hindus of the old school. But the Patrika was conducted in a newer style, and struck a deeper cord in the heart of the young Hindu. It created a thirst for knowledge and for moral elevation, it awakened in rising generations a moral enthusiasm and a religious fervour, and it spread that spirit of reform and of progress of which Raja Ram Mohan Rai was the first great apostle in this century. The profound thought and the earnest tone of Akhay Kumar's writings struck even those who were intensely partial to English education in those days. It is said that the talented Ram Gopal Ghosh, one of the most brilliant students of the Hindu College, read one of Akhay Kumar's articles, and turning to his friend, the distinguished Ram Tanu Lahiri, remarked;—`Have you ever seen profound and thoughtful composition in the Bengali language? It is here.'[৫২]

ZËe‡ewabx cwÎKv'র মাধ্যমেই অক্ষয়কুমার দত্তের শিক্ষাচিন্তা ও সমাজচিন্তার বিকাশ ঘটেছে। তিনি এতে একদিকে যেমন বিশুদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করেছেন অন্যদিকে তেমনি সমাজের ভিতরকার নানা সমস্যা, জটিলতা, অভাব-অভিযোগ নিরসনে নিষ্ঠাবান সমাজকর্মীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজন, শারীরিক শক্তির অনুশীলন, বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহের দোষ, জমিদার ও নীলকরদের সীমাহীন অত্যাচার, সুরাপান নিবারণ এবং মিশনারিদের ধর্মসম্পর্কিত অনাচার এইসব সমকালীন বিষয়ে তিনি অবিশ্রান্তভাবে লিখে ZË‡ewabx পত্রিকায় প্রকাশ করেছেন। তিনি এ পত্রিকা নিয়মিত বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-বিষয়ক ছোট ছোট প্রবন্ধ লিখে সেকালে বিস্ময় সৃষ্টি করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন :

> তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা আর একটি বিষয়ের সূত্রপাত করে বঙ্গের তদানীন্তন শিক্ষিতসমাজকে চমকিত করে তুলেছিল। বঙ্গভাষায় বিজ্ঞানের বিষয় নিয়মিতরূপে আলোচনা করতে প্রবৃত্ত হওয়া সেকালের কাছে খুবই নূতন বোধ হয়েছিল। ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত সৃষ্ট বস্তুর বর্ণনা ও অনন্ত বিশ্বের আশ্চর্য কৌশল প্রকাশ করবার অঙ্গীকারসূত্রে বিজ্ঞানবিষয়ক নানা প্রবন্ধ সচিত্র হয়ে পত্রিকার অঙ্গ ভূষিত করতে লাগল। আমরা জানি যে সেকালের বঙ্গের শিক্ষিতমণ্ডলির অনেকে এই সকল বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের জন্য তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রকাশ প্রতীক্ষা করে থাকতেন। তাঁরা প্রথম প্রথম বিশ্বাসই করতে পারেন নি যে বঙ্গভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ সুচারুরূপে লেখা যেতে পারে।[৫৩]

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য বলেছেন– 'বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর চৌদ্দ বছর বয়সে হুগলী কলেজের বিদ্যালয় শাখায় পড়বার সময় অক্ষয় দত্ত সম্পাদিত এক বছরের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাকে ১৮৫৩-র জুনিয়র বৃত্তি-পরীক্ষার পাঠ্যতালিকার মধ্যে পেয়েছিলেন। সে বছর পরীক্ষা পাঁচ মাস পিছিয়ে যাওয়ায় অতিরিক্ত (Supplementary) পাঠ্যরূপে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ১৭৭৪ শকের বৈশাখ থেকে চৈত্র (১৮৫২-৫৩ খ্রি) সংখ্যা নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। এই সময় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা জ্ঞানবিজ্ঞানের বহু বিষয়ক রচনার মুখ্য লেখকের

ভূমিকায় ছিলেন স্বয়ং সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত।'[৫৪] ZË‡ewabx cwÎKv‡র মাধ্যমে অক্ষয়কুমার দত্তের ভূমিকা সম্পর্কে অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য আরও লিখেছেন :

> সাময়িকপত্রের মাধ্যমে আধুনিক যুগে বাংলা ভাষায় জ্ঞানের আলো জ্বেলেছিলেন সর্বপ্রথম অক্ষয়কুমার দত্ত—সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তাঁর সম্পাদনাপর্বে (১৮৪৩-১৮৫৫) তিনিই ছিলেন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মুখ্য লেখক, সর্বাধিক আকর্ষক গদ্যশিল্পী। তাঁর যুক্তিবাদী বিজ্ঞানমনস্ক মন সাধারণ বাঙালীকে বুদ্ধির জগতে পৌঁছতে ক্রমে ক্রমে সহায়তা করেছে। তাঁর প্রদর্শিত সাময়িকপত্রের পথটিকে ক্রমে প্রশস্ততর রাজপথে পরিণত করেছেন বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ ও পরে-পরে আরো অনেক কৃতী সম্পাদক। বঙ্কিম-সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে যেমন ছিলেন প্রধান লেখক, রবীন্দ্রনাথের সাধনা পত্রিকায় যেমন রবীন্দ্রনাথ, তেমনি অক্ষয় দত্ত সম্পাদিত তত্ত্ববোধিনীতে অক্ষয় দত্তকেই দেখি সর্বাধিক ব্যস্ত লেখকের ভূমিকায়।[৫৫]

অক্ষয়কুমার দত্ত ZË‡ewabx cwÎKv‡য় 'ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়','বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' প্রভৃতি গ্রন্থ এবং প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্যবিস্তার, ভারতবর্ষ মধ্যে হিন্দু সন্তানদিগের বসতিবিস্তার, ধর্মনীতি, পদার্থবিদ্যা, পাণ্ডুপুত্র ও ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদিগের অস্ত্রপরীক্ষা, মনুষ্যজাতির মহË কিসে হয়' প্রভৃতি প্রবন্ধ লিখেছেন। এ পত্রিকায় তিনি ভারতবর্ষে ব্রিটিশ-শাসন সম্পর্কেও ধারাবাহিক রচনা প্রকাশ করেছেন। বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক মনোমোহন ঘোষ বলেছেন–'বাঙালী জাতির মন, তথা সাহিত্য গঠন ব্যাপারে এই পত্রিকা যে বিপুল সাহায্য করিয়াছে তাহার তুলনা নাই।'[৫৬] ZË‡ewabx cwÎKv‡য় প্রকাশিত বাংলা ভাষা বিষয়ক তাঁর প্রবন্ধাবলি বাঙালি জাতির জন্য এক অসাধারণ দিক নির্দেশনা হয়ে আছে।

৪.৪

তËবোধিনী পাঠশালায় শিক্ষকতা

১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে 'তËবোধিনী পাঠশালা' প্রতিষ্ঠিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ বাংলা ভাষায় বাঙালি ছেলেদের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জ্ঞানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে এটি স্থাপন করেন। তËবোধিনী পাঠশালার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে :

> ১৮৩৫ সনে বড় লাট লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক এই বিধান দিয়া যান যে সরকার পরিচালিত সাধারণ বিদ্যালয়সমূহে ইংরেজীর মাধ্যমেই এদেশবাসীকে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইবে। আবার সরকারের দায়িত্বপূর্ণ পদসমূহে ইংরেজী শিক্ষিত ভারতবাসীদের নিয়োগেরও তিনি ব্যবস্থা করিয়া যান। এসব কারণে ইংরেজী শিক্ষার দিকেই অতঃপর সাধারণের বেশী ঝোঁক পড়িল। সরকারী বিদ্যালয়ে পূর্ণোদ্যমে ইংরেজীর চর্চ্চা আরম্ভ হইল। এদেশের ধনী ও কৃতবিদ্য ব্যক্তিরাও কলিকাতায় এবং মফঃস্বলে ইংরেজী স্কুল স্থাপন করিতে লাগিলেন। ইহার ফলে বাংলা পাঠশালা এবং বাংলা শিক্ষা দুইয়েরই অত্যন্ত দুরবস্থা হইল। শিক্ষার এই ত্রুটি কথঞ্চিৎ দূর করিবার জন্য প্রসন্নকুমার ঠাকুরের আগ্রহাতিশয়ে হিন্দুকলেজ কর্তৃপক্ষ একটি আদর্শ বাংলা পাঠশালা ১৮৪০, ১৮ই জানুয়ারী স্থাপন করিলেন।.....বাংলার মাধ্যমে ইউরোপীয় ও ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়াই ছিল এই পাঠশালার মূল লক্ষ্য। দেবেন্দ্রনাথও এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইলেন।[৫৭]

অক্ষয়কুমার দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এ উদ্যোগের সঙ্গে নিজের প্রত্যাশার মিল খুঁজে পেয়েছিলেন। তিনিও চেয়েছিলেন এদেশে বাংলা ভাষায় পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা হোক। এ দিক থেকে তাঁর চিন্তা দেবেন্দ্রনাথের তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপনের চিন্তার অনুকূল ছিল। এ কারণে শুরু থেকেই অক্ষয়কুমার তËবোধিনী পাঠশালার শিক্ষক হিসেবে আত্মনিয়োগ করেন। এ পাঠশালার পাঠ্যপুস্তক হিসেবে বাংলা ভাষায় লেখা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়ানো হতো। অক্ষয়কুমার দত্ত ভূগোল, অঙ্ক, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে বাংলা ভাষায় পুস্তক লিখে তা পাঠ্যপুস্তক হিসেবে ব্যবহার করতেন। আর সেগুলো তত্ত্ববোধিনী সভা থেকে গ্রন্থরূপে প্রকাশ করা হতো। অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনীকার নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস লিখেছেন:

> অক্ষয় বাবু বর্ণমালা ভূগোল ও পদার্থবিদ্যা এই দুই বিষয়ে অধ্যাপনা করিতেন। সভা পাঠশালার নিমিত্ত পদার্থবিদ্যা ও ভূগোল প্রকাশ করেন। ইনি ইতঃপূর্ব্বে একখানি ভূগোল প্রস্তুত করেন; কিন্তু অর্থাভাবে বহুদিন যে মুদ্রিত করিতে অসমর্থ থাকেন, পরে সভার সাহায্যে পাঠশালার নিমিত্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়, তাহা তিনি স্পষ্টাক্ষরে উক্ত পুস্তকে স্বীকার করিয়াছেন। এই ভূগোলখানি এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য।[৫৮]

তত্ত্ববোধিনী পাঠশালায় বাংলা ভাষায় পদার্থবিদ্যা ও ভূগোল শেখানোর ব্যাপারে এ পাঠশালা কর্তৃপক্ষ দুটি যুক্তি দেখিয়েছিলেন। এতে শিক্ষক অক্ষয়কুমার দত্তের পুর্ণ সমর্থন ছিল। এ দুটি যুক্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে :

> এই পাঠশালাতে পদার্থবিদ্যা এবং ভূগোলের উপদেশ বঙ্গভাষাতে প্রদান করিবার তাৎপর্য্য এই যে বঙ্গভাষা স্বদেশীয় ভাষা, অতএব তাহাতে উক্ত শাস্ত্র সকল প্রচলিত হইলে ক্রমশঃ তাহার জ্ঞান সাধারণ লোকের মধ্যে বিস্তারিত হইতে পারিবেক, দ্বিতীয়তঃ ছাত্রেরা অতি অল্প বয়স্ক, অদ্যাপি ইংলণ্ডীয় ভাষাতে এরূপ সুশিক্ষিত হয় নাই যাহাতে উক্ত শাস্ত্র সকল উক্ত ভাষাতে অধ্যয়ন করিতে সমর্থ হয়। যখন তাঁহারা সুশিক্ষিত হইবে তখন বঙ্গভাষাতে উক্ত শাস্ত্র সকলের প্রধান প্রধান গ্রন্থ অপ্রাপ্ত হইলে ইংলণ্ডীয় ভাষাতে অধ্যাপন করা যাইতে পারিবেক।[৫৯]

এই নিয়মেই তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা চলতে থাকল। মিশনারিদের অবৈতনিক ইংরেজি বিদ্যালয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এ পাঠশালা বেশি দূর অগ্রসর হতে পারল না। সেসবের পেছনে পড়ে গেল। এ পেছনে পড়ে যাওয়ার দুটি প্রধান কারণের একটি বলা হয়েছে, অন্যটি ইংরেজি শিক্ষায় নগদমূল্য চাকরি পাওয়ার লোভ। ফলে প্রথম দিকে ভালোভাবে চললেও পরে পাঠশালার ছাত্রসংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পেয়ে তা ভাঙনের মুখে পড়ল। পাঠশালার এ দশার আরও কিছু কারণ অক্ষয়কুমার দত্তের দৃষ্টিতে এসেছিল। তিনি লিখেছেন :

> সভ্যদিগের অভিপ্রায় মতে প্রথমে কেবল বাঙ্গালা এবং সংস্কৃত ভাষাতেই ছাত্রদিগকে উপদেশ প্রদান করা যাইত, এবং তাহারদিগের উপস্থিতির সময় প্রাতঃকালে ছয় ঘন্টা অবধি নয় ঘন্টা পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট থাকাতে তাহারা নয় ঘন্টার পরে অন্য অন্য বিদ্যালয়ে ইংলণ্ডীয় ভাষা শিক্ষা করিতে পারিত। কিন্তু বালকেরা দ্বিগুণ পরিশ্রম সহ্য করিতে অক্ষম প্রযুক্ত ইংলণ্ডীয় ভাষা শিক্ষার অনুরোধে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল, সুতরাং ছাত্রের সংখ্যা ক্রমে শূন্য হইয়া পাঠশালা ভগ্নপ্রায় হইল।[৬০]

কিন্তু ভাঙল না, স্থানান্তরিত হলো; কলকাতা থেকে হুগলির বাঁশবেড়িয়া গ্রামে। তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা কলকাতা থেকে হুগলির পল্লিতে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্য সম্পর্কে অক্ষয়কুমার বলেছেন :

> ইহাতে বিবেচনা হইল যে নগর মধ্যস্থ অনেক বিদ্যালয়ে যে প্রকার বিস্তীর্ণরূপে শিক্ষা প্রদান হয় তাহা এ সভার অল্প আয় দ্বারা কদাপি সম্ভব নহে। ইহাও বিবেচনা হইল যে পল্লীগ্রামে বিদ্যাশিক্ষা এবং ধর্ম্মশিক্ষা উভয়ই অতি মলিন অবস্থায় আছে। অতএব পল্লীগ্রামে বিশেষতঃ যে সকল স্থান পূর্ব্বে বিদ্যার প্রধান আসন ছিল তাহাতেই সভার উপকার বিস্তার করা কর্ত্তব্য বোধ হইল। তদনুসারে কলিকাতার পাঠশালা রহিত হইয়া ১৭৬৫ শকের ১৮ই বৈশাখ বংশবাটীতে এক উক্ত প্রকার বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।[৬১]

অক্ষয়কুমারকে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার কর্তৃপক্ষ অনুরোধ করলেন প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ বাঁশবেড়িয়া গ্রামে যেতে। অক্ষয়কুমার কলকাতা ছাড়তে রাজি হলেন না, বিনয়ের সঙ্গে দ্বিগুণ বেতন এবং প্রধান শিক্ষকের প্রস্তাব পাঠশালা কর্তৃপক্ষকে ফিরিয়ে দিলেন। কিন্তু তাঁদের উদ্যোগ থেকে তিনি মুখ ফিরালেন না। অক্ষয়কুমার তিন বছর (১৮৪০-১৮৪৩) পর তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার শিক্ষকতা ছাড়লেন, দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গ ত্যাগ করলেন না। আমরা জানি যে, তাঁরা দু'জন পরস্পর বিপরীত ধারার স্বতন্ত্র মানুষ ছিলেন; কিন্তু স্বদেশপ্রেমের দিক থেকে তাঁদের চিন্তার বিরোধ ছিল না। এ প্রসঙ্গে একজন সমালোচক লিখেছেন :

> অক্ষয়কুমার ভেবেছেন মাতৃভাষায় ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়া দরকার। সেটা মনে রেখেই তিনি ছাত্রদের শিক্ষা-উপযোগী পুস্তক রচনা করায় মনোযোগী হয়েছেন। দেশের জ্ঞান, বিদেশের জ্ঞান–যে জ্ঞানই হোক, সেটা মাতৃভাষাতেই দিতে হবে। কিন্তু তা পরিশ্রম সাপেক্ষ। অক্ষয়কুমার সে পরিশ্রম আনন্দের সঙ্গে স্বীকার করেছেন। দেবেন্দ্রনাথের চিন্তায়ও যে এটা কাজ করেনি তা নয়, কিন্তু তিনি একটু ভিন্ন ভাবনাও ভেবেছেন। এবং সেটাই তাঁর ভাবনার কেন্দ্রবিন্দু। অক্ষয়কুমারের কাছে মাতৃভাষার মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা দেওয়াটাই মুখ্য। দেবেন্দ্রনাথ ভেবেছেন, সেটাই যথেষ্ট নয়। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য। তাঁরা দুজনেই মাতৃভাষাকে ভালোবাসেন।[৬২]

তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা কলকাতায় চালাতে না পেরে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঁশবেড়িয়া গ্রামে নিয়ে গিয়েছিলেন একটি প্রধান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে, তা হলো–শিক্ষার্থীদের মধ্যে ধর্মীয় ভাব বিস্তার । দেবেন্দ্রনাথের এরূপ উদ্দেশ্যের প্রধান কারণ ভারতবর্ষে খ্রিষ্টধর্মের হঠাৎ তৎপরতা ঠেকানো। এ উদ্দেশ্যেই তিনি তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। খ্রিষ্টান মিশনারিদের ধর্মগত তৎপরতা অক্ষয়কুমার দত্তের সহ্যের সীমা ছাড়িয়েছিল। মিশনারিদের কর্মকাণ্ডে তিনি বিরক্ত হয়েছিলেন। ব্রিটিশের রাজত্বেরও প্রতি অক্ষয়কুমার ছিলেন ক্ষুব্ধ, পরাধীনতাকে কিছুতেই মানতে পারেননি। সেদিনের বাঁশবেড়িয়া গ্রামে পাঠশালা প্রতিষ্ঠার দিনে [৩০

এপ্রিল ১৮৪৩] আয়োজিত অনুষ্ঠানে দেওয়া বক্তৃতায় অক্ষয়কুমার তাঁর সেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বাংলা ভাষায় :

> আমরা আর কোন বিষয়ে আপনারদিগের প্রতি নির্ভর করিতে পারি না। আমরা পরের শাসনের অধীন রহিতেছি, পরের ভাষায় শিক্ষিত হইতেছি, পরের অত্যাচার সহ্য করিতেছি,এবং খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মের যেরূপ প্রাদুর্ভাব হইতেছে তাহাতে শঙ্কা হয় কি জানি পরের ধর্ম্ম বা এদেশের জাতীয় ধর্ম্ম হয়। অতএব এইক্ষণে আমারদিগের স্ব স্ব সাধ্যানুসারে আপন ভাষায় শিক্ষা প্রদান করা, এবং এদেশীয় যথার্থ ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করা অতি আবশ্যক হইয়াছে। নতুবা আর কিয়ৎকাল গৌণে ইংরাজদিগের সহিত আমারদিগের কোন বিষয়ে জাতীয় প্রভেদ থাকিবেক না—তাঁহারদিগের ভাষাই এদেশের জাতীয় ভাষা হইবেক, এবং তাঁহারদিগের ধর্ম্মই এদেশের জাতীয় ধর্ম্ম হইবেক, সুতরাং ব্যক্ত করিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, যে হিন্দু নাম ঘুচিয়া আমারদিগের পরের নামে বিখ্যাত হইবার সম্ভাবনা দেখিতেছি। এই সকল সাংঘাতিক ঘটনার বিবরণ করিতে এবং বঙ্গভাষায় বিজ্ঞানশাস্ত্র এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশ প্রদান করিতে তত্ত্ববোধিনী সভা অদ্য ১৭৬৫ শকের ১৮ই বৈশাখ রবিবারে এতৎ পাঠশালারূপ নবকুমার প্রসব করিলেন।[৬৩]

শুধু অক্ষয়কুমার নয়, সেই অনুষ্ঠানে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও পাঠশালার আদর্শ ও উদ্দেশ্য বিষয়ে বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করেন। এর আগে কোনো অনুষ্ঠানে কেউ বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করেননি। তাঁদের দুজনের বক্তৃতা পরে ZË‡ewabx cwÎKvয় প্রকাশিত হয়। সম্ভবত, ব্রাহ্মসমাজের এই দুই নেতার মাধ্যমেই প্রথম বাংলা ভাষায় বক্তৃতার রীতি চালু হয়।'[৬৪] অক্ষয়কুমার দত্ত চাইতেন না যে, পরের ভাষায়, পরের নামে বাঙালির একটা পরিচয় তৈরি হোক। পরাধীনতার তীব্র দহনে তাঁরও আশংকা ছিল, পাছে বাঙালির ভাষা, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি জাতীয় সম্পদ সম্পূর্ণভাবে পরের অধীনে চলে না যায়। এ কারণে সেদিন তিনি সেই ক্ষুদ্র বাংলা পাঠশালা প্রতিষ্ঠাকে তাঁর স্বজাতির নব জীবনের সূচনা মনে করেছিলেন। আবেগদীপ্ত তাঁর এই বক্তৃতায় আমরা বাংলা গদ্যে দীপ্ত তেজ ও অসামান্য শক্তির প্রকাশ লক্ষ করি। আমারা জানি যে, প্রসন্নকুমার ঠাকুরের প্রভাবে হিন্দু কলেজের অধীনে আদর্শ বাংলা পাঠশালার স্থাপিত হয়েছিল, কিন্তু তার উন্নতি কিছু আমাদের চোখে পড়ে না। কারণ তাতে সরকারি শিক্ষা কমিটির প্রতিবন্ধকতায় বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেনি।'[৬৫] এদিক থেকে আর্থিক সংকটে পড়ে বন্ধ (১৮৪৮) হয়ে গেলেও বাঙালি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ববোধিনী পাঠশালাই বাংলা পাঠশালার প্রথম আদর্শ। আর অক্ষয়কুমার ছিলেন সেই প্রতিষ্ঠানের প্রথম শিক্ষক ।

৪.৫

কলকাতা নর্মাল স্কুলে শিক্ষকতা

১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ জুন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কলকাতায় নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এ স্কুল প্রতিষ্ঠার সময় তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার আদর্শ বিদ্যাসাগরের সামনে থাকলেও উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠার পেছনে তাঁর লক্ষ্য ছিল দেশে শিক্ষাদানের জন্য উপযুক্ত শিক্ষকের দৈন্য দূর করা তথা শিক্ষক তৈরি করা। এর কারণ তখনকার দিনে নতুন কোনো আদর্শ স্কুলের যোগ্য শিক্ষক পাওয়া যেত না। শিক্ষক হতে যাঁরা প্রার্থী হন, তাঁদের বেশিরভাগই শিক্ষক হওয়ার যোগ্য নন। যাঁদেরকে পাওয়া যায় তাঁদের জ্ঞানও সমাজ-ধর্ম-ভাব-ভাষায় পরিশোধিত নয়। 'এ দৈন্য দূর করা যায় কিভাবে তার ব্যবস্থা জানিয়ে শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর উইলিয়ম গর্ডন ইয়ং-এর কাছে বিদ্যাসাগর একটি আবেদন পত্র লেখেন। আবেদন মঞ্জুর হয়। বিদ্যাসাগর নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। নর্মাল স্কুলে পড়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে অন্যান্য স্কুলে শিক্ষকতা করবার অধিকার জন্মিত।[৬৬] বিদ্যাসাগরের বিশেষ অনুরোধে অক্ষয়কুমার দত্ত শিক্ষক তৈরি করার এ স্কুলে ১৫০ টাকা বেতনে প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হলেন। ৫০ টাকা বেতনে এ স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক নিযুক্ত হন পণ্ডিত মধুসূদন বাচস্পতি। ৭১ জন ছাত্র নিয়ে যাত্রা করে নর্মাল স্কুল। অক্ষয়কুমার দত্ত এ স্কুল বেশি দিন শিক্ষকতা করতে পারেননি। এক বছরের মধেই তিনি মস্তিষ্ক রোগে আরও বেশি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কোনো বিষয় চিন্তা করতে গেলেই মস্তিষ্কের যন্ত্রণা ক্রমশ বাড়তে থাকে। পর পর দু'বার ছুটি নিয়েও তাঁর স্বাস্থের কোনো উন্নতি হল না। তিনি নর্মাল স্কুলের চাকরি ছেড়ে দিলেন। অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনীকার নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস লিখেছেন:

Dhaka University Institutional Repository

> অত্যন্ত দুঃখের বিষয় শিরোরোগে তাঁহাকে দীর্ঘকাল এখানে থাকিতে হইল না। এক বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে অগষ্ট মাসে এরূপ পীড়িত হন যে, প্রথম একবারে এক বৎসরের জন্য, তারপর ছয় মাস করিয়া দুইবার, অবকাশ প্রার্থনা করিতে বাধ্য হন।....১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের অগষ্ট মাসে ইনি কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন।[৬৭]

অক্ষয়কুমার শিরপীড়ায় আক্রন্ত হওয়ার পরও ঘরে বসে লেখালেখির কাজ করতে চেয়েছেন। আর তিনি অসুস্থ হওয়ার আগে যে কাজ করেছিলেন তার আলোই ক্রমশ দিকে দিকে ছড়িয়ে যাচ্ছিল। উনিশ শতকে বাঙালির চিন্তায় যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল, সাহিত্যে তার প্রথম প্রকাশ অক্ষয়কুমার দত্তের হাতে। তার সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য ছিল মানুষের স্বাধীন স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তির প্রতিষ্ঠা করা, যে বুদ্ধির প্রমাণ প্রাকৃতিক নিয়মতত্ত্বে বিশ্বাস অর্জন। আমাদের মনের জগৎ থেকে সবরকম ধোঁয়াটে ভাব ও অলৌকিক ভাবনাকে দূরীভূত করে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকেই প্রামাণ্য হিসাবে গ্রহণ করা। এই প্রবণতা উনিশ শতকের মনীষীদের চিন্তার সাধারণ প্রকৃতি হয়ে উঠেছিল, অক্ষয়কুমার দত্তই তার প্রথম অভিব্যক্তি।

৫

শিক্ষাচিন্তায় আত্মপ্রকাশ: জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা

অক্ষয়কুমার দত্ত পরাধীন ভারতবর্ষে ইংরেজি ভাষার আধিপত্যের সময় বাংলা ভাষায় শিক্ষা বিস্তারের কথা ভেবেছিলেন। তখন সমাজে-রাষ্ট্রে নানা সমস্যা বিরাজমান ছিল। অথচ তা থেকে উত্তরণের কোনো চেষ্টা ছিল না। যাঁরা উদ্যোগী হওয়ার যোগ্য, তাঁদের একদল ধর্মরক্ষা-রীতি রক্ষা নিয়ে ব্যস্ত, অন্যদল চলতি ইংরেজ ও ইংরেজির দাসত্ব লাভে চেষ্টায় মিথ্যা স্বপ্নে দিশেহারা। সেকালের এই অবস্থার মধ্যে তিনি তাঁর চিন্তাভাবনা নিয়ে হাজির হলেন। তাঁর আত্মপ্রকাশের আগেই, উনিশ শতকের বাংলায় চিন্তাভাবনার দিক বিবেচনায় কয়েকটি বিষয় লক্ষ করা যায়। এর মধ্যে এদেশে মিশনারিদের ইংরেজি শিক্ষাবিস্তার, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা গদ্য চর্চা, রামমোহন রায়ের সমন্বয়বাদী চিন্তাধারা বিশেষভাবে চোখে পড়ে। সেকালের এসব ধারা ও কর্মতৎপরতার প্রতি সজাগ থেকেই অক্ষয়কুমার তাঁর শিক্ষাচিন্তা গঠন করেছেন। ধর্মসংস্কার, বিজ্ঞানচর্চায় আগ্রহ, সতীদাহ প্রথা নিবারণ, স্ত্রীশিক্ষা, সংবাদপত্র ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা প্রভৃতি কাজের জন্য তিনি রামমোহন রায়কে শ্রদ্ধা করতেন। কিন্তু ভারতে ইংরেজ এবং ইংরেজির আধিপত্য তিনি মেনে নিতে চাননি। তিনি চাইতেন বাঙালি মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভ করে সেসবের উচিত জবাব দেওয়ার যোগ্যতা অর্জন করুক। শিক্ষাক্ষেত্রে অক্ষয়কুমার দত্তের আগমন প্রসঙ্গে সমালোচক লিখেছেন :

> তিনি যে সময়ের মানুষ, সে সময়টা নানা দিক থেকে সঙ্কটে পরিপূর্ণ। পরাধীনতা যে কত দুঃসহ যাতনার বিষয়, সেটা তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর মনে পরাধীনতার বিষ-জ্বালা তো ছিলই—আরও ছিল জাতীয় সমস্যা। সমাজে-ধর্মে-রাজনীতিতে এক কথায় জাতীয় সংস্কৃতির অবর্ণনীয় দৈন্য। যে ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করা দরকার—যে ভাষায় শিক্ষা-দীক্ষা সবই হওয়া প্রয়োজন, সে ভাষায় তখন শিক্ষিত লোকেরা কথা বলেন না। শাসক-গোষ্ঠীর ভাষাই তখন চলতি। সকলেই তাতে মেতে ছিলেন। নিজের রক্ত-চেনা ভাষায় কেউ কথা বলেন না—বইপত্র লেখা হয় না; এ ভাষায় যে শিক্ষিত লোকের পড়বার উপযোগী কিছু লেখা চলে, এটা কেউ তখন বিশ্বাস করত না।....'ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠী'—যাঁদের মাতৃভাষা বাংলা হওয়া সত্ত্বেও সে-ভাষা তাঁরা তো বাইরে বলতেনই না, এমনকি ঘরেও না। এমন যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, তিনিও বিশ্বাস করতেন, বাংলায় কিছু হবার নয়, ... এমন সঙ্কটের দিনে অক্ষয়কুমার দত্তের চিন্তাভাবনা গঠিত ও বিকশিত হয়েছে।[৬৮]

উনিশ শতকের বাংলায় অক্ষয়কুমার দত্তের সমতুল্য আধুনিক জ্ঞানসম্পন্ন লোক দ্বিতীয় কেউ ছিলেন না। শিক্ষা জীবনে তিনি গৌরমোহন আঢ্যের ওরিয়েন্টাল সেমিনারি স্কুলের ডাবল প্রমোশন পাওয়া প্রতিভাবান ছাত্র । আমরা জানি, পিতার মৃত্যুতে আর্থিক ও পারিবারিক সমস্যায় পড়ে তাঁকে সে স্কুল ছাড়তে হয়েছিল। কিন্তু তাঁকে পড়া ছাড়তে হয়নি, তিনি নিজের দায়িত্বে তা চালিয়ে গেছেন। শ্রীনাথ ঘোষ, আনন্দকৃষ্ণ বসু, অমৃতলাল মিত্র প্রমুখ শিক্ষিত সুহৃদের সহায়তায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহুমূল্য অসংখ্য বই তিনি পড়েছেন।[৬৯] ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে পড়তে এসে অক্ষয়কুমার তাঁর পিসতুতো ভাই রামধন বসুর বাসায় থাকতেন। সে

Dhaka University Institutional Repository

বাসায় থাকার সময়েই ঘটনাক্রমে এঁদের সঙ্গে অক্ষয়কুমারেরর পরিচয় হয়। তাঁর আত্মজীবনীতে সে ঘটনাটি আছে।[৭০] অক্ষয়কুমার দত্ত কর্ম জীবনে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে দুটি পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সুনামের সঙ্গে শিক্ষকতা করেছেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তত্ত্ববোধিনী পাঠশালায় ছাত্রদের জন্য ভূগোল, পদার্থবিদ্যা বিষয়ে পাঠ্য পুস্তক রচনা করেছেন। আবার সেগুলো ছাত্রদের কীভাবে পড়াতে হয়, সেই শিক্ষক গড়ার প্রতিষ্ঠান নর্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ছিলেন আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক পরিশীলিত চিন্তার অধিকারী। তাই সেকালের প্রচলিত কোনো একটা ধর্মমতে তাঁর আস্থা ছিল না। ফলে তাঁর মন ছিল সংস্কারমুক্ত। সভ্যতা ও ইতিহাস সম্পর্কে সম্যক ধারণা ছিল বলে প্রাচীন ও আধুনিক সভ্যতার সমন্বয় সাধন করেছেন খুব সহজে। অক্ষয়কুমার দত্তের এসব কাজের সাফল্য দেখে আমরা বুঝতে পারি, তিনি শিক্ষা বিষয়ে কথা বলার মতো জ্ঞান ও যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন।

৬

শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

শিক্ষার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশে শিক্ষার লক্ষ্য বিভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। এর কারণ দেশ-জাতি-সময়ভেদে এবং সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পটপরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমাদের জীবনের লক্ষ্যের পরিবর্তন। প্রাচীন ভারতে শিক্ষার লক্ষ্য ছিল মোক্ষ বা মুক্তি।[৭১] আর 'প্রাচীন গ্রিসদের কাছে শিক্ষার লক্ষ্য ছিল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে পূর্ণভাবে বিকশিত করা। সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিস্টটল প্রমুখের প্রভাবে এথেন্সে শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে দাঁড়াবে: ব্যক্তিরুচি, প্রকৃতি ও সামর্থ্য অনুযায়ী তার অভ্যন্তর সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশ ঘটানো। একই সময়ে স্পার্টায় ছিল সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী শিক্ষাব্যবস্থা। সেখানে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পরিবর্তে শিক্ষার লক্ষ্য ছিল সুসংবদ্ধ ও উন্নত রাষ্ট্রীয় জীবন গঠন। এথেন্সে সুসংহত সমাজজীবনের প্রয়োজনীয়তাকে অবহেলা করা হয়েছিল, ফলে অধিকতর সমাজবদ্ধ প্রতিবেশী রাষ্ট্র স্পার্টার আক্রমণে এথেন্সের পতন ঘটে। গ্রিক ও রোমান সভ্যতার পতনের পর ইউরোপে শিক্ষাক্ষেত্রে অন্ধকার নেমে আসে। এ সময়ে ইউরোপের শিক্ষাব্যবস্থা খ্রিষ্টধর্মের অনুশাসনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো। রেনেসাঁর প্রভাবে এই শিক্ষাব্যবস্থার প্রতিক্রিয়া হিসেবে দেখা দেয় দুটি আন্দোলন- মানবতাবাদ ও প্রকৃতিবাদ। মতবাদ দুটির মধ্যে কোন মৌলিক বৈসাদৃশ্য না থাকলেও তাদের পদ্ধতি ও প্রতিপাদ্য ছিল ভিন্ন। আন্দোলন দু'টির প্রভাবেই কালক্রমে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শিক্ষার লক্ষ্য, প্রকৃতি ও পদ্ধতি পরিবর্তিত হয়। অক্ষয়কুমার দত্ত সেই পরিবর্তন ধারার শিক্ষাচিন্তক। সেকালে অক্ষয়কুমার দত্তের বন্ধুজনেরা তাঁকে অসুস্থ সমাজে সুস্থ মানুষ মনে করতেন। তিনিও চাইতেন শিক্ষার মাধ্যমে সমাজে সুস্থ মানুষ তৈরি করতে। যাঁরা সমাজকে বদলাতে পারে, সুস্থতা দিতে পারে। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই তিনি শিক্ষার লক্ষ্য স্থির করেছেন। তাঁর শিক্ষার মূল লক্ষ্য হচ্ছে বিদ্যাশিক্ষা করা। সে বিদ্যাশিক্ষা সত্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার মতো বিদ্যাশিক্ষা, সত্য সন্ধানে অনুপ্রাণিত করার মতো বিদ্যাশিক্ষা।

অক্ষয়কুমার বিশ্বাস করতেন সত্যের সঙ্গে শিক্ষার্থীর পরিচয় ঘটলে সমাজে ব্যাধি সৃষ্টিকারী মিথ্যাটা থাকবে না। কারণ তিনি লক্ষ করেছেন এক শ্রেণির মানুষের স্বার্থবুদ্ধির সঙ্গে শিক্ষাটা তখনও জড়ানো। তাই স্বার্থবুদ্ধি থেকে মনকে মুক্ত করার বিদ্যাশিক্ষার কথা ভাবলেন তিনি। কারণ শিক্ষার্থীর মনকে উন্মুক্ত না করে, বিশেষ কোনো একটা মত-পথের মধ্যে আটকে রাখা বিদ্যাশিক্ষার কাজ নয়। তিনি সত্যের সঙ্গে সবার পরিচয় করিয়ে দিতে চেয়েছেন। কারণ সত্য জানা থাকলে শিক্ষায় ব্রাহ্মণ-শূদ্রে, উচু-নিচু বৈষম্য তৈরি হবে না। সমাজ জীবনে একসঙ্গে কাজ করা অসম্ভব হবে। তিনি বিশ্বাস করতেন, এ বিদ্যাশিক্ষা হলে গুরু-শিষ্যের ব্যবধান থাকবে না, শিক্ষার্থীর মানসিক উন্নতি নিশ্চিত হবে, শিক্ষা সবার জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে। কিন্তু প্রচলিত শিক্ষার মধ্যে সেসব লক্ষ্য তিনি খুঁজে পাননি। সেগুলোতে তিনি হিতের বিপরীত কর্মতৎপরতাই বেশি দেখেছেন। তিনি নিজেই সেই বিকৃতির সাক্ষ্য দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন:

> আমারদিগের মানসিক তাবৎ বৃত্তির উন্নতি ও সুনিয়ম করা, দুষ্ট রিপুসকল শাসন করিয়া ধর্ম্মের প্রবৃত্তি প্রবল করা, সুসাধু বিশুদ্ধ চরিত্র ভূষণে আপনাকে ভূষিত করা, পিতামাতার প্রতি ভক্তি, স্বদেশের প্রতি প্রীতি, পরোপকারে অনুরাগ সঞ্চার করা, এবং জগদীশ্বরের প্রেমামৃত রসে চিত্ত আর্দ্র রাখা, বিদ্যাভ্যাসের সম্যক প্রয়োজন হইয়াছে। এ সমস্ত প্রয়োজন এ দেশের ইংলণ্ডীয় কি দেশ্য ভাষার কোন বিদ্যালয়েই সিদ্ধ হয় না,

> বিশেষতঃ সর্ব্বাপেক্ষা গুরু মহাশয়ের শিষ্যগণ ইহার বিপরীত ব্যবহার সকলের অনুষ্ঠানেই প্রবৃত্ত হয়। তিনি তাহারদিগের চিত্তভূমিকে সুরম্য সৌরভ পুষ্পে আমোদিত না করিয়া ঘনরোপিত কণ্টকি বন দ্বারা ভয়ঙ্কর করেন। যদ্রূপ সন্তানকে স্নেহের সহিত পালন করা উচিত, তদ্রূপ শিষ্যকে প্রীতির সহিত উপদেশ কর্ত্তব্য, কিন্তু গুরু মহাশয়ের ব্যবহার এ রীতির কি বিপরীত? তিনি নিয়ত ক্রোধেতে পরিপূর্ণ এবং ছাত্রেরা ভয়েতে সর্ব্বদাই শঙ্কিত। তাঁহার শত প্রকার প্রসিদ্ধ নির্দ্দয় দণ্ড ভয়ে তাহারা কম্পিতকলেবর থাকে। তাহারা শিক্ষাগুরুকে যম স্বরূপ দেখে, এবং বিদ্যালয়কে যমালয় জ্ঞান করে; সুতরাং অনেকেরই স্বভাবতঃ তাঁহার প্রতি শত্রুতা ভাব ও দ্বেষানল ক্রমশঃ প্রজ্বলিত হইতে থাকে। তাহারা তাঁহার আসনতলে কণ্টক স্থাপন ও তিমিরাবৃত রজনীতে মৃৎপিণ্ড বা ইষ্টক খণ্ড ক্ষেপণ করিয়া তাঁহাকে উত্ত্যক্ত করিতে ত্রুটি করে না, দেব দেবীর সন্নিধানে একান্ত চিত্তে তাঁহার মৃত্যুও প্রার্থনা করিতে নিরস্ত হয় না। এ স্থলেও তাহারদিগের দুর্ম্মতির নিরাস নাই। পিতা মাতা তাহারদিগকে এমত যন্ত্রণার স্থানে প্রেরণ করেন, ইহা ভাবিয়া কেহ কেহ পিতা মাতারও অমঙ্গল ইচ্ছা করে। এইরূপে তাহারদিগের ক্রোধ, দ্বেষ, গুরু নিন্দা ও অকৃতজ্ঞতাদি মনের কুবৃত্তি সকল প্রবল হয়। যাহারা গুরু মহাশয়ের প্রসন্নতা লাভের নিমিত্তে সচেষ্ট, তাহারা চৌর্য্যবৃত্তি ও মিথ্যাচারণের অভ্যাসে আশু নিপুণ হয়; কারণ যে বালক অপহরণ করিয়াও গুরু মহাশয়কে তাঁহার প্রয়োজনীয় যত বস্তু প্রদান করিতে পারে, ততই তিনি তাহার প্রতি প্রসন্ন হয়েন।[৭২]

অক্ষয়কুমার বাঙালির শিক্ষার যে দায়িত্ব নিজে নিয়েছিলেন তার জন্যই আজীবন কাজ করে গেছেন। তাঁর এ কর্মপথে তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে পেয়েছেন। এর ফলে তিনি নবোদ্যমে সে কাজে আরও সক্রিয় হয়েছেন। অক্ষয়কুমার তাঁর শিক্ষকতার বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে সেকালে এদেশে বাংলা ভাষায় শিক্ষার একটি নতুন আদর্শ গড়ে তুলেছেন। তাঁর শিক্ষার লক্ষ্য কেবল ভাষা শিক্ষা নয়, পরিপূর্ণ বিদ্যাশিক্ষা। ভাষা শিক্ষাকে তিনি শিক্ষার একটা উপায় বা অংশ হিসেবে মানতেন। এ বিষয়ে তিনি লিখেছেন :

> অনেকে ভাষা-শিক্ষাকেই প্রকৃত বিদ্যা-শিক্ষা বোধ করেন, এবং যে ব্যক্তি আপনাকে যত প্রকার ভাষায় ব্যুৎপন্ন বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহার তত পরিমাণে প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন। তাঁহারা কহিয়া থাকেন, অমুক ইংরেজী, পারসী, আরবী, বাঙ্গালা চারি বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন, কিন্তু ভাষা-শিক্ষা যে প্রকৃত বিদ্যা-শিক্ষা নহে, তাঁহারা বিবেচনা করেন না। বস্তুতঃ, ভাষা-শিক্ষা প্রকৃত জ্ঞান-শিক্ষা নহে, জ্ঞান-শিক্ষার উপায় মাত্র। ভাষা জ্ঞানরূপ ভাণ্ডারের দ্বার স্বরূপ; সেই দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া জ্ঞান-ভাণ্ডারে প্রবেশ করিতে হয়। চিরজীবন কেবল দ্বার-দেশে দণ্ডায়মান থাকিলে, কি রূপে জ্ঞানরূপ মহারত্ন লাভের সম্ভাবনা থাকে? জ্ঞান-রত্ন লাভার্থে যত্ন না করিয়া কতকগুলি ভাষা শিক্ষায় কাল ক্ষেপ করিলে, অসিদ্ধকাম ভিক্ষুকের ন্যায় কেবল দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করা হয়। এতদ্দেশীয় পণ্ডিতেরা কথা প্রসঙ্গে ব্যক্তি-বিশেষকে বৈয়াকরণিক বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকেন, কিন্তু যে ব্যক্তি কেবল ব্যাকরণ-শাস্ত্র মাত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, জ্ঞান লাভ বিষয়ে নিতান্ত অশিক্ষিত ব্যক্তির সহিত তাঁহার বিশেষ বিভিন্নতা নাই। কারণ এরূপ বৈয়াকরণিক জ্ঞান-কোষের কেবল দ্বার-দেশ পর্য্যন্ত উপনীত হইয়াছেন, তাহার অভ্যন্তরে পদ বিক্ষেপ করিতে সমর্থ হন নাই।[৭৩]

অক্ষয়কুমার দত্তের শিক্ষাচিন্তার মূল সুর মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধন। তাঁর শিক্ষাচিন্তার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যও তাই। বদরুদ্দীন উমরের মতে–'শিক্ষার সর্বপ্রধান লক্ষ্য যে মানুষের নিজের বিকাশ সাধন ও জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিবিধ কর্মের মধ্যে মনুষ্যত্বের প্রতিফলন ঘটানো, এ বিষয়টি অক্ষয়কুমার দত্তের সামগ্রিক শিক্ষা বিষয়ক চিন্তার মূলসূত্র স্বরূপ।'[৭৪] শিক্ষার মাধ্যমে যদি মনুষ্যত্ব উদ্বোধিত না-হয়, তবে তাঁকে শিক্ষা বলা যাবে না। এ থেকে বুঝা যায় যে কোনো একটা ভাষা শিক্ষা করলেই তাকে শিক্ষা বলা যাবে না । কারণ তাতেই মানুষের সম্পূর্ণ বিকাশ সাধিত হয় না।

৭

শিক্ষার মাধ্যম ও শিক্ষানীতি নির্ধারণ

অক্ষয়কুমার দত্ত শিক্ষা লাভ করেছিলেন ইংরেজি ভাষায়। কারণ তখন পর্যন্ত বাংলা ভাষায় শিক্ষাদানের বিশেষ কোনো ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। ফলে নিজের মাতৃভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় শিক্ষালাভের যে যন্ত্রণা, সে অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল। ইংরেজি ভাষায় জ্ঞান অর্জন করতে গিয়ে বাঙালির কী পরিমাণ সময় ও অর্থ অপচয় হয় তা তিনি জানতেন। আর সে শিক্ষায় স্বদেশের যে মঙ্গল সম্ভব নয়, সেটাও তাঁর অজানা ছিল না। এসব দিক বিবেচনা করে তিনি বাঙালির শিক্ষার মাধ্যম ঠিক করলেন বাংলা ভাষা।

Dhaka University Institutional Repository

অক্ষয়কুমার যখন বাংলা ভাষাকে বাঙালির শিক্ষার মাধ্যম করার কথা বললেন, তখন এদেশে ইংরেজের সরকারি শিক্ষানীতি চলছে। কিন্তু সে শিক্ষানীতি তাঁর কাছে নীতি বলে মনে হয়নি। কারণ সে শিক্ষানীতি তখন যেমন ক্ষতিকর, ভবিষ্যতেও তেমনি বাঙালির আত্মবিকাশের অন্তরায়। তিনি অনুধাবন করলেন, ইংরেজের শিক্ষানীতির দয়ায় সমাজে শিক্ষার আগাছা গজাতে পারে, ফুল-ফল শোভিত বৃক্ষের জন্ম সম্ভব নয়। তাঁর এ ধারণা জন্মেছিল সেসময়ে সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত বাংলা বিদ্যালয়গুলোর অবস্থা দেখে। এ সম্পর্কে অক্ষয়কুমার লিখেছেন :

> পূর্ব্বোক্ত একশত বিদ্যালয়ের কথা কি কহিব? তাহার দুরবস্থা আলোচনা করিলে ইহাই স্পষ্ট বোধ হয় যে সে বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের লেশমাত্রও যত্ন নাই; তাহার প্রয়োজন সিদ্ধি করা তাঁহারদিগের অভিপ্রায় নহে। এই সকল পাঠশালা অপেক্ষা ইংলণ্ডীয় ভাষার বিদ্যালয়ের প্রতি তাঁহারদিগের যেরূপ উৎসাহ, তাহা চিন্তা করিলেই তাঁহারদিগের আন্তরিক অভিপ্রায় সুন্দর প্রকাশ পায়। তাঁহারা ইংরাজী বিদ্যালয়ের নিমিত্তে প্রচুর ধন ব্যয় করেন, তাহার তত্ত্বাবধারণ বিষয়ে বহু মনোযোগ করেন, উপযুক্ত শিক্ষক প্রস্তুতির জন্য পৃথক বিদ্যাগারও স্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ঐ একশত বাঙ্গালা পাঠশালার প্রতি তাঁহারদিগের যত্নের কি চিহ্ন প্রকাশ হইয়াছে? গ্রন্থ নাই, শিক্ষক নাই, এবং তাহার তত্ত্বাবধারণেরও নিয়ম নাই, অথচ তাহার কার্য্য সফল হইবেক, ইহা অপেক্ষা অলীক কথা আর কি হইতে পারে? একজন সাহেব যথার্থ কহিয়াছেন যে ইংরাজী পাঠশালা সকল সপত্নীর সন্তান। আত্ম-সন্তানের ন্যায় সপত্নী সন্তানকে কে স্নেহ করিয়া থাকে? অতএব এদেশে দেশভাষা প্রচারের জন্য গবর্ণমেণ্টের যে চেষ্টা সে কেবল নামমাত্র।[৭৫]

অক্ষয়কুমার তাই সরকারের শিক্ষানীতির পরিবর্তে জাতীয় শিক্ষানীতির কথা ভাবলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল কম সময়ে, সহজে বাংলা ভাষায় জনশিক্ষা বিস্তার। বাঙালির স্বার্থে তাঁকে শাসকের শিক্ষানীতির বিপরীতে দাঁড়াতে হলো শিক্ষার একটা জাতীয়নীতি স্থির করার জন্য। সে নীতিতে তিনি 'শিক্ষার মাধ্যম, শিক্ষার বিষয়, শিক্ষার পদ্ধতি, শিক্ষার উপকরণ, শিক্ষার পরিবেশ, শিক্ষার গ্রহণের উপায়, শিক্ষকের যোগ্যতা, ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক, শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে রূপরেখা প্রণয়ন করলেন। অক্ষয়কুমার দত্তের শিক্ষাচিন্তার ওপর ভিত্তি করে সেকালে এদেশে জাতীয় শিক্ষা ও জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার একটা আন্দোলন গড়ে উঠল। বিদ্যাসাগরের আদর্শ স্কুলগুলো এবং পরবর্তীতে বোলপুরে রবীন্দ্রনাথের 'ব্রহ্মচর্য-বিদ্যালয়' স্থাপন তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁর চেষ্টায় শিক্ষানীতিতে যে পরিবর্তন আনলেন বাঙালির জন্য তা সত্যিই খুব আনন্দের ও গৌরবের ব্যাপার। অক্ষয়কুমার কখনো জাতীয় শিক্ষানীতির এ আদর্শের বাইরে যাননি। এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য খুব স্পষ্ট ছিল। তিনি লিখেছেন :

> কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে ইংলণ্ডীয় ভাষায় নানাবিধ পুস্তক প্রস্তুত আছে, ও তাহার সুনিপুণ শিক্ষক সকল অনায়াসে প্রাপ্ত হয়, অতএব এদেশীয় লোককে বাঙ্গালার পরিবর্ত্তে সাধারণরূপে ইংলণ্ডীয় ভাষার উপদেশ করা উচিত। অনেক ইংলণ্ডীয় পুরুষ এবং আমারদিগের স্বদেশস্থ কোন কোন ইংলণ্ডীয় ভাষাভিজ্ঞ যুবাও এই মত প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু ইহার পর অলীক মতও আর নাই। এ ভ্রম খণ্ডনের নিমিত্তে এই মাত্র বিবেচনা করা উচিত যে আত্ম ভাষায় কি পর ভাষায় জ্ঞান উপার্জ্জন সুলভ হয়? এ বিষয়ে আমারদিগের কোন সংশয় স্থলই হয় না—ইহা প্রশ্নেরও যোগ্য নহে। শিশুর রসনা মাতৃদুগ্ধ[৭৬] পানের সহিত যে ভাষার অনুশীলন করে, বিদ্যারম্ভের পূর্ব্বকালেই যে ভাষার অর্দ্ধভাগ তার কণ্ঠগত হয়, এবং তরুণ বা প্রৌঢ় কালে সাধ্যপর যত্নেও যাহা বিস্মৃত হইতে লোক অসমর্থ হয়, সেই পৈতৃকভাষা অভ্যাস করা সুলভ নহে, আর পৃথিবীর ভিন্ন প্রান্তবাসী পর জাতীয় ভাষা শিক্ষা সুলভ, ইহা কি প্রকারে মনুষ্যের মনোগত হয়?[৭৭]

অক্ষয়কুমার শাসকগোষ্ঠীর শিক্ষানীতির বাইরে এসে যে জাতীয় শিক্ষানীতি দিলেন তা শিক্ষার এক নবদিগন্ত উন্মোচন করল। তাঁর আগে রামমোহন এ বিষয় নিয়ে ভাবেননি। সেকালে বাঙালিকে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের সে নীতির যথার্থ প্রতিফলন ঘটানো অক্ষয়কুমারের পক্ষে সহজ ছিল না। তবু তিনি সে পথ থেকে সরে দাঁড়াননি। তখনকার সমাজে প্রচলিত সব রকম অনিয়মকে অস্বীকার করে তিনি বাঙালির কাছে শিক্ষার প্রকৃত রূপ তুলে ধরার প্রয়াস চালান। সে চেষ্টায় তিনি আঁধার রাতের একলা পথিক ।

Dhaka University Institutional Repository

৮

শিক্ষার্থীর মানসিক বিকাশে মাতৃভাষার ভূমিকা

অক্ষয়কুমার দত্ত বিশ্বাস করতেন মাতৃভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় যে শিক্ষা, তা কোনো স্বাভাবিক শিক্ষা নয়। আর সে শিক্ষায় শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক মানসিক বিকাশও সম্ভব নয়। যে ভাষার সঙ্গে স্বদেশের আলো-বাতাসের কোনো যোগ নেই, সে ভাষা শিক্ষার্থীর মনের পরিপুষ্টি সাধনের অন্তরায়। কিন্তু একদল আশা করছিল, ইংরেজি ভাষা কালক্রমে ভারতবর্ষের ভাষা হয়ে উঠবে এবং এদেশের ভাষা হারিয়ে যাবে। সেকালের এসব শিক্ষিত স্বদেশীদের এমন অযৌক্তিক ধারণা মানতে পারেননি অক্ষয়কুমার। তাঁদের এ ধরনের প্রত্যাশা তাঁর কাছে বাস্তব বলে মনে হয়নি। তিনি বলেছেন–'ইহার পর অলীক কথা আর নাই। যাঁহারা একথা কহেন, তাঁহারা ইহাও বলিতে পারেন যে ভারতবর্ষের তাবৎ ভূমি খনন করিয়া ইংলণ্ড ভূমি দ্বারা তাহা পূর্ণ করিবেন।'[৭৮] স্বদেশে বিদেশি ভাষা স্থায়ী হওয়ার কোনো কারণ আছে বলে তাঁর জানা ছিল না। তিনি বিশ্বের বিভিন্ন ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে জানতেন। কোনো কোনো দেশে সাময়িকভাবে কোনো একটা ভাষা হয়তো আত্মপ্রকাশ করেছে, কিন্তু বেশি দিন টিকেনি. সেদেশের ভাষাই শেষ পর্যন্ত অক্ষুন্নো থেকেছে। কাজেই তাঁর যুগে যাঁরা ভাবতেন এদেশের ভাষা ভিন্ন অন্য কোনো ভাষা এদেশে প্রসিদ্ধি লাভ করবে, তাঁরা ঠিক বলেন না। অক্ষয়কুমার ইতিহাসের আলোকে তাঁদের উদ্দেশে লিখেছেন :

> কোন দেশের ভাষা যে এককালে উচ্ছিন্ন হয় ইহা যুক্তিসিদ্ধ নহে, ইতিহাসেও ইহার উদাহরণ প্রাপ্ত হয় না। ইহা সত্য যে, গ্রীক ও রোমান লোকেরা আপনারদিগের অধিকৃত আত্মাভাষা প্রচারের যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু সে কার্য্যে তাঁহারা কি পর্য্যন্ত কৃতার্থ হইয়াছিলেন? সেই সকল দেশের ভাষা উচ্ছেদ করিতে তাঁহারা কতদূর সমর্থ হইয়াছিলেন? স্বভাবতঃ অধিকারী জাতির অধিকার নাশের সহিত অধিকৃত দেশ হইতে তাহারদিগের ভাষা লুপ্ত হইতে থাকে। মিশর দেশে রোমানদিগের অধিকারচ্যুত হইলে গ্রীক ভাষার ব্যবহার লুপ্ত হইল, কিন্তু তাহার দেশ ভাষা যে কপটিক্ তাহা এইক্ষণকার দুই শতবর্ষ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। ফ্রান্স ও স্পেন দেশেও তাদৃশ ঘটনা হয়। সীরিয়া দেশে গ্রীকদিগের অধিকার কালে যে সকল নগর গ্রীক নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল, তাহা পুনর্ব্বার দেশ ভাষার প্রাচীন নামে খ্যাত হইল। বাস্তবিক জয়ী লোকেরা যদি পরাজিত দেশের বহু সংখ্যাতে পুরুষানুক্রমে বসতি করেন, এবং পুরোবাসিদিগের সহিত বিবাহাদি সম্বন্ধ দ্বারা মিশ্রিত হয়েন, তবে উভয়ের সংশ্রবে এক নতুন সঙ্কীর্ণ ভাষা উৎপন্ন হয়। হিন্দুস্থানী ও পারসীক এবং ফ্রেন্স ও স্পানিষ প্রভৃতি ভাষার এইরূপ উদ্ভব হইয়াছে। যদি জয়বান জাতি স্বাধিকৃত দেশে বাহুল্যরূপে বসতি না করেন, এবং বিবাহাদি সম্বন্ধ দ্বারা তাহারদিগের সহিত এক জাতিভূত না হয়েন, তবে সে দেশীয় ভাষার বিশেষ অন্যথা হওয়া সম্ভব নহে। আরবেরা যে সিশিলি দ্বীপ অধিকার করিয়াছিল, তাহার কি নিদর্শন এইক্ষণে প্রাপ্ত হয়? জয়ী লোক যদি পরাজিত লোককে তাহারদিগের স্বদেশ হইতে বহিস্কৃত করিয়া আপনারা তাহাতে বাস করেন, তবে সেখানে তাঁহারা আপনারদিগের ভাষা আপনারাই ব্যবহার করেন, তাহাতে সে দেশীয় লোকের ভাষার কি অন্যথা হইল? অতএব যে পক্ষে বিচার করুন, ভারতবর্ষের দেশ ভাষা সকল উচ্ছিন্ন হইয়া তৎপরিবর্ত্তে যে ইংরাজী ভাষা স্থাপিত হইবে, ইহা কেহ যেন মনেও স্থান দেন না—নিঃসংশয়ে এই ভবিষ্যৎ কথা ব্যক্ত করিতেছি যে কাহারও এ মনস্কামনা কদাপি সিদ্ধ হইবে না।[৭৯]

নিজেদের ইতিহাস-ঐতিহ্য ভুলে বিজাতীয় ভাষার মোহে মেতে ওঠা বাঙালির জন্য কতটা আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত অক্ষয়কুমার তা ভালোভাবেই বুঝেছিলেন। তাই তিনি চেয়েছিলেন শিক্ষার মাধ্যমে নিজের ভাষা-সংস্কৃতির প্রতি বাঙালির অনুরাগ সৃষ্টি করতে। কারণ মাতৃভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করে জাতি যতটা উন্নতি করতে পারে, অন্য কোনো ভাষায় তা পারে না। অক্ষয়কুমার জাতীয় উন্নতির মূলে মাতৃভাষা বিকল্প ভাষার চিন্তাকে পাপ মনে করতেন। তাই তিনি 'ইংরেজি ভাষার এবং ইংরেজ শাসনের প্রশ্নহীন দাসত্বকে কোনো দিনই মানেননি। আপোষ করেননি দুয়েরই সঙ্গে।'[৮০] পৃথিবীর কোথায়, কোন দেশে মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভ করে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে কোন জাতি কতটা খ্যাতি অর্জন করেছিল অক্ষয়কুমার তা জানতেন। শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক মানসিক বিকাশে মাতৃভাষার গুরুত্ব তুলে ধরে তিনি লিখেছেন :

> দেখ ভারতবর্ষের সমীবর্ত্তী পারসীক দেশে যে পর্য্যন্ত কেবল আরবী ভাষার আলোচনা বিশিষ্টরূপে প্রচার ছিল, সে পর্য্যন্ত সে দেশে কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্ত্তার উদয় হয় নাই। তৎপরে মহাকবি ফেরদৌসী আত্মভাষাতে শাহনামা গ্রন্থ রচনা করিলে কত কাব্যামৃত-রসপূর্ণ গ্রন্থ সকল প্রকাশ হইতে লাগিল! তখন সাদি আপনার সুকোমল মধুরস্ফীত উপদেশ পুস্তকের সহিত উদয় হইলেন। তখন হাফেজ চিত্ত প্রমোদকারী অতি রমণীয় সঙ্গীত সকল প্রচার করিতে লাগিলেন। রোমানেরা অনেক দেশ অধিকার করিয়াছিলেন, সে সকল দেশে

Dhaka University Institutional Repository

> আপনারদিগের ভাষা ও বিদ্যা প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বদেশ ইটালী ব্যতীত তাঁহারদিগের অধীন অন্য অন্য দেশে প্রায় কোন ব্যক্তি যশস্বী গ্রন্থকর্ত্তারূপে বিদিত হয়েন নাই। সুবিখ্যাত বর্জ্জিল ও হোরেস, এবং লিবি ও সিসিরো ইঁহারা সকলেই ইটালী ভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। জর্ম্মেণি দেশেতে কীর্ত্তিমান ফ্রেডরিক্ রাজার রাজত্বকাল পর্য্যন্ত ফ্রেন্স ভাষার বহু সমাদর ছিল, তত্রস্থ বিদ্বান্ লোকেরা সেই ভাষারই অনুষ্ঠান করিতেন, এবং তাহাতেই রাজকার্য্য সম্পন্ন হইত, তথাপি তৎকাল পর্য্যন্ত সে দেশে কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশ হয় নাই। পরে যখন গোএথি নামক মহাকবি স্বকৃত ললিত কবিতা দ্বারা আপনার দেশ ভাষা উজ্জ্বল করিলেন, তদবধি সে দেশীয় অন্য মহা মহা গ্রন্থকর্ত্তা আপনারদিগের অসাধারণ মানসিক বীর্য্যোদ্ভব রচনা সকল প্রকাশ করিয়া মানব জাতিকে চমৎকৃত করিতে লাগিলেন।.....সামান্যত দেখ ইউরোপ খণ্ডে যে পর্য্যন্ত লাটিন্ ভাষায় বিদ্যাভ্যাসের রীতি প্রচলিত ছিল, সে পর্য্যন্ত সেখানে বিদ্যার স্ফূর্ত্তি হয় নাই, ও উত্তমোত্তম গ্রন্থ সকলও প্রকাশ হয় নাই; তৎখণ্ডের লোক সেই কালের অন্ধকাল সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু তৎপরে ইটালী, স্পেন, পোর্টুগেল্, ও ফ্রান্স প্রভৃতি দেশীয় লোকেরা যখন স্ব স্ব দেশ ভাষার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন, তদবধি ইউরোপখণ্ড গ্রন্থকারদিগের যশেতে আমোদিত ও জ্ঞান জ্যোতিতে উজ্জ্বল হইতে লাগিল।[৮১]

অক্ষয়কুমার তাঁর জীবনব্যাপী মাতৃভাষাকে সর্বস্তরের মানুয়ের ভাষা করার অক্লান্ত চেষ্টা করে গেছেন। কারণ তিনি জানতেন যে, মাতৃভাষার খোলা হাওয়ায় শিক্ষার স্বাভাবিক সুযোগ অবাধ হলে, বাঙালি মনের পূর্ণ বিকাশ ঘটে দেশের উন্নতি নিশ্চিত হবে। মাতৃভাষায় শিক্ষার এ দাবির পেছনে তাঁর যে-সমস্ত যুক্তি ছিল তা কেবল তত্ত্বগত ব্যাপার ছিল না, স্বাভাবিক প্রাণধর্ম নিয়ে বাঁচার দাবিও তাতে ছিল। প্রাণের স্বাভাবিক বাঁচা যেমন আলো-বাতাস সাপেক্ষ, মাতৃভাষায় শিক্ষা অর্জনের ব্যাপারটাও তাঁর কাছে তাই মনে হয়েছে। মাতৃভাষায় শিক্ষা অর্জনের সামাজিক এবং মানবিক দিকটির কথা তিনি কখনো ভুলে যাননি। তিনি লিখেছেন :

> যে অল্প ব্যক্তির স্বচ্ছন্দ অবস্থা, সুতরাং জ্ঞানার্জ্জনের যথেষ্ট কাল প্রাপ্তির উপায় আছে, তাহারা যদিও বহু অংশে কৃতার্থ হইতে পারে, কিন্তু দেশময় যে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র সন্তান অন্নাভাবে শীর্ণ, বা যে-সকল মধ্যবিত্ত গৃহস্থ বালকেরা দুরবস্থ হইয়া ক্ষুণ্নভাবে কাল যাপন করে, যাহারদিগের পিতা মাতা কেবল আপন পুত্রদিগের ভাবী উপার্জ্জনের প্রত্যাশায় প্রাণ ধারণ করেন, সে সকল বালকের পরের ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়া বিদ্যালাভের সময় নাই, তাদৃশ বহুমূল্যে জ্ঞানার্জ্জন করিবার উপায়ও নাই।[৮২]

তিনি নিজের জীবনে শিক্ষালাভের অভিজ্ঞতা থেকে তা বুঝেছিলেন। তিনি বলতেন–'পরদেশীয় ভাষা মাত্র অভ্যাসে যে কাল ব্যয় হয়, সে কাল মধ্যে স্বদেশীয় ভাষায় বিবিধ বিদ্যার সংস্কার হইতে পারে।'[৮৩] 'আমাদের দেশের যাঁরা চিন্তানেতা, তাঁরা সকলেই এই জাতীয় শিক্ষানীতির পক্ষে কথা বলে এসেছেন। কেননা সে নীতি জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত। এই শিক্ষানীতির প্রথম কথা শিক্ষা যারা অর্জন করবে এবং যা কিছু শিক্ষণীয় তা তারা রক্তে-চেনা ভাষাতেই শিখবে।'[৮৪] মাতৃভাষাতেই শিক্ষার্থীর মনের পরিপুষ্টি সাধন ও স্বাভাবিক মানসিক বিকাশ ঘটবে।

৯

মাতৃভাষায় শিক্ষার অন্তরায় অনুধাবন

অক্ষয়কুমার দত্ত বাংলা ভাষার চর্চার পক্ষে যে যুক্তি দিয়েছিলেন তা সেকালের শাসকগোষ্ঠীর সামনে সহজে দাঁড়াতে পারেনি। তার কারণ ভারতবাসীর অসম্ভব মোহ এবং তাঁদের পরাধীনতা। ইংরেজির প্রতি বাঙালির মোহের নেপথ্যে আছে ভারতবর্ষ ত্যাগের আগে লর্ড বেন্টিঙ্কের করে যাওয়া আইনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা। এ আইনের মূল কথা ছিল–ভারতবাসীদের মধ্যে যাঁরা ইংরেজি শিক্ষিত হবেন, তাঁরাই সরকারের দায়িত্বপূর্ণ পদসমূহের অধিকারী হবেন। এর ফলে তখন ধনী ও কৃতবিদ্য ব্যক্তিদের সন্তানেরা ব্যাপকভাবে খ্রিষ্টান মিশনারিদের বিদ্যালয়ে বিপুল উৎসাহে ইংরেজি চর্চা শুরু করে। বাংলা ভাষার প্রতি তাঁদের অনীহা বাড়তে থাকে। কালক্রমে এরা এবং এদের অভিভাবকরা স্বদেশী ভাষার কর্মকাণ্ড পরিচালনার প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠে। তাঁরা নানাভাবে এ ভাষার বিরোধিতা করে। অক্ষয়কুমার তাঁর ভাষার প্রথম শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেছেন ইংরেজি ভাষার মোহগ্রস্থ বাঙালিকে। তাঁর মতে, 'প্রথম প্রতিবন্ধক শিক্ষিত বঙ্গবাসিগণ কর্তৃক সমধিক ইংরাজি ভাষার চর্চা ও আলোচনা, এবং বঙ্গভাষানুশীলনে অবহেলা এবং তাহার প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন।'[৮৫] যে সমস্ত ইংরেজি শিক্ষিতরা বাংলা ভাষাকে অবজ্ঞা করত, তাঁদের উদ্দেশ করে অক্ষয়কুমার বলেছেন:

Dhaka University Institutional Repository

> যাঁহারদিগের এরূপ অস্বাভাবিক ও বিপরীত রীতি হইল, আত্মভাষার উচ্ছেদ মানস করা তাঁহাদিগের পক্ষে আশ্চর্য্য নহে। আপাততঃ তাহারদিগের মধ্যে এরূপ এক সম্প্রদায় ভেদ হইয়াছে বটে, যাঁহারা মৌখিক বলেন যে দেশভাষার অনুশীলন করা অতি আবশ্যক কর্ম্ম। কিন্তু ইহা কি তাঁহারদিগের আন্তরিক বাসনা? ইহা কি তাঁহারদিগের এমত স্নেহের বিষয় যে তাহা সিদ্ধ না হইলে মনেতে অসহ্য বেদনা বোধ হইবে? ইহা যদি হইবে তবে তাঁহারা ইংলণ্ডীয় ভাষাভিজ্ঞ কোন মিত্রকে প্রাপ্ত হইলে কেবল ইংরাজী কথোপকথনেই মনের দ্বার কেন উদ্ঘাটন করেন? বাঙ্গালির সভাতে ইংরাজী কথা ও ইংরাজী বক্তৃতা কেন করিয়া থাকেন? যাহা হউক এ সকল জন্মভূমির প্রতি প্রেমের চিহ্ন নহে।[৮৬]

অক্ষয়কুমারের চিন্তা ছিল শাসকগোষ্ঠীর মর্জির প্রতিকূল। পরাধীন রাষ্ট্রে শাসকের অবিচার তাঁকে ব্যথিত করত, কিন্তু শাসিত ভারতবাসীকে করত না। ভারতবাসী বাংলা ভাষায় শিক্ষা লাভ করে পরাধীনতা থেকে মুক্তির কথা ভাবতেন না। তাঁরা চাইতেন কোনো উপায়ে আর্থিক উন্নতি, আত্মিক উন্নতি নয়। তাঁদের সে প্রত্যাশা পূরণে বাংলা ভাষার তখন কোনো ভূমিকা ছিল না। আর্থিক উন্নতিতে বাংলা ভাষার ভূমিকা না থাকায় সবাই ছুটেছে ইংরেজির পিছনে। আত্মমর্যাদা, স্বদেশ, সমাজ, ভাষা, সংস্কৃতি, জাতীয় উন্নতি এসব নিয়ে কেউ ভাবেনি। এসব ভাবনা তাঁদের বোধের মধ্যেই ছিল না। কারণ ইংরেজি শিখে চাকরি পাওয়ার লোভে তাঁরা স্বাভাবিক বোধবুদ্ধি হারিয়েছিল। আর অক্ষয়কুমার বাংলা ভাষার এমন প্রতিবন্ধক স্রোতের বিরুদ্ধে ছিলেন বলে তাঁর বাংলা ভাষার চর্চা তখন প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদা পায়নি। তবু তিনি শাসকের কাছে তা প্রত্যাশা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন:

> ইংরাজরা যদি এদেশীয় প্রজাদিগের কিঞ্চিৎ প্রত্যুপকার করিতে স্বীকৃত হয়েন, আমারদিগের সর্ব্বস্বের পরিবর্ত্তে যদি কিঞ্চিৎ বিদ্যা দান করা উচিত বোধ করেন, তবে ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থানে দেশভাষার পাঠশালা সকল সংস্থাপন করিয়া উৎকৃষ্ট নিয়মে শিক্ষা দান করুন। অনুরাগ, উৎসাহ ও উদ্যমের সহিত ইহাতে সচেষ্ট হউন।[৮৭]

অক্ষয়কুমারের এ আবেদন সরকার শুনলেন না। বরং প্রজাসাধারণের মধ্য থেকে সে দাবি যাতে না উঠতে পারে তার একটা ব্যবস্থা করলেন। অক্ষয়কুমার সরকারে বিরুদ্ধে এই বলে অভিযোগ করলেন, 'বাঙ্গলা পাঠশালা অপেক্ষা ইংরাজী পাঠশালার নিমিত্তে তাঁহারদিগের কিঞ্চিৎ যত্ন দৃষ্ট হইতেছে, বাস্তবিক প্রজাদিগের বিদ্যানুশীলনের জন্য রাজার যদ্রূপ চেষ্টা কর্ত্তব্য, তাঁহার সহস্র অংশের এক অংশও করিতেছেন না।'[৮৮] সরকার ভারতবাসীকে দেখালেন যে তাঁরা দেশের নানা স্থানে একশটি বাংলা পাঠশালা এবং নগরের শাখা বিচারালয়গুলোতে 'দেশভাষা' চালু রেখেছেন। সরকারের এ রাজনৈতিক কৌশল এবং সচেতন প্রহসন অক্ষয়কুমার বুঝলেও তাঁর স্বদেশবাসী সেই ফাঁকিটা ধরতে পারল না। ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী এ হীন চরিত্র সম্পর্কে অক্ষয়কুমারের ধারণা ছিল। ইংরেজের এ সচেতন প্রহসন প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন:

> বঙ্গদেশীয় বিচারালয় সকলে বঙ্গভাষা ব্যবহারের নিয়ম প্রচার করিয়া তাহা সফল করিবার জন্য কি উপযুক্ত উপায় চেষ্টা করিয়াছেন? তাঁহারা কি তৎপরে অনুসন্ধান করিয়াছেন যে সে নিয়ম বলবৎ হইতেছে কি না? এইক্ষণে যে ভাষাতে সেই সকল বিচারালয়ের কার্য্য নির্বাহ হয় সে ভাষা বাঙ্গালা নহে, ইংরাজী নহে, হিন্দী নহে, পারসীক নহে, কিন্তু তাহা এই ভাষার সন্নিপাত স্বরূপ হইয়াছে। বিচারালয়ের কোন লিপি এ পর্য্যন্ত শুদ্ধ দেখি নাই, যাহারা কোন কালে ভাষা রচনা শিক্ষা করে নাই, তাহারাই বিচারাগারের লিপি কর্ম্মচারী! জ্ঞানাপন্ন রাজাদিগের রাজকার্য্যের যে এইরূপ বিকৃতি হয়, ইহা অতি দুঃখের বিষয়। নিয়ম আছে অথচ তদনুযায়ী কর্ম্মানুষ্ঠান হয় না, ইহা কদাপি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের যোগ্য নহে।[৮৯]

অক্ষয়কুমার এ বক্তব্যে ইংরেজ চরিত্রের প্রকৃত পরিচয় প্রতিফলিত হয়েছে। শাসক-ইংরেজের এ হীন চরিত্র অক্ষয়কুমার বহু প্রবন্ধে, গ্রন্থে বর্ণনা করে, তাঁর স্বদেশবাসীকে বোঝাতে চেয়েছেন। সে চেষ্টার মধ্য দিয়ে তিনি স্বদেশবাসীকে আত্মবিশ্বাসী করে তুলতে চেয়েছেন। কারণ তারা তখন আত্মশক্তি হারিয়ে ইংরেজের দাসত্ব স্বীকারে যত্নবান হয়ে উঠেছে। শুধু যুক্তি দিয়েই নয়, অনেক সময় আবেগ দিয়েও স্বদেশের সন্তানদের ইংরেজির মোহ এবং ইংরাজের মোহ উভয় ত্যাগের আহবান করেছেন। শাসক-ইংরেজ বাংলা ভাষার চর্চায় যে প্রহসন ও প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছেন, সেটা জেনে তিনি স্বদেশবাসীকে জাগানোর জন্য আবেগতাড়িত হয়েছেন। তিনি স্বদেশবাসীকে নিবেদন করে লিখছেন :

> যে স্থানে আমরা শৈশব কালে স্নেহমিশ্রিত যত্ন দ্বারা লালিত হইয়াছি, যে স্থানে বাল্যক্রীড়া দ্বারা আহ্লাদের সহিত বাল্যকাল যাপন করিয়াছি, যে স্থানে যৌবনের প্রারম্ভাবধি সহযোগি মিত্রদিগের প্রীতি দ্বারা সতত আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছি, যে স্থানে আমারদিগের বয়োবৃদ্ধির সহিত সৃহৃদ্‌মণ্ডলীর সীমা বৃদ্ধি হইয়াছে, এবং যে

Dhaka University Institutional Repository

> স্থানে প্রসাদে ধন, মান, বিদ্যা, বুদ্ধি, যশঃ, সম্পদ যাহা কিছু সকলই আমারদিগের লব্ধ হইয়াছে, সে স্থানের প্রতি বিশেষ স্নেহ হওয়া কি স্বভাব সিদ্ধ নহে? স্বদেশ এ প্রকার প্রিয় পদার্থ যে তাহার নদী, পর্ব্বত, মৃত্তিকা পর্য্যন্ত আমারদিগের প্রণয় আকর্ষণ ও আহ্লাদ সঞ্চার করে। জন্মভূমির নাম দ্বারা সেই বস্তুর নাম উচ্চারণ করা হয় যাহার অপেক্ষা প্রিয়তর পদার্থ পৃথিবী মধ্যে আর নাই...যে নাম চিন্তামাত্র পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভার্য্যা, পুত্র, কন্যা, সুহৃদবান্ধবের প্রেমার্দ্র আনন সকল মনেতে জাগ্রৎ হইয়া উঠে! যিনি প্রবাসী হইয়া দূর হইতে আপনার দেশ স্মরণ করিয়াছেন, তিনিই স্বদেশের মর্ম্ম জ্ঞাত হইয়াছেন, তিনিই জানেন যে জন্মভূমি মনুষ্যের দৃষ্টিতে কি রমণীয় বেশ ধারণ করে। 'কাশ্মীরের নির্ম্মল হ্রদ ও মনোহর উদ্যান, কিম্বা সিরাজের সুচারু গুলাব পুষ্পের উপবন' কিছুতেই তাঁহার চিত্তকে আকৃষ্ট রাখিতে সমর্থ হয় না। তিনি বালুময় মরুভূমিবাসী হইলেও সেই স্বদেশ সন্দর্শন পিপাসায় ব্যাকুল থাকেন। এমত সুখের আকর যে জন্মভূমি তাহার প্রতি যাহার প্রীতি না থাকে, সে কি মনুষ্য? পূর্ব্বে আমারদিগের স্বজাতীয় লোকের এরূপ ব্যবহার কখনই ছিল না।[৯০]

অক্ষয়কুমার বাংলা ভাষার প্রতিবন্ধকতা দূর করতে ইংরেজি ভাষায় সুশিক্ষিতদের—ইংরেজির পরিবর্তে বাংলা ভাষায় সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি, পুরাতত্ত্ব, বার্তাশাস্ত্র, বিজ্ঞান ও দর্শন বিষয়ে বই লেখার অনুরোধ করেছেন। তিনি আশা করেছেন ইংরেজিতে অবিজ্ঞরা যদি বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করেন, সর্বসাধারণের সঙ্গে কথা বলেন, তবেই এ ভাষার প্রতিবন্ধকতা বহুলাংশে হ্রাস পাবে। আর তা হলে ভারতবাসীর মধ্যেই বাংলা ভাষায় অনেক প্রতিভাবান সাহিত্যিক, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, বিজ্ঞানীর জন্ম হবে। বাংলা ভাষার দ্বিতীয় প্রতিবন্ধক প্রসঙ্গে অক্ষয়কুমার লিখেছেন:

> বঙ্গভাষার উন্নতির পক্ষে দ্বিতীয় প্রতিবন্ধক বাঙ্গালীদিগের স্বাধীনতাশূন্যতা। স্বাধীনতা ভাষার উন্নতি সাধনের পক্ষে একটি অত্যাবশ্যক উপকরণ। স্বাধীনতাশূন্যতা ভাষার উন্নতিপক্ষে একটি মহান ও প্রধান প্রতিবন্ধক। আমরা দেখিতে পাই যাহার যেরূপ মনের অবস্থা তাহার ভাষাও সেইরূপ হইয়া থাকে। যিনি সম্রাট কিংবা রাজা, তাঁহার হৃদয় প্রভুত্ব ও রাজকীয় মহত্ত্বে পরিপূর্ণ এবং তাঁহার ভাষাও দাসত্বব্যঞ্জক। যে ব্যক্তি স্বাধীন তাহার ভাষাও সেইরূপ মুক্ত এবং যে ব্যক্তি পরাধীন তাহার ভাষাও সেইরূপ বদ্ধ। সেই প্রকার যে জাতির স্বাধীনতা আছে, সেই জাতির ভাষা মুক্ত, সুতরাং উন্নত। আর যে জাতির স্বাধীনতা নাই সেই জাতির ভাষা বদ্ধ। সুতরাং অনুন্নত ও অপরিমার্জিত। যে দেশের লোকেরা স্বাধীন তাহারা স্বাধীনভাবে নির্ভয়ে, মুক্তভাবে তাহাদিগের চিন্তাশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি সকল পরিচালনা করিতে পারে তজ্জন্য তাহাদের ভাষা শীঘ্র পরিপুষ্ট ও পরিমার্জিত হইয়া উন্নত হয়, আর যে দেশের লোকেরা স্বেচ্ছাচারী কিন্তু যথেচ্ছাচারী রাজার অধীন এবং সকল প্রকার স্বাধীনতা পরিভ্রষ্ট তাহারা সর্বদা ভয়ে কম্পিত, তাহাদের হৃদয় ও মন বদ্ধ; স্বাধীনতাজনিত মনের নির্ভয়তা ও মুক্তভাব তাহাদিগের মন হইতে একেবারে পলায়ন করিয়াছে সুতরাং তাহাদিগের ভাষা বিশেষরূপে উন্নত হইতে পারে না। যে জাতি স্বাধীন সে জাতির লোকেরা স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে কোন বাধা ও বিঘ্ন প্রাপ্ত হয় না, তাহারা সকল সময়ে সকল অবস্থায় যাহা করে তাহা অবাধে মন খুলিয়া বলিতে পারে, সুতরাং তাহাদিগের চিন্তাস্রোত উন্মুক্ত হইয়া যায় এবং চিন্তাশক্তি তেজস্বী, প্রখর ও দৃঢ় হয়, তজ্জন্য তাহাদের ভাষায় নূতন নূতন কথার সৃষ্টি হইতে থাকে এবং উহা নূতন নূতন ভাবে সুসজ্জিত হইতে থাকে; সেইরূপ তাহাদের ভাষা ক্রমশ উন্নত, বিশুদ্ধ ও পরিমার্জিত হইতে থাকে। কিন্তু যে জাতির স্বাধীনতা নাই সে জাতির লোকেরা স্বাধীনরূপে চিন্তা করিতে পারে না, স্বাধীনভাবে, মন খুলিয়া সকল কথা বলিতে পারে না, ভয়ে তাহাদের মুখ বদ্ধ থাকে, সুতরাং তাহাদিগের চিন্তাশক্তি অবাধে পরিচালিত হইতে না পারাতে উহা তেজস্বী হইতে পারে না, তজ্জন্য তাহাদের ভাষাও উন্নতি লাভ করিতে পারে না। স্বাধীনতা যে ভাষার একটি উন্নতিসাধক এবং স্বাধীনতাশূন্যতা যে ভাষার উন্নতি সাধনের একটি প্রতিবন্ধক ইতিহাস তাহার যথার্থতা অকাট্যরূপে প্রমাণ করিয়া দিতেছে।[৯১]

অক্ষয়কুমার পরাধীন রাষ্ট্রে বাস করেও বাংলা ভাষার পক্ষে এত সব মূলবান কথা বলেছিলেন স্বদেশবাসীর কল্যাণ বিবেচনা করে। কারণ তিনি জানতেন মাতৃভাষায় স্বদেশে শিক্ষার প্রসার ঘটলে বাঙালি পরাধীনতা থেকে মুক্তির পথ খুঁজে পাবে। তিনি মনে করতেন, 'যৎকালে বঙ্গভাষার উন্নতির পক্ষে উপরোক্ত দুইটি প্রতিবন্ধক একেবারে অপসারিত হইবে তখন আমরা বাঙ্গালি জাতির গার্হস্থ্য, সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মসম্বন্ধীয় সম্যক উন্নতি দেখিতে পাইব; কারণ যে জাতির ভাষা উন্নত সে জাতি অন্যান্য সকল বিষয়েই উন্নত হইয়া থাকে। ভাষা উন্নত হইলে জাতীয় উন্নতি একপ্রকার অবশ্যম্ভাবী। একজন দূরদর্শী বিজ্ঞ ইংরেজ লেখক বলিয়াছেন : The best index to the growth of a people is the growth and development of its language.'পৃথিবীর ইতিহাসও এই মতের যথার্থতার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।[৯২]

Dhaka University Institutional Repository

১০

বিশেষ ধরনের শিক্ষার পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি

অক্ষয়কুমার বাঙালির জন্য একটি পরিপূর্ণ শিক্ষার পরিকল্পনা করেছিলেন। যে শিক্ষা মানুষকে মনুষ্যত্ব দান করবে, ন্যায়বোধকে জাগ্রত করবে এবং মানুষকে সুন্দরভাবে বাঁচার উপযোগী করে গড়ে তুলবে। এ ধরনের শিক্ষাকেই তিনি বিশিষ্টরূপ শিক্ষা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। 'শিক্ষাদান ও শিক্ষাপ্রণালী' প্রবন্ধের শুরুতেই অক্ষয়কুমার এই বিশিষ্টরূপ শিক্ষার কথা বলেছেন। তিনি লিখেছেন:

> ...সন্তানগণেকে শিক্ষিত ও বিনীত করা কর্তব্য। পিতা ও মাতা হৃদয়াধিক পুত্র-কন্যাদিগের কেবল শারীরিক স্বাস্থ্য লাভের ব্যবস্থা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন, তাহাদিগকে সুচারুরূপ শিক্ষাদান দ্বারা লোকযাত্রা নির্বাহে ও অন্যান্য সমস্ত কর্তব্য সাধনে সমর্থ করা বিধেয়। কোনও সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত কহিয়াছেন, লোকসমাজে অশিক্ষিত সন্তান প্রেরণ করা আর ক্ষিপ্ত কুকুরের গলা-বন্ধন মোচন করিয়া তাহাকে পথ মধ্যে পরিত্যাগ করা উভয়ই তুল্য। যাহাতে আমরা কতকগুলো কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করিয়া সুখি হইতে পারি, পরমেশ্বর আমাদিগকে তদুপযুক্ত শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতি প্রদান করিয়াছেন। আমাদিগের শরীর ও মন সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ রাখা বিধেয়, পরিজনবর্গকে রীতিমত প্রতিপালন করা কর্তব্য, বন্ধু-বান্ধবগিদের সহিত উচিতমত ব্যবহার করা আবশ্যক এবং জ্ঞান ও ধর্ম-প্রচার দ্বারা জনসমাজের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করা কর্তব্য। কিন্তু কীরূপে এই সমস্ত শুভকর্ম সম্পাদন করিতে হয়, তাহা বিশিষ্টরূপ শিক্ষা ব্যতিরেখে জানিতে পারা যায় না।[৯৩]

অক্ষয়কুমার এই শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য যে শিক্ষা পদ্ধতি ও প্রণালির কথা ভেবেছিলেন তা ছিল যুগোপযোগী এবং আধুনিক। তিনি শিক্ষাপদ্ধতিকে তিনটি স্তরে বা পর্বে ভাগ করেছিলেন। আর শিক্ষার্থীর বয়স নির্ধারণ করেছিলেন জন্ম থেকে বাইশ বছর পর্যন্ত। বয়সের দিক থেকে ছেলে-মেয়ে উভয়ই এ হিসাবের মধ্যে ছিল। অক্ষয়কুমার পরিকল্পিত শিক্ষার স্তরগুলো দেখে নেওয়া যাক।

প্রথম স্তর বা পর্ব : বয়সক্রম দুই থেকে সাত বছর (প্রাথমিক শিক্ষা)
দ্বিতীয় স্তর বা পর্ব : বয়সক্রম সাত থেকে পনের বছর (মাধ্যমিক শিক্ষা)
তৃতীয় স্তর বা পর্ব : বয়সক্রম পনেরো থেকে বাইশ বছর (উচ্চশিক্ষা)

কীভাবে বা কোন পদ্ধতির মধ্য দিয়ে এই তিন স্তরের শিক্ষা সম্পন্ন হতে পারে, সে বিষয়েও তিনি একটা পূর্ণাঙ্গ রুপরেখা দিয়েছেন। শিক্ষার প্রতিটি স্তর আলোচনায় এ বিষয়গুলো ধাপে ধাপে জানা যাবে।

প্রথম স্তর বা পর্ব: প্রাথমিক শিক্ষা

মানব-শিশু পৃথিবীতে আসে কতগুলো সহজাত নিয়ে। শিশুর সেই সম্ভাবনাগুলোর অভীষ্ট বিকাশই শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য। শিশুই শিক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তাই যাকে শিক্ষা দেওয়া ক্ষেত্রে শিশুকে জেনে শিশুর প্রয়োজন অনুসারে, শিশুর রুচি, প্রবণতা ও সামর্থ্য জেনেই শিক্ষা দেওয়া উচিত। অথচ সেকালের প্রচলিত শিক্ষায় শিশুর এসব বিষয়কে কোনো গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। শিক্ষাদানকালে শিশু থাকত একেবারেই নিষ্ক্রিয়, তার রুচি, আগ্রহ, প্রয়োজন, প্রবণতা প্রভৃতি বিবেচনা না করে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিশুর ওপর জ্ঞানের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হতো। এতে শিশুর শিক্ষা ও আত্মবিকাশ ঠিকমতো হতো না। শিশুশিক্ষার এসব দিক বিবেচনা করে অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁর শিক্ষাচিন্তায় শিশুর আত্মবিকাশের দশটি প্রস্তাব তৈরি করেছিলেন। এই প্রস্তাব দশটিই শিশুশিক্ষার প্রধান মূলনীতি। এ প্রস্তাবগুলোর মাধ্যমেই বোঝা যাবে তিনি কী ধরনের শিশুশিক্ষা ও শিশুশিক্ষা পদ্ধতির কথা চিন্তা করেছিলেন। অক্ষয়কুমার তাঁর আদর্শ স্কুলের পরিকল্পনায় লিখেছেন :

১. পাঠগৃহ প্রশস্ত ও পরিষ্কৃত করা উচিত, এবং যাহাতে তন্মধ্যে বিশুদ্ধ বায়ুর সঞ্চার থাকে, তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য। সুনির্ম্মল বায়ু সেবন, শরীর সঞ্চালন ও অঙ্গ পরিমার্জ্জন, বস্ত্র ও বাসস্থান প্রক্ষালন ও পরিস্কৃত করণ, এই সমুদয় বিষয় সাধন করা যে অত্যন্ত হিতকারী ও নিতান্ত আবশ্যক, ইহা শিশুগণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।
২. যাহাতে তাহাদিগের অন্তঃকরণে সকল বিষয়ে বিশুদ্ধ ভাবের আবির্ভাব হয় এবং সমুদায় অশুদ্ধ বিষয়ে বিরাগ জন্মে, শিক্ষালয় সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়েরই সেইরূপ বিধান করা কর্ত্তব্য। এ নিমিত্ত, তাহাদের ক্রীড়া-ভূমি

Dhaka University Institutional Repository

সুপরিস্কৃত পরিপাটী করা এবং তাহার প্রান্তভাগ সুন্দর সুন্দর পুষ্প-বৃক্ষে সুশোভিত করা শ্রেয়স্কর। তাহারা তাহার শোভা দেখিয়া সতত প্রফুল্ল থাকিতে পারে, সুতরাং তাহাদের অন্তঃকরণের বৃত্তি সমুদায় উত্তরোত্তর স্ফুরিত ও বিশোধিত হইতে থাকে।

৩. যে ক্রীড়ায় ও হস্তপদাদি অঙ্গ সমুদায় সঞ্চালিত হইয়া বল বৃদ্ধি হইতে পারে, তাহাদের সেইরূপ ক্রীড়ার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া বিধেয়। বায়ু-সঞ্চার বিশিষ্ট অনাবৃত স্থানই তাহাদের ক্রীড়ার মুখ্য-স্থান।

৪. বয়োবৃদ্ধি হইলে নানা প্রকার লোকের সহিত যে রূপ ব্যবহার করিতে হইবে, বিদ্যালয়েই তাহার অভ্যাস করান কর্ত্তব্য। অতএব, শিশু শিক্ষালয়ের ছাত্রসংখ্যা নিতান্ত অল্প হওয়া বিহিত নহে। পঞ্চাশের ন্যূন ও একশতের অধিক না হইলেই ভাল।

৫. তাহারা পরস্পর কিরূপ ব্যবহার করিবে, শিক্ষকেরা তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন, এবং যৎকালে তাহারা একত্র মিলিত হইয়া ক্রীড়া ও কথোপকথন করিবে, শিক্ষকেরা তাহাদের সমভিব্যাহারে ইতস্ততঃ অবস্থিতি করিয়া তৎসমুদায় দর্শন ও শ্রবণ করিবেন, এবং তাহারা দোষ করিলে এক সময়ে শোধন করিয়া দিবেন।

৬. শিক্ষাগুরু শিশুগণের প্রতি সতত স্নেহ, দয়া, বাৎসল্য ও প্রসন্নতাভাব প্রকাশ করিবেন, এবং স্বীয় মনের সমধিক স্ফূর্তিভাব প্রদর্শন করিয়া তাহাদের মনোবৃত্তি সমুদায় সতেজ করিয়া রাখিবেন, অথচ তাহারা যাহাতে অবাধ্য না হয় এইরূপ করিয়া সকল কার্য্য সম্পাদন করিবেন।

৭. শিশুগণ কীট পতঙ্গাদি দেখিলে তাহা ধৃত করিয়া নষ্ট করে, ইহাতে তাহাদিগের নির্দ্দয়াচরণ করা ক্রমশঃ অভ্যাস পাইয়া যায়। অতএব, প্রযত্নপূর্ব্বক এ বিষয়ের প্রতিবিধান করা কর্ত্তব্য। জীবজন্তুকে যাতনা দেওয়া যে বিষম বিগর্হিত ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ ক্রিয়া এ বিষয়ে তাহাদের প্রতীতি জন্মাইয়া, এবং কোন কোন পালিত পশুর প্রতি সতত সদয় ব্যবহার অভ্যাস করাইয়া, তাহাদের ঐ পাপাঙ্কুর সমূলে উন্মূলন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

৮. শ্রদ্ধা, ভক্তি, দয়া, ক্ষমা, ন্যায়, সত্য, সারল্য, বাৎসল্য, ঔদার্য্যভাব এই সমস্ত বিশুদ্ধ ধর্ম্মের অনুশীলন বিষয়ে শিশুগণকে অবিশ্রান্ত উৎসাহ প্রদান করা কর্ত্তব্য। রাগ, দ্বেষ, মিথ্যা, প্রতারণা, লোভ, মদ, মাৎসর্য্য, খলতা, কপটতা, ভীরুতা, নিষ্ঠুরতা, অশ্লীলতা, এবং অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার অবৈধ ব্যবহার সম্যক রূপ দমন করা আবশ্যক। কোন শিশু কোন বিষয়ে উক্তরূপ অনুচিত আচরণ করিলে, তাহা শাসন না করিয়া নিস্কৃতি দেওয়া উচিত নহে। অপরাপর সমাধ্যায়ী বালক দ্বারা তাহার দোষাদোষ বিচার করাইয়া, তাহাকে লজ্জিত ও তিরস্কৃত করিয়া, তাহাতে নিবৃত্ত করা কর্ত্তব্য। শিক্ষাগুরুকে বিচারকর্ত্তা হইয়া, ও বালকদিগকে জুরি অর্থাৎ পঞ্চায়েত স্বরূপ করিয়া, এ বিষয়ের বিচার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়। ইহা হইলে দোষী বালক যৎপরোনাস্তি ঘৃণা ও লজ্জা পাইয়া নিবৃত্ত হইতে পারে, এবং অপরাপর বালকগণেরও ন্যায়পরতার উন্নতি হইয়া অধর্ম্মাচরণে অশ্রদ্ধা জন্মিতে পারে। তাহা হইলে ন্যায়, সত্য, ও দয়া শিশুশিক্ষালয়ের সুস্পষ্ট লক্ষণ স্বরূপ হইবে এবং তথায় পুণ্য স্বরূপ সমীরণ সতত সঞ্চরণ করিতে থাকিবে।

৯. ভূতের ভয়, ডাইনের আশঙ্কা, অমূলক অলক্ষণ, শুভাশুভ দিন ক্ষণ, ও অন্যান্য অনেক বিষয়ের কুসংস্কার জনসমাজে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। যাহাতে এই সমস্ত ভ্রমাঙ্কুর শিশুগণের চিত্ত-ক্ষেত্রে বদ্ধমূল না হইতে পারে, উপদেশ দ্বারা এবং কথা প্রসঙ্গে এ সকল বিষয়ে অনাদর ও উপহাস প্রকাশ দ্বারা তাহার উপায় করা আবশ্যক। এই সমস্ত বিষয়ের আশঙ্কা অন্তঃকরণে একবার প্রবিষ্ট হইলে, নিঃশেষে নিষ্কাশিত করা সুকঠিন হইয় উঠে।

১০. শিশুগণের শারীরিক শক্তি বর্দ্ধন ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তির উন্নতি সাধন বিষয়ে যেরূপ ব্যবস্থা করা বিধেয়, তাহার কতিপয় উদাহরণ মাত্র প্রদর্শিত হইল।তাহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালন বিষয়েও সমধিক যত্ন প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। চক্ষুঃকর্ণাদি ইন্দ্রিয় সকল সর্ব্বাগ্রে সতেজ ও কর্ম্মণ্য হয়। অতএব যদি নানাবিধ স্বভাব-জাত ও শিল্পজাত বস্তু সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে দেখান ও তত্তদ্বিষয় শিক্ষা করান যায়, তাহা হইলে তাহারা অতি অল্প সময়ে অনেক বিষয় শিক্ষা করিতে পারে। প্রথমে অক্ষর ও শব্দ শিক্ষা করান যে অধিক উপকারী, ইহা এক্ষণে নিঃসন্দেহে অবধারিত হইয়াছে। শিশুগণ বর্ণ ও শব্দ শিক্ষায় কোনরূপেই অনুরক্ত নহে, কিন্তু বৃক্ষ লতা গুল্ম, ফল মূল পুষ্প, পশু পক্ষী পতঙ্গ, মৃন্ময়, ধাতুময় পাষাণময় ও চিত্রময় প্রতিরূপ, ইত্যাদি প্রাকৃত পদার্থ সমুদায় দর্শন তত্তদ্বিষয় শ্রবণ করিবার নিমিত্তে অতিমাত্র আগ্রহ ও সাতিশয় ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়া থাকে। অতএব, বিদ্যালয়ে পূর্ব্বোক্ত নানাবিধ সজীব ও নির্জীব এবং দুর্লভ সামগ্রী সকলের জড়ময় প্রতিমূর্ত্তি ও চিত্রময় প্রতিরূপ সঙ্কলন করিয়া রাখা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। শিশু-গণকে সর্ব্বাগ্রে কেবল শব্দ শিক্ষায় নিযুক্ত না করিয়া সুপ্রণালীক্রমে সেই সকল বস্তুর আকার ,প্রকার,গুণাগুণ বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিলে,তাহারা প্রফুল্ল মনে অল্প কালে অশেষ বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিতে পারে, এবং সেই সঞ্চিত জ্ঞান উত্তর কালে অশেষবিধ প্রগাঢ় বিদ্যার অনুশীলন বিষয়েও বিশিষ্টরূপ উপকারী হইতে পারে। শিশুগণ নিত্য নিত্য নূতন বিষয় শিক্ষা করিতে ভালবাসে, অতএব, সুকৌশল-সদুপদেশ প্রদান করিয়া তাহাদিগের উদ্দীপ্ত কৌতূহল চরিতার্থ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহাদিগকে একেবারে এক ঘণ্টা অপেক্ষায় অধিক সময় পাঠ শিক্ষায় নিযুক্ত রাখা উচিত নহে। নানা প্রকার বস্তুর গুণ, বহুবিধ পশু পক্ষ্যাদির স্বভাব, দেশ নগরাদির নাম, কিছু

> কিছু অঙ্ক, রেখা গণিত সংক্রান্ত ক্ষেত্র সমুদায়ের আকার, অল্প অল্প ধর্ম্মনীতি বিষয়ক প্রস্তাব এতাবন্মাত্র শিশুশিক্ষালয়ে শিক্ষা দেওয়া উচিত।[৯৪]

শিশুর প্রাথমিক শিক্ষার পদ্ধতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে অক্ষয়কুমার এসব প্রস্তাব করেছিলেন তাঁর a¤§bxwZ (প্রথম ভাগ) গ্রন্থে। এটি ক্যালকাটা, দ্য নিউ সংস্কৃত প্রেস থেকে প্রকাশিত (১৭৭৭ শকের ১০ই মাঘ, ১৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দে) হয়। সেই হিসাবে আজ থেকে ১৪৭ বছর আগে তিনি বাঙলির সামনে এসব প্রস্তাব রেখেছিলেন। আজ একবিংশ শতাব্দীর সূচনা মঞ্চে দাঁড়িয়েও আমরা তাঁর মতো করে এত গভীরে ভাবতে পারছি না। তিনি দু'বছর বয়স হলেই শিশুকে শিক্ষা দেওয়ার কথা বলেছেন। সে শিক্ষা কী এবং কীভাবে দিতে হবে সে সম্পর্কেও তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন। শিশুর শিক্ষা অর্জন বিষয়ে বলতে গিয়ে তিনি লিখেছেন:

> বালক [এখানে বালক বলতে তিনি সন্তানকে নির্দেশ করছেন] ভূমিষ্ঠ হইবার পরক্ষণ অবধি শিক্ষা লাভ করিতে আরম্ভ করে। তাহার সুকোমল নেত্র নিমিষে নিমিষে অশেষবিধ অদ্ভুত বস্তুদর্শন করে, এবং তাহার সুকুমার কর্ণ প্রতিক্ষণে গুরু, লঘু, কর্কশ, বিবিধ শব্দ শ্রবণ করিতে থাকে। তাহার শরীর যেমন চন্দ্রকলা বৃদ্ধির ন্যায় দিনে দিনে বৃদ্ধি পায়, মনোবৃত্তি সকলও সেইরূপ দিন দিন বর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। অতএব, নিতান্ত শৈশব কালাবধি শিশুদিগের অন্তঃকরণকে উচিত পথে নিয়োজিত ও বিপথ হইতে নিবৃত্ত করিবার উপায় বিধান করা কর্ত্তব্য। তাহাদিগকে প্রথমাবধি বিনীত না করিলে, পরিশেষে বিনীত করা সুকঠিন হইয়া উঠে। তাহাদিগের দুই বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত মাতা ভিন্ন অন্য কাহারও বশীভূত হওয়া সম্ভব না। তৎকালে কেবল স্নেহময়ী জননীই হৃদয়নন্দন স্বীয় নন্দন ও নন্দিনীকে অবলীলাক্রমে শিক্ষিত ও বিনীত করিতে পারেন। তখন তিনিই তাহার শিক্ষা-গুরু ও তাঁহার সুকুমার ক্রোড়েই তাহাদের সুচারু শিক্ষা-স্থান। যাহাতে তাহারা সুস্থ, সচ্ছন্দ ও প্রফুল্লচিত্ত থাকে, নানা প্রকার প্রত্যক্ষ-গোচর পদার্থ চিনিতে ও সেই সকলের গুণাগুণ জানিতে পারে, কীট পতঙ্গাদি ইতর জন্তুদিগের ক্লেশোৎপাদনে ও প্রাণ সংহার করণে পরাঙ্মুখ হয়, এবং ঈর্ষাদি রিপুর বশীভূত না হইয়া অন্যান্য শিশুগণের সহিত সৌহৃদ্য করিতে প্রবৃত্ত হয়, প্রথমাবধি তাহাই সাধন করা জননীর অবশ্য কর্ত্তব্য গুরুতর কর্ম্ম।'[৯৫]

অক্ষয়কুমার এখানে পরিবার থেকে শিশুর প্রাথমিক শিক্ষার সূচনা নির্দেশ করছেন এবং শিশুকে অন্য শিশুর সঙ্গে মিশতে দেওয়ার কথা বলছেন শিশুদের সামাজিক ও মানসিক বিকাশ ঘটানোর জন্য। সেকালে এ ধরনের ব্যবস্থা ছিল না, করাও সহজ ছিল না। অক্ষয়কুমার দত্ত নিজেই বলেছেন, এরূপ শিশু-শিক্ষালয়ের ব্যবস্থা করা সুকঠিন কর্ম্ম। এতাদৃশ অল্প বয়স্ক শিশুগণকে শিক্ষা দান করাও অতি দুরূহ কার্য্য।[৯৬] কারণ শিশুর মনস্তত্ত্ব তিনি বুঝতেন। শিশুর মনের নানা রহস্যময়তা সুপ্ত প্রতিভা সম্পর্কে তিনি জানতেন। অনুকূল বা প্রতিকূল পরিবেশ শিশু মনে কী প্রভাব ফেলে তা তিনি নিজের অভিজ্ঞতা থেকেও বুঝেছেন। অক্ষয়কুমার যে, শিশু-মনের নানা আকার-ইঙ্গিত নিয়ে ভাবতেন, তা শিশুদের জন্য তাঁর শিক্ষার পরিকল্পনা থেকেই স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন:

> শিশুগণ যেরূপ দৃষ্টান্ত দেখে, সেইরূপ শিক্ষা করে, সেইরূপ কর্ম্ম করে, এবং ক্রমে ক্রমে তাহাদের চরিত্র সেইরূপ হইয়া উঠে। বিশেষতঃ গুরুজনদিগের যেরূপ আচরণ দেখিতে পায়, তাহাদের সেইরূপ প্রবৃত্তি জন্মান সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্ভব। অতএব, বালক বালিকাদিগকে সুশীল সচ্চরিত্র করিতে হইলে, জনক জননী ও শিক্ষাগুরুকেও সেইরূপ হইতে হয়। যাঁহারা পাপপঙ্কে পতিত হইয়া পরিলুণ্ঠিত হইতেছেন, তাঁহাদের কথা কি কহিব? তাঁহারা স্বীয় সন্তানগণের যত অকল্যাণ উৎপাদন করিতেছেন, বোধ হয়, ভূমণ্ডলে অন্য কাহারও কর্ত্তৃক এত হইবার সম্ভাবনা নাই। দুর্ব্বাক্য কথন, অশিষ্টাচরণ, ভৃত্যাদিকে প্রহার করণ, শিশুগণকে শারীরিক দণ্ড প্রদান ইত্যাদি কতকগুলি কুরীতিও অশেষ অনর্থের হেতু। যে সমস্ত শিশু সতত এই সকল কুব্যবহার প্রত্যক্ষ করে, তাহাদের কারুণ্যরসাভিষিক্ত সুকুমার ভাবের তিরোভাব হইয়া ক্রমশঃ উগ্র ভাবেরই আবির্ভাব হয়। শিশুগণকে কটু বাক্য বলা, প্রচণ্ড রূপ তাড়না ও ভর্ৎসনা করা এবং শারীরিক দণ্ড প্রদান করা অনিষ্টকর ব্যতিরেকে কদাপি ইষ্টকর নহে। তদ্দারা তাহাদের কেবল ক্রোধাদি রিপুই প্রবল হইতে থাকে। যাঁহার এমন অভিলাষ থাকে, সন্তান সকল শিষ্ট, শান্ত, দয়ালু ও ন্যায়বান্ হউক, তাঁহাকেও তাহাদের সমক্ষে সতত তদনুরূপ আচরণ প্রকাশ করিতে হইবে। পিতা মাতাকে সর্ব্বদা রাগ, দ্বেষ, বিবাদ-কলহ, ও অন্যান্য কুৎসিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত দেখিলে, সন্তানদিগেরও সেই সকল দোষ ক্রমে ক্রমে সঞ্চারিত ও আবির্ভূত হইতে থাকে। অতএব তাহাদিগকে সুমধুর মৃদু বচনে সুযুক্তি-সিদ্ধ উপদেশ দেওয়াই উচিত; ক্রোধ প্রকাশ করিয়া তাহাদিগের ক্রোধ রিপুর উত্তেজনা করা কর্ত্তব্য নহে। যে গৃহ ও যে বিদ্যালয় শান্তি ও সন্তোষের আলয় রূপে প্রতীয়মান হয়, তাহাই শিশু সন্তানগণের অবস্থিতির উপযুক্ত স্থান।[৯৭]

অক্ষয়কুমার সে+কালে বাংলা ভাষায় শিক্ষা পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষা বা শিশুশিক্ষা ক্ষেত্রে যে চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন তার তুলনা হয় না। তাঁর শিশু-শিক্ষার আদর্শ ও চিন্তা ছিল অত্যন্ত আধুনিক। শিশুদের শিক্ষা-পদ্ধতির পরিকল্পনায় অক্ষয়কুমার দত্তের কৃতিত্ব প্রসঙ্গে অসিতকুমার ভট্টাচার্য বলেছেন:

> আমরা যতদূর জানি এর পূর্বে শিশুশিক্ষার বিষয়ে গভীর বিস্তৃত আলোচনা করেন ফ্রোয়েবেল (ফ্রীডরিশ হ্বিল হেলন ফ্রোয়েবেল, ১৭৮২-১৮৫২), যিনি kindergerten (শিশু উদ্যান) বিদ্যালয়ের স্রষ্টা ও স্বপ্নদ্রষ্টা। প্রত্যেক মানব শিশুকে তার নিজস্ব সত্তার বিকাশে সাহায্য করা, পড়ার সঙ্গে শিশুর খেলার কঠিন বিচ্ছেদ দূর করা, কঠিন শাসনের আওতা থেকে শিশুর শিক্ষার পরিবেশকে মুক্ত করে, শিশুর কাছে বিদ্যালয়কে আনন্দময় করে তোলা, শিশুর মনের দিকে, মনের স্বাভাবিক স্ফূর্তির দিকে লক্ষ্য রেখে উপযুক্ত শিক্ষা দান ইত্যাদি বিষয়ে মনোবিজ্ঞান সম্মত আধুনিক শিশু শিক্ষাদর্শের জনক হিসেবে ফ্রোয়েবেল সর্বত্র সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি লাভ করেছেন। আমরা জানি না, অক্ষয় দত্ত ফ্রোয়েবেলের চিন্তা সঙ্গে কতটা পরিচিত ছিলেন। কিন্তু তাঁর শিক্ষাচিন্তা সে-যুগে পৃথিবীর সবচেয়ে অগ্রসর চিন্তার সহযোগী ছিল এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।[৯৮]

দ্বিতীয় স্তর বা পর্ব : মাধ্যমিক শিক্ষা

অক্ষয়কুমার দত্ত কেবল শিশুশিক্ষা নিয়ে কথা বলেই থেমে যাননি, তিনি সেই পথ ধরে আরও সামনে এগিয়েছেন। দুই থেকে ছয়-সাত বছর পর্যন্ত শিশু প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর মাধ্যমিকে গিয়ে কী করবে, সেই বিষয়েও তিনি ভেবেছেন। ছয়-সাত থেকে চৌদ্দ-পনেরো বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষার দ্বিতীয় স্তর বা মাধ্যমিক শিক্ষা। মাধ্যমিক শিক্ষা কোন পদ্ধতিতে চলবে, কীভাবে পড়ানো হবে তারও একটি সুন্দর কাঠামো তিনি তৈরি করে দিয়েছেন। শিক্ষার দ্বিতীয় স্তর বা পর্বে এসে তিনি এ শিক্ষার তেরোটি বিষয় নির্দেশ করেছেন। তাঁর সেসব নির্দেশ একটি শিশুর প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠার পথনির্দেশনাস্বরূপ। অক্ষয়কুমার লিখেছেন'[৯৯] :

১. ভাষা শিক্ষার উপযোগী পুস্তক পাঠ, এবং লিপি অভ্যাস ও প্রস্তাব-রচনা শিক্ষা করা উচিত; কেননা এই তিন বিষয় জ্ঞান শিক্ষা ও প্রচার করিবার প্রধান উপায়।

২. পাটীগণিত, বীজগণিত, রেখাগণিত প্রভৃতি গণিত শাস্ত্রও শিক্ষা করা কর্ত্তব্য; কেননা জ্যোতিষাদি কতকগুলি বিদ্যা অধ্যয়ন করিতে হইলে, গণিতবিদ্যা, আবশ্যক করে। গণিতবিদ্যা, জ্যোতিষ ও শিল্পাদি অধ্যয়নের এক প্রধান সোপান।

৩. ভূগোল। ভূগোলবিদ্যা অভ্যাস করিয়া দেশ, প্রদেশ, নগর, গ্রাম, নদী, সমুদ্র প্রভৃতির স্বভাবসিদ্ধ ও মনুষ্য-কল্পিত চতুঃসীমা অবগত হওয়া উচিত, এবং প্রত্যেক দেশের জল, বায়ু ও ভূমির কিরূপ গুণ, তথায় কোন্ কোন্ বস্তু উৎপন্ন হয় এবং আচার ব্যবহার ও রাজ্য শাসনের কিরূপ প্রণালী প্রতিষ্ঠিত আছে, এই সমুদায়ের সবিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক।

৪. প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত। এই বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া জন্তু, উদ্ভিদ ও ধাতু সমুদায়ের বিস্তারিত বিবরণ অবগত হওয়া উচিত। কিন্তু কেবল পুস্তক পাঠ করিয়া ক্ষান্ত হইলে, তাদৃশ ফল দর্শে না। যে সকল সামগ্রীর বর্ণনা পাঠ করিতে হয়, তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া গুণাগুণ পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য।

৫. রসায়ন। চতুর্দিকে যাবতীয় জড় বস্তু প্রত্যক্ষ হইতেছে, তৎসমুদায় কি কি রূঢ় পদার্থের যোগে উৎপন্ন হইয়াছে, এবং কোন্ পদার্থের সহিত কোন্ পদার্থের যোগ করিলে কি রূপ গুণ সমুদ্ভূত হয়, রসায়নবিদ্যায় এই সমস্ত বিষয়ের সবিশেষ বৃত্তান্ত লিখিত থাকে।

৬. শারীর ও শারীরবিধান। এই দুই প্রধান বিদ্যা অধ্যয়ন করিলে, শরীরের প্রত্যেক অঙ্গের অবয়ব-সংস্থান ও তৎসংক্রান্ত স্বাভাবিক নিয়ম শিক্ষা করা যায়।

৭. পদার্থবিদ্যা। রসায়ন ও শারীরবিধান অধ্যয়ন দ্বারা জড় পদার্থের যে সমস্ত গুণ অবগত হওয়া যায়, তদ্ভিন্ন তাহাদের অন্য অন্য গুণ, পরস্পর সম্বন্ধ, গতির নিয়ম ও কার্য্য-প্রণালীর বিষয় পদার্থবিদ্যায় নির্দ্দিষ্ট থাকে। জল, বায়ু ও জ্যোতির স্বভাব এই বিদ্যায় বর্ণিত থাকে। শিল্প ও জ্যোতিষ এই বিদ্যারই অন্তর্গত। এ বিদ্যার অনুশীলন করিলে, অন্তঃকরণ প্রসন্ন ও প্রশস্ত হয়, বুদ্ধিবৃত্তি মার্জিত ও বর্দ্ধিত হয়।

৮. পুরাবৃত্ত। সুপ্রণালী-সিদ্ধ পুরাবৃত্ত বিষয়ক পুস্তক পাঠ করিলে, কি কারণে কোন্ দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, এবং কি কারণেই বা জাতি-বিশেষের অধঃপতন হইয়াছে, তাহা অবধারণ করা যায়।

৯. লোকযাত্রাবিধান। সামাজিক কর্ত্তব্য সাধন ও বৈষয়িক কর্ম্ম সম্পাদনের সুবিহিত রীতি অবলম্বন ও সংস্থাপনার্থে এই বিদ্যা অধ্যয়ন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

১০. মনোবিদ্যা ও ধর্ম্মনীতি। এই দুই পরম মঙ্গলদায়ক প্রধান বিদ্যা অধ্যয়ন করিলে, মনুষ্যের মানসিক স্বভাব, মনোবৃত্তি সমুদায়ের প্রয়োজন অপ্রয়োজন এবং ধর্ম্ম সংক্রান্ত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণ করিতে সমর্থ হওয়া যায়।

১১. পরমার্থ বিদ্যা। বিশ্বকার্য্য পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক বিশ্বাধিপের স্বরূপ ও অভিপ্রায় নিরূপণ করিয়া তাঁহার যথার্থ আরাধনা উপদেশ করা পরমার্থ বিদ্যার প্রয়োজন।

১২. সাহিত্য। সাহিত্য পাঠ দ্বারা সাতিশয় বিশুদ্ধ আনন্দ অনুভূত হয়, এবং যদি তাহাতে পরম পবিত্র পারমার্থিক বিষয়ের বর্ণনা থাকে, তাহা হইলে অন্তঃকরণস্থ সৎবৃত্তি সমুদায় উন্নত ও পশিোধিত হইয়া অপার আনন্দ উদ্ভাবন করে।

১৩. চিত্রবিদ্যা শিল্পবিদ্যা। পরমেশ্বর মনুষ্যকে চিত্রবিদ্যা, তুর্য্যবিদ্যা প্রভৃতি উপকারজনক ও লোকরঞ্জন শিল্পবিদ্যা শিক্ষার উপযোগী বিবিধ বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, অতএব তৎসমুদায় মনুষ্যের সুপ্রণালী ক্রমে শিক্ষণীয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

উনিশ শতকের বাঙালির শিক্ষাচিন্তায় অক্ষয়কুমার দত্তের এ চিন্তা যে অসামান্য তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। জাতীয় শিক্ষার পদ্ধতিতে এমন বৈজ্ঞানিক শৃঙ্খলা তাঁর আগে বাংলা ভাষায় আর দেখা যায়নি। "অক্ষয়কুমার উল্লিখিত বিষয়গুলো যেভাবে নির্দেশ করেছেন এবং শিক্ষার্থীদের বয়স যেভাবে বেঁধে দিয়েছেন, তাতে শিক্ষার এ সময়টা আরও গুরুত্ব পেয়েছে । শিক্ষার্থীরা যাতে আনন্দের সঙ্গে এ শিক্ষা অর্জন করতে পারে, সে সম্পর্কে তিনি বলেছেন–'শিক্ষার্থীরা যা শিখবে এবং যে বিষয়গুলো শিখবে, সেগুলো তারা কেবল অবহিত হবে না, যে বিষয়গুলো বিশেষ পরীক্ষা না করলে যথার্থ জ্ঞান হয় না, সেগুলো পরীক্ষা করে দেখবে।"[১০০] বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন: "যদি ব্যায়াম শিক্ষার 'উপদেশ' শোনা যায় কিন্তু 'নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে হস্ত পদাদি সঞ্চালন' না করা যায়, তবে শত বছরেও সে উপদেশে শারীরিক স্বাস্থ্যের কোনো উন্নতি হবে না।"[১০১] এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেছেন :

> যখন বালক-বালিকারা কোন বস্তুর বিষয় শিক্ষা করে, তখন যাহাতে আপনারা তাহার আকার, প্রকার, লঘুত্ব, গুরুত্ব, কাঠিন্য, কোমলতা, ঘনত্ব, তারল্য প্রভৃতি প্রত্যক্ষ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারে, এবং তাহা কোন্ দেশে কিরূপে উৎপন্ন হয়, কি প্রকারেই বা প্রাপ্ত হওয়া যায়, কোন্ কোন্ বস্তুর সহিত মিশ্রিত হইলে তাহার কিরূপ গুণ প্রকাশ পায় এই সমস্ত বিষয় সবিশেষ অনুসন্ধান ও পর্য্যালোচনা করিয়া বুঝিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।[১০২]

তৃতীয় স্তর বা পর্ব : উচ্চশিক্ষা

অক্ষয়কুমার উচ্চশিক্ষা বা তাত্ত্বিক শিক্ষার জন্য শিক্ষার্থীর বয়সক্রম পনেরো থেকে বাইশ বছর নির্ধারণ করেছেন। শিক্ষার প্রথম দুটি স্তর অতিক্রম করে শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষামুখী হতে পারবে। সে ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করার মতো যোগ্যতার শিক্ষার্থীর আছে কিনা সেই প্রশ্ন তুলেছেন। কারণ উচ্চশিক্ষার জন্য যে পরিমাণ মেধাশক্তি আর্থিক সামর্থ্য থাকা জরুরি তা বেশিরভাগ শিক্ষার্থীরই থাকে না। এসব দিক বিবেচনা করে অক্ষয়কুমার সে শিক্ষার পক্ষে জোর দাবি তুলেননি। শিক্ষার গুরুত্ব বিবেচনায় তিনি শিক্ষার একটা সর্বজনীন স্তর পর্যন্ত শিক্ষা করাকেই সংগত মনে করেছেন। তাঁর উচ্চশিক্ষার ধারণা সম্পর্কে সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন:

> ....নির্বাচিত কিছুসংখ্যক মেধাবী ছাত্রই কেবল বিশ থেকে বাইশ বছর বয়স অবধি উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাবে। বাকি সাধারণ মেধার ছাত্রদের কারিগরি এবং পেশার পক্ষে উপযোগী শিক্ষা দিতে হবে— বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বগত উচ্চশিক্ষা তাদের ক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন।[১০৩]

অক্ষয়কুমারের মতে প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের যে শিক্ষার আয়োজন, তা শিক্ষার সূচনা মাত্র। সেটা 'জ্ঞান-ভূমি আরোহণের' প্রস্তুতিপর্ব। প্রকৃত শিক্ষা যা 'উদ্‌যাপন করা কর্ত্তব্য', তা '১৫ অবধি ২০/২২ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত শিক্ষা লাভ বিষয়ে বিশিষ্ট যত্নবান হওয়া আবশ্যক।' কারণ এ 'সময়ে মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তি দিন দিন পরিপক্ক হইতে থাকে, এবং তন্নিমিত্তি তখন বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় প্রগাঢ় তত্ত্ব সমুদায়ের আলোচনায় অভিনিবেশ করিতে পারা যায়।'[১০৪] অক্ষয়কুমারের 'উচ্চশিক্ষা' বিষয়ক পর্বটিকে আমরা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষা হিসেবে ধারণা করতে পারি। কারণ তিনি এ পর্বে 'গণিত, আন্বীক্ষিকী [ন্যায়দর্শন], পদার্থবিদ্যা, জ্যোতিষাদি যাবতীয় বিজ্ঞান ও দর্শন শাস্ত্রের প্রধান প্রধান অঙ্গ সমুদায় রীতিমত শিক্ষা করিতে হয়।'[১০৫] তাছাড়া সব শিক্ষার্থীর

Dhaka University Institutional Repository

উচ্চশিক্ষা সবার জন্য দরকারও নেই। যে শিক্ষায় ধনী-দরিদ্র যেকোনো শিক্ষার্থী শিক্ষিত হয়ে কর্মজীবনে প্রবেশ করতে পারে সেটাই বেশি জরুরি। সে ক্ষেত্রে তিনি কর্মানুসারে শিক্ষার্থীকে দক্ষতা অর্জন করতে বলেছেন। অর্থাৎ শিক্ষার্থী যে কাজ বেছে নেবে, তাকে সেই বিষয়ে নিপুণ হতে হবে। তাহলে সে তার কর্মে দক্ষ ও যোগ্য হতে পারবে।

১১

নারীশিক্ষা ও শিশুর বিকাশে শিক্ষিত মায়ের ভূমিকা

অক্ষয়কুমার দত্ত we‘¨v‘kb (১৮৪২) পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে নারীশিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরেন। প্রবন্ধগুলোতে তিনি নারীশিক্ষার প্রবর্তন, বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ বন্ধের যে দাবি করেন তা সেকালের সমাজে এক ধরনের সংস্কার আন্দোলনের রূপ নেয়। তাঁর এ কাজের অন্তত এক যুগ পরে আমরা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে সমাজসংস্কারমূলক কাজে ব্রতী হতে দেখি। অক্ষয়কুমার নারীশিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরে ১৮৪২ সনের জুন মাসে we‘¨v‘kb পত্রিকায় ‘হিন্দু স্ত্রীদিগের বিদ্যাশিক্ষা’ নামে একটি প্রবন্ধ লিখেন। এতে শুরুতেই তিনি লিখেছেন–“এদেশীয় পুরুষেরা সম্পূর্ণ বিদ্যাধিকারী, কিন্তু স্ত্রীলোকেরা যে কি জন্য তাহাতে বঞ্চিত তাহার কারণ প্রত্যক্ষ হয় না।”[১০৬] সেকালে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে তাঁর এ ধরনের মনোভাব ছিল সম্পূর্ণ নতুন এবং আধুনিক। এ ক্ষেত্রে তিনি হিন্দু সমাজে নারীর ‘কুলধর্ম্ম’ এবং ‘জাতিরক্ষার’ কঠিন নিয়মের বিরোধিতা করেননি। এর কারণ সেকালের সমাজের বাস্তব অবস্থাটা তাঁর জানা ছিল। তাই তিনি সরাসরি সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে না গিয়ে কৌশলে এগিয়েছেন। তিনি নারীশিক্ষা বিস্তারে তাদের ঐক্যবদ্ধ সহায়তা প্রত্যাশা করেছেন। তিনি বলেছেন:

> আমরা সকল উপায়াপেক্ষা এ বিষয়ের জন্য একতার প্রতিই অধিক নির্ভর করিতে পারি এবং স্ত্রীবিদ্যার উন্নতি কল্পে দেশহিতৈষী জনসমূহের যুক্ত সাহায্য ভিন্ন অন্য কিছুই শুভকর বোধ করি না; অতএব আমরা একান্তরূপে অনুরোধ করিতেছি, দয়াশীল মহাশয়েরা ঐক্য-বাক্যে একত্র হইয়া এতদ্দেশীয় স্ত্রীবিদ্যার উন্নতি নিমিত্ত একটি সভাস্থাপন করুন, এবং দৃঢ়রূপে তৎসমাজের কার্য্য বিষয়ে মনোযোগী হউন।....দোহাই বঙ্গদেশের ধনীবর্গ, আপনারা এই বিষয়ে উৎসাহি হউন।[১০৭]

অক্ষয়কুমার দত্ত ‘স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাভ্যাস’ প্রবন্ধে লিখেছেন:

> এইক্ষণে হিন্দু স্ত্রীদিগের যেরূপ কুল ধর্ম্ম এবং জাতি রক্ষার যে প্রকার কঠিন নিয়ম দৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে স্ত্রীবিদ্যা সাধারণ্যে হওয়া দুরূহ।.....সুতরাং ঐ সকল প্রতিবন্ধক সত্ত্বে ইহা সমাধা করা সামান্য কার্য্য নহে; অতএব এই বিষয়ের পরীক্ষার্থ জন-সমাজে আমরা এক প্রস্তাবোত্থাপন করিতে অভিলাষ করিয়াছি। তাহা মনোনীত জ্ঞান করিয়া যদি অন্য অন্য ভ্রাতা সম্পাদকগণ অগ্রসর হয়েন,তবে অনুমান করি,সাধারণ জনসমূহেরও উৎসাহ হইতে পারে।[১০৮]

অক্ষয়কুমার দত্ত নারীশিক্ষার ব্যাপারে যে সময়ে এসব প্রবন্ধ লিখে শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করছিলেন, সে সময়ে নারীশিক্ষার অবস্থা তাঁর প্রত্যাশার মতো উৎসাহ–ব্যঞ্জক ছিল না। এর প্রধান কারণ তাঁর আগে নারীশিক্ষা নিয়ে গভীরভাবে কেউ ভাবেননি। রাজা রামমোহন রায় ভারতীয়দের শিক্ষার ব্যাপারে গভর্নর জেনারেলের কাছে যে আবেদন করেছিলেন, তাতে সংস্কৃত শিক্ষার পরিবর্তে ইংরেজি শিক্ষার উপযোগিতা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ মতামত থাকলেও নারীশিক্ষা বিষয়ে তাঁর কোনো সক্রিয় ভূমিকা ছিল না। ‘এমনকি বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠিত হলেও স্ত্রীদেরকে স্কুলে প্রেরণ করা কেবল দ্বিধা ছিল না, রীতিমত আপত্তি ছিল।[১০৯] সমাজ-মানস প্রতিকূল থাকায় ১৮২০ থেকে ১৮৪০-এর দশকের মধ্যে স্ত্রীরা শিক্ষার স্বাভাবিক সুযোগ পায়নি। সেকালে নারীশিক্ষার প্রতিবন্ধকতার পেছনে ‘শাস্ত্রীয় ও দেশাচারের সমস্যা’ এবং ‘খ্রিষ্টান হবার ভয়’ এ দুটি কারণ সক্রিয় ছিল। অক্ষয়কুমার দত্তের ‘হিন্দু স্ত্রীদিগের দুঃখমোচনীয় সম্বাদ’ প্রবন্ধ লিখেছেন। তিনি খ্রিস্টান হওয়ার ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত সমাজকে উদ্দেশ করে লিখেছেন:

> আমরা পৃথিবীমধ্যে যে যে বিষয়কে আনন্দবর্দ্ধক বলিয়া জানি হিন্দু রমণীগণের বিদ্যাভ্যাস এবং সভ্যতা শিক্ষা তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠরূপে গণ্য আছে। এদেশীয় স্ত্রীলোকেরা বিদ্যাবতী হইবেন এই সমাচার আমারদিগের কর্ণপথে অতিশয় মিষ্টভাবে আগমন করিয়া থাকে, এবং তাহার চিত্রণে অন্তঃকরণ আনন্দসাগরে সন্তরণ

Dhaka University Institutional Repository

> করে। আমরা শঙ্কাশূন্য হইয়া কহিতে পারি, হিন্দু স্ত্রীদিগের অজ্ঞানাবস্থায় হিন্দুজাতির সভ্য সংজ্ঞা কখনই হইবেক না।[১১০]

অক্ষয়কুমার মানসগত ক্রিয়ায় স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য করেননি। জ্ঞান অর্জন ও বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে তিনি উভয়ের জন্য সমান অধিকার ও গুরুত্বের দাবি করেছেন। তিনি বলেছেন:

> .... দর্শন ও শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়বোধ, স্মরণ, চিন্তন, ও তুলনাদির বুদ্ধি শক্তি, এবং সুখ, দুঃখ, ঘৃণা, আশা, ক্রোধাদি চিত্তবিকার ইত্যাদি সমুদয় বিদ্যার উপযোগী যে মনের কার্য্য তাহা কি পুরুষ, কি স্ত্রী, উভয় জাতিতেই এপ্রকার সমান রূপে প্রত্যক্ষ হইতেছে, যে উভয়ের পক্ষেই সমূহ জ্ঞানশিক্ষা ব্যতীত এই সংসার মধ্যে কালযাপন করা অসাধ্য। পরমেশ্বর এই সকল জ্ঞানজনক রত্নে পৃথিবীস্থ লোকদিগকে ভূষিত করিয়াও কৃপা বিতরণে, এবং স্বাভিপ্রায় প্রকাশে ক্ষান্ত হয়েন নাই। তিনি আমারদিগের মনোমধ্যে যে এক জ্ঞানৈষা, অর্থাৎ জ্ঞানের বাঞ্ছা করিয়া দিয়াছেন, যাহার দ্বারা আমরা স্বচেষ্টায় নানা প্রকার বিদ্যাভ্যাসে উৎসাহিত হই, সেই জ্ঞানৈষা স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতিতেই সমান।[১১১]

অশিক্ষিত স্ত্রী পরিবারের জন্য কতটা পীড়াদায়ক হয়, সে সম্পর্কে অক্ষয়কুমার বলেছেন:

> কি আক্ষেপের বিষয়! যৎসামান্য সাংসারিক কথা এবং কোন ইতর সুখের প্রসঙ্গ ব্যতিরেকে তৎসন্নিধানে [স্ত্রীর] আর কোন বিষয়ই উত্থাপন করিবার উপায় নাই। বিদ্যার প্রসঙ্গ, ধর্ম্মের যথার্থ তত্ত্ব, সংসারের সুখজনক কোন নূতন প্রথা সংস্থাপন ইত্যাদি হৃদয় ভাণ্ডারের অমূল্য রত্ন সকল তাহার নিকটে প্রকাশ করা যায় না। ইহাতে এমন যে সুলভ সুখ সংসার ধাম, তাহাও বিপদরূপ বিষম-বিষদূষিত হইয়া সর্ব্বদাই দুঃখরূপ দারুণ রোগের উৎপত্তি হয়।[১১২]

নারীশিক্ষার কীভাবে সম্পন্ন করা যায় সে বিষয়েও অক্ষয়কুমার সজাগ ছিলেন। তিনি লিখেছেন:

> এক্ষণে আমাদিগের দেশ যেরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত, তাহাতে স্বামী স্বীয় পত্নীকে শিক্ষা দান না করিলে আর উপায় নেই। স্ত্রীগণ পিতৃ-গৃহে শিক্ষা পায় না, এবং যদিও এক্ষণে কেহ কেহ আপনা কন্যাকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু সে শিক্ষা প্রকৃতরূপ বিদ্যা-শিক্ষা বলিয়া ধর্ত্তব্য নহে। কি বিধানানুসারে গৃহ-কার্য্য সম্পাদন করিতে হয়, এবং কিরূপেই বা সন্তানদিগকে উচিতমত শিক্ষাদান ও প্রতিপালন পূর্ব্বক ধর্ম্ম-পথে প্রবৃত্ত করিয়া বিনীত করিতে হয়, এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকেরা তাহার রীতিমত শিক্ষা পায় না। এই নিমিত্ত, ভর্ত্তা ও ভার্য্যা উভয়কেই নানা বিষয়ে অসুখী থাকিতে হয়, সন্তান সকল অবিনীত ও অসচ্চরিত্র হইয়া পিতা মাতার অশেষপ্রকার ক্লেশ উৎপাদন করে, এবং পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগের দোষে অন্য অন্য পরিজনেরাও অনেক বিষয়ে মনঃপীড়া পায়। অতএব, স্ব স্ব সহধর্ম্মিণীকে বিদ্যারূপ সুধা-রসে স্বাদগ্রহে সমর্থ করিতে যত্ন করা স্বামীদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য।[১১৩]

অক্ষয়কুমার দত্ত মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের সুখ-সমৃদ্ধির জন্য পরিবারের সুস্থতার ওপর জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে পরিবারের ভিত্তি আলগা হলে সব দিক থেকেই জীবন শুষ্ক হয়ে ওঠে। এই শুষ্কতা থেকে মুক্তি পেতে হলে স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই সহযোগিতা দরকার। পারস্পরিক স্নেহ-প্রেম ও শ্রদ্ধাবোধ না থাকলে এই সহযোগিতা রক্ষা করা কঠিন। আর এ কারণে স্বামীর মতো স্ত্রীর শিক্ষাও অত্যন্ত জরুরি। সেকালের সমাজ প্রেক্ষাপট বিবেচনা করেই তিনি নারীশিক্ষার ভার স্বামীর ওপর অর্পণ করেছেন। কারণ তখনকার সমাজে স্বামী ছিলেন পরিবারের একমাত্র কর্তা। উপার্জনক্ষম ব্যক্তি হিসেবে তিনিই সংসারের সব বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। শিশুশিক্ষায় শিক্ষিত মায়ের ভূমিকা সম্পর্কে অক্ষয়কুমারের মতো উনিশ শতকের বাংলায় আর কেউ ভাবেননি। অক্ষয়কুমার নারীশিক্ষার নানা দিক সম্পর্কে লিখেছেন:

> স্ত্রীগণের কর্ত্তব্য অবধারিত হলেই, তাহাদের শিক্ষা প্রণালীও অবধারিত হইবে। গৃহ-ধর্ম্মের বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে, সন্তান উৎপাদন, তাহার রক্ষাণাবেক্ষণ ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন, স্নেহ, প্রীতি, ও ক্ষমা প্রদর্শনপূর্ব্বক পরিজনবর্গের সন্তোষ সাধন ও আনন্দ বর্দ্ধন এই সমুদায় বিষয় যাহাতে সুচারু রূপে সম্পন্ন হয়, তাহা উত্তমরূপে অভ্যাস করা স্ত্রীগণের প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতে থাকে।[১১৪]

নারীশিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করে অক্ষয়কুমার চারটি সূত্র উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন:

> প্রথমত : যাহাতে আপনার ও সন্তানের শরীর সুস্থ স্বচ্ছন্দ থাকে, তাহার উপায় করা জননীর প্রধান কর্ম্ম। সন্তানের শারীরিক প্রকৃতির গুণাগুণ পিতামাতার শারীরিক প্রকৃতির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। অতএব, সন্তানের কল্যাণ উদ্দেশেও, তাঁহাদিগকে স্বীয় শরীর সুস্থ রাখিবার নিমিত্ত যত্ন করা কর্ত্তব্য। জননী স্বীয় সন্তানের স্নেহ-বন্ধনে যেমন বদ্ধ থাকেন, এবং যেরূপ অকপট হৃদয়ে একান্ত মনে তাহার কল্যাণ প্রার্থনা করেন, ভূমণ্ডলে তাহার আর দ্বিতীয় উপমা-স্থল নাই। তিনি সন্তানের নিমিত্ত যথার্থই প্রাণ পর্য্যন্ত সমর্পণ করিতে

পারেন। কিন্তু তনয় ও তনয়ার এরূপ একান্ত শুভাভিলাষিণী হইয়াও যে জ্ঞান বিরহে তাহাদের জীবন রক্ষণে ও স্বাস্থ্যসাধনে অসমর্থ হন, এবং তাহাদের নিতান্ত অশুভ-সূচক কর্ম্মকে শুভ-সূচক জ্ঞান করিয়া তাহার অনুশীলন করিয়া থাকেন, ইহা যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণার বিষয়। ....তাহাদিগের শরীর সুস্থ রাখা অপেক্ষায় মাতার অধিকতর বাঞ্ছিত ও গুরুতর কর্ত্তব্য আর কি আছে? অতএব, তদর্থে শারীরস্থান ও শারীরবিধান বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া শারীরিক নিয়ম শিক্ষা করা স্ত্রীগণের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। প্রসিদ্ধ চিকিৎসকদিগের ন্যায় তাঁহাদের ঐ উভয় বিদ্যায় বিশিষ্টরূপ ব্যুৎপন্ন হওয়া আবশ্যক না হউক, কিন্তু শরীরের যে যে অংশ ও যে যে নিয়মের উপর শারীরিক সুস্থতা নির্ভর করে, তদ্বিষয়ের জ্ঞান উপার্জ্জন করা নিতান্ত আবশ্যক তাহার সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয়ত : শিশু সন্তানদিগকে সুন্দর রূপ শিক্ষিত ও বিনীত করা জননীর অন্য একটি প্রধান কর্ম্ম। যেরূপ শিক্ষিত ও বিনীত করিলে, বুদ্ধি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সমুদায় তাহাদের বশবর্তী হইয়া কার্য্য করে, শিশুগণকে সেইরূপ শিক্ষিত ও বিনীত করা কর্ত্তব্য। এই পরম রমণীয় মনোরথ সাধন করিতে হইলে, আমাদের কি কি মনোবৃত্তি আছে, কোন্ বৃত্তির কি রূপ স্বভাব ও কি প্রয়োজন, তাহাকে প্রবল বা দুর্ব্বল করিতে হইলে কি উপায় কর্ত্তব্য, কোন্ বিষয় উপস্থিত হইলে কোন্ বৃত্তি উত্তেজিত হয় এই সমুদায় বিষয় সুপ্রণালীক্রমে শিক্ষা করিবার নিমিত্ত মনোবিষয়ক বিদ্যা অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য। দিগ্দর্শন ব্যতিরেকে অসীম-প্রায় মহাসমুদ্রে সমুদ্রপোত পরিচালন করা আর মনোবিদ্যা ও ধর্ম্মনীতি বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন না হইয়া বালক বালিকাদিগকে শিক্ষিত ও বিনীত করিবার চেষ্টা পাওয়া উভয়ই তুল্য।

তৃতীয়ত : শিশুগণ সচরাচর যে সকল বস্তু দেখিতে পায়, মাতাকে সর্ব্বদাই তাহার বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে। অতএব, চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী সমস্ত বিশ্ব-ব্যাপার যে সকল শুভকর নিয়মানুসারে সম্পন্ন হইতেছে, তাহা সুপ্রণালীক্রমে শিক্ষা করা স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য। এবং তদর্থে তাঁহাদিগের পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত ( ), নানা জাতীয় পুরাবৃত্ত ও স্বদেশীয় সামাজিক ব্যবস্থার বিষয় অধ্যয়ন করা বিধেয়।

চতুর্থত : যে সমস্ত শুভকর বিষয় স্ত্রীলোক মাত্রেরই শিক্ষা করা কর্ত্তব্য, তাহাই এ স্থলে প্রদর্শিত হইল। তদ্ভিন্ন, তাঁহাদের গীত-বাদ্যাদি কতকগুলি মনোরঞ্জন গুণ থাকিলে, সংসারাশ্রম অনুপম সুখের আস্পদ হইয়া উঠে। .... তাহাদিগের অন্যান্য গুরুতর বিদ্যা অধ্যয়ন করা আবশ্যক বলিয়া এই সমুদায় সুখকর বিষয়ের অনুশীলনে একেবারে ঔদাস্য প্রকাশ করা উচিত নহে।[১১৫]

অক্ষয়কুমার এখানে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, প্রাকৃতিক ইতিহাস প্রভৃতি শিখে মায়েদের 'বিশ্ব-কোষ' হতে বলেছেন শিশুকে ঐসব বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য । কারণ শিশুরা চোখের সামনে যা কিছু দেখে, সেসব বিষয়েই তাঁর মা-বাবাকে জিজ্ঞাসা করে। সাধারণত পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা ও প্রাকৃতিক ইতিহাসের উপাদানের মতো জিনিসগুলোই শিশুর চোখের সামনে বেশি পড়ে। কাজেই এসব উপাদান সম্পর্কে মায়েদের যদি সাধারণ জ্ঞান (General knowledge) না থাকে, তবে তাঁরা শিশুকে শিক্ষায় সহায়তা করতে পারবেন না। অন্যদিকে শিশুর অসংখ্য প্রশ্নের উত্তরে মায়েদের ভুল করা বা ভুল শিক্ষা দেওয়াও শিশুর জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। বাল্যশিক্ষার ভিত্তি মজবুত না হলে জীবনে শিক্ষা যে অর্থবহ হয় না, এ শিক্ষা আমরা অক্ষয়কুমার দত্তের কাছ থেকে পেয়েছি। এ প্রসঙ্গে একজন বিখ্যাত বাঙালি ইতিহাসবিদ শিশুশিক্ষা প্রসঙ্গে বিশ শতকের শেষ পর্বে লিখেছেন :

স্মরণ রাখবেন, শিক্ষা দুরকম। জ্ঞানচর্চার শিক্ষা এবং চরিত্র গঠনের শিক্ষা। জ্ঞানচর্চার শিক্ষায় স্কুলের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। চরিত্র গঠনে প্রথম প্রয়োজন সুস্থ পারিবারিক জীবন এবং সামাজিক পরিবেশ। চরিত্র গঠনের ব্যাপারে শিশু কোনওদিনই শুনে শেখে না, শিশু দেখে শেখে। মনে রাখবেন শিশু বিচক্ষণ ব্যক্তি, বিশেষত বাঙালি মাত্রই জীবনের প্রথম পাঁচ বছর বুদ্ধিমান। বাবা, মা, স্বজনবর্গ এবং প্রতিবেশী সকলেই অলস, অসৎ এবং বিশ্বনিন্দুক এই সত্য যদি দৈনন্দিন জীবনে শিশু ও বালক লক্ষ করে, তাহলে রামচন্দ্র কি যুধিষ্ঠির, বিবেকানন্দ কি বিদ্যাসাগর কেউই ভবিষ্যতের আদর্শ নাগরিক তৈরি করতে পারবেন না। বরঞ্চ বয়স্কদের বক্তব্য এবং বয়স্কদের ব্যবহার পরস্পর বিরোধী হলে শিশুমনে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে। এই বিশৃঙ্খলা বিপজ্জনক।[১১৬]

অক্ষয়কুমার নারীকে কেবল স্ত্রী হিসেবে দেখেননি– মানুষ হিসেবে দেখেছেন। নারীর শারীরিক ও মানসিক শক্তি সম্পর্কে সেকালে প্রচলিত ধারণার মূলে আঘাত করেছেন তিনি । সর্বজনীন শিক্ষার বিস্তার ঘটিয়ে তিনি সমস্ত কুসংস্কার দূর করতে চেয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন:

Dhaka University Institutional Repository

> অনেকে বোধ করেন, স্ত্রীলোকের প্রকৃতি কোমল, তাহাদিগকে কোন কষ্ট-সাধ্য বিষয়-ব্যাপারেও নিযুক্ত হইতে হয় না, অতএব যে সকল বিষয় অনুশীলনার্থে প্রগাঢ় মানসিক পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয়, তাহা স্ত্রীগণের শিক্ষণীয় নহে। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে, তাঁহাদের এ অভিপ্রায় কোনরূপেই অঙ্গীকার করা যায় না। স্ত্রীদিগের যেরূপ শিক্ষা দান করা উচিত, যদিও তাহা অদ্যাপি প্রচলিত হয় নাই, তথাপি তাহারা যে নানা প্রকার প্রগাঢ়তর কঠিন বিদ্যার অনুশীলন করিতে পারে, এবং বিদ্যার্থী পুরুষদিগের ন্যায় মানসিক পরিশ্রমকে সুখের বিষয় বোধ করিয়া জ্ঞানালোচনায় অনুরক্ত হইতে পারে, ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।[১১৭]

অক্ষয়কুমার দত্তের আগে বাংলা ভাষায় শিক্ষাচিন্তার এই বিস্তৃত পরিসর ও শিক্ষার মৌল বিষয় সম্পর্কে এমন ধারণা অন্য কোনো বাঙালি চিন্তকের কাছ থেকে পাওয়া যায়নি। 'স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে অক্ষয়কুমার দত্তের মত বিজ্ঞানমনস্ক, মনুষ্যবোধসম্পন্ন, উদারনৈতিক ব্যক্তির মতামত কি ছিল তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে তাঁর সাথে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চিন্তার অখণ্ড ঐক্য ছিল। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগর উভয়েই সমাজ সংস্কার বিষয়ক চিন্তা এবং আন্দোলনের ক্ষেত্রে বড় আকারে ব্যবহার করেছিলেন। অক্ষয়কুমার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা যে কি অসাধারণ যোগ্যতার সাথে সম্পাদনা করেছিলেন এটা তৎকালীন সংবাদপত্র, বিধবাবিবাহ আন্দোলনসহ নানা সমাজ সংস্কার আন্দোলন, শিক্ষা আন্দোলন, স্ত্রীশিক্ষার আন্দোলন ইত্যাদি তাবৎ বিষয়ের ইতিহাসের সাথে যাঁদের সামান্য পরিচয় আছে তাঁরাই জানেন।'[১১৮] অক্ষয়কুমার নিজের চেষ্টায় বাংলা ভাষার মাধ্যমে আধুনিক চিন্তা-চেতনার দ্বার উদ্ঘাটন করে জাতীয় উন্নতির উপায় করে দিয়েছেন।

১২

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষার গুরুত্ব

ভারতবর্ষে রামমোহন রায়ের মনে প্রথম জ্ঞান-বিজ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা জাগে। তিনি আন্তরিকভাবে চাইতেন যে এদেশের মানুষের মনের মুক্তি ঘটুক। তখনকার বড়লাট আমহার্স্টকে লেখা তাঁর বিখ্যাত চিঠিতে পশ্চিমী রীতি অনুযায়ী বিজ্ঞানের শিক্ষা দেওয়ার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছিলেন। ডেভিড হেয়ার এবং তাঁর চেষ্টায় হিন্দু কলেজ (১৮১৭) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রামমোহন রায় সেখানে বিজ্ঞান চিন্তার সূত্রপাত করেন পরবর্তীতে অক্ষয়কুমার দত্তের মাধ্যমে তা বিস্তার লাভ করে। এ প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য লিখেছেন:

> বাংলায় বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনার পথ দেখিয়েছিলেন প্রধানতঃ ইউরোপীয়েরাই। কিন্তু ইউরোপীয় গ্রন্থকারদের মধ্যে একমাত্র ইয়েট্স ছাড়া অপরাপর লেখকদের প্রায় সকলের ভাষাই ছিল কৃত্রিম ও দুর্বোধ্য। উদাহরণস্বরূপ ফেলিক্স্ কেরী ও ম্যাকের দুর্বোধ্য ভাষার কথা উল্লেখ করা যায়। অক্ষয়কুমার দত্তই সর্বপ্রথম ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানকে দেশীয় সাজে সজ্জিত করেন। শুধু তাই নয়, তিনিই প্রথম বাঙ্গালী যিনি বাংলা ভাষার মাধ্যমে ইউরোপীয় বিজ্ঞানকে জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দিলেন।'[১১৯]

অক্ষয়কুমার দত্তের লেখা বিজ্ঞান বিষয়ক প্রথম বই f‡Mvj (১৮৪১ সনে) ব্রাহ্মসমাজ থেকে প্রকাশিত হয়। এতে নয়টি অধ্যায় আছে। এ বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ বের হয়নি। এ বই সম্পর্কে বলা হয় : 'অক্ষয়কুমারের গ্রন্থে পৃথিবীর আকৃতি, পরিমাণ, গোলত্ব , জলস্থলের বিবরণ, বিভিন্ন মহাদেশের প্রাকৃতিক ও বাণিজ্যিক বিবরণ এবং অধিবাসীদের ধর্ম ও ভাষা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সংক্ষিপ্ত হলেও পৃথিবীর রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল নিয়ে সামগ্রিক আলোচনার প্রয়াস ইতিপূর্বে প্রকাশিত শিশুসেবধি (১২৪৭ সাল) নামক গ্রন্থেও পাওয়া গিয়েছিল। অক্ষয়কুমারের গ্রন্থে এই প্রয়াস আরও বিস্তৃত ও সুপরিকল্পিত। তা' ছাড়া শিশুসেবধির তুলনায় তাঁর রচনা অনেক বেশী তথ্যসমৃদ্ধ।'[১২০] মাত্র একুশ বছর বয়সে অক্ষয়কুমার f‡Mvj বই লিখেছিলেন । এই বইয়ে ভারতবর্ষের ভাষা সম্পর্কে তিনি লিখেছেন:

> পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে আদিভাষা সংস্কৃত ব্যবহার ছিল। মধ্যে সংস্কৃতানুযায়ি প্রাকৃত ভাষা মগধ দেশাদিতে প্রচলিত হয়। পরে সংস্কৃতের পরিবর্ত্তে এবং তদনুসারে হিন্দুস্থানের স্থানে২ নানা ভাষার সংস্থান হয়। লঙ্কায় অদ্যাপি প্রায় সংস্কৃত চলিত আছে। দক্ষিণে মথুরা, মহীশূর, এবং মলয়বর প্রদেশের কিয়দংশে তামূল ভাষা প্রবলা। কানাড়ার দক্ষিণস্থ ইলী পর্ব্বত অবধি মলয়বর ত্রাবঙ্কুর প্রভৃতি স্থানে মলয়বর ভাষা প্রচলিতা আছে। কানাড়া দেশে কানাড়া ভাষা, মহারাষ্ট্র দেশে মহারাষ্ট্র ভাষা চলিতা।.... বঙ্গদেশে বঙ্গভাষা প্রবলা, ইহাতে

Dhaka University Institutional Repository

> সংস্কৃতমূলক অনেক শব্দ আছে। হিন্দুস্থানী ভাষা আগরা আলাহাবাদ বারনশী প্রভৃতি স্থানে প্রচলিতা, ইহার চলিত অক্ষর দেবনাগর এবং নাগর, ইহাতে অভিপ্রায় সুন্দররূপে ব্যক্ত করা যায়। [১২১]

অক্ষয়কুমারের বিজ্ঞানচর্চার শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে লেখা বই দিয়ে শুরু হলেও we‘¨v‘kb পত্রিকার মাধ্যমে সেটাকে তিনি সবার কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন। we‘¨v‘kb পত্রিকায় প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক রচনা ‘প্রাণীবর্গের বৃত্তান্ত’- থেকে একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

> যদিও বনৌষধিবর্গ হইতে প্রাণীবর্গের প্রভেদ স্পষ্টরূপে উপলব্ধি হয়। তথাচ কোন ২ বৃক্ষ এবং পশুর পরস্পর সদৃশ স্বভাব যে তাহারা কোন্ বর্গভুক্ত ইহা নির্ণয় করা অতিশয় কঠিন। সচেতন নামক এক প্রকার বৃক্ষ স্পর্শমাত্রই শরীর স্পন্দন এবং গমন করে এবং অনেক ২ বৃক্ষলতাদি অপেক্ষা বহুতর চেতনের কার্য্য প্রকাশ করিয়া থাকে। লজ্জাবতী নামে এক লতা স্পর্শমাত্র সজীবের ন্যায় সঙ্কোচিত হয়। আবার পলিপস নামক এক প্রকার পতঙ্গ সচেতন বৃক্ষ হইতেও ধীরগামী বোধ হয়, আর ছেদন করিলে কলমের বৃক্ষসম খণ্ড ২ হইয়া ও পৃথক্ ২ জীবন ধারণ করে, যাহা সচেতন নামক বৃক্ষে কদাচও প্রত্যক্ষ হয় না। এস্থলে প্রাণিবর্গ অপেক্ষা বনৌষধি শ্রেষ্ঠতর বোধ করা যাইতে পারে, কিন্তু পলিপসের স্থান পরিবর্ত্তন, আহার অন্বেষণ, ও বিপদ মোচনের উপায়চেষ্টা প্রভৃতি যে বিশেষ ২ শক্তি আছে তাহাতে সে প্রাণিবর্গ ব্যতীত কদাচ অন্য বর্গভুক্ত হইতে পারে না; অতএব অতি অধম প্রাণীও অতি উত্তম বৃক্ষ হইতে উৎকৃষ্ট।[১২২]

we‘¨v‘kb পত্রিকার ছয়টি সংখ্যায় চারটি বৈজ্ঞানিক রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। রচনাগুলো হচ্ছে ‘প্রাণীবর্গের বৃত্তান্ত’, ‘হিমালয় পর্বত’, সমুদ্র সম্বন্ধে’, এবং ‘পাঞ্জাবের লবণাকর’।[১২৩] ভূগোল ও ভূবিদ্যা-বিষয়ক রচনাও বিদ্যাদর্শন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।[১২৪] এতে বোঝা যায়, বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করে তুলতে তিনি কতটা সচেষ্ট ছিলেন । এ প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বলেন:

> বাংলা সাময়িক-পত্রে প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক আলোচনা প্রথম পাওয়া গেল বিদ্যাদর্শনে।.....বিদ্যাদর্শনের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলির অধিকাংশই অক্ষয়কুমারের রচনা বলে মনে হয়। বিদ্যাদর্শনের প্রবন্ধগুলির বৈশিষ্ট্য প্রকাশভঙ্গীর স্বচ্ছতায়। যথাযথ তথ্য সমাবেশও এই পত্রিকার রচনাগুলির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ইতিপূর্বেকার কোনো কোনো পত্র-পত্রিকায় তথ্য-সমাবেশ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রাথমিক প্রকৃতি।....বৈজ্ঞানিক তথ্যাদির পরিমিত সমাবেশ বিদ্যাদর্শনে পাওয়া গেল।[১২৫]

we‘¨v‘kb পত্রিকায় জ্ঞানবিজ্ঞান বিষয়ে উৎকৃষ্ট রচনা প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও তখনো জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি। কারণ তখন পর্যন্ত এসব লেখার উপযোগী নাগরিক রুচি তৈরি হয়নি। কাজেই ‘যে পরিকল্পনা নিয়ে অক্ষয়কুমার বিদ্যাদর্শন পত্রিকার পরিচালনা আরম্ভ করেছিলেন, তা পূর্ণাঙ্গ রূপ পেল তত্ত্ববোধিনীতে’।[১২৬] ZË‡ewabx cwÎKv পেয়ে তিনি পূববর্তী বিষয়ে আরও গুরুত্ব মনোযোগী হলেন। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বলেছেন : ‘এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করেই বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যে নবযুগের সূত্রপাত। আর এই নবযুগের উদগাতা হলেন অক্ষয়কুমার দত্ত।’[১২৭] ‘অসুস্থতার জন্য অক্ষয়কুমার যখন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় লেখা বন্ধ করলেন তখন এই পত্রিকার গ্রাহকসংখ্যা কমে সাত শত থেকে দু’শতে নেমে আসে। কাজেই, প্রথম বার বৎসরে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সাফল্য যে অক্ষয়কুমারের ব্যক্তিগত, তা’ বোধ করি অস্বীকার করা চলে না।’[১২৮] অক্ষয়কুমারের বিজ্ঞান-সাধনা এতটাই প্রভাব ফেলেছিল যে–সে যুগের কিছু কিছু পত্রিকা তাঁর নাম ভাঙ্গিয়ে পত্রিকার প্রচার বাড়াতে চেয়েছে। এই প্রসঙ্গে ‘উপহার’ পত্রিকার নাম করা যেতে পারে। ‘বঙ্গীয় লেখক চূড়ামণি শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত’ এই পত্রিকায় লিখে থাকেন বলে উপহারের বিজ্ঞাপনে ঘোষণা করা হয়।’[১২৯] ZË‡ewabx cwÎKvয় অক্ষয়কুমারের বিজ্ঞানবিষয়ক গুরত্বপূর্ণ প্রায় পঞ্চাশটি রচনা প্রকাশিত হয়েছিল।’[১৩০] অক্ষয়কুমার বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষার বিস্তার ঘটিয়ে এদেশের সাধারণ মানুষের কল্যাণ সাধন করতে চেয়েছেন। তাঁর সাধনা ছিল দেশ-সেবার সাধনা। দেশের চিত্তক্ষেত্রকে অশিক্ষার অন্ধকারের পীড়ন থেকে তিনি মুক্ত করতে চেয়েছেন। ‘এক কথায় আমরা যাকে বৈজ্ঞানিক মনোভাব (Scientific attitude) বলি, তার প্রচার করাই ছিল অক্ষয়কুমারের উদ্দেশ্য।’[১৩১] ZË‡ewabx cwÎKvয় প্রতিফলিত অক্ষয়কুমারের এই মনোভাব আলোচনা করে দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন :

> বস্তুত বিজ্ঞান বিষয়ক অনেক রচনাই তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত হয়।‘পদার্থবিদ্যা’ শীর্ষক একটি বই ধারাবাহিকভাবে বেরোয় যা বস্তুত পাঠ্যপুস্তক। মনে রাখবেন, তত্ত্ববোধিনী ছিল সেকালের সম্ভ্রান্ত মাসিক পত্র। তার পৃষ্ঠা সংখ্যাও ছিল সীমাবদ্ধ––মাসে চোদ্দো-পনেরো পৃষ্ঠা। তার মধ্যে এইসব বই ছাপা নিশ্চয়ই সহজ ছিল না।....অমানুষিক পরিশ্রম করে কাজটিকে তিনি তখনকার কালের শ্রেষ্ঠ পত্রিকা করে তোলেন। নিজের পড়াশোনার ঘাড়তটি তিনি পূরণ করে নেন কলকাতার প্রধান গ্রন্থাগারগুলির সদ্ব্যবহার করে। তার

> মধ্যে শোভাবাজারের রাজবাড়ি এবং উত্তরপাড়ার জমিদারগৃহের গ্রন্থাগার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এমনকী কলকাতার মেডিক্যাল কলেজের ক্লাসেও তিনি গিয়ে বসতেন উদ্ভিদবিদ্যা এবং প্রাণীবিদ্যা শিখবার উদ্দেশ্যে। মেডিক্যাল কলেজই ছিল তখনকার কলকাতায় একমাত্র আধুনিক বিজ্ঞানশিক্ষার প্রতিষ্ঠান।[১৩২]

দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আরও লিখেছেন:

> এইখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার। তখনও আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চার উপযোগী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এদেশে বড় একটা তৈরি হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না। উচ্চশিক্ষার উপযোগী কলেজই ছিল গোনাগুনতি। অক্ষয়কুমার সেই শূন্যতার মধ্যে সম্পাদকের কাজের সঙ্গে তুলে নিলেন জনশিক্ষার দায়িত্ব। এইভাবে দেখলে তবেই তত্ত্ববোধিনীতে 'পদার্থবিদ্যা' কিংবা 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার' কিংবা 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়'-এর মতো গ্রন্থের ধারাবাহিক প্রকাশের মর্ম বোঝা যায়। শেষোক্ত বইটি ছিল বলতে গেলে তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। দেড়শো বছর আগে ওই রচনায় তিনি সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের এরকম গোড়াপত্তন করেছিলেন।[১৩৩]

উনিশ শতকের আশির দশক পর্যন্ত "পূর্ববঙ্গে সে-সময় উচ্চশিক্ষা লাভের বিশেষ কোনো উপায় ছিল না। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দেও সমগ্র পূর্ব এবং উত্তরবঙ্গে ১৫টির বেশি উচ্চ বিদ্যালয় ছিল কিনা, সন্দেহ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ক্যালেন্ডার অনুসারে ঐ সময়ে পূর্ব এবং উত্তরবঙ্গে প্রথম শ্রেণীর কলেজ ছিল মাত্র ৩টি; এফ.এ. কলেজ ছিল মাত্র ৬টি; এবং আইন পড়াবার ব্যবস্থা ছিল মাত্র ৪টি কলেজ। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দেও সেখানে একটিও ডাক্তারী এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ছিল না।[১৩৪] এমন অবস্থায় অক্ষয়কুমার বিজ্ঞানের আলো হাতে এগিয়ে এসেছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৮৫৭) প্রতিষ্ঠার আগে তিনি বিজ্ঞান-সমুদ্রের বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে একলা তাঁর স্বজাতির কথা ভেবেছিলেন। তাঁ সে চেষ্টা বিফলে যায়নি। দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায় তার প্রমাণ দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন :

> ভারতী' পত্রিকার ১২৮৯ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যায় স্বর্ণকুমারী দেবী 'বিজ্ঞানশিক্ষা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখেন, যা থেকে বিজ্ঞান সম্বন্ধে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরপরিবারের সে যুগের মনোভাবের একটা আন্দাজ পাওয়া যায়। বিজ্ঞানচর্চার দ্বারা মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তি মার্জিত হয়, বিজ্ঞানের প্রণালী অনুসারে চিন্তা করিলে বুদ্ধিবৃত্তি দৃঢ়তা লাভ করে, কল্পনাসম্ভূত সিদ্ধান্ত হইতে আমরা মুক্তিলাভ করি। এক কথায় বিজ্ঞানের প্রণালী অনুসারে যাহাকে আমরা কুসংস্কার বলি তাহার অপনয়ন হয়। ...কেবল ইহাই নয়––যদি জাতীয় উন্নতি করিতে হয়, যদি ব্যবহারগত সুখের বৃদ্ধি করিতে হয় তো বিজ্ঞানকেই অবলম্বন করিতে হইবে।' এই প্রবন্ধ অবশ্যই অক্ষয়কুমার দত্তের বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার।'-এর অনেক পরে লেখা। তবু শেষ দুটি ছত্রে যেন অক্ষয়কুমারেরই প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। 'বাহ্যবস্তু'র উপক্রমণিকায় তিনি বলেছেন : 'ইয়োরোপীয় বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা বিজ্ঞান শাস্ত্রের অনুশীলন করিয়া নিশ্চয় জানিতেছেন, যৎ পরিমাণে জগতের নিয়ম নিরূপিত হইবে, ও লোকে তদনুসারে কার্য করিতে সমর্থ হইবে, তৎপরিমাণে তাহাদিগের সুখের বৃদ্ধি এবং অবস্থা ও স্বরূপের উন্নতি হইবে।[১৩৫]

অক্ষয়কুমার দত্ত 'পদার্থবিজ্ঞান' বিষয়ে ZË‡ewabx cwÎKvয় ধারাবাহিকভাবে লিখেছিলেন। পরে এসব লেখা বই আকারে প্রকাশিত (শ্রাবণ ১৭৭৮ শকাব্দে) হয়। এই বইয়ে তিনি জড় ও জড়ের গুণ, বিস্তৃতি, স্থিতিবিরোধ, পরমাণু, আকৃতি, মাধ্যাকর্ষণ, যোগাকর্ষণ, চৌম্বক, তাড়িতাকর্ষণ, তেজ, পরিচালকতা, কাঠিণ্য, স্থিতিস্থাপকতা, গতি, শক্তি, প্রভৃতি পদার্থের সম্ভাব্য সকল প্রকার গুণের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা করেছেন। এ বইয়ের 'বিজ্ঞাপন' এ তিনি লিখেছেন:

> এই পুস্তক প্রথম মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। ইহা কোন গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ নহে। চেম্বর্স ও আর্ণষ্ট প্রভৃতি ইংরেজি গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত ও অনুবাদিত হইয়াছে। আমি কোন উৎকট পীড়ায় পীড়িত থাকাতে, এই পুস্তক আদ্যোপান্ত উচিতমত সংশোধন করিতে সমর্থ হইলাম না। কিন্তু গবর্ণমেন্ট সংস্থাপিত অভিনব বাঙ্গালা বিদ্যালয় সমুদায়ের ছাত্রগণের ব্যবহারোপযোগী এতাদৃশ কোন পুস্তক বিদ্যমান নাই বলিয়া ইহাকে এই অবস্থাতেই প্রচার করিলাম। ইহা পাঠ করিয়া তাহাদিগের পদার্থ বিদ্যায় অনুরাগমাত্র জন্মিলে সমস্ত পরিশ্রম সার্থক বিবেচনা করিব।[১৩৬]

নবেন্দু সেন evn¨e¯i mwnZ gvbecKwZi m¤Ü‡Pvi গ্রন্থটিকে বিজ্ঞানবিষয়ক রচনার মধ্যে স্থান দিয়েছেন।[১৩৭] তবে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তা মনে করেন না। তিনি বলেন : 'অক্ষয়কুমার দত্তের 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার' নামক গ্রন্থটিকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (Natural Science) বিষয়ক পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ বলা যায় না। তবে এর যায়গায় যায়গায় বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি রয়েছে। এই গ্রন্থরচনার মূলে ছিল ধর্ম, বিজ্ঞান ও

দর্শনে লেখকের পাণ্ডিত্য এবং ব্রাহ্মধর্মের মধ্য দিয়ে শরীর, বুদ্ধি ও ধর্মভাবের উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা।'[১৩৮] অক্ষয়কুমার দত্তের Pvi¤cvV বিজ্ঞানের বই না হলেও এতে বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ পঞ্চান্নটি। বাকি তিরিশটি প্রবন্ধ সমাজ-সাহিত্য, শিক্ষা-ভাষা, নীতিতত্ত্ব ও স্বদেশপ্রেমমূলক।

১৩

বিজ্ঞান বিষয়ক রচনার ভাষা-বৈশিষ্ট্য

হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর "প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের স্থূল মর্ম" (১৮৭৩ সনে) নামে একটি বই লিখেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরে ১৯০৬ সনের মার্চ মাসে সেটি প্রকাশিত হয়। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এ বইয়ের ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন। তাতে তিনি বইটির ভাষা প্রসঙ্গে লিখেছেন :'পুস্তকের ভাষা বোধহয় পাঠকের নিকট স্থানে স্থানে জটিল ও দুর্বোধ মনে হইবে। কিন্তু তজ্জন্য রচনার দোষ দেওয়া চলিবে না। বাঙ্গালা ভাষা এখনও বিজ্ঞান প্রচারের উপযোগী হয় নাই। বিজ্ঞানের বাঙ্গালা এখনও গড়িয়া তুলিতে হইবে। ভাষার অভাবে এখনও বিজ্ঞানের গ্রন্থ লিখিতে কেহ সাহস করে না। লিখিলেই রচনা অপাঠ্য ও অবোধ্য হইয়া উঠে।'[১৩৯] রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর এ ভুমিকা লেখার পঁয়ষট্টি বছর আগে অক্ষয়কুমার তাঁর f‡Mvj গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। কিন্তু গ্রন্থের ভাষা কোথাও 'জটিল ও দুর্বোধ' নয়। তাঁর বৈজ্ঞানিক রচনার ভাষা ছিল মনোমুগ্ধকর। এ প্রসঙ্গে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের কথাটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, 'প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক অক্ষয়কুমার দত্তই প্রথমে জ্যোতিষ ও প্রাকৃত বিজ্ঞানের গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করেন।'[১৪০] প্রফুল্লচন্দ্র রায় অক্ষয়কুমার দত্তের evn¨e¯i mwnZ gvbecKwZi m¤Ü wePvi গ্রন্থকে উদ্দেশ্য এ কথা বলেছেন। যে গ্রন্থের মাধ্যমে বাংলা গদ্য প্রথম বিজ্ঞান আলোচনার উপযোগী হয়ে ওঠে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতা J.C.Ghosh বলেন :

> He was the first Bengali writer to employ modern and Scientific methods of inquiry, and he shaped the language into a fit instrument of argument and discourse.[১৪১]

অক্ষয়কুমারের বিজ্ঞানচর্চার ভাষার কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

১. 'বৃক্ষ-লতাদির উৎপত্তির নিয়ম' থেকে:

> পুষ্পের পাপড়ি কাহাকে বলে, সকলেই জানে; সংস্কৃত ভাষায় তাহার নাম দল। চতুর্দ্দিকে পাপড়ি, তাহার মধ্যস্থলে যে কতকগুলি সরু সরু সূত্র থাকে, তাহাকে কেশর কহে। তন্মধ্যে যে সূত্র-গাছি সর্ব্বাপেক্ষা স্থূল, তাহার নাম গর্ভকেশর, অবশিষ্ট সমুদায়কে পরাগকেশর কহে।....বীজকোষে যে বীজ থাকে, প্রথমে তাহার অঙ্কুরোৎপাদনের শক্তি থাকে না। পরাগকেশরের শিরোভাগে যে ধূলির ন্যায় এক প্রকার গুঁড় গুঁড় পদার্থ থাকে, তাহাই গর্ভকেশরের শিরোভাগে পতিত হইয়া, বীজকোষের বীজ সমুদায়কে উৎপাদিকা-শক্তি প্রদান করে। ঐ ধূলিবৎ পদার্থকে পুষ্পরেণু কহে। পরাগকেশরে যেমন রেণু থাকে, গর্ভকেশরের শিরোভাগে সেইরূপ একপ্রকার তরল পদার্থ থাকে।[১৪২]

২. 'পদার্থবিজ্ঞান' থেকে :

> চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা যে সকল বস্তু প্রত্যক্ষ করা যায়, সে সমুদায়ই জড় পদার্থ। জড় পদার্থ দুই প্রকার; সজীব ও নির্জীব। যাহার জীবন আছে, অর্থাৎ যথাক্রমে জন্ম, বৃদ্ধি, হ্রাস ও মৃত্যু হয়, তাহাকে সজীব কহে; যেমন পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা ইত্যাদি। আর যাহার জীবন নাই, সুতরাং যথাক্রমে জন্ম, বৃদ্ধি, হ্রাসাদি হয় না, তাহাকে নির্জীব বলা যায়; যেমন প্রস্তর, মৃত্তিকা, লৌহ ইত্যাদি। যে বিদ্যা শিক্ষা করিলে নির্জীব জড় পদার্থের গুণ ও গতির বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহার নাম পদার্থবিদ্যা।[১৪৩]

অক্ষয়কুমার দত্তের বিজ্ঞান বিষয়ক রচনার ভাষা প্রসঙ্গে শিশিরকুমার দাশ লিখেছেন:

> অক্ষয়কুমারের রচনার বৈচিত্র্য ছিল কিন্তু তিনি প্রধানত বাংলায় বৈজ্ঞানিক রচনার জন্যে খ্যাত এবং বাংলায় বিজ্ঞানচর্চার উপযোগী গদ্যের স্রষ্টা। বিজ্ঞানরচনার গদ্যের রচনার সূত্রপাত হয়েছিল তাঁর আগে, কিন্তু তিনিই প্রথম বাঙালী সাহিত্যিক যিনি বিজ্ঞানকে আমাদের সংস্কৃতির অন্যতম উপাদান হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, যিনি চেয়েছিলেন এক বৈজ্ঞানিক মানসিকতার সৃষ্টি করতে। ইউরোপীয় রেনেসাঁস-এর মানবিক ধর্মের প্রতি উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী যে পরিমাণ আকর্ষণ বোধ করেছিল, ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার প্রতি সে উৎসাহ দেখায় নি, ভাবেনি যে বৈজ্ঞানিক মানসিকতা আমাদের সংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট উপাদান হতে

Dhaka University Institutional Repository

> পারে। যে দু-একজন বাঙালী তার ব্যতিক্রম ছিলেন অক্ষয়কুমার তাঁদের অন্যতম। তাঁর হাতেই গড়ে উঠেছিল বাংলা বৈজ্ঞানিক গদ্য তথা বৈজ্ঞানিক মানসিককতাসম্পন্ন রচনা।[১৪৪]

এ ভাবে অক্ষয়কুমার দত্ত বাংলা বৈজ্ঞানিক গদ্যের মেরুদণ্ড গড়ে দিয়েছিলেন। কয়েকটি ক্লাসিক ভাষা জানা সত্ত্বেও তিনি একমাত্র বাংলা ভাষাতেই লিখেছেন। কারণ তিনি বিদেশি ভাষা শিখেছিলেন জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হতে, জ্ঞানচর্চার জন্য নয়। তাই আত্মবিকাশের জন্য মাতৃভাষাকে আশ্রয় করেছিলেন। মহেন্দ্রনাথ রায় লিখেছেন:

> মণি-মুক্তাদি ওজস্বী, কিন্তু মধুর নয়। সাল-সেগুন সারবান্, কিন্তু রসবান নয়। সমুদ্রের জল বহু উপকারী, কিন্তু বিশুদ্ধ নয়। কিন্তু অক্ষয় বাবুর রচনায় ওজস্বিতা, মধুরতা, সারবত্তা, রসবত্তা, বিশুদ্ধতা প্রভৃতি বিবিধ সদ্‌গুণ একত্র মিলিত হইয়া, একরূপ চমৎকারময় অপূর্ব্ব পদার্থ উদ্ভাবন করে। রচনার ওজস্বিতাগুণে 'প্রস্তাবিত বিষয় সমুদায় সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান বোধ হইতে থাকে।[১৪৫]

অক্ষয়কুমার দত্ত বিজ্ঞানচর্চার মাধ্যমে বিজ্ঞানের দিকে লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন বিজ্ঞানের যথার্থ অনুশীলনেই বৈজ্ঞানিক রুচির বিস্তার সম্ভব, অন্যথায় নয়।

১৪

বিজ্ঞান শিক্ষায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা

বিজ্ঞানশিক্ষা, বিজ্ঞানচর্চা ও বিজ্ঞান প্রচার প্রসারে সহজ ও সুবোধ্য মাতৃভাষা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। বাংলা ভাষাভাষী জনগণের শিক্ষিত ক্ষুদ্র অংশ ইংরেজি পড়ে বহু বছর আগে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সন্ধান পেয়েছিলেন। বিজ্ঞানের ভাষাবিধানে সতের শতকে ইংল্যাণ্ডে রয়্যাল সোসাইটি যে উদ্যোগ নিয়েছিল সেই ইতিহাস অক্ষয়কুমারের অজানা ছিল না।[১৪৬] ফলে তিনি বিজ্ঞান, দর্শন, শিক্ষা ও সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি রচনার জন্য পরিভাষার দিকে মনোযোগ না দিয়ে তিনি থাকতে পারেননি। এ বিষয়ে কাজ করতে গিয়ে তিনি বাঙালিদের মধ্যে অগ্রদূতের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁর আগে কোনো বাঙালি লেখক পরিভাষা সৃষ্টির কাজে হাত দেননি। কারণ সেসময় পরিভাষা নিয়ে যাঁরা চিন্তাভাবনা করেছিলেন, তাঁদের কেউ বাঙালি ছিলেন না। ফলে তাঁরা যে-সমস্ত পরিভাষা তৈরি করেছিলেন, সেগুলো ব্যবহারে অক্ষয়কুমার স্বচ্ছন্দ বোধ করেননি। তিনি তাঁর পরিভাষা সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। রাজনারায়ণ বসুকে লেখা এক চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেছেন:

> পদার্থবিদ্যা সমাপ্ত হইলে আপনকার অভিপ্রায়ানুসারে যন্ত্রবিষয়ক একখানি গ্রন্থ লিখিবার মানস থাকিল। কিন্তু তাই, একে নূতন ভাষায় নূতন শব্দ সঙ্কলন করিয়া লিখিতে হয়, তাহাতে, বিদ্যা সাধ্য যত তাহা আপনার অবিদিত নাই; আবার এ দেশের যে প্রকার স্বভাব এবং আমাদের যেরূপ বলবীর্য্যহীন প্রকৃতি, তাহাতে এসকল বিষয়ে কোনমতেই সাহস করা যায় না। সময়ে সময়ে নিশ্চয়ই বোধ হয় যে, মনোমত কোন কার্য্যই হইয়া উঠিল না।[১৪৭]

অক্ষয়কুমার শিশু-কিশোরদের উপযোগী অনেক রচনায় যথাসম্ভব পারিভাষিক শব্দ এড়িয়ে চলেছেন। কিন্তু সব সময় তা বজায় রাখতে পারেননি। বাধ্য হয়ে তাঁকে পরিভাষায় মন দিতে হয়েছে। এ প্রসঙ্গে নবেন্দু সেন লিখেছেন :

> অক্ষয়কুমারের পূর্বে বাংলা পরিভাষার ব্যবহার থাকা সত্ত্বেও পরিভাষা-নির্মাতা হিসাবে অক্ষয়কুমারের একটি স্বতন্ত্র স্থান বাংলা ভাষার ইতিহাসে অবশ্যই আছে। প্রথমত অক্ষয়কুমার যত বেশী বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সে সময় ব্যবহার করেছেন, ঊনবিংশ শতকে একজন গদ্যলেখক, ঠিক তত বেশী বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ব্যবহার করেছেন কিনা সন্দেহ। অক্ষয়কুমারের মোট রচনার বেশীর ভাগই বিজ্ঞানবিষয়ক। অনিবার্যভাবে বৈজ্ঞানিক পরিভাষার ব্যবহারও অক্ষয়কুমারের রচনাতে বেশী হয়েছে তাই।.....বহুসংখ্যক বৈজ্ঞানিক রচনায় সমৃদ্ধ 'চারুপাঠ' তিন খণ্ড সে সময়ে এবং পরেও (রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের কাল পর্যন্তও) বিশেষ সমাদৃত পুস্তক ছিল। অক্ষয়কুমারের বৈজ্ঞানিক পরিভাষাগুলি নিতান্ত মূল্যহীন হলে বহু বৎসর কাল ধরে তাঁর গ্রন্থগুলির জনপ্রিয়তাও অটুট থাকতো না।'[১৪৮]

Dhaka University Institutional Repository

অক্ষয়কুমার দত্তের পরে অনেকেই বাংলা পরিভাষা নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছেন । তাঁদের মধ্যে যোগেশচন্দ্র রায় (১৮৫৯-১৯৫৬),[১৪৯]রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'[১৫০]ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী'[১৫১] প্রধান। পরিভাষা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন–'পরিভাষিক চর্ব্যজাতের জিনিস। দাঁত ওঠার পরে সেটা পথ্য।'[১৫২] রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় (১৮৬১-১৯৪৪) বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষার বিকাশের ক্ষেত্রে পরিভাষার বিশেষ গুরুত্ব অনুধাবন করেছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্যটি স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন:

> পরিভাষা-সঙ্কলনে আমাদের দেশে অনেক বাধা বিপত্তি আছে। আমাদের দেশে এমন কোন প্রতিষ্ঠান নাই, যাহা সমস্ত প্রদেশে একই পরিভাষা চালাইবার ব্যবস্থা করিতে পারে, এমন কি––একই প্রদেশের বিভিন্ন লেখককে একই পরিভাষা ব্যবহার করিতে বাধ্য করিতে পারে। এখানে প্রত্যেকেই স্ব স্ব প্রধান! সকল প্রদেশে একই পরিভাষা না চলিলে, ইহার একটা সাধারণ সমতা রক্ষা করা অসম্ভব। বিখ্যাত ফরাসী রাসায়নিক ল্যাভয়সিয়ার নব্য রসায়নশাস্ত্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিবার পর ফার্সী বিজ্ঞান পরিষৎ (French Academy of Sciences) যখন হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ইত্যাদি মৌলিক পদার্থের পরিভাষা সৃষ্টি করিলেন, তখন সমগ্র ইউরোপ তাহা মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। অক্ষয়কুমার দত্ত যখন অম্লজান, উদজান প্রভৃতি পরিভাষা সৃষ্টি করিলেন, অমনি বাঙলা ভাষার অপর গ্রন্থকারগণ তাহার প্রতিশব্দ দিয়া জলজান, বারিজান প্রভৃতি সৃষ্টি করিলেন।[১৫৩]

অক্ষয়কুমার যখন বাংলা গদ্য লিখতে শুরু করলেন তখন তাঁর সামনে এর আদর্শ বলতে তেমন কিছু ছিল না। পরিভাষার ক্ষেত্রেও ছিল এক বিরাট শূন্যতা। নবেন্দু সেন লিখেছেন:

> অক্ষয়কুমারের সামনে বাংলা গদ্যের আদর্শ বলতে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকে প্রকাশিত ক-খানি গ্রন্থ, রামমোহনের গ্রন্থ ক-খানি, আর দু-চারখানি সাময়িকপত্র। প্রকৃতপক্ষে বাংলা গদ্য তখনো গঠনের অপেক্ষায়। ভূগোল বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে রচিত কোন বাংলা গদ্যের বই তাঁর সামনে আদর্শ হিসাবে ছিল না; অতএব বাংলা গদ্য রচনা করতে বসে অক্ষয়কুমারকে প্রথম যে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তা শব্দ নির্বাচনের। ইংরাজী ভাষার 'টেক্‌নিকাল শব্দগুলির পরিবর্তে বাংলা কোন পরিভাষা ছিল না তখন। অথচ মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার জন্য এগুলির বাংলা পরিভাষার প্রয়োজন ছিল অনিবার্য। আরবি, ফারসী, হিন্দী, বা উর্দূ ভাষায় নয় বাংলা ভাষায় বাঙালীর কাছে বিষয়গুলিকে বোধগম্য করার কঠিন দায়িত্ব নিয়েছিলেন অক্ষয়কুমার; অতএব লিখতে বসে শব্দ নির্মাণও তাঁকে করতে হল। বাংলা পরিভাষার ইতিহাসে অক্ষয়কুমারের নির্মিত এই শব্দগুলির একটি চিরস্থায়ী মূল্য আছে। অক্ষয়-পূর্বকালের বাংলা পরিভাষার সঙ্গে অক্ষয়কুমারের এই পরিভাষাগুলি তুলনা করলে যেমন দেখা যাবে অক্ষয়কুমারের পরিভাষাগুলি কত সংহত, অর্থদ্যোতক তেমনি অক্ষয়-পরবর্তীকালের বাংলা পরিভাষার সঙ্গে তুলনা করলেও দেখতে পাওয়া যায় অক্ষয়-কৃত পরিভাষাগুলি নিকৃষ্ট ত নয়ই, উত্তরকালে বরং বহু জায়গায় সেগুলি রক্ষিত হয়েছে।[১৫৪]

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী পরিভাষা সম্পর্কে কিছু সূত্রের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর একটি এরকম : 'যে শব্দটি প্রয়োগ করিবে, তাহার যেন একটি সুনির্দ্দিষ্ট, বাঁধাবাঁধি, সীমাবদ্ধ, স্পষ্ট তাৎপর্য্য থাকে। প্রত্যেক শব্দ একটি নির্দ্দিষ্ট অর্থে ব্যবহার করিবে; সেই শব্দটি আর দ্বিতীয় অর্থে প্রয়োগ করিবে না, এবং সেই অর্থে দ্বিতীয় শব্দের প্রয়োগ করিবে না। এই হইল বৈজ্ঞানিক পরিভাষার মূলসূত্র।'[১৫৫] ধরা যাক Coral শব্দটি। এ শব্দের পরিভাষা 'প্রবাল' যদি সাব্যস্ত করা যায়, তবে এর আর অপর কোনো অর্থই করা যাবে না। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর এই সূত্রের মূল খোঁজে পাওয়া যায় অক্ষয়কুমার দত্তের আবিষ্কৃত পারিভাষিক শব্দে এবং তার ব্যবহারে। এই বিশেষত্ব উল্লেখ করে নবেন্দু সেন লিখেছেন:

> অক্ষয়কুমারের পরিভাষাগুলির স্বাতন্ত্র্য এইখানে। প্রধানত তাঁর কৃত পরিভাষাগুলি পারিভাষিক শব্দ-নির্মাণের পদ্ধতিসম্পন্ন, একটি শব্দ একটি শব্দের অর্থকেই সূচিত করে, একাধিক শব্দের সমার্থক শব্দ সৃষ্টি হয়নি সেগুলি, দ্বিতীয়ত শব্দগুলি 'সংজ্ঞা শব্দ' অর্থাৎ যে বিষয়ক শব্দটিকে বোঝায়, শব্দটি সেই বিষয়ক শব্দটির স্বভাবকে সম্পূর্ণরূপে উদ্ঘাটিত করতে চেষ্টা করে। যেমন, 'VOLCANO' শব্দের পারিভাষিক শব্দ অক্ষয়কুমার 'আগ্নেয়গিরি' ব্যবহার করেছেন। এখন এই 'আগ্নেয়গিরি' শব্দটি 'জ্বালামুখী' বা 'দাবানল' বা 'অগ্নি উদ্গিরণ ক্রিয়াসম্পন্ন এক শ্রেণীর পর্বত'কে বোঝায় না, 'আগ্নেয়গিরি'র সমার্থক শব্দ আর নেই, VOLCANO'র বাংলা পরিভাষা ঐটি।[১৫৬]

অক্ষয়কুমার দত্ত বিজ্ঞান, দর্শন ও সমাজবিজ্ঞানের বহু পরিভাষা তৈরি করেছেন। পরিভাষা তৈরি করা এবং তার ব্যবহারে বহু জটিলতা বাংলা ভাষায় লক্ষ করা যায়। সেই দিক বিবেচনায় অক্ষয়কুমার দত্তের তৈরি পরিভাষা অধিকাংশই জটিলতামুক্ত সহজ সরল বহুল ব্যবহৃত, আজকের দিনেও চলমান। যেমন- পরিভাষার

স্রষ্টার দূরদৃষ্টিই এর চালিকাশক্তি। অক্ষয়কুমার দত্তের সমস্ত রচনায় অনুসন্ধান চালিয়ে '৮৪ টি'[১৫৭] পরিভাষা পাওয়া যায়।

১৫

শিক্ষার উপকরণ পরিকল্পনা

অক্ষয়কুমার দত্ত শিক্ষার বিভিন্ন উপাদানের বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছেন। শিক্ষার পরিবেশ, শিক্ষাদানের জন্য প্রয়োজনীয় বইপত্র, শিক্ষাদানকারী শিক্ষকের যোগ্যতা, শিক্ষা গ্রহণকারীর শারীরিক ও মানসিক অবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে তিনি গুরুত্বপূর্ণ মতামত দিয়েছেন। শিশু-কিশোর উপযোগী বইপুস্তক কেমন হওয়া উচিত তা তিনি নিজে লিখে দেখিয়েছেন। অক্ষয়ককুমার তত্ত্ববোধিনী পাঠশালায় শিক্ষকতা করবার সময়েই f‡Mvj ও c'v_we'¨v নামে বিজ্ঞান বিষয়ক দুটি বই লিখেছিলেন। পরে একে একে PviæcvV, evn¨e¯i mwnZ gvbecKwZi m¤Ü wePvi ও a¤§bxwZ প্রভৃতি লিখেছেন। তাঁর এসব বই সেকালে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। প্রাথমিকভাবে তাঁর এসব বই-ই সেকালে বাঙালির মানসিক জগৎ গড়ে তোলে–নতুন চিন্তা, রুচি ও মননের ভিত্তি তৈরি করেছিল। অক্ষয়কুমার দত্তের বইয়ের মধ্য দিয়ে যে সেকালের বাঙালির মানসিক শিক্ষা আরম্ভ হয়েছিল যে প্রসঙ্গে পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন ev½vjv fvlv I ev½vjv mwnZ¨ welqK c¯Íve গ্রন্থে লিখেছেন:

> ইহার (PvæcvV-এর) পূর্ব্বে বিশ্বের নিয়ম ও বাস্তব পদার্থ-সংক্রান্ত এরূপ মনোহর ও জ্ঞানপ্রদ বাঙ্গালা পাঠ্যপুস্তক রচিত হয় নাই। এই পুস্তক দুইখানি [আসলে একটি দুখণ্ডে] ঐ বিষয়ে যেমন সর্ব্বপ্রথম, তেমনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই দুই পুস্তক পাঠ করিলে যে কত নূতন বিষয়ের জ্ঞান লাভ হয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। গ্রন্থকার ইংরেজি গ্রন্থ হইতেই ঐসকল বিষয় সঙ্কলন করিয়াছেন, সত্যকথা, কিন্তু তাঁহার রচনা দেখিয়া কে বলিতে পারে যে, উহা ইংরেজির অনুবাদ। বিজ্ঞাপনে স্বীকার না থাকিলে কিয়ৎকাল পরে উহা মূল রচনাই হইয়া যাইত।....অধিক আর কি বলিব,তাঁহার দুই ভাগ চারুপাঠ বাঙ্গালা শিক্ষার্থী বালকদিগের জ্ঞানরত্নের অক্ষয়ভাণ্ডার স্বরূপ।[১৫৮]

রামগতি ন্যায়রত্ন PviæcvV-এর তৃতীয় ভাগ সম্পর্কে বলেন:

> ৩য় ভাগ চারুপাঠ ও ১ম ও ২য় ভাগের সমানই কৃতার্থতা লাভ করিয়াছে; জনসমাজে ইহারও আদরের সীমা নাই। তবে এখানি অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ উচ্চ অঙ্গের হইয়াছে। ইহার অন্তর্গত 'স্বপ্নদর্শন' নামক প্রস্তাবগুলিতে কয়েকটি প্রগাঢ় বিষয়ের রূপক বর্ণনা আছে এবং গুরুতর প্রাকৃতিক ঘটনা ইহাতে বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু সে সকল স্থলেও, অক্ষয় বাবুর লেখনী যেরূপ সরসতা সম্পাদনা করিয়া থাকে, তাহা করিতে ক্রটি করেন নাই। এই পুস্তকের রচনা ও ভাবগাম্ভীর্য্য কিরূপ উপাদেয় হইয়াছে, তাহা সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য আমরা পাঠকগণকে অনুরোধ করি যে, তাঁহারা উহার অন্তর্গত 'মিত্রতা', 'জীববিষয়ে পরমেশ্বরের কৌশল ও মহিমা' এবং 'সুশিক্ষিত ও অশিক্ষিতের সুখের তারতম্য' নামক প্রস্তাব তিনটি অন্ততঃ একবারও পাঠ করেন।[১৫৯]

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অক্ষয়কুমারকে বাঙালি জাতির শিক্ষাদাতা অভিহিত করেছেন। তাঁর বক্তব্য:

> বাঙালি ছেলেদের মধ্যে ইংরাজি ভাব প্রবেশ করানো সর্বপ্রথম অক্ষয়কুমার দত্ত দ্বারা সাধিত হয়। তিনিই বাঙালির সর্বপ্রথম নীতিশিক্ষক; তাঁহার 'চারুপাঠ' (১৮৫৩-৫৯ খৃ.), 'ধর্ম্মনীতি' (১৮৫৬ খৃ.), 'বাহ্যবস্তু' (evn¨e¯i mwnZ gvbecKwZi m¤Ü wePvi, ১৮৫১-৫৩ খৃ.) প্রভৃতি গ্রন্থ বিজ্ঞলোকেও পাঠ করিয়া নীত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে পারেন। বালকেরা এই সকল গ্রন্থপাঠে কতদূর উপকৃত হয় তাহা [বলে শেষ করা] যায় না।[১৬০]

উনিশ শতক পার হয়ে বিশ শতকেও অক্ষয়কুমারের স্কুল-পাঠ্য বইগুলো কীভাবে পরম্পরা রক্ষা করে আসছিল, তার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়'[১৬১] ও দীনেশচন্দ্র সেন।'[১৬২] এঁদের প্রত্যেকের ছাত্রজীবনে অক্ষয়কুমার দত্তের বইগুলো পাঠ্য ছিল। রবীন্দ্রনাথ **১৯১২** খ্রিষ্টাব্দে লিখেছেন:

> তখন নর্মাল স্কুলের একটি শিক্ষক, শ্রীযুক্ত নীলকমল ঘোষাল মহাশয় বাড়িতে আমাদের পড়াইতেন। তাঁহার শরীর ক্ষীণ, শুষ্ক ও কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ ছিল। তাঁহাকে মানুষজন্মধারী একটি ছিপছিপে বেতের মতো বোধ হইত। সকাল ছটা হইতে সাড়ে নয়টা পর্যন্ত আমাদের শিক্ষাভার তাঁহার উপর ছিল। চারুপাঠ, বস্তুবিচার, প্রাণীবৃত্তান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া মাইকেলের মেঘনাদবধ কাব্য পর্যন্ত ইঁহার কাছে পড়া। আমাদিগকে বিচিত্র

Dhaka University Institutional Repository

> বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্য সেজদাদার বিশেষ উৎসাহ ছিল। স্কুলে আমাদের যাহা পাঠ্য ছিল বাড়িতে তাহার চেয়ে অনেক বেশি পড়িতে হইত। ভোরে অন্ধকার থাকিতে উঠিয়া লংটি পরিয়া প্রথমেই এক কানা পালোয়ানের সঙ্গে কুস্তি করিতে হইত। তাহার পরে সেই মাটিমাখা শরীরেরর উপরে জামা পরিয়া পদার্থবিদ্যা, মেঘনাদবধকাব্য, জ্যামিতি, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল শিখিতে হইত।[১৬৩]

বাঙালি-মনকে অক্ষয়কুমার কীভাবে শিক্ষিত করতে চেয়েছিলেন, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন:

> সমসাময়িক বাঙালীর মনোভাব বিশ্লেষণ করিতে গেলে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ও বিবিধার্থ সংগ্রহের সূচীপত্র অনুসন্ধান করিতে হইবে। ১৮৪৩ সালের ১৬ই আগস্ট হইতে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করে; এবং ইহাতে শুধু ব্রাহ্মসমাজ বা ব্রাহ্মধর্মের পরিচয়-ব্যাখ্যান থাকিত না, সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত দর্শন ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে এই পত্রিকায় মৌলিক গবেষণা করিয়াছিলেন। বাঙালির মানসমুক্তি ও নবযুগের অভ্যুদয় ত্বরান্বিত হইয়াছিল 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সাহায্যে। 'বঙ্গদর্শন' (১২৭৮) যেমন বাঙালীর প্রাণের ক্ষুধা ও হৃদয়-পিপাসা নিবৃত করিতে সাহায্য করিয়াছিল, 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'ও তেমনি বাঙালীর মননধর্মিতা বর্ধিত করিয়াছিল। বাঙালীর এই যে জ্ঞানবাদী, তার্কিক ও তত্ত্বজ্ঞ চিত্তের জাগরণ, ইহার জন্য অক্ষয়কুমারের অমানসিক পরিশ্রমই দায়ী। ইহাতে তিনি জ্যোতিষ, পদার্থবিদ্যা, ভূতত্ত্ববিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, শিল্পবিদ্যা, স্বপ্নতত্ত্ব, এবারক্রাম্বি ও রীড অবলম্বনে মনোবৈজ্ঞানিক আলোচনা প্রভৃতি নানা কৌতূহলোদ্দীপক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া তাঁহার ধারাবাহিক প্রবন্ধ 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' প্রকাশিত হইতে থাকিলে শিক্ষিত বাঙালী প্রাকৃতিক জগতের সহিত মানব জীবনের কার্যকারণের যোগাযোগ বুঝিতে পারিল।[১৬৪]

অক্ষয়কুমার দত্ত প্রাথমিক পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও দর্শন, বিজ্ঞান, প্রভৃতি বিষয়ে অসংখ্য প্রবন্ধ লিখেছেন। অক্ষয়কুমার দত্তের Pvi¤cvV প্রকাশিত হবার পরে, জনসমাজে সেরকম বই লেখার একটা বিপুল আগ্রহ তৈরি হয়। এই আগ্রহটাই এরকম লোকশিক্ষামূলক বইয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক। অক্ষয়কুমারও চেয়েছিলেন শিক্ষিত সমাজে এই ঔৎসুক্য বাড়ুক। কেননা শেখার আকাঙ্ক্ষা মানুষের মনে দেখা দিলে, তবেই শিক্ষার উপকরণ বিষয়ে চিন্তা করা যায়। শেখার আগ্রহ যেখানে নেই, সৃষ্টির আগ্রহ সেখানে জাগতে পারে না। অক্ষয়কুমার তাঁর সমাজ-মানসে এই আগ্রহটা জাগাতে পেরেছিলেন। মহেন্দ্রনাথ রায় লিখেছেন:

> চারুপাঠ কেবল নিজে শিক্ষা দান করিয়া, লোকের মন উজ্জ্বল করিতেছে এমন নয়, ইহা তাদৃশ বিস্তর গ্রন্থের প্রবর্ত্তক হইয়া অন্যরূপেও উপকার সাধন করিয়া আসিতেছে। এই গ্রন্থ-প্রচারের পূর্ব্বে ভারতবর্ষের কোন ভাষায় এরূপ সুমনোহর বিজ্ঞান-গর্ভ পাঠ্য-পুস্তক ছিল না। ইহা অদ্যাপি এরূপ গ্রন্থের আদর্শ-ভূমি হইয়া রহিয়াছে। ইহার আদর্শ-ক্রমে ও ইহার অনুকরণ করিয়া পাঠাবলী, তত্ত্বাবলী, জ্ঞানাঙ্কুর নামক দুই খণ্ডে পুস্তক (প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ), রত্নসার, চারুবোধ, চারুনীতিপাঠ, প্রবন্ধমালা, বস্তুবিচার, প্রকৃতিপাঠ, নীতিপথ, প্রবন্ধকুসুম ইত্যাদি বিস্তর পাঠ্য গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে। যদিও সে সমুদায় চারুপাঠের মত সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর সুললিত চিত্ত-রঞ্জন গ্রন্থ না হউক, এবং ইহার মত উৎকৃষ্ট পদ প্রাপ্ত না হউক, তথাচ সে সমস্ত বিশুদ্ধ হইলে, বিজ্ঞান বিষয়ের অনুশীলন ও ঘৃষ্ট-ঘর্ষণ দ্বারা জন-সমাজের যথেষ্ট উপকার সম্ভাবনা বলিতে হইবে। সে সমুদায় দ্বারা যাহা কিছু উপকার হউক, চারুপাঠই তাহার মূল প্রবর্ত্তক।[১৬৫]

অক্ষয়কুমার দত্ত বাঙালি জাতিকে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ও আত্মনির্ভরশীল মানুষ করে গড়ে তুলতে 'শিক্ষাকে' প্রধান উপায় হিসেবে দেখেছেন। বাঙালির উন্নতির জন্য শিক্ষার বিকল্প কিছু ভাবেননি।

১৬

শিক্ষাদানের জন্য উপযুক্ত শিক্ষক নির্বাচন

অক্ষয়কুমার নিজে শিক্ষকতার মাধ্যমে শিক্ষাগুরুর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। তিনি তাত্ত্বিকভাবেও তাঁর মত অত্যন্ত সহজভাবে করে ব্যক্ত করেছেন। 'তিনি জানতেন, তাঁর নিজের দৃষ্টান্তটা লোকে আর পাঁচটা বিষয়ের মতো ভুলে যাবে। রামতনু লাহিড়ী (১৮১৩-১৮৯৮), ডেভিড হেয়ার (১৭৭৫-১৮৪২), ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১) প্রমুখ শিক্ষকের দৃষ্টান্ত লোকে তো একরকম ভুলে গেছে। কাজেই অক্ষয়কুমার শিক্ষার ব্যাপারে শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতা ছাড়াও যে আরও কিছু প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন, তা তাত্ত্বিকভাবে লিখে রাখা

উচিত মনে করেছিলেন।'[১৬৬] অক্ষয়কুমার তাঁর চারপাশের শিক্ষা-ব্যবস্থা, শিক্ষকদের মানসিক সঙ্গে সম্যক পরিচিত ছিলেন। শিক্ষকদের যোগ্যতা বিষয়ে তিনি লিখেছেন:

> .... শিশুশিক্ষালয়ের শিক্ষকতা কার্য্য সম্পাদন করা সহজ বিষয় নহে, অনেকানেক অসাধারণ গুণ অপেক্ষা করে। যিনি স্বয়ং অশেষবিধ বাস্তবিক বিষয় সুন্দররূপে শিক্ষা করিয়াছেন এবং তাহা অবলীলাক্রমে অনভিজ্ঞ বালকদিগের হৃদয়ঙ্গম করাইতে পারেন; যিনি শান্ত, সদয়, ক্ষমাবান, ধৈর্য্যবান, মধুরভাষী, এবং সতত হৃষ্টাতন্তঃকরণ ও প্রসন্ন-বদন; যিনি শিশুগণের প্রতি মাতৃবৎ স্নেহ প্রকাশ ও বয়স্যের ন্যায় সদ্ভাব প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহাদের প্রীতির আস্পদ ও শ্রদ্ধাভাজন হইতে পারেন, এবং যিনি পাঠশিক্ষা বিষয়ে তাহাদের মনোবৃত্তি সকল সৎপথে সঞ্চালন করিবার সুন্দর কৌশল অবগত আছেন, তিনিই শিশুশিক্ষালয়ের শিক্ষকতা-পদে অধিরূঢ় হইবার উপযুক্ত। রীতিমত শিক্ষা না করিলে, শিক্ষকতা কার্য্যে সুদক্ষ হওয়া যায় না।[১৬৭]

অক্ষয়কুমার একজন শিক্ষকের মধ্যে একই সঙ্গের শিক্ষাগুরু (Guide), দীক্ষাগুরু (Phylosopher) এবং বন্ধু (Friend) যোগ্যতার দাবি করেছেন। এই তিনগুণ অর্জন করার জন্য একজন শিক্ষককে যে পরিশ্রম ও ত্যাগ করতে হবে, তা তিনি স্বেচ্ছায় করতে প্রস্তুত থাকবেন। কারণ তিনি জানতেন, এ ত্রিগুণের ত্রিবেণী সঙ্গম হলেই কেবল একজন শিক্ষক 'শিশুশিক্ষালয়ে' শিক্ষকতা করার অধিকার পেতে পারেন। 'অক্ষয়কুমার নিজে ছিলেন এ বিষয়ের একজন অগ্রগণ্য শিক্ষক-মনীষী। বাংলাদেশে শিশুশিক্ষালয়ের জন্য শিক্ষক তৈরি করবার কাজে তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। সম্ভবত, বাংলাদেশে সেটা ছিল প্রথম উদ্যোগ। নর্মাল স্কুলের কাজই ছিল শিশু-কিশোরদের শিক্ষা দেবার উপযোগী শিক্ষক তৈরি করা।'[১৬৮]

১৭

শিক্ষার্থীর শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য ও পরিবেশ

অক্ষয়কুমার দত্তের শিক্ষাচিন্তার অপর একটি মূল্যবান দিক হচ্ছে–শিক্ষার সঙ্গে স্বাস্থ্যের সমুন্নত ধারণা। তিনি শিক্ষার্থীদের খেলাধুলা এবং ব্যায়াম শিক্ষার প্রতি মনোযোগ দেওয়ার কথা বলেছেন। কারণ, তিনি নিজের জীবন দিয়ে বুঝেছিলেন সুস্বাস্থ্য ছাড়া সুশিক্ষা অর্জনে ব্রতী হওয়া যায় না। এ কারণে তিনি শিক্ষার্থীর মানসিক জগৎ গড়ে তোলার ব্যাপারে যতটা গুরুত্ব দিয়েছেন, তার সমান গুরুত্ব দিয়েছেন তাদের স্বাস্থ্য-চেতনায়। এই স্বাস্থ্য চেতনা তাঁর রচনাবলির একটি বিস্তৃত জায়গা দখল করে আছে। তাঁর Pvi¤cvV গ্রন্থের প্রথম ভাগের প্রথম প্রবন্ধটি
'বিদ্যাশিক্ষা' হলেও এ-ভাগের একটি মূল্যবান প্রবন্ধের নাম 'শারীরিক স্বাস্থ্য-সাধন'। অক্ষয়কুমার এ প্রবন্ধের শেষাংশে যে কথা বলেছেন, তা সবার মনের কথা হয়ে উঠেছে। তিনি বলেছেন:

> প্রতিদিন পরিমিত ভোজন ও বায়ু সেবন করা কর্ত্তব্য, শরীর প্রক্ষালন ও পরিমার্জন করা এবং পরিধেয় বস্ত্র পরিষ্কার রাখা আবশ্যক। যে গৃহ শুষ্ক,প্রশস্ত ও পরিষ্কৃত এবং যাহাতে অহোরাত্র বিশুদ্ধ বায়ুর সঞ্চার থাকে, তাহাতেই বাস করা বিধেয়। সচরাচর মাদক সেবন করা অকর্ত্তব্য; প্রতিরাত্রিতে ৬-৭ ঘণ্টা নিদ্রা যাওয়া আবশ্যক, মনোমধ্যে উৎকণ্ঠা ও যন্ত্রণা উপস্থিত হইতে না দেওয়া ও উপস্থিত বিপদে ধৈর্য্যাবলম্বন করা কর্ত্তব্য। ....অপর সাধারণ সকলেরই এই এই সমুদায় শুভদায়ক আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে যত্নবান থাকা উচিত। সকলে এই সমস্ত নিয়ম পালন করিতে পারিলে, ভূমণ্ডলে রোগের প্রাদুর্ভাব হ্রাস হইয়া শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য লাভ ও তন্নিবন্ধন অশেষ প্রকার সুখোন্নতি বিষয়ে যুগান্তর উপস্থিত হয়।[১৬৯]

অক্ষয়কুমার দেখেছেন সেকালে সামাজিক অনাচারের হাত থেকে, সমস্ত ধর্মীয় গোঁড়ামি ও দেশাচারের দাসত্ব থেকে, অযুক্তি-কুযুক্তি ও কুসংস্কারের কবল থেকে–এক কথায় মধ্যযুগীয় চিন্তার বর্বরতা থেকে আধুনিকত্বে উত্তীর্ণ হওয়ার উপায়স্বরূপ সবাই মদ্যপান করে। তিনি এই মদ্যপানের বিরুদ্ধে প্রথম লেখেন we¨v'kb পত্রিকায়। we¨v'kb পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেলে ZË‡ewabx cwÎKv'য় তার ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছেন। মদ্যপানের বিরুদ্ধে তাঁর দুটি মূল্যবান প্রবন্ধ—'পানদোষ' ও 'সুরাপান' ZË‡ewabx cwÎKv'য় প্রকাশিত হয়েছিল যথাক্রমে—৮৪ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৭৭২ শকাব্দে [আগস্ট ১৮৫০ খ্রি.] ও ১১১ সংখ্যা, কার্তিক ১৭৭৪ শকাব্দে [অক্টোবর ১৮৫২ খ্রি.] আমাদের দেশের মানুষের স্বাস্থ্য-বিষয়ক চেতনা কত অগভীর তার একটি দৃষ্টান্ত স্ত্রীলোকদের সন্তান প্রসবকালীন ঘটনার উল্লেখ করেছেন অক্ষয়কুমার। তিনি লিখেছেন:

Dhaka University Institutional Repository

> সন্তান যখন জননী-গর্ভে জরায়ু-শয্যায় শয়ান থাকে, তৎকালে তাহার সমুদয় বিষয়ই মাতার উপরে নির্ভর করে। তখন মাতার আহারেই সন্তানের আহার, মাতার পীড়াতেই সন্তানের পীড়া, ও মাতার স্বাস্থ্যতেই সন্তানের স্বাস্থ্য লাভ হয়। তখন তাহার শরীর নিশ্চল, ইন্দ্রিয় নিশ্চেষ্ট, এবং হৃদয় ও পাকস্থলী প্রভৃতি শারীরিক যন্ত্র সমুদায়ও নিস্পন্দ থাকে। কিন্তু ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র সম্পূর্ণ বৈপরীত্য ঘটিয়া থাকে। তখন সে অন্ধকারময় কারাগার হইতে একেবারে আলোকময় লোকালয়ে আগমন করে। তখন তাহার নবীন নেত্র নানা প্রকার অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব রূপ দর্শন করে, সুকোমল কর্ণ অশেষবিধ শব্দাবলি শ্রবণ করিতে আরম্ভ করে, এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয় সমুদায় স্ব স্ব বিষয় প্রাপ্ত হইয়া চরিতার্থ হইতে থাকে। তখন বায়ু-প্রবাহ নিশ্বাস সহকারে হৃদয় মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শরীর-যন্ত্র সঞ্চালিত করে, এবং পাকস্থলীভুক্ত অন্ন গ্রহণ করিয়া জীর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। এরূপ পরিবর্ত্তনের সময়ে সেই সদ্যঃপ্রসূত শিশুকে স্বাস্থ্য-সাধক উৎকৃষ্ট স্থানে স্থাপন করিয়া তাহার সমুদায় শারীরিক নিয়ম পরিপালন বিষয়ে সাধ্যমত যত্ন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়! এতদ্দেশীয় লোকের কেমন কুসংস্কার, গৃহমধ্যে যে স্থান সর্ব্বাপেক্ষা আর্দ্র ও কদর্য্য, এবং যে স্থানে বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চার ও পর্য্যাপ্ত আলোক প্রাপ্তির সম্ভাবনা না থাকে, তাঁহারা সেই স্থানেই সূতিকাগার প্রস্তুত করেন, এবং সেই স্থানেই নবপ্রসূত কুমার কুমারী জন্মগ্রহণ করিয়া নানা প্রকার নিগ্রহ ভোগ করে। তাহারা এক কারাগার হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আর এক কারাগারে প্রবেশ করে।[১৭০]

বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার এবং ধর্ম্মনীতি গ্রন্থে অক্ষয়কুমার দেখিয়েছেন, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল জীবনই স্বর্ণোজ্জ্বল জীবন। কিন্তু এ ব্যাপারে অনেক শিক্ষিত লোকই অবহিত ছিলেন না।

অক্ষয়কুমার দত্ত শিক্ষার জন্য উপযুক্ত পরিবেশের চিন্তা করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর চিন্তাভাবনায় যেটা লক্ষ করা যায়, তা আজকের দিনের শিক্ষার পরিবেশ সংকটের বিপরীত। সংকট তখনও ছিল, তবে তা ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে ছিল, সহজে মোকাবিলা করা যেত। তিনি সেই সামান্য সমস্যাকেও অবহেলা করেননি। 'যে মানুষ বড় হয়, ছোট ছোট বিষয়গুলোও তাঁর মনকে দখল করে থাকে। তাঁরা অতি সাধারণ জিনিসগুলোর প্রতি সচেতন বলেই বড়কে স্পর্শ করতে পারেন। ছোট জলকণা থেকে সমুদ্রের ধারণা সেখান থেকেই।[১৭১] তিনি যখন কলকাতা শহরে বাস করছিলেন, তখন সে শহর আজকের মতো ছিল না। তার আকার ক্ষুদ্র ছিল, কিন্তু সেই ক্ষুদ্র শহরের পরিবেশ তাঁর জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। তাঁর বিভিন্ন লেখা থেকেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়। অক্ষয়কুমার লিখেছেন :

> পল্লীগ্রামের অপেক্ষা কলিকাতার লোক যে অধিক দুর্ব্বল ও রোগাক্রান্ত হয়, এখানকার বিষম দুঃখদায়ক দুরবস্থা একবার বিবেচনা করিয়া দেখিলেই তাহার যথার্থ কারণ অবধারণ করা যায়। পূতিগন্ধিক জলপ্রণালী, স্থানে স্থানে রাশীকৃত জঞ্জাল, সংকীর্ণ স্থানে বাস, অস্বাস্থ্যদায়ক বায়ু সেবন ইত্যাদি ভূরি ভূরি কারণে কলিকাতার লোক রুগ্ন, ও জীর্ণশরীর হয়। ঐ রাজধানীর যে অংশে এতদ্দেশীয় লোকের বসতি, তাহার জলপ্রণালী সকল ইষ্টক-বদ্ধ ও সমতল নহে, তাহার মধ্যে মধ্যে গভীর গর্ত্ত হইয়া তাহাতে যে সমস্ত দুর্গন্ধ দ্রব্য সঞ্চিত থাকে, তাহা কখনই সম্যকরূপে নির্গত হয় না। ঐ সকল মলপূর্ণ দুরাঘ্রেয় জল-প্রণালী রীতিমত পরিস্কৃত হয় না, এ কারণে তাহা হইতে অনবরতই বিষতুল্য বাষ্পোদ্গম হইয়া লোকের নানা প্রকার রোগোৎপত্তি করে।[১৭২]

অক্ষয়কুমার এখানে স্বভাবতই আধুনিক শহুরে পরিবেশের কথাই বলেছেন। পরিবেশ দূষণ শুরু হয় প্রধানত শহর থেকে। অক্ষয়কুমার তাঁর কালেই শাসক-ইংরেজের বসতি স্থাপন করা কলকাতার পরিবেশের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা যে কতটা উদ্বিগ্নের বিষয় ছিল, সেটা তাঁর বক্তব্য থেকেই বোঝা যায়। তিনি লিখেছেন :

> কলকাতার'....স্থানে স্থানে যে সকল অপরিস্কৃত পুষ্করিণী আছে, তাহাও বিষম অনিষ্টদায়ক। তৎসমুদায় বর্ষাকালে জল-পূর্ণ হয়, তটস্থ তৃণ ও গলিত ক্ষুদ্র পত্র ও নানাবিধ মৃত জন্তু তাহাতে মগ্ন হইয়া পচিতে আরম্ভ হয়, এবং অনন্তর তাহার জল যত শুষ্ক হয়, ততই দুঃসহ প্রাণঘাতক বাষ্প নির্যাত হইয়া চতুর্দিকে নরক বিস্তার করিতে থাকে। এইরূপে নগর মধ্যে সুনির্ম্মল স্বাস্থ্যকর জলাভাবে যৎপরোনাস্তি অকল্যাণ ঘটিতেছে। ....বাঙ্গালি পল্লীতে উত্তম সরোবর প্রায় নাই, এ প্রযুক্ত ধনাঢ্য ব্যক্তিরা দূর হইতে পানীয় জল আনয়ন করিয়া রাখেন; দুঃখী ও মধ্যবর্ত্তী লোকদিগকে....গঙ্গাজল ও নিকটবর্ত্তী অপকৃষ্ট পুষ্করিণীর জলই ব্যবহার করিতে হয়। ইহাতে যে কলিকাতার অধিক লোককে সর্ব্বদা পীড়িত দেখা যায়, তাহার আশ্চর্য্য কি? বিষপানে কাহার না অপমৃত্যু ঘটে?'[১৭৩]

অক্ষয়কুমার সমকালের কলকাতার পরিবেশ-দূষণ দেখে উদ্বিগ্ন ছিলেন। তিনি সে-সময়ের কলকাতাকে 'কারাগার' বলে অভিহিত করেছেন। তিনি লিখেছেন:

> যাঁহারা কলিকাতারূপ কারাগার মধ্যে রুদ্ধ আছেন, তাঁহাদের জীবনস্বরূপ জল প্রাপ্তি যেমন দুষ্কর, যথেষ্ট নির্ম্মল বায়ু লাভ তদপেক্ষাও দুরূহ। অপ্রতিহত সুলভ বায়ু প্রাপ্তির আবশ্যকতা বিবেচনা করিয়া বাঙ্গালি পল্লীর

Dhaka University Institutional Repository

> পথ সমুদায় নির্ম্মিত হয় নাই, কারণ তাহার সমুদায় পথই বক্র ও অপ্রশস্ত। নগরান্তর্গত জল-প্রণালী ও অন্যান্য নরকতুল্য ঘৃণিত স্থানের বিষময় বাষ্প সংযোগে নগরের বায়ু অনবরতই দূষিত হইতেছে। কলিকাতার দক্ষিণ প্রান্তরীয় নির্ম্মল বায়ু অবকাশ-শূন্য নিবিড় গৃহ-শ্রেণী-দ্বারা প্রতিবদ্ধ হওয়াতে, নগর প্রবেশপূর্ব্বক তদীয় অস্বচ্ছ বায়ুকে বহির্গত করিতে পারে না, এবং সূর্য্যকিরণও সম্যকরূপে বিকীর্ণ হইয়া ঐসকল প্রাণ-সংহারক বাষ্পকে উৎক্ষিপ্ত করিতে সমর্থ হয় না। বায়ু ও রৌদ্রাভাবে কলিকাতার যাবতীয় একতলা গৃহ যেরূপ আর্দ্র ও পীড়াদায়ক, তাহা কাহার অবিদিত আছে? ইহা চিন্তা করিলে চিত্ত ব্যাকুল হয় যে, সহস্র সহস্র সহায়হীন নিরূপায় ব্যক্তি এই প্রকার অতি জঘন্য সংকীর্ণ গৃহে রুদ্ধ থাকিয়া ও রোগের সময়ে শয্যায় লোলুণ্ঠমান হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে! কতশত ব্যক্তি ক্লেদান্বিত দুর্গন্ধ জল-প্রণালীর সন্নিধানে উপবেশ ও শয়ন করিয়া নিশ্বাস সহকারে তদীয় বাষ্পরূপ বিষম বিষ অবিরতই শরীরস্থ করিতে থাকে।[১৭৪]

এসব কারণে অক্ষয়কুমার ভারতে ব্রিটিশ সরকারের শাসনকে শ্রদ্ধার চোখে দেখেননি। ভারতবর্ষের মানুষের নানা দুর্দশার জন্য তিনি সরাসরি ইংরেজের শাসননীতিকে দায়ী করেছেন। কলকাতা শহরের পরিবেশ যে দূষণে সরকারের নির্বিকার থাকাকে তিনি মানতে পারেননি। তিনি লিখেছেন :

> রাজপুরুষেরা অহরহঃ লোকের এইরূপ ক্লেশ ও মৃত্যু ঘটনা দেখিয়াও যে তৎপ্রতীকারে যত্ন করেন না ইহা যৎপরোনাস্তি আক্ষেপের বিষয়। যে নির্দ্দয় রাজা পুত্রতুল্য প্রজাদিগকে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতে দেখিয়া শক্তি সত্ত্বে তাহার প্রাণ রক্ষা না করেন, তাঁহাকে কিরূপে ভদ্র রাজা বলা যায়? শক্তি সত্ত্বে মুমূর্ষু ব্যক্তির প্রাণ রক্ষা না করা আর সহস্তে খড়্গ প্রহারে কাহারও মুণ্ডচ্ছেদ করা উভয়ই তুল্য। রাজপুরুষেরা এ বিষয়ের তত্ত্বাবধাণার্থ কতিপয় কমিশনর নিয়োগ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাও বিফল হইল। কমিশনেরা স্বকীয় পদ গ্রহণ করিয়া কেবল সর্ব্বসাধারণের হাস্যাস্পদ হইয়াছেন।[১৭৫]

শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের 'চিত্তরঞ্জন'-এর দিকে অক্ষয়কুমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছিলেন। শিক্ষার্থীরা যে প্রতিমুহূর্তে নানা বাস্তব পদার্থের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে—এ ব্যাপারটি যেন তারা বুঝতেই না-পারে, শিক্ষার পরিবেশটা এমনভাবে তৈরি হওয়া উচিত। শিক্ষার্থীদের মনের উপর জুলুম করা আধুনিক শিক্ষার বিরোধী। সেটা করতে গেলে যথার্থ শিক্ষায় ব্যাঘাত ঘটতে পারে। এজন্য শিক্ষার কেন্দ্রে থাকতে হবে আনন্দের আমেজ। কেননা আনন্দহীন শিক্ষা আর মুখস্থ করা বুলি—দুইই বিরক্তিকর। শিক্ষাব্যবস্থাটাকে সম্পূর্ণভাবে শিক্ষার্থীদের মানসিক আনন্দের উপযোগী করে প্রস্তুত করা দরকার। অক্ষয়কুমারকে এ ব্যাপারে, বলা চলে, শিক্ষার্থীদের পরম বন্ধু ছিলেন—যিনি তাদের প্রতিনিধি হয়ে,তাদের পড়ালেখার সুব্যবস্থার জন্য জোর লড়াই করে গিয়েছেন। অক্ষয়কুমার লিখেছেন:

> পাঠগৃহ ও তাহার পাশ্ববর্ত্তী ভূমি খণ্ডের যেরূপ পরিপাটী হইলে, বালকগণের চিত্তরঞ্জন ও শিক্ষানুকূল হইতে পারে, সেইরূপ করাই বিধেয়। ঐ পার্শ্ববর্ত্তী ভূমিখণ্ড সুন্দর পথ ও মনোহর বৃক্ষ-শ্রেণীতে সুশোভিত করা এবং স্থানে স্থানে বৃক্ষ লতাদি প্রণালী-বদ্ধ করিয়া উদ্ভিদ্‌বিদ্যা শিক্ষার উপযোগী করিয়া রাখা আবশ্যক। যদি উল্লিখিত প্রমোদকর পথের মধ্যে মধ্যে নিবিড় স্থান ও পরিস্কৃত আসন প্রস্তুত করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে, বালকেরা সময়ে সময়ে সেই পথে ভ্রমণ ও উপবেশন পুরঃসর অশেষবিধ বোধজনক বিষয়ের প্রসঙ্গ করিয়া পুলকিত হইতে পারে। তাহারা যদি এমন রম্য স্থানে সুনিপুণ শিক্ষক সন্নিধানে সুপ্রণালী ক্রমে শিক্ষা করিতে পায়, তাহা হইলে, বিদ্যালয়ের প্রতি বিরাগ ও বিদ্বেষ প্রকাশ করা দূরে থাকুক, তাহা পরম সুখকর সুরম্য স্থান জ্ঞান করে, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু কেবল সুখকর কেন? উল্লিখিত প্রকৃষ্ট পদবী সমুদায়কে ছাত্রদের শিক্ষা সাধন ও চরিত্র শোধনের বিলক্ষণ উপযোগী করা যাইতে পারে। যদি ঐ পথের মধ্যে সক্রেটিস, বেকন, নিউটন, ফ্রাঙ্কলিন, পাস্কেল, ওয়াসিংটন, আর্য্যভট্ট, ভাস্করাচার্য্য, রামমোহন রায় প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত মহাত্মাদিগের, বিশেষতঃ যাঁহারা প্রথম বয়সেই জ্ঞানানুশীলন ও ধর্ম্মানুষ্ঠান বিষয়ে বিশেষ রূপ যশোভাজন হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের, প্রতিমূর্ত্তি স্থানে স্থানে স্থাপন করা যায়, এবং মধ্যে মধ্যে কাষ্ঠফলক রোপণ করিয়া পরমার্থ ঘটিত ও সুনীতিসূচক নীতিসার ও পদার্থবিদ্যাদি বিজ্ঞান শাস্ত্র সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তিত কথা সকল খোদিত করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে, ঐ সমুদায় বিষয় বালকদিগের নেত্র-পথে সতত পতিত হইয়া নিরন্তর স্মরণারূঢ় থাকে, এবং শিক্ষকেরাও সময়ে সেই সমুদায়ের তাৎপর্য্য বিবরণ ও পূর্ব্বোল্লিখিত মহানুভাব ব্যক্তিদিগের সচ্চরিত্র ও সদ্বিদ্যার বিষয় বর্ণনা করিয়া ছাত্রগণের দৃঢ়তর রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন।[১৭৬]

অক্ষয়কুমার দত্তের শিক্ষাচিন্তা যেমন বিজ্ঞানসম্মত তেমনি বাস্তবধর্মী ছিল। একারণেই গত দেড়শো বছর আগের সেই চিন্তা এখনো অম্লান। এ কারণে সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বলেন–অক্ষয়কুমারের শিক্ষা সম্পর্কিত আদর্শ ও পদ্ধতি আজকের দিনেও প্রযোজ্য। কেশবচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, প্রমুখ উত্তরসুরীরা অনেকেই তাঁর শিক্ষাদর্শে অনুপ্রাণিত বলে মনে করা হয়।'[১৭৭] বাংলা ভাষায় শিক্ষাচিন্তর যে ধারা প্রবাহ তিনি সৃষ্টি করেছিলেন তা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় আরও গতিময়তা লাভ করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায় : অক্ষয়কুমার দত্তের শিক্ষাচিন্তা

তথ্যসূত্র :

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর স্মৃতিপুস্তকের জন্য'; nicmv' kv¯¿x ¯§viKMš', (সত্যজিৎ চৌধুরী, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত সম্পাদিত) কলকাতা, সান্যাল প্রকাশন, আষাঢ় ১৩৮৬ (জুলাই ১৯৭৯), পৃ ১৭৬
২. fviZelxq DcvmK-m¤cª`vq-২, কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, আষাঢ় ১৪০৬, পৃ ১৯
৩. অক্ষয়কুমার দত্তের দুটি তাত্ত্বিক গ্রন্থ fviZelxq DcvmK-m¤cª`vq–দুই ভাগ; ও cvPxb wn›`y‡`i mg‡`hvÎv I evwYR¨ we¯Ívi। প্রথম গ্রন্থটিতে তিনি- প্রধানত ভারতবর্ষের বৃহৎ সমাজের বাইরেও যে অসংখ্য ধর্ম, ধর্মপন্থা ও ধর্মসম্প্রদায় আছে যাঁরা জীবনে ও কর্মে বিচিত্র মত ও পথের মানুষের জীবনবোধ সংক্ষিপ্ত পরিসরে ফুটিয়ে তুলেছেন। দ্বিতীয় গ্রন্থে- একাধারে ভারতবর্ষের ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ের বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। প্রাচীন ভারতবর্ষের লোকেরা তিনটি কর্মের উপর জীবিকা নির্বাহ করতেনকৃষি, শিল্প এবং বাণিজ্য। এই তিনটি বিষয়ের আলোচনা বইটির প্রধান বিশেষত্ব। দ্বিতীয়ত, সমকালীন ইংরেজ শাসন ভারতবর্ষের অর্থনীতিকে কোন্ পরিণতির মুখে ঠেলে দিয়েছে, সে সম্পর্কেও অক্ষয়কুমার দত্তের দৃষ্টিভঙ্গি এ গ্রন্থে প্রতিফলিত হয়েছে। [দ্র. মুহম্মদ সাইফুল ইসলামঃ Aÿq Kgvi `Ë I Dwbk kZ‡Ki evOjv, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা ,আগস্ট ২০০৯, পৃ-৬]
৪. ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : evsjv mvwn‡Z¨i m¤úY© BwZeË, নতুন পরিবর্ধিত সংস্করণ, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড,কলিকাতা, ২০০৮, পৃ-৩০৫
৫. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়: Ebwesk kZvãxi c_gva I evsjv mvwnZ¨ ; বুকল্যান্ড প্রাইভেট লি. কলকাতা, ১৯৬৫, পৃ.১৬২
৬. মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম সম্পাদিত : weÁvb-ew× PPvi AMc_K Aÿq Kgvi `Ë I evOvwj mgvR, রেনেসাঁস, কলকাতা, ৩১ জানুয়ারি ২০০৬, পৃ-১৩ ও ১৪
৭. সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর : AvZ¥Rxebx , , কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৯৬২, পৃ ৩৭
৮. মুহম্মদ সাইফুল ইসলামঃ Aÿq Kgvi `Ë I Dwbk kZ‡Ki evOjv, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা , ২০০৯, পৃ-২
৯. দেবেন্দ্রনা ঠাকুর ছিলেন ব্রক্ষভক্ত প্রাচীন চিন্তার ধারক। ধর্ম রক্ষাই ছিল তাঁর প্রধান চেষ্টা। তাঁর ব্রক্ষভক্তি সম্পর্কে কাজী আবদুল ওদুদ লিখেছেন : 'দেবেন্দ্রনাথের এই যে অন্তরে অন্তরে সেই ব্রহ্মোল্লাস অনুভব করা,সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ যে তার দৈনন্দিন জীবনে জ্ঞান ও কর্মের ভিতর দিয়ে শ্রেয়ের অন্বেষণ করে যাবে, যে অন্বেষণে মুখের প্রার্থনার প্রয়োজন সে অনুভব করতে পারে, নাও পারে,অনন্ত কর্ম-ও প্রেম- পুলকিত মানুষের জীবনে তার আরাধ্য হয়তো তারই জীবনের সুরভি, হয়তো তার জ্ঞাননেত্রে বিশ্বজগতের নিয়ামক, হয়তো বিশ্বজগতের জন্য তার প্রেমের বন্ধন, হয়তো কর্মক্ষেত্রে তার চিরজাগ্রত নেতা, অক্ষয়কুমারের ভিতর দিয়ে উৎসারিত এই আধুনিক মনোভাবকে যে তিনি তেমন শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতে পারেননি,এইখানেই তাঁর মধ্যযুগীয়ত্ব;এবং আধুনিক জীবনোপযোগী জ্ঞানানুরাগ সুমার্জিত জীবন-যাপন ইত্যাদি সত্ত্বেও তিনি যে বৃদ্ধ বয়সে ভাবের আতিশয্যে নৃত্য করতে পেরেছিলেন হয়তো তাঁর এই প্রগলভা মধ্যযুগীয় ভক্তিই তার কারণ।' [দ্র, kvkZ e½, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ,১৩৫৮, পৃ ৩৪৮]
১০. প্রমথনাথ বিশী ও বিজিতকুমার দত্ত সম্পাদিত 'evsjv M‡`¨i c`v¼, কলকাতা, ১৯৬১, পৃ ৮৭-৮৮
১১. আশীষ লাহিড়ী, A¶qKgvi `Ë: Avavi iv‡Z GKjv cw_K, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা জুলাই ২০০৭, পৃ.২২
১২. অক্ষয়কুমার দত্তের মা দয়াময়ীর পরোপকার ও আর্তের সেবাদান প্রসঙ্গে মহেন্দ্রনাথ রায় লিখেছেন : অক্ষয়কুমার বাবুর বন্ধু জনেরা ইঁহার পিতার অমায়িকতা ও পরোপকারিতাদি গুণ এবং মাতার প্রবল বুদ্ধি ও ধর্মপ্রবৃত্তির বিষয় ইঁহার নিকটে বারংবার শুনিয়াছেন। জনক-জননীর, বিশেষতঃ জননীর, গুণাবলী সন্তানে বিদ্যমান আছে। মহাবীর নেপোলিয়ন বোনাপার্টি, অরিন্দিম সার জর্জ ওয়াশিংটন, দুর্দ্ধর্ষ জোসেফ ম্যাটসিনি, খৃষ্টীয় ধর্মসংস্কারক মহাত্মা থিওডোর পার্কার, বিবিধ বিদ্যাবিশারদ স্যার উইলিয়াম জোন্স ও সুতীক্ষ্ণ মনীষাসম্পন্ন রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতি মহাপুরুষগণ তাহার প্রদীপ্ত প্রমাণ। অক্ষয় বাবু উত্তরকালে যে একজন অসাধারণ সুনীতিপরায়ণ বলিয়া প্রসিদ্ধ হন, স্বীয় জননীর প্রবল ধর্মপ্রকৃতিই তাহার প্রধান কারণ। ইঁহার মাতা স্বভাব-সিদ্ধ পরোপকারিতা, ন্যায়পরতা ও সৌজন্যাদি বিবিধ গুণে গ্রামস্থ প্রতিবাসি-মণ্ডলীর সম্মানাস্পদ ও শ্রদ্ধাভাজন হইয়া জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার সহিত যাঁহার একবার সাক্ষাৎকার ঘটিত, তিনিই তাঁহার গুণানুবাদ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। .... অক্ষয়বাবুর পিতার অমায়িকভাব ও ভদ্রতাপূর্ণ ব্যবহার দেখিয়া বোধ হইত, তিনি আত্মীয় কুটুম্ব ও স্বগ্রামস্থ সকলকে আত্ম-পরিজনের মত দেখেন। বস্তুতঃ তিনি সেই সকলকে তদনুরূপ সম্বোধন ও তাঁহাদের প্রতি চিরদিন তদনুরূপ ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন।"[দ্র. মহেন্দ্রনাথ রায়, kÖxh³ eve A¶qKgvi `‡Ëi Rxeb-eEvšÍ, কলিকাতা, ১২৯২, পৃ ১-৩]
১৩. অক্ষয়কুমার দত্তের তিনজন জীবনীকার-মহেন্দ্রনাথ রায়, নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস ও রাজকুমার চক্রবর্তী। এঁদের বক্তব্য অক্ষয়কুমার সম্পর্কে জানা যায়, তিনি কত গভীর অন্ধকার পরিবার থেকে আলোর জগতে উঠে এসেছিলেন। সেকালের সমাজমানস কি ধরনের মূল্যবোধে বিশ্বাস করত, সেটাও বোঝা যায়। অক্ষয়কুমার দত্তের জন্ম-বৃত্তান্ত সম্পর্কে মহেন্দনাথ রায় লিখেছেন, 'পীতাম্বর দত্তের প্রথমে চারিটি সন্তান নষ্ট হয়। দুইটি পুত্র ও একটি কন্যা

Dhaka University Institutional Repository

মাতৃগর্ভেই মরিয়া যায় এবং মথুরানাথ নামে অপর একটি পুত্র ভুমিষ্ঠ হইয়া, কয়েক মাস পরে প্রাণত্যাগ করে। মথুরানাথের পিতা মাতা শোকাকুল হইয়া আপনাদের ধর্মানুসারে অনেক দেবতার স্থানে অনেক প্রকার মানসিক করেন এবং চুপীর ন্যূনাধিক ১॥০ দেড় ক্রোশ দক্ষিণে কাণা গোঁসাই নামে যে একটি অন্ধ সাধু অবস্থিতি করেন, ১২২৬ সালে তাঁহার দ্বারা পুত্রেষ্টি যাগ করান। ১২২৭ সালে অক্ষয়কুমারের জন্ম হয়। অক্ষয়কুমার দত্তের মা-বাবার চারটি সন্তান মারা যাওয়ার ঘটনা মহেন্দ্রনাথ রায় যেভাবে বর্ণনা করেছেন, নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস অনুরূপ বর্ণনা করার পরে বলেন, 'এই মৃতবৎসা কাকবন্ধ্যার ইহার পর ১০/১২ বৎসর আর কোন সন্তানাদি হয় নাই। সন্তানের জন্য অনেক দেব দেবীর নিকট অনেক আরাধনা করেন। চুপীর এক ক্রোশ দক্ষিণে ব্রহ্মাণীতলা নামক গ্রামে একজন মহারাষ্ট্রীয় সাধু বাস করিতেন। তাঁহার একটি চক্ষু ছিল না বলিয়া লোকে তাঁহাকে কাণা গোসাঞি বলিয়া ডাকিত। দয়াময়ী তাঁহার নিকট গমন করেন। তিনি পুত্রেষ্টি যাগ করিয়াছিলেন। সেই যাগের চরু খাইবার পর উহার গর্ভ সঞ্চার হয়। সেই গর্ভে ১২২৭ সালের ১ শ্রাবণ শনিবার শুক্ল পক্ষ পঞ্চমী তিথিতে রাত্রি অনুমান ৬ দণ্ডের সময় চুপিতে অক্ষয়কুমার জন্ম গ্রহণ করেন। কাণা গোসাঞি ইঁহার নাম নৃসিংহপ্রসাদ রাখিয়াছিলেন। ইঁহার পিতা মাতা ইঁহার জন্মতিথি পূজার অনুষ্ঠান করিতেন।' [দ্র.A¶q-P॥iZ,কলিকাতা, আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র, ভাদ্র ১২৯৪,পৃ ৪-৫]

১৪. মহেন্দ্রনাথ রায়, পূর্বোক্ত, পৃ ৫

১৫. নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস, পূর্বোক্ত, পৃ ৬

১৬. পূর্বোক্ত, পৃ ৬

১৭. সেকালের ''শিক্ষার ভয়াবহ বিকৃত প্রণালী ছিল। শিক্ষকের আলয়ে না যাইবার নিমিত্ত যমালয়ে যাইতে প্রস্তুত হইয়াছিলাম। গুরুমহাশয় ও ওস্তাদজি, উভয়ে কৃতান্ত অপেক্ষাও ভয়ানক ছিলেন। পাঠশালায় যেমন প্রথমেই নীরস ও কঠিন অঙ্কবিদ্যা শিখাইবার রীতি ছিল, মকতবেও তেমনি বালবুদ্ধির অগম্য পুস্তকসকল ব্যবহৃত হইত। উভয় স্থলেই ছাত্রগণ শিক্ষকের ইচ্ছানুরূপ শিক্ষা করিতে না পারিলে বা পঠিত বিষয় বিস্মৃত হইলে, অতি নির্দয়রূপে তিরস্কৃত বা প্রহারিত হইত। শিক্ষাতে তাহাদের মনোযোগ নাই, ইহাই শিক্ষক ও গুরুজন বিবেচনা করিতেন, এবং কেবলমাত্র পীড়ন দ্বারা তাহাদিগকে শিক্ষায় আবিষ্ট করাইতে প্রবৃত্ত হইতেন। কিন্তু তাহারা কি জন্য শিক্ষায় বিমুখ থাকিত, তাহার প্রকৃত কারণ বুঝিতে একবারও চেষ্টা করিতেন না। শুনিয়াছি গুরুমহাশয়ের ভয়ে এক বালক খর্জ্জুর বৃক্ষে আরোহণ করিয়াছিল। গুরুমহাশয়ের কোন কোন পড়ুয়া যাইয়া তাহাকে নামাইবার নিমিত্ত লোষ্ট্র প্রহার করিতে লাগিল। বালক নিরূপায় দেখিয়া অতি কাতরস্বরে কহিল, 'হে ঈশ্বর! যদি তুমি খেজুরের কাঁটায় আমার চক্ষু দুইটি অন্ধ করিয়া দাও, তবে আর আমায় পাঠশালায় যাইতে হয় না।' যে লেখাপড়া জন্য ইদানীন্তন শিশুগণ পর্য্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করে, শিক্ষাপ্রণালীর দোষে সেই লেখাপড়ার ভয়ে ১২/১৩ বৎসরের বালকেরাও প্রাণত্যাগ করিবার ও অন্ধ হইবার বাঞ্ছা করিত।'[দ্র. A॥Z¦-R॥eb-P॥iZ, কলিকাতা, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রা. লি., ১৩৬৩, পৃ ২২-২৩

১৮. মহেন্দ্রনাথ রায়, পূর্বোক্ত, পৃ ৬

১৯. খিদিরপুরে তাঁর পিতৃব্যপুত্র হরমোহন দত্তের বাসা ছিল। অক্ষয়কুমার দত্তের ঠাকুর দাদার ছিল পাঁচ পুত্র পদ্মলোচন, কাশীনাথ, চূড়ামণি, পীতাম্বর ও কীর্তিচন্দ্র। হরমোহন দত্ত ছিলেন কাশীনাথ দত্তের চার পুত্রের মধ্যে তৃতীয়। এই হরমোহন দত্ত ইংরেজি জানতেন। তিনি কলকাতার 'সুপ্রিম কোর্টের মাষ্টার আফিসে' প্রধান কেরানির কাজ করতেন। তিনি আর্থিকভাবে স্বচ্ছল ছিলেন। আত্মীয়দের মধ্যে কারো শিক্ষার ব্যাপারে কিছু করতে হলে তিনি সহায়তা করতেন। পীতাম্বর দত্ত তাঁর চার সন্তান হারাবার পর, এই হরমোহন দত্তকে পুত্রস্নেহে লেখাপড়া শিখিয়েছেন। কাজেই অক্ষয়কুমার ইংরেজি পড়বার আগ্রহ প্রকাশ করলে হরমোহন দত্তের বাসায় থেকে তার ব্যবস্থা করা হয়। তখন খিদির পুরে জয়কৃষ্ণ সরকার ও গঙ্গাচরণ সরকার নামে দুজন মাষ্টারের ইংরেজি পড়ানোর সুনাম ছিল। অক্ষয়কুমারকে এই মাষ্টারদ্বয়ের অধীনে ইংরেজি পড়াবার দায়িত্ব দেন হরমোহন দত্ত। [দ্র.মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম, অক্ষয়কুমা দত্ত ও উনিশ শতকের বাঙলা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, আগস্ট ৯, ঢাকা, পৃ.১৪-১৫

২০. পূর্বোক্ত, পৃ ১৪

২১. পূর্বোক্ত, পৃ ১৫-১৬

২২. মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম, অক্ষয়কুমা দত্ত ও উনিশ শতকের বাঙলা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৯, ঢাকা, পৃ. ১৫

২৩. মহেন্দ্রনাথ রায় লিখেছেন-গৌরমোহন বাবু ইঁহাকে সপ্তম শ্রেণীতে গ্রহণ করিতে মনস্থ করিলে, ইনি ঐ শ্রেণী হইতে উচ্চতর কোন শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইতে চাহিলেন। সে সময় গৌরমোহন আঢ্য মহাশয় পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রগণের পাঠনা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। অক্ষয় বাবুর ইচ্ছা, তাঁহাকে সেই শ্রেণীতে সন্নিবিষ্ট করা হয়। শুদ্ধ মনের ভিতর ঐ ইচ্ছা প্রচ্ছন্ন না রাখিয়া প্রকাশ্যে স্পষ্ট ভাষায় গৌরমোহন বাবুকে তাহা বলিলেন। আঢ্য মহাশয় তাহাতে বলিয়া উঠিলেন, 'সে কি? তুমি ইংরেজী ব্যাকরণও কিছু রীতিমত পড় নাই, বিশুদ্ধরূপে ইংরেজী উচ্চারণও করিতে শিক্ষা কর নাই। কেবল বয়স অধিক হইয়াছে বলিয়াই তোমাকে সপ্তম শ্রেণীতে দিলাম। অপেক্ষাকৃত অল্প বয়স হইলে, আরও নিম্ন শ্রেণীতে ভর্ত্তি করিতাম।' গৌরমোহন বাবু ঐরূপ বলিলেও, অক্ষয়বাবু নিরস্ত হইলেন না; পঞ্চম শ্রেণীতেই ভর্ত্তি হইবার নিমিত্ত নির্ব্বান্ধাতিশয় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। নবীন ছাত্রের এই সাহস ও প্রতিজ্ঞা দেখিয়া অবশেষে আঢ্য মহাশয়কে ইঁহার মতেই সম্মত হইতে হইল। তখন ইনি পদসাধন, অন্বয়-বোধ, প্রকৃতি-প্রত্যয়-পরিজ্ঞান প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য ও বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয় কিছুমাত্র জানিতেন না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, প্রার্থিত পঞ্চম শ্রেণীতে সন্নিবিষ্ট হইয়া অবধি গুরুতর পরিশ্রম, অসীম অধ্যবসায় ও প্রগাঢ় উৎসাহ সহকারে পাঠে এমনই

মনোনিবেশ করিলেন যে, ছয়-সাত মাসের মধ্যেই স্কুলের পারিতোষিক বিতরণ সময়ে দ্বিতীয় পারিতোষিক প্রাপ্ত হইলেন। বিদ্যালয়–স্বামী গৌরমোহন আঢ্য যে অক্ষয়কুমারকে প্রথমে কোনরূপেই পঞ্চম শ্রেণীর উপযুক্ত মনে করেন নাই, কয়েক মাস পরেই ইনি সেই শ্রেণীর একটি প্রধান পারিতোষিক প্রাপ্ত হইলেন দেখিয়া, আঢ্য মহাশয় ইঁহাকে বিশেষরূপ বুদ্ধিমান ও ক্ষমতাপন্ন বিবেচনা করিয়া একেবারেই তৃতীয় শ্রেণীতে উঠাইয়া দিলেন। [দ্র.মহেন্দ্রনাথ রায়, kxh³ eve A¶qKgvi evei Rxeb-eË¨vš Í, কলিকাতা, ১২৯২, পৃ ১৭-১৯]

২৪. পূর্বোক্ত, পৃ ২২

২৫. সেকালের প্রচলিত সমাজব্যবস্থা ও পরিবারের প্রবল রক্ষণশীলতার কারণে ছাত্রাবস্থায় অক্ষয়কুমারকে বিয়ে করতে হয়। পড়াশোনা অবস্থাতেই তিনি একটি কন্যা সন্তানের জনক হন। মহেন্দ্রনাথ রায় লিখেছেন : ''বলিব কি, পঠদ্দশাতেই ইঁহার প্রথম কন্যা হয়। কলিকাতায় ইনি তদ্বিষয়ের সংবাদ পান। পাইয়া বড়ই উদ্বিগ্ন হন এবং দুই একটি বিচক্ষণ বয়স্যকে বলেন,'আমি অসময়ে কি বদ্ধ হইয়া পড়িলাম। কোথায় আমি দেশ-ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইব, দেশ-দেশান্তর পরিভ্রমণ পূর্ব্বক নানা বিষয় শিক্ষা করিব, নানা স্থানে নানা বিষয় দর্শন ও সংগ্রহ করিব, না কোথায় শৃঙ্খল-বদ্ধ হইয়া পড়িলাম। নূতন প্রকার কর্ত্তব্য-কর্ম্ম-জালে বদ্ধ হইলাম।" [দ্র. kxh³ eve A¶qKgvi '‡Ëi Rxeb-eË¨vš Í, পূর্বোক্ত, পৃ ৩০৮]

২৬. ১৮৩৯ সনে পীতাম্বর দত্তের মৃত্যু হয় কাশীতে। ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে তাঁর এক বছরের বেতন বাকি পড়ে। ব্যাপারটা তিনি স্কুলের প্রধান গৌরমোহন আঢ্যকে জানান এবং বলেন যে, 'যখন এক বৎসর আমার বেতন আদায় হয় নাই, তখন যে আবার রীতিমত আদায় হইতে থাকিবে, এরূপ বোধ হয় না। অতএব আমার আর স্কুলে পড়া কিরূপে চলিতে পারে? অর্থের অভাবে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে হইল, একথা উচ্চারণ করিতেও আমার কষ্ট হইতেছে।' অক্ষয়কুমারের মুখে এ কথা শুনে গৌরমোহন তাঁকে বিনাবেতনে পড়াতে চান। কেননা ইতিমধ্যে বুদ্ধিমান, মেধাবী ছাত্র হিসাবে স্কুলে তাঁর সুনাম হয়। এবং মেধাশক্তিতে এরকম ছাত্র স্কুলে থাকাতে স্কুলের গৌরব বৃদ্ধি পায়। গৌরমোহন আঢ্য এ-কথা স্কুলের সমস্ত ছাত্রের সামনে স্বীকার করেন; এমনকি অক্ষয়কুমারের কোনরূপ পরীক্ষা ছাড়াই উচ্চতর শ্রেণীতে উত্তীর্ণ করে দেবার কথাও তিনি সব ছাত্রের সামনে বলে তাদের সম্মতি আদায় করেন। কিন্তু পিতার মৃত্যুতে স্কুল ছাড়তে হয়। [দ্র.মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম, অক্ষয়কুমা দত্ত ও উনিশ শতকের বাঙলা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, আগস্ট ৯, ঢাকা, পৃ.১৭]

২৭. মহেন্দ্রনাথ রায়, পূর্বোক্ত, পৃ ৪৩

২৮. মহেন্দ্রনাথ রায়, পূর্বোক্ত, পৃ ৩৩

২৯. নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস লিখেছেন: 'ইনি মধ্যে মধ্যে ভাবিতেন পদ্য না গদ্য কিসে লোকের বেশি উপকার সম্ভাবনা? একদা এবম্বিধ চিন্তাকে প্রশ্রয় দিবার পর ইনি প্রভাকর যন্ত্রালয়ে গুপ্ত মহাশয়ের নিকট গমন করেন। কি বিচিত্র অনুকূল ঘটনা! তাঁহার সহকারী সেদিন উপস্থিত না থাকাতে তিনি উহাকে সুবিখ্যাত ইংলিশম্যান পত্রিকা হইতে কিয়দংশ অনুবাদ করিয়া দিতে অনুরোধ করেন। অক্ষয় বাবু বলিলেন, 'আমি লিখিতে পারিব না, যেহেতু আমি কখনও গদ্য লিখি নাই।' এই কথা শুনিয়া সম্পাদক মহাশয় উত্তর করিলেন 'আমার বিশ্বাস তুমি পারিবে, নচেৎ বলিতাম না। কি করেন লিখিলেন। লেখাটি এরূপ উত্তম হইল যে তাহা দেখিয়া তিনি বলিলেন 'যে ব্যক্তি বহু দিবসাবধি এই কার্য্য করিয়া আসিতেছেন, তিনি এমত সুন্দর লিখিতে পারেন না।' যে ওজস্বিনী গদ্য রচনায় দত্ত মহাশয় অখিল বঙ্গদেশকে বিমোহিত করেন, এই সেই গদ্য রচনার সূত্রপাত।, [দ্র. A¶q-P\iZ, পূর্বোক্ত, পৃ ১৪-১৫]

৩০. নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস, পূর্বোক্ত, পৃ ১৩-১৪

৩১. কেদারনাথ মজুমদার, পূর্বোক্ত, পৃ ২৭৩

৩২. ১৭৬১ শক, ২১ আশ্বিন [১৮৩৯, ৬ অক্টোবর] তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। স্থানড়জোড়াসাঁকোর দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাড়ি। প্রথম দিন প্রথম অধিবেশনে এর নাম ছিল তত্ত্বরঞ্জিনী সভা। দ্বিতীয় অধিবেশনে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ উক্ত নামের পরিবর্তে 'তত্ত্ববোধিনী সভা' রাখেন। এই সভার উদ্দেশ্য সম্পর্কে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন, 'ইহার উদ্দেশ্য, আমারদিগের সমুদায় শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব এবং বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার। প্রথম দিনে এর সভ্য সংখ্যা ছিল দশজন। এই দশজন সভ্য ছিল প্রধানত, দেবেন্দ্রনাথের বন্ধু-বান্ধব, তাঁর পরিবারের আত্মীয়-স্বজন। এবং তাঁর কতিপয় ভ্রাতা। [দ্র. সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর: AvZ¥Rxebx, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৯৬২, পৃ ২৬]

৩৩. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী, পূর্বোক্ত, পৃ ২৬। এখানে আর-একটি তথ্য উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৮৪৩ সনের ২১ ডিসেম্বর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশজন বন্ধু সমেত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের কাছে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। অক্ষয়কুমার দত্ত ছিলেন এই বিশজনের মধ্যে অন্যতম। কিন্তু যাঁর কাছে তাঁরা এই ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, তিনি ব্রাহ্ম ছিলেন না।

৩৪. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাময়িকপত্র-১, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পুর্নমুদ্রণড়মাঘ ১৪১০, পৃ ৮০

৩৫. মহেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন-বৃত্তান্ত, কলিকাতা, নূতন সংস্কৃত যন্ত্র, ১২৯২, পৃ ৪৬

৩৬. কেদারনাথ মজুমদার, বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য-১, কলিকাতা, প্রকাশকড়্যারেন্দ্রনাথ মজুমদার, জুলাই ১৯১৭, পৃ ২৭৬

৩৭. বিনয় ঘোষ, সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র-৩, কলকাতা, প্যাপিরাস, জানুয়ারি ১৯৮০, পৃ ২৪০

৩৮. পূর্বোক্ত, পৃ ২৭৪

৩৯. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ ৮১

৪০. মহেন্দ্রনাথ রায়, পূর্বোক্ত, পৃ ৪৬
৪১. কেদারনাথ মজুমদার, পূর্বোক্ত, পৃ ২৭৪
৪২. সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র-৩, পূর্বোক্ত, পৃ ৭-৮
৪৩. রোজনামচাটির কিছু অংশ এরকম:

শুক্রবার, ৭ ঘন্টার সময় বাটী আসিয়া একবার নিদ্রা গেলাম, ১০ টার সময়ে নিদ্রা ভঙ্গ হইল, সে দিন আর চা পান করিতে ইচ্ছা হইল না, স্নানভোজন করিতে দুই প্রহর অতীত হইল, পরে নিদ্রা গিয়া বেলা যখন ৩টা তখন একবার নীলাম দেখিতে গমন করিলাম, আমার চেরেটের জন্য একটা যুড়ি ক্রয় করিতে মানস ছিল, কিন্তু মনোমত প্রাপ্ত হইলাম না, সুতরাং নীলাম পরিত্যাগপূর্ব্বক একবার সুপ্রীম কোর্ট এবং কার ঠাকুরের হৌস দেখিয়া বাটী আসিলাম, বস্ত্র ত্যাগ করিয়া জল পান করিলে আমি, হরিবাবু এবং শ্যামবাবু একত্র হইয়া বাগানে গমন করিলাম, সেদিন আর বাটী আসা হইল না, রাত্রি ১০টার সময়ে বাগান হইতে অমনি স্থানান্তরে গমন করিয়াছিলাম।

শনিবার শুক্রবার কোন বিষয় উপলক্ষে অধিক রাত্রি জাগরণ প্রযুক্ত স্থানান্তরে অধিক বেলা অবধি নিদ্রা যাইতেছিলাম, পরে দুইজন বন্ধু সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া বেলা ১০টার সময়ে আমার নিদ্রাভঙ্গ করিলেন, তাহারদিগের সহিত অনেক পরিহাস ও কথোপকথনপূর্ব্বক স্থির হইল যে খড়দহে রাসযাত্রা দেখিতে যাইব, অনন্তর বাটী আসিয়া স্নান ভোজনান্তে খড়দহে যাত্রা করিলাম, দুইজন ....লোকও সঙ্গে ছিল, তাহাতে যেরূপ আমোদ হইয়াছে তাহা বর্ণনা করা যায় না।

রবিবার অদ্য বেলা দুই প্রহরের সময়ে বাটী আসিয়াছি, আবার বাবুর বাগানে নিমন্ত্রণ আছে, বৈকালে যাইব, সেখানেও অদ্য রাত্রিতে অত্যন্ত আমোদ হইবে।

কলিকাতা　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　বড়মানুষ
৬ অগ্রহায়ণ, রবিবার

[দ্র.বিনয় ঘোষ, বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ, কলকাতা, ওরিয়েন্ট লংম্যান, ১৯৯৩, পৃ ১২১-১২২]

৪৪. সে-সময়ে অক্ষয়কুমার দত্ত ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অত্যন্ত কাছের মানুষ। তখন বন্ধু-প্রীতিতে দুজনেই ছিলেন অভিসিক্ত। অক্ষয়কুমার তখন তত্ত্ববোধিনী পাঠশালায় শিক্ষকতা করছেন এবং একই সঙ্গে তত্ত্ববোধিনী সভার সহকারী সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করছেন। অক্ষয়কুমার দত্তের এইসব কাজের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের সম্যক পরিচয় ছিল। কাজেই we'¨v'kb পত্রিকা যখন বন্ধ হয়ে যায়, তখন সেরকম একটি মাসিক পত্রিকা তত্ত্ববোধিনী সভা থেকে প্রকাশ করবার কথা ভেবেছিলেন। কেদারনাথ মজুমদার এ ব্যাপারে বলেন : 'বিদ্যাদর্শন' উচ্চশ্রেণীর বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্যের একটি সুন্দর আদর্শ রাখিয়া গিয়াছিল। ..... বিদ্যাদর্শন' বন্ধ হইয়া গেলে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মনে একখানা উন্নত আদর্শের পত্রিকা পরিচালনের কল্পনা জাগ্রত হইয়া উঠে। ইহার ফলেই ১৭৬৫ শকের (১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে) ১লা ভাদ্র তত্ত্ববোধিনী সভা হইতে সেই সভার মুখপত্র স্বরূপ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' বাহির হইতে আরম্ভ করে।" [দ্র. ev½vjv mvgwqK mvwnZ¨-১, পূর্বোক্ত, পৃ ২৭৪-২৭৫]
৪৫. ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার জন্ম-কথা', দ্র. বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন-স্মৃতি, কলকাতা, সুবর্ণরেখা, ২০০২, পৃ ৮০-৮১
৪৬. প্রথম অধ্যায়ের ডিরোজিও অংশে নব্যবঙ্গ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।
৪৭. শিবনাথ শাস্ত্রী, শিবনাথ রচনাসংগ্রহ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, ৫ জুলাই ১৯৭৯, পৃ ৩৬০
৪৮. পূর্বোক্ত, পৃ ৩৬০
৪৯. পূর্বোক্ত, পৃ ২৭
৫০. মহেন্দ্রনাথ রায়, পূর্বোক্ত,পৃ ১০৮-১০৯
৫১. ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পুর্বোক্ত, পৃ ৭৯-৮০
৫২. Romesh Chunder Dutt, *The Literature of Bengal*, Calcutta, Thacker Spink & Co. 1895, p. 164
৫৩. ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পূর্বোক্ত, পৃ ৭৮
৫৪. অমিত্রসূদন, পূর্বোক্ত, পৃ ৩৪
৫৫. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ ২৬
৫৬. মনোমোহন ঘোষ, বাংলা সাহিত্য, কলকাতা, ইন্ডিয়ান পাবলিসিটি সোসাইটি, ১৯৫৫, পৃ ২৬৪
৫৭. যোগেশচন্দ্র বাগল : দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর; (সাহিত্য-সাধক চরিতমালা-৪৫, তৃতীয় খণ্ড) কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, চতুর্থ মুদ্রণ বৈশাখ ১৩৮৪, পৃ ৩৩
৫৮. নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস, অক্ষয়-চরিত; আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীকালিদাস চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত- প্রকাশিত, ভাদ্র ১২৯৪ বঙ্গাব্দ, পৃ ১৬
৫৯. বিনয় ঘোষ : সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র-৫, কলকাতা, প্যাপিরাস, নভেম্বর ১৯৮১, পৃ ১০
৬০. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৬ সংখ্যা, ১লা অগ্রহায়ণ ১৭৬৬ শকাব্দ, পৃ ১২৬
৬১. পূর্বোক্ত, পৃ ১২৬
৬২. মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম:Aÿ qKgvi 'Ë I Dwbk kZ‡Ki evOjv, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৩৫৯

Dhaka University Institutional Repository

৬৩. বাংলা সাময়িকপত্রে সমাজচিত্র-৫; পূর্বোক্ত, পৃ ৭

৬৪. রাজনারায়ণ বসু বলেন, 'বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা করিবার উৎকৃষ্ট প্রণালী ব্রাহ্মসমাজের সভ্যেরা প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন।' [দ্র. wbewPZ evsjv iPbvmsMn; (বারিদবরণ ঘোষ সম্পাদিত), কলকাতা, প্রকাশক শ্রীসমীরচন্দ্র চৌধুরী, ১৪০২, পৃ ২৪৮] সুকুমার সেন কথাটা সমর্থন করে লিখেছেন, 'বাঙ্গালা ভাষায় ভাষণ দেওয়া ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা প্রবর্তিত হয়।' [দ্র. ev½vjv mvwn‡Z¨ M'¨; কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটিড, জানুয়ারি ১৯৯৮, পৃ ৯৮] এই দুই বক্তব্য ঠিক বলেই মনে হয়। তবে ব্রাহ্মসমাজের আরম্ভ থেকে দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার দত্তই প্রধানত এই রীতি চালু করেন। দেবেন্দ্রনাথের বক্তৃতা ছিল 'ভক্তিপ্রধান' আর অক্ষয়কুমার দত্তের বক্তৃতা ছিল 'জ্ঞানপ্রধান'।

৬৫. যোগেশচন্দ্র বাগল লিখেছেন : 'হিন্দু-কলেজ কর্তৃপক্ষ নিজ পাঠশালার জন্য যোগ্য ব্যক্তিদের দ্বারা ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য, গণিত, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন বটে, কিন্তু তাহাও সরকারী শিক্ষা-কমিটির প্রতিবন্ধকতায় অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। পাশ্চাত্য দর্শন রীতিনীতি ও ভাবধারার পরিবর্ত্তে প্রাচ্য দর্শন, রীতিনীতি ও ভাবধারা যাহাতে পাঠ্যপুস্তকে স্থান না-পায় সেদিকে শিক্ষা-কমিটির শ্যেনদৃষ্টি ছিল। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে পাঠ্যপুস্তক রচনার ভার সরকার নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের পক্ষে শিক্ষা-কমিটি এইরূপ নিয়ম করিলেন যে, অগ্রে সকল পাঠ্য-পুস্তকই ইংরেজীতে লিখিতে হইবে, এবং তাহা অনুমোদিত হইলে তবে বাংলা ও অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষায় অনুবাদ করাইয়া পাঠ্যপুস্তকরূপে ব্যবহার করা চলিবে! সরকারি বিদ্যালয় সমূহে ব্যবহারোপযোগী সকল পুস্তকই তখন এইরূপে 'সেন্সর' (censor) করিয়া লওয়া হইত।' [দ্র. †'‡e›'bv_ VvKi, পূর্বোক্ত, পৃ ৩৪]

৬৬. বিহারীলাল সরকার : we'¨vmvMi; কলকাতা, ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানি, নভেম্বর ১৯৯১, পৃ ১৬০

৬৭. নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস, পূর্বোক্ত, পৃ ৩৮-৩৯

৬৮. মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম, অক্ষয়কুমার দত্ত ও উনিশ শতকের বাঙলা পৃ-৩৫৬

৬৯. অক্ষয়কুমার দত্তের দুর্লভ জীবন-গড়ায় এঁদের ভূমিকা ছিল। এ তিনজনের ঋণ স্বীকার করে কথা অক্ষয়কুমার দত্ত বলেছেন-তাঁহারা সেই দিন অবধি এ পর্য্যন্ত আমার প্রতি যেরূপ সদ্ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন, তাহাতে আমার এইরূপ অবধারিত আছে যে, তাঁহারা চির দিনের নিমিত্ত আমার উপকার-ব্রতে ব্রতী হইয়া থাকিবেন, এইটিই প্রথম অবধি মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছেন; তাঁহারা উভয়ে আমাকে শিক্ষা দিয়াছেন; আপনাদের ভূরি ভূরি পুস্তক আমাকে ব্যবহার করিতে দিয়াছেন ও আমার জন্য অকাতরে ও অক্লিষ্ট চিত্তে কতই পরিশ্রম করিয়া আসিতেছেন; আমার সংক্রান্ত কাজের উপর কাজ, কাজের উপর কাজ, যতই পড়ুক না কেন, কিছুতেই ক্লিষ্ট ও পরাঙ্মুখ হন না। আনন্দ বাবু আমার নিমিত্ত কোন কোন গণিত গ্রন্থের সারাংশ স্বহস্তে লিখিয়া দিয়াছেন। আমি নিজে তাহার প্রতিলিপি করিয়া যত্ন পূর্ব্বক রাখিয়াছি; সেই চিরস্মরণীয় প্রতিলিপি আমার কৃতজ্ঞতার সহিত মিলিত হইয়া অদ্যাপি জাজ্বল্যমান রহিয়াছে; শ্রীনাথ বাবু আমার ক্লেশ-লাঘব জন্য এতই ঝন্‌ঝাট্ সহ্য করিয়া থাকেন যে, অনেকে নিজ সংসারের জন্য তাহার অধিক পারে কিনা সন্দেহ; কাহাকেও নিজ সহোদরের জন্য এমত ক্লেশ স্বীকার করিতে দেখিয়াছি এরূপ মনে হয় না; যে দিন আমি অসাধ্য শিরোরোগে জন্মের মত আক্রান্ত হইলাম, সেই দিন অবধি তাঁহারা উভয়ে যতদূর সম্ভব ততদূর যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া আমার জীবন রক্ষা ও ক্লেশ লাঘব করিবেন এই প্রতিজ্ঞায় আরূঢ় হইয়া রহিয়াছেন। ইঁহাদের সহিত আর এক মহানুভব মহাপুরুষের নাম সংযুক্ত করা উচিত; সে নামটি অমৃতলাল মিত্র। তাঁহার অভাবে পৃথিবী যে শূন্য হইয়া গেল, আর তাহা পূর্ণ হইল না, হইবেও না! ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় ভাগ এক খানি তাঁহার কর-কমলে যে অর্পণ করিতে পারিলাম না, আমার এ দুঃখের প্রতিশোধ কিছুতেই হইবার নয়। [মহেন্দ্রনাথ রায়, kxh³ eve A¶qKgvi evei Rxeb-eËvšÍ, কলিকাতা, সংস্কৃত যন্ত্র, ১২৯২, পৃ ৩৫-৩৬]

৭০. শ্রীনাথ ঘোষ রাজা রাধাকান্ত দেবের জামাতা, আনন্দকৃষ্ণ বসু তাঁর দৌহিত্র। এঁদের দুজনের সঙ্গে অক্ষয়কুমারের পরিচয় সম্পর্কে মহেন্দ্রনাথ রায় অক্ষয়কুমারের আত্মজীবনীতে লিখেছেন : এই চিন্তা করিয়া ইঁহার অন্তঃকরণ বড়ই অসুখী থাকিত। সেই লোক যে সকল পুস্তক আত্মসাৎ করিয়া লইয়া আইসে, তাহা অন্য কোন স্থলে যদি বিক্রয় করে, তবে প্রকৃত পুস্তকাধিকারীর সে সকল পাইবার কোন পন্থাই থাকিবে না ভাবিয়া, অক্ষয় বাবু সেই চোর চাকরকে কোন কথাই বলিলেন না। এদিকে পুস্তকাধিকারীদিগকে যে কোন উপায়ে হউক, সমাচার দিতে হইবে বলিয়া ইঁহার চিত্ত অতীব ব্যাকুল হইতে লাগিল। পশ্চাৎ, সে ব্যক্তি রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের বাটির চাকর, এই কথা যাই শুনিলেন, তৎক্ষণাৎ কোন কোন লোক দ্বারা তথায় ঐ সংবাদ বলিয়া পাঠাইলেন। দুঃখের বিষয়, সংবাদদাতাদের মধ্যে কেহই শীঘ্র ঐ কথা রাজবাটির লোকের শ্রুতিগোচর করিলেন না। ইতিমধ্যে একদিন ঐ চোর আসিয়া কহে, 'ঐ পুস্তক সকল চুরী গিয়াছে, ইহা রাজবাটির লোকেরা বুঝিতে পারিয়াছেন এবং তজ্জন্য তাঁহারা আমাকে সন্দেহ না করিয়া এক ব্রাহ্মণকে সন্দেহ করিয়াছেন এবং তাহাকে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।' এই কথা শুনিয়াই ইনি যৎপরোনাস্তি অস্থির হইয়া পড়িলেন; কেন না, নির্দ্দোষী ব্যক্তি অকারণে কষ্ট পাইতেছে; আর যে বাস্তবিক দোষী, সে অম্লান মুখে মনের আনন্দে কৌতুক দেখিতেছে। যে দিন এই ব্যাপার ঘটে, সে দিন ইঁহার এত দূর মনঃকষ্ট হয় যে, অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত নিদ্রা হয় নাই। একটু মাত্র যে সামান্য নিদ্রা হয়, তাহাও সুনিদ্রা নহে। এ বিষয়ের জন্য ইনি নিতান্ত ব্যগ্র থাকিলেন। যদি কাহারও দ্বারা প্রতিকার হয়, এই প্রত্যাশায় আত্মীয় পরিচিত বিস্তর লোকের সমক্ষে ঐ বিষয়ের প্রসঙ্গ উপস্থিত করেন। ইঁহার একটি প্রতিবাসী কবিরাজ রাজবাটিতে চিকিৎসা করিতেন। তাঁহাকেও বলা হইল, তাহাতেও কোন ফল দর্শিল না। সে ব্যক্তি ইঁহার ব্যথায় ব্যথিত হইলেন না।

একে পুস্তক-স্বামীদের বিশেষ ক্ষতি তাহাতে আবার এক নিরপরাধ ব্যক্তির অকারণ দণ্ড! এই দুই বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দত্ত মহাশয়ের এত অসুখ ও এত মনঃক্লেশ চলিল যে, বারংবার যার তার কাছে ঐ কথা উত্থাপন করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছু দিন যায়। পরিশেষে এক দিন কথাপ্রসঙ্গে জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরকে উপস্থিত বিষয় অবগত করিলেন। জ্ঞানেন্দ্র বাবু স্বীয় সহাধ্যায়ী, রাজবাটির দৌহিত্র শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দকৃষ্ণ বসুকে এই ব্যাপার জ্ঞাপন করেন। আনন্দ বাবু উহা শুনিবামাত্র সেই দিনেই বৈকালে জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর বাবুর একটি লোক সঙ্গে করিয়া অক্ষয় বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছিলেন ....পথিমধ্যে আনন্দ বাবুর সহিত সাক্ষাৎকার ঘটে। ঘটিলে, অক্ষয় বাবু তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া নিজ বাসায় প্রত্যাগমন করেন। এ দিকে ঠিক্ সেই সময়েই আবার তাঁহাদের সেই দুষ্ট চোর চাকরটাও বিক্রীত পুস্তকের মূল্য লইতে আসিয়াছিল। অক্ষয় বাবু এক্ষণে তাবৎ পুস্তকগুলি আনন্দকৃষ্ণ বাবুর হস্তে সমর্পণ করিয়া আপনাকে নিশ্চিন্ত ও কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন। রাজবাটিস্থ মহাশয়েরা যে যে পুস্তক হারাইয়া গিয়াছে জানিতেন, তাহার অতিরিক্ত আরও অনেক পুস্তক পাইয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং পুস্তকার্পণকারীর অকৃত্রিম সরলতা, ন্যায়পরতা, উদারতা ও লোভহীনতা দেখিয়া অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিলেন। [দ্র.মহেন্দ্রনাথ রায়, kÖh³ eve A¶qKgvi eveyi Rxeb-eÉvšÍ, কলিকাতা, সংস্কৃত যন্ত্র, ১২৯২ পৃ ৩৫-৩৬]

৭১. মেকওয়েলের স্কুলে সব শ্রেণির মানুষের প্রবেশ অবাধ ছিল না। তাঁর স্কুলে তাঁদের প্রবেশ কাম্য ছিল যাঁরা শাসক ইংরেজের

৭২. নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস,অক্ষয়-চরিত; আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রী কালিদাস চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত-প্রকাশিত, ভাদ্র ১২৯৪ বঙ্গাব্দ, পৃ ১৬

৭৩. ধর্মনীতি : কলিকাতা, কলিকাতা সুচারু যন্ত্র, ১৭৭৭ শক, পৃ ১২১-১২২

৭৪. বদরুদ্দীন উমর : 'ভূমিকা', শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধাবলী; পূর্বোক্ত, পৃ ৮

৭৫. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ৬০ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৭৭০ শকাব্দ, পৃ ৭২

৭৬. শিক্ষায় মাতৃভাষা যে 'মাতৃদুগ্ধ' এই অতি সহজ এবং অতি মহাসত্য কথাটি উনিশ শতকের মধ্যপর্বে শোনা গেল। যতদূর অনুসন্ধানে দেখা যায়, এর আগে মাতৃভাষা এতবড় সম্মান পায়নি। পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তায় এই মৌল নীতিটি বার বার ধ্বনিত হয়েছে। বিশেষত, তাঁর 'শিক্ষার সাঙ্গীকরণ' প্রবন্ধটি এর সুন্দর দৃষ্টান্ত। এটি তাঁর wk¶v গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়।

৭৭. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ৬০ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৭৭০ শকাব্দ (জুলাই ১৮৪৮), পৃ ৬৬

৭৮. পূর্বোক্ত, পৃ ৬৭

৭৯. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ৬০ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৭৭০ শকাব্দ, পৃ ৬৮

৮০. মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম, অক্ষয়কুমার দত্ত ও উনিশ শতকের বাঙলা পৃ-৩৬৫

৮১. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ৬০ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৭৭০ শকাব্দ, পৃ ৭০-৭১

৮২. পূর্বোক্ত, পৃ ৬৬

৮৩. পূর্বোক্ত, পৃ ৬৬

৮৪. মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম, A¶qKgvi `Ë I Dwbk kZ‡Ki evOjv,বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, পৃ-৩৬৪

৮৫. সেকালে মাতৃভাষার প্রতি অনিহা প্রসঙ্গে মাইকেল মধুসূদন দত্তের কথা বলতে গিয়ে যোগীন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন: বেশির ভাগ ইংরেজি শিক্ষিত লোকই যখন বাংলা জানে না বলে এক রকম গর্ব করে, তখন মধুসূদন দত্তকে দোষ দিয়ে লাভ কি? 'মধুসূদনেরও বিশেষ অপরাধ ছিল না। বাঙ্গালা ভাষার তখন যে অবস্থা ছিল, তাহাতে পাশ্চাত্য ভাষায় সুশিক্ষিত কোন ব্যক্তির পক্ষে তাহার অনুশীলন দ্বারা তৃপ্তি লাভের সম্ভাবনা ছিল না। যাঁহাদিগের চেষ্টায় এক্ষণে বাঙ্গালা ভাষা সমৃদ্ধমতী হইয়াছেন, তাঁহাদিগের কেহই তখন লেখনী ধারণ করেন নাই। অন্যের কথা দূরের থাকুক, বাঙ্গালা ভাষার পিতৃস্থানীয় অক্ষয়কুমার দত্ত ও বিদ্যাসাগর মহাশয় পর্য্যন্ত তখন বাঙ্গালা সাহিত্যে অপরিচিত ছিলেন।' [gvB‡Kj gam`b `‡Ëi RxebPwiZ, কলকাতা, দে'জ, পঞ্চম সংস্করণ ১৯২৫, ৩৬] ''তাঁহার সমকালবর্ত্তী অন্যান্য অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির ন্যায় তিনিও মনে করিতেন, ইংরাজী সাহিত্যের অনুশীলন ও ইংরাজী ভাষায় গ্রন্থ রচনা দ্বারাই তিনি যশ ও প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিবেন। [পূর্বোক্ত,পৃ ৭৭]

৮৬. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা; ৬০ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৭৭০ শক, পৃ ৬৯

৮৭. পূর্বোক্ত, পৃ ৭২

৮৮. পূর্বোক্ত, পৃ ৭২

৮৯. পূর্বোক্ত,, পৃ ৭২

৯০. পূর্বোক্ত, পৃ ৬৯-৭০

৯১. অক্ষয়কুমার দত্তের শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধাবলী; মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম সম্পাদিত, ঢাকা, মে ২০০৭, পৃ ৯৬

৯২. শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধাবলী; পূর্বোক্ত, পৃ ৯৫

৯৩. সাইফুল ইসলাম ও তপন বাগচী সম্পাদিত বাঙলাদেশে উচ্চশিক্ষার দুশো বছর, সূচীপত্র, ফেব্রুয়ারি ২০০৬, ঢাকা, পৃ.২৩

৯৪. ধর্মনীতি : কলিকাতা, কলিকাতা সুচারু যন্ত্র, ১৭৭৭ শক, পৃ ১৪৭-১৫১

৯৫. প্রমথ চৌধুরী : 'আমাদের শিক্ষা ও বর্ত্তমান জীবন-সমস্যা'; meRcÎ, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, আষাঢ় ১৩২৬, পৃ.১৪৫-১৪৬

৯৬. পূর্বোক্ত, পৃ.১৪৭

৯৭. পূর্বোক্ত, পৃ.১৪৩-১৪৪
৯৮. অসিতকুমার ভট্টাচার্য : A¶qKgvi ‘Ë Ges Dwbk kZ‡Ki evsjvq ag I mgvR wPšÍv; কলকাতা, কে পি বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানী, প্রথম প্রকাশ––২০০৭, পৃ ৮২
৯৯. agbxwZ, পৃ ১২৩-১২৭
১০০. মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম, অক্ষয়কুমার দত্ত ও উনিশ শতকের বাঙলা, পূর্বোক্ত, পৃ.৪১২-৪১৩
১০১. agbxwZ; পূর্বোক্ত, পৃ ১৩৭
১০২. পূর্বোক্ত, পৃ১৩৯
১০৩. সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় : ev0vjxi ivówPšÍv-১, কলকাতা, জি.এ.ই. পাবলিশার্স, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৯১, পৃ ৫৯
১০৪. agbxwZ : কলিকাতা, কলিকাতা সুচারু যন্ত্র, ১৭৭৭ শক, পৃ ১৬৪
১০৫. পূর্বোক্ত, পৃ ১৬৫
১০৬. mvgwqKc‡Î evsjvi mgvRwPÎ-৩, পূর্বোক্ত, পৃ ২৪
১০৭. mvgwqKc‡Î evsjvi mgvRwPÎ-৩, পূর্বোক্ত, পৃ ৩২-৩৩
১০৮. পূর্বোক্ত, পৃ ৩২
১০৯. গোলাম মুরশিদ, mgvR ms¯‹vi Av‡›`vjb I evsjv bvUK; ঢাকা, বাংলা একাডেমী, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৪, পৃ
১১০. mvgwqKc‡Î evsjvi mgvRwPÎ-৩, পূর্বোক্ত, পৃ ২৭
১১১. পূর্বোক্ত, ২৪]
১১২. evn¨e¯‘i mwnZ gvbecKwZi m¤Ü wePvi-১, পূর্বোক্ত, পৃ ১১৭
১১৩. agbxwZ, পূর্বোক্ত, পৃ ৯২-৯৩
১১৪. পূর্বোক্ত, পৃ ১৩০
১১৫. পূর্বোক্ত,১৩১-৫
১১৬. অশীন দাশগুপ্ত, ceÜ mgM; কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ, ২০০১, পৃ ১১৮
১১৭. agbxwZ, পূর্বোক্ত,পৃ ১২৮-১২৯
১১৮. wk¶vwelqK ceÜvejx, পূর্বোক্ত, পৃ ১২
১১৯. বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, e½mwn‡Z¨ weÁvb, কলকাতা, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, জানুয়ারি ১৯৬০, পৃ ৬০
১২০. পূর্বোক্ত, পৃ ৬০
১২১. f‡Mvj, তত্ত্ববোধিনী সভা, ১৭৬৩ শক, পৃ ২৯-৩০
১২২. পূর্বোক্ত পৃ ৪৯-৫০
১২৩. বিনয়ভূষণ রায়, Dwbk kZ‡Ki evsjvq weÁvb mvabv, সুবর্ণরেখা, ১ বৈশাখ ১৩৯৪, পৃ ২৩০
১২৪. বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ ৫০
১২৫. বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ ৪৮-৪৯
১২৬. পূর্বোক্ত, পৃ ৬৮
১২৭. পূর্বোক্ত পৃ ৬৮
১২৮. পূর্বোক্ত পৃ ৬৮
১২৯. পূর্বোক্ত পৃ ৬৮-৬৯
১৩০. মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম, অক্ষয়কুমার দত্ত ও উনিশ শতকের বাঙলা, পূর্বোক্ত, পৃ.৩২৯
১৩১. দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, iex›`bv_ I weÁvb, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, জানুয়ারি ২০০০, পৃ ৭৮
১৩২. পূর্বোক্ত, পৃ ৭৯
১৩৩. পূর্বোক্ত, পৃ ৮০
১৩৪. রমাকান্ত চক্রবর্তী, ‘‘উনিশ শতকের ‘কলিকাতা-সভ্যতা’এবং ‘বাঙাল’’, PZi½, ৩৫ বর্ষ, শ্রাবণ-পৌষ ১৩৮০ পৃ ১১৫
১৩৫. দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ ৯২
১৩৬. c‘v_we‘¨v, কলিকাতা, সংস্কৃত প্রেস, চতুর্থ মুদ্রণ–১৮৬১, দ্র ‘বিজ্ঞাপন’
১৩৭. নবেন্দু সেন, পূর্বোক্ত, পৃ ৭২
১৩৮. বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ ৬১
১৩৯. দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায় উদ্ধৃত, পূর্বোক্ত, পৃ ৮৬
১৪০. প্রফুল্লচন্দ্র রায়, AvZ‡PwiZ, কলকাতা, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, দ্বিতীয় সংস্করণ, শ্রাবণ ১৩৬৮, পৃ ১১৩
১৪১. ঔ. ঈ. এযড়ংয, Bengali Literatre, খড়হফড়হ, ঙীভড়ৎফ টহরাবৎংরঃু ঢ়ৎবংং, ১৯৪৮, ঢ়. ১২২
১৪২. পূর্বোক্ত, ১১১ সংখ্যা, কার্তিক ১৭৭৪ শক, পৃ ৭৯
১৪৩. c‘v_we‘¨v, কলিকাতা, সংস্কৃত প্রেস, চতুর্থ সংস্করণ ১৮৬১, পৃ ১
১৪৪. শিশিরকুমার দাশ, ‘মুখবন্ধ’, নবেন্দু সেন, M‘¨wkíx A¶qKgvi ‘Ë I †‘‡e›`bv_ VvKi, পূর্বোক্ত, পৃ ১৩
১৪৫. মহেন্দ্রনাথ রায়, পূর্বোক্ত, পৃ ১৬০
১৪৬. তপন চক্রবর্তী ,শতবর্ষে বাঙালির বিজ্ঞানচর্চা,বাংলা একাডেমি, চৈত্র ১৪০৭/ মার্চ ২০০১, ঢাকা, পৃ ৮৮-৮৯

১৪৭. যোগীন্দ্রনাথ বসু, 'অক্ষয়কুমার দত্ত ও বাংলা সাহিত্য', weÁvb-eï×PPvi AMc_K A¶qKgvi 'Ë I evOwj mgvR, পূর্বোক্ত, পৃ ৯২
১৪৮. নবেন্দু সেন, পূর্বোক্ত, পৃ ১৮২
১৪৯. যোগেশচন্দ্র রায় কটক কলেজে বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন। বিজ্ঞান বিষয়ে কয়েকটি বই লিখেছিলেন। তার মধ্যে mij c'v_-weÁvb (১৮৮৬), mij cvKZ f‡Mvj (১২৯৫), mij imvqb (১৮৯৮) প্রভৃতি প্রধান। এসব বইতে তিনি পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। Ancient Indian Life (১৯৪৮) গ্রন্থের জন্য ১৯৫১ সনে রবীন্দ্রস্মৃতি পুরস্কার পান এবং cRvcveY (১৩৫৮) গ্রন্থের জন্য ১৯৫২ সনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ তাঁকে রামপ্রাণ গুপ্ত পুরস্কার প্রদান করে। যোগেশচন্দ্র রায় প্রথম বাংলা বানানে দ্বিত্ববর্জনের প্রস্তাব করেছিলেন এবং তাঁর প্রস্তাব মান্যতা পায়।
১৫০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর wekcwiPq (১৩৪৪) গ্রন্থে পরিভাষা বর্জনের চেষ্টা করলেও এ বিষয়ে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। তিনি বিজ্ঞান ও অন্যন্য বিষয়ে যে-সমস্ত পরিভাষা প্রণয়ন করেছিলেন, তার একটি পুর্ণাঙ্গ তালিকা পাওয়া যায় evsjv kãZË (তৃ. স. ১৩৯১) গ্রন্থে।
১৫১. রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী যে-সমস্ত বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রণয়ন করেন, তার সবগুলি বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সম্পাদিত iv‡g›'m›'i iPbvmgM প্রথম খণ্ডে [কলকাতা, গ্রন্থমেলা, ৭ বৈশাখ ১৩৮২] সঙ্কলিত হয়েছে।
১৫২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, wekcwiPq, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, অগ্রহায়ণ ১৩৮৭, পৃ ৭
১৫৩. AvPvh cdjøP‡›'i ceÜ (সঙ্কলন ও সম্পাদনা শ্যামল চক্রবর্তী), কলকাতা, আজকাল, বইমেলা ২০০১, পৃ ১৯১-১৯২
১৫৪. নবেন্দু সেন, evsjv M'¨ : ÷vBwjmwUKm, সাহিত্য প্রকাশ, ৩১ মার্চ ১৯৯০, পৃ ৬০
১৫৫. রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, iv‡g›'m›'i iPbvmgM-১, পূর্বোক্ত, পৃ ১২৭
১৫৬. নবেন্দু সেন, পূর্বোক্ত, পৃ ১৮১
১৫৭. মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম, অক্ষয়কুমার দত্ত ও উনিশ শতকের বাঙলা, পূর্বোক্ত, পৃ.৫৩৪
১৫৮. রামগতি ন্যায়রত্ন : ev½vjv fvlv I ev½vjv mvwnZ¨welqK c¯Íve; (অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত), কলকাতা, সুপ্রীম বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, নতুন সংস্করণ১৯৯১, পৃ ২১০
১৫৯. পূর্বোক্ত, পৃ ২১০
১৬০. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী : nicmv' iPbvejx-২ খণ্ড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ডিসেম্বর ১৯৮১, পৃ ৫০৮
১৬১. নবেন্দু সেন লিখেছেন, '...কেবল উনিশ শতকের মধ্যেই Pvi æcvV-এর সীমা প্রসারিত নয়, বিশ শতকেও তার বিস্তার লক্ষিত হয়। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও এই পুস্তক পাঠ করেছেন। আত্মকথায় শরৎচন্দ্র এ বিষয়ে লিখেছেন 'এলাম শহরে, একমাত্র বোধোদয়ের নজিরে গুরুজনেরা ভর্তি করে দিলেন ছাত্রবৃত্তি ক্লাশে। তার পাঠ্য সীতার বনবাস, চারুপাঠ, সদ্ভাবশতক ও মস্ত মোটা ব্যাকরণ।' [দ্র. M'¨wkíx A¶qKgvi 'Ë I †'‡e›'bv_ VvKi; পূর্বোক্ত, পৃ ৪৮ [
১৬২. দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর আত্মজীবনী গ্রন্থে অক্ষয়কুমারের Pvi æcvV পড়ার অভিজ্ঞতা স্মৃতিচারণ করেছেন এভাবে : 'বিশ্বম্ভরের পাঠশালায় চারুপাঠ দ্বিতীয় ভাগ পর্যন্ত শেষ করিয়া আমি মানিকগঞ্জ মাইনর স্কুলে ভর্তি হইলাম। বিশ্বম্ভরের নিজের পড়াশুনার দৌড় ঐ চারুপাঠ পর্যন্তই ছিল এমনকি চারুপাঠের শেষ পর্যন্ত অনেকটা তিনি নিজেই ভাল বুঝিতেন না এজন্য উচ্চ ক্লাসের পড়ুয়ারা ঠকাইবার ইচ্ছায় যখন তাঁহাকে বিরক্ত করিত তখন একদিকে তিনি দমাদম কিল, চড় ও বেত মারিতে থাকিতেন, এবং অপরদিকে কঠোর শাসনসূচক বহুতর গালাগালি মুখ হইতে নিষ্ঠীবনের সঙ্গে অজস্র বাহির হইতে থাকিত।' [দ্র. N‡ii K_v I hMmwnZ¨: কলকাতা, জিজ্ঞাসা, দ্বিতীয় মুদ্রণ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৬,জুন ১৯৬৯, পৃ ৪২] দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর ইংরেজিতে লেখা *Bengali Prose Style* গ্রন্থেও লিখেছেন : With Charupath, pt. II. I presume most of my readers are irresistibly of the free use of cane on my back received daily from my Quondam Guru, Bishwambhar Saha, lame of one leg, for my neglecting the lessons. So Aksay Datta's scientific primer bears to me many painful associations of early days having been at one time a source of my constant tears in a far truer sense than any work of fiction has ever been to me in my after life. (*Bengali Prose Style*; Calcutta, Calcutta University, 1921, p 141.)
১৬৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : gvB‡Kj gam'b 'Ë; কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, এপ্রিল ১৯৯৮, পৃ ৮৩-৮৪
১৬৪. মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম, অক্ষয়কুমার দত্ত ও উনিশ শতকের বাঙলা, পূর্বোক্ত, পৃ ৪০৮
১৬৫. পূর্বোক্ত, পৃ ২২১
১৬৬. মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম, অক্ষয়কুমার দত্ত ও উনিশ শতকের বাঙলা, পূর্বোক্ত, পৃ.৪১০
১৬৭. agbwnZ, পৃ ১৫২-১৫৩
১৬৮. মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম, অক্ষয়কুমার দত্ত ও উনিশ শতকের বাঙলা, পূর্বোক্ত, পৃ ৪৩০
১৬৯. পূর্বোক্ত, পৃ ৭৭
১৭০. agbwnZ, পূর্বোক্ত, পৃ ১১২-১১৩
১৭১. মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম, অক্ষয়কুমার দত্ত ও উনিশ শতকের বাঙলা, পূর্বোক্ত, পৃ ৪৩৪
১৭২. evn¨e¯i mwnZ gvbecKwZi m¤Ü wePvi-১, পূর্বোক্ত, পৃ ১১১-১১২

১৭৩. পূর্বোক্ত, পৃ ১১২
১৭৪. ZË‡ewabx cwÎKv; ৭৭ সংখ্যা, পৌষ ১৭৭১ শক, পৃ ১৪২-১৪৩
১৭৫. evn¨e¯i mwnZ gvbecKwZi m¤Ü wePvi-১, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৪
১৭৬. অক্ষয়কুমার দত্ত, agbxwZ: কলিকাতা, কলিকাতা সুচারু যন্ত্র, ১৭৭৭ শক, পৃ ১৫৪-১৫৫
১৭৭. সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় : evOvjxi ivóªPšÍv-১, কলকাতা, জি. এ. ই. পাবলিশার্স, তৃতীয় সংস্করণ১৯৯১, পৃ ৫৭

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শিক্ষাচিন্তা

১. পরিচয়
২. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মানস বৈশিষ্ট্য
৩. প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা
৪. কর্মজীবন
৫. শিক্ষাচিন্তায় আত্মনিয়োগ
৬. শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
৭. শিক্ষা পরিকল্পনা ও পদ্ধতি
৮. আদর্শ বঙ্গ বিদ্যালয় স্থাপন
৯. শিক্ষা বিষয়ক পাঠ্যপুস্তক রচনা
১০. নারীশিক্ষা ও নারীর মর্যাদা
১১. জনশিক্ষা

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শিক্ষাচিন্তা

পরিচয়

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯৪) উনিশ শতকের শ্রেষ্ঠ চিন্তকদের একজন। তিনি বাংলা গদ্যের জনক, সমাজ সংস্কারক ও মানবিক বিদ্যার সাধক হিসেবে সুপরিচিত। তিনি শিক্ষার মাধ্যমে এদেশের মানুষকে কুসংস্কারমুক্ত ও আত্মসচেতন করে তুলতে চেয়েছিলেন। বাঙালির শিক্ষাচিন্তায় বিদ্যাসাগর সমন্বয়সাধকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁর শিক্ষানীতিতে একদিকে ছিল সংস্কার অন্যদিকে সংগঠন। সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা সংস্কারের যেমন প্রস্তাব করেছেন তেমনি বাংলার দক্ষিণাঞ্চলের স্কুলসমূহ পরিদর্শনে গিয়ে তিনি গ্রামান্তরে মডেল স্কুল ও বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন। শিক্ষায় সমন্বয় সাধন করতে গিয়ে তিনি সহায়ক মাধ্যম হিসেবে ইংরেজি কিংবা সংস্কৃত কোনোটির উপরই সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করেননি। কারণ বিদ্যাসাগর অনুধাবন করেছিলেন যে, সংস্কৃত শিক্ষা যেমন পরিবর্তনশীল সমাজ ব্যবস্থায় সময়ের দাবী মিটাতে পারবে না; তেমনি ইংরেজির মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষাও সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব নয়। এই বিবেচনায়, বাঙালির চিন্তাগঠন ও জ্ঞানার্জনের জন্য তিনি উভয় বিদ্যার সমন্বয়ে এক নতুন শিক্ষাদর্শ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তাতে বিদ্যাশিক্ষার পদ্ধতির ক্ষেত্রে কোনো প্রকার মিশ্রণ ঘটেনি। তাঁর বক্তব্য ছিল, সংস্কৃতের সাহায্যে মাতৃভাষাকে শক্তিশালী করা এবং ইংরেজির মাধ্যমে পাশ্চাত্যের জ্ঞান আহরণ করে, মাতৃভাষাকে সম্পদশালী করার পক্ষে। এই মৌলিক চিন্তা থেকেই তিনি সংস্কৃত কলেজকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার সমন্বয় কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের অভিপ্রায় ছিল সংস্কৃত কলেজ থেকে বাংলা ভাষায় পরিপূর্ণ দক্ষতাসম্পন্ন ছেলে তৈরি করা, যারা সেখান থেকে বের হয়ে মাতৃভাষার মাধ্যমে যুগোপযোগী শিক্ষা সাধারণের কাছে পৌঁছে দিবে। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই তিনি বাংলা ভাষায় গ্রন্থ রচনা এবং বিদ্যালয় স্থাপনে ব্রতী হয়েছিলেন। এই অধ্যায়ে বাংলা ভাষায় শিক্ষাচিন্তার ক্রমবিকাশ ধারায় তাঁর চিন্তাভাবনা কয়েকটি উপ-শিরোনামে ভাগ করে উপস্থাপন করা হবে।

২

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মানস বৈশিষ্ট্য

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অতুলনীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী কীর্তি পুরুষ হিসেবে এখনো সম্মানিত। তিনি বাংলা সাহিত্য, শিক্ষা এবং সমাজ সংস্কারে এক অসামান্য ভূমিকা পালন করেছেন। উনিশ শতকের বাংলাদেশে অক্ষয়কুমার দত্ত ছাড়া তাঁর সঙ্গে আর কারো তুলনা চলে না। এঁদের দু'জনের তুল্য শিক্ষাচিন্তক সেকালে কেউ ছিলেন না, না জ্ঞানের পরিচয়ে, না মানবকল্যাণে আত্মনিবেদনে। তখন একদিকে প্রচলিত প্রাচীন সংস্কার অন্যদিকে শাসক ইংরেজের আধিপত্য। এই দুই প্রভূত্বের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তাঁরা বাঙালিকে মুক্তির পথ নির্দেশ করেছিলেন। ব্রিটিশ শাসনের যুগে বিদ্যাসাগর তাঁর চিত্তের দৃঢ়তা, বিজ্ঞানের যুক্তিবাদ, ইউরোপীয় রেনেসাঁসের মানবিকবোধ এবং বাঙালি মাতৃহৃদয়ের কোমলতা নিয়ে মানবকল্যাণে ব্রতী হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন বাস্তববোধ সম্পন্ন আধুনিক চিন্তার রুচিশীল মানুষ।

Dhaka University Institutional Repository

সমাজ সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ড, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ সাধন এবং শিক্ষা বিষয়ে গভীর মনোযোগের জন্য এখনো তিনি বাঙালির প্রণম্য ব্যক্তিত্ব। তাঁর সম্পর্কে বলতে গিয়ে কবীর চৌধুরী লিখেছেন:

> বিদ্যাসাগর অতুলনীয় তাঁর অর্জনের বিশালতায় ও বহুমুখীনতায় ও বৈচিত্র্যে। যিনি বিদ্যার সাগর তিনি আবার করুণারও সাগর। যিনি করুণাসিন্ধু, কোমলপ্রাণ, যার দানের পরিমাণ ও ব্যাপকতা বিস্ময়কর । তিনি আবার নীতির প্রশ্নে পাহাড়ের মতো অটল। যিনি সংস্কৃতের বিদগ্ধ পণ্ডিত, যিনি আপাদমস্তক একজন খাঁটি বাঙালি, যাকে বাংলা গদ্যের জনক বলে আখ্যায়িত করা হয়, তিনি আবার ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের গভীর অনুরাগী, পাশ্চাত্যের জ্ঞান বিজ্ঞান দর্শন দ্বারা অনুপ্রাণিত। আমাকে সব চাইতে বেশী আকর্ষণ করে নিজের আদর্শ ও বিশ্বাসের প্রতি বিদ্যাসাগরের অবিচল আস্থা, তাঁর সাহস, তেজস্বিতা ও পৌরুষ।[১]

বিদ্যাসাগর কারো কাছে অবনত হওয়া বা নতি স্বীকার করাকে ঘৃণা করতেন। তাঁর জীবন পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, তিনি কখনো কারো দাসত্ব মেনে নেননি, না প্রাচীন সংস্কারের না প্রচলিত ইংরেজি সাহেবীয়ানার। আত্মমর্যাদাজ্ঞান, দেশজ ঐতিহ্যানুরাগ, ন্যায্য কথা বলার সাহস তাঁর জীবনের লক্ষনীয় বৈশিষ্ট্য। হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ কার সাহেবের মুখের সামনে তাঁর নিজের চটিশুদ্ধ পা উঠিয়ে বসার কাহিনি সর্বজনবিদিত। ইংরেজ আধিপত্যের সেই যুগে এমন দুঃসাহসিক কাজ সত্যিই অকল্পনীয়। সেই আচরণের জন্য তাঁর কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে কৈফিয়ৎ তলব করা হয়। তার জবাবে তিনি লিখেছিলেন :

> I thought that we (natives) were an uncivilized race quite unacquainted with refined manners of receiving a gentleman visitor. I learned the manners of which Mr. Karr complains from the gentleman himself, a few days ago, when I had on occasion to call on him. My notions of refined manners being thus formed from the conduct of an enlighted, civilized, European, I behaved myself as respectfully towards him, as he had himself done. [২]

বিদ্যাসাগর সারাজীবন তেজস্বিতার সঙ্গে স্বদেশীয় ব্যবহাররীতি ও পোশাক পরিচ্ছদের প্রতি তাঁর আনুগত্য অক্ষুন্ন রেখেছিলেন। ছোট লাটের সঙ্গে দেখা করতে গেলেও তিনি অফিসের পোশাক ব্যবহার করতেন না, বাঙালির পোশাকেই যেতেন। ধুতি চাদর পরে চটি পায়ে স্বদর্পে ঘুরে বেড়ানো সাধারণ পোশাকের এক অসাধারণ বাঙালি ছিলেন তিনি। বিদ্যাসাগর এই দীক্ষা সম্ভবত তাঁর পরিবার থেকে পেয়েছিলেন। তাঁর পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ ছিলেন ভীষণ জেদী লোক। ভাইদের সঙ্গে মতান্তর হওয়ায় তিনি নিজ গ্রাম ছেড়ে অন্যগ্রামে গিয়ে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করেছেন। পিতামহের স্বভাব বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিদ্যাসাগর বলেছেন–'তিনি নিরতিশয় তেজস্বী ছিলেন, কোনো অংশে কাহারও নিকট অবনত হইয়া চলিতে অথবা কোনো প্রকারে অনাদর বা অবমাননা সহ্য করিতে পারিতেন না। উপকার প্রত্যাশায় অথবা অন্যকোনো কারণে তিনি কখনো পরের উপাসনা বা আনুগত্য করিতে পারেন নাই।'[৩] বিদ্যাসাগরের জীবনীকারদের ধারনা তাঁর এই একগুঁয়ে তেজস্বীজতা পিতামহের আদর্শে প্রভাবিত। বিদ্যাসাগরের ছাত্রজীবন এবং পরবর্তীকালের এসব আচরণ থেকে তাঁর একগুঁয়ে স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

> ক্ষুদ্র একগুঁয়ে ছেলেটি মাথায় মস্ত ছাতা তুলিয়া তাহাদের বড়োবাজারের বাসা হইতে পটলডাঙ্গায় সংস্কৃত কলেজে যাত্রা করিতেন, লোকে মনে করিত একটা ছাতা চলিয়া যাইতেছে।[৪]

বিদ্যাসাগর সেকালে মধ্যবিত্ত বাঙালির স্বভাব বৈশিষ্ট্যের'[৫] বিরোধীতা করতেন। তখন মধ্যবিত্ত বাঙালি সাধারণত যে ধরণের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিল সেগুলো তাঁর পছন্দ ছিল না। তাই বাঙালি মধ্যবিত্তের একজন হয়েও বিদ্যাসাগর ছিলেন এই শ্রেণির নিয়মবহির্ভূত, শক্ত শিরদাঁড়ার স্বাধীনতা প্রিয় মানুষ। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী লিখেছেন:

> মধ্যবিত্ত যখন নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করছে সেই ঐতিহাসিক সময়ে বিদ্যাসাগর জন্মেছিলেন; যদিও ওই শ্রেণির সঙ্গে তাঁর দূরত্ব, এমনকি বিরোধও ছিল কঠিন। এদিক থেকে রামমোহনের তুলনায় তিনি মধ্যবিত্তের অধিকতর নিকটবর্তী ছিলেন। আধুনিক মধ্যবিত্তের সংস্কৃতি তাঁর কাছে গভীরভাবে ঋণী।....এই মধ্যবিত্তের সামাজিক ভিত্তিটা গড়ে উঠেছে প্রধানত শিক্ষার ওপর নির্ভর করে, কিন্তু কেবল শিক্ষা নয় রুচিকেও সে খুব জরুরী অর্জন বলে মনে করে। রুচির ক্ষেত্রে নিজেকে জানে সে ভদ্রলোক বলে। ভদ্রলোকত্বের গুরুত্ব বিষয়ে বাঙালী মধ্যবিত্তের

> সজাতার অনেকটাই এসেছে শাসক ইংরেজের 'জেন্টলম্যানের' ধারণার সংস্রব থেকে। তবে ইংরেজ জেন্টলম্যান ও বাঙালী ভদ্রলোকের মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য অলঙ্ঘনীয়। ইংরেজী জেন্টলম্যান স্বাধীন দেশের নাগরিক, আর বাঙালী ভদ্রলোককে জন্মাতেই হয়েছিল পরাধীনতার অভিশাপ বহন করে। বাঙালী ভদ্রলোক পরাধীন অবস্থাতেই উন্নতির চেষ্টা করেছে। এদিক থেকে বিদ্যাসাগর মোটেই ভদ্রলোক ছিলেন না।[৬]

বিদ্যাসাগরের এই অভদ্রলোকত্বের অবদানই তাঁকে সেকালের কলকাতায় অসামান্য প্রতিষ্ঠা এনেদিয়েছিল। তিনি কখনো আত্মমর্যাদা ও নীতি বিসর্জন দিয়ে কিছু অর্জন করতে চাননি। সরকারি চাকরির মোহও তাঁকে লক্ষ্যচ্যুত করতে পারেনি। যেখানে তাঁর লক্ষ্য অর্জনের অন্তরায় দেখা দিয়েছে সেখানে তিনি প্রতিবাদ করেছেন। তিনি স্বাধীনভাবে কাজ করতে না পারায় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ ছেড়ে দিয়েছেন। তাঁকে যখন এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হয় এর পরে কি করবেন ? তখন তিনি সদম্ভে জবাব দিয়েছিলেন- 'কেন, আলুপটল বেচিব, মুদীর দোকান করিব, তবুও যে পদে সম্মান নাই, সেই পদ গ্রহণ করিতে চাই না।'[৭] তাঁর এই আত্মমর্যাদাবোধ কখনো ম্লান হয়নি। এসব বৈশিষ্ট্য তাঁকে বাঙালি মধ্যবিত্ত চরিত্রের এক ব্যতিক্রম ব্যক্তিত্বের অধিকারী করেছিল।

বিদ্যাসাগরের মানসিক বৈশিষ্ট্যের আরেকটি দিক হচ্ছে-মানবকল্যাণ অপেক্ষা ঈশ্বরভাবনাকে অধিক গুরুত্ব না দেওয়া। একারণেই প্রচলিত সংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযান অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। বিদ্যাসাগর কর্মজীবনে বহু গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। কিন্তু কোথাও তিনি কোনো সামাজিক প্রথা, সংস্কার ও প্রাচীনত্বের দ্বারা প্রভাবিত হননি। তাঁর কাছে যা যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়েছে তা তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। আবার যা অযৌক্তিক অবৈজ্ঞানিক মানবকল্যাণের পরিপন্থী বলে মনে হয়েছে তা বর্জন করেছেন। বাংলার শিক্ষাব্যবস্থার সামগ্রিক কল্যাণে তাঁর প্রচেষ্টা বাঙালিকে প্রদীপ্ত ভবিষ্যতের স্বপ্ন এনে দিয়েছিল। মাতৃভাষায় শিক্ষাদান ও জনশিক্ষা বিস্তারে তাঁর অগ্রণী ভূমিকা অবিস্মরণীয়। তাঁর কার্যক্রমে সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়ও স্পষ্ট। তাঁর চেষ্টায় সংস্কৃত কলেজে সব জাতির ছাত্রের পড়ার সুযোগ সৃষ্টিই এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ।'[৮] সেকালের রক্ষনশীল হিন্দু সমাজে আচারসর্বস্ব ধর্মীয় কুসংস্কারগুলোর প্রতি মানুষ যখন অন্ধভাবে অনুরক্ত তখন বিদ্যাসাগরের এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা মোটেই সহজ ছিল না। এ প্রসঙ্গে সুনীল আচার্য লিখেছেন:

> বিদ্যাসাগর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন না, ছিলেন পণ্ডিত ব্রাহ্মণ, একান্ত মুক্তমন। ধর্মীয় গণ্ডির মধ্যে কখনও আটকা পড়েননি। তিনি কোনও মন্দিরে যাননি, ঈশ্বর বা ধর্মবিষয়ক কোনও কিছুই লেখেননি। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ সন্তান হওয়া সত্ত্বেও কোনও পূজা-অর্চনায় যোগ দেননি। তাঁর অনুজ শম্ভুচন্দ্র তাঁর we'¨vmvMi বইয়ে লিখেছেন, 'একদিন কয়েকজন ধর্মপ্রচারক ও কৃতবিদ্য লোকের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন যে,'ধর্ম যে কী বস্তু তাহা মানুষের বর্তমান অবস্থায় জ্ঞানের অতীত এবং ইহা জানিবারও কোনও প্রয়োজনও নাই।' ধর্মের মূল ভগবৎ নির্ভরতা। কিন্তু ভগবান সম্পর্কে তাঁর বিন্দুমাত্র কৌতূহল ছিল না।[৯]

১৮৫১ সালে প্রকাশিত 'বোধোদয়ে' বিদ্যাসাগর ঈশ্বর সম্পর্কে লিখেছেন:

> ঈশ্বর কি চেতন, কি অচেতন, কি উদ্ভিদ, সমস্ত পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন এ নিমিত্ত, ঈশ্বরকে সৃষ্টিকর্তা বলে। ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ। তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না; কিন্তু তিনি সর্বদা সর্বত্র বিদ্যমান আছেন। আমরা যাহা করি, তিনি তাহা দেখিতে পান; আমরা যাহা মনে মনে ভাবি, তিনি তাহা জানিতে পারেন। ঈশ্বর পরম দয়ালু; তিনি সমস্ত জীবের আহারদাতা ও রক্ষাকর্তা।[১০]

ঈশ্বর সম্পর্কে 'বোধোদয়ের' এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ ছাড়া বিদ্যাসাগরের চিন্তায় ঈশ্বরভাবুকতার আর কোনো লক্ষণ কোথাও পাওয়া যায় না। অক্ষয়কুমার যেমন বাহ্যবস্তুতে ঈশ্বরের উল্লেখ করেছেন অত্যন্ত নিস্পৃহ ও যান্ত্রিক ভাবে, বিদ্যাসাগরও তেমনি ভাবাবেগহীন ভাবেই কথাটি বলেছেন। অন্যদিকে সেকালের দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাজনারায়ণ বসুর আচরণে ও বাক্যে ঈশ্বরভাবনার পরিচয় স্পষ্ট হয়ে আছে। তাঁদের মতো রক্ষনশীল ঈশ্বর বিশ্বাসীদের দৃষ্টিতে অক্ষয়কুমার দত্তের মতো বিদ্যাসাগরও নাস্তিক ছিলেন। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা স্মরণ করা যায়। বিদ্যাসাগর তখন অক্ষয়কুমার দত্তের সঙ্গে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পেপার কমিটি বা গ্রন্থাধ্যক্ষসভার সদস্য। সেইসময় রাজনারায়ণ বসুর একটি বক্তৃতা তিনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশযোগ্য বলে মনে করেননি।

Dhaka University Institutional Repository

এই ঘটনায় দেবেন্দ্রনাথ অসন্তুষ্ট হয়ে এক চিঠিতে লিখেছিলেন:

> এ বক্তৃতা আমার বন্ধুদের মধ্যে যাঁহারা শুনিলেন তাঁহারাই পরিতৃপ্ত হইলেন; কিন্তু আশ্চর্য এই যে তত্ত্ববোধিনী সভার গ্রন্থাধ্যক্ষেরা ইহাকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশযোগ্য বোধ করিলেন না। কতকগুলো নাস্তিক গ্রন্থাধ্যক্ষ হইয়াছে, ইহাদিগকে এ পদ হইতে বহিষ্কৃত না করিয়া দিলে আর ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের সুবিধা নাই।[১১]

এখানে 'কতকগুলো নাস্তিক গ্রন্থাধ্যক্ষ' বলতে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে অক্ষয়কুমার দত্তকে ইঙ্গিত করেছেন। দেবেন্দ্রনাথের মতে এঁরা দুইজনই ঈশ্বরে-অবিশ্বাসী, নাস্তিক। (দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'evn¨e¯i mwnZ gvbe cKwZi m¤Ü wePvi' গ্রন্থের আলোচনায় প্রচলিত ধর্ম এবং ঈশ্বর প্রার্থনার গুরুত্ব সম্পর্কে অক্ষয়কুমার দত্তের ধারণা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ১৮৫৪ সালের ঐ ঘটনা থেকেই দেবেন্দ্রনাথ ও রাজনারায়ণের ধর্মবোধ এবং অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগরের বিজ্ঞানবোধ এই দুই বিপরীত ধারা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠে। এ প্রসঙ্গে বিনয় ঘোষ লিখেছেন:

> দুজনেই সাহিত্য, বিজ্ঞান ও সমাজ সংস্কারের মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে তত্ত্ববোধিনীর সংস্পর্শে এসেছিলেন, ধর্মচর্চা বা আধ্যাত্মিক জ্ঞানানুশীলনের আকাঙ্ক্ষা তাঁদের কাছে ছিল গৌণ। অক্ষয়কুমার ব্রাহ্ম হলেও ঘোর বস্তুবাদী ও বৈজ্ঞানিক মনোভাবাপন্ন ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র তো 'ঈশ্বর'[১২] নিয়ে চিন্তা করারই অবকাশ পেতেন না।[১৩]

বিদ্যাসাগরের ভাবনায় ঈশ্বর মানবতার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেনি। তিনি কখনো ঈশ্বরকে অপ্রমাণ করার চেষ্টা করেননি। আমরা দেখি যে, তাঁর ভাবনা অনেকটা বুদ্ধের সঙ্গে মিলে। ঈশ্বর নেই, এ কথা বুদ্ধ কখনো বলেননি। তিনি মানুষের দুঃখনিবারণই সর্ব প্রধান ও প্রথম কর্তব্য বলে ভেবেছেন। বিদ্যাসাগরও অনুরূপ মনোভাব পোষন করতেন। তিনি ঈশ্বরের কথা ভেবে জীবনের প্রতি কর্তব্যে উদাসীন হতে চাননি। তাঁকে কেউ নাস্তিক ও ঈশ্বরে অবিশ্বাসী বললেও সে-বিষয়ে তিনি তর্ক করে নিজের মত প্রতিষ্ঠা করতে উৎসাহবোধ করতেন না। তাঁর চিন্তা ঈশ্বরমুখী ছিল না, ছিল মানবমুখী। তিনি মানব সমাজে যেসব সংস্কার ও প্রথাকে মানবত্বের অপমান বলে মনে করেছেন, শিক্ষার মাধ্যমে সেইসব আচার সংস্কার দূর করতে সচেষ্ট হয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরকে এদেশে একক বলে চিহ্নিত করেছিলেন। বিদ্যাসাগর নিজের মধ্যে যে এক অকৃত্রিম মনুষ্যত্ব অনুভব করতেন চারদিকের জনমণ্ডলীর মধ্যে তা প্রত্যক্ষ করেননি। তিনি প্রতিদিন দেখেছেন– আমরা আরম্ভ করি, শেষ করি না; আড়ম্বর করি, কাজ করি না; যা অনুষ্ঠান করি তা বিশ্বাস করি না; যা বিশ্বাস করি তা পালন করি না; ভূরি পরিমাণ বাক্য রচনা করতে পারি, তিল পরিমাণ আত্মত্যাগ করতে পারি না। পরের অনুকরণে আমাদের গর্ব, পরের অনুগ্রহে আমাদের সম্মান, পরের চোখে ধূলি নিক্ষেপ করা আমাদের পলিটিক্স এবং নিজের বাকচাতুর্যে নিজের প্রতি ভক্তিবিহ্বল হয়ে উঠাই আমাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। তিনি ছিলেন এসবের সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর মানুষ। ওজস্বিতা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞাই বিদ্যাসাগরের সর্ব প্রধান গুণ হিসেবে রমেশচন্দ্র দত্ত লিখেছেন:

> যেটি কর্তব্য সেটি অনুষ্ঠান করিব, সেটি সাধন করিব, এই ছিল ঈশ্বরচন্দ্রের হৃদয়ের সংকল্প। সমস্ত যদি বাধা দিবার চেষ্টা করে, সিংহবীর্য ঈশ্বরচন্দ্র সে সমাজব্যূহ বেদ করিয়া তাহার অলঙ্ঘনীয় সংকল্প সাধন করেন। ঈশ্বরচন্দ্র আজি আমাদের এই পরম শিক্ষা দান করিতেছেন, এই শিক্ষা যদি আমরা লাভ করিতে পারি, তবে আমাদের ভবিষ্যৎ আমাদের হস্তে, পরের হস্তে নহে। তিনি আরো লিখেছেন, ঈশ্বরচন্দ্রের ন্যায় বিদ্যাবুদ্ধি সকলের ঘটে না। ঈশ্বরচন্দ্রের ন্যায় ওজস্বিতা, মানবিক বল ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সকলের সম্ভব না। ঈশ্বরচন্দ্রের ন্যায় জগৎগ্রাহী সহৃদয়তা, বদান্যতা ও উপচিকীর্ষাও সকলের হইয়া উঠে না। কিন্তু তথাপি ঈশ্বরচন্দ্রের কথা স্মরণ করিয়া আমরা বোধ হয় একটু সোজা পথে চলিতে পারি,-একটু কর্তব্য অনুষ্ঠানে উদ্যম করিতে পারি,-একটু ভন্ডামি ত্যাগ করিতে পারি।[১৪]

শিক্ষা বিস্তারের অবলম্বন হিসাবে সাহিত্যের ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের মনে কোনো সংশয় ছিল না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর লেখা 'চরিত্রপূজা'য় বলেছেন যে, বাংলা গদ্যই হচ্ছে বিদ্যাসাগরের প্রধান কীর্তি। আমরা দেখেছি যে, বিদ্যাসাগরের নিজের ধারণা ছিল ভিন্নতর, তিনি তাঁর সামাজিক কাজকেই প্রধান বলে গণ্য করতেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়ন খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথম কথা, সামাজিক কাজগুলো হচ্ছে কখনো স্রোত, কখনো ঢেউ, প্রবহমান ধারায় তাদেরকে আলাদা করে চিহ্নিত করা সহজ নয়; সে তুলনায় সাহিত্যিক অবদান দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়,

Dhaka University Institutional Repository

কেননা তাকে মুদ্রিত গ্রন্থের মধ্যে পাওয়া যায়, এবং ইতিহাসে স্থাপন করে বিবেচনা করা সম্ভব হয়। এর চেয়েও বড় ব্যাপার হচ্ছে বাঙালী রুচি, যে রুচি সাহিত্যকে অত্যন্ত উচ্চমূল্য দিতে অভ্যস্ত। মধ্যবিত্ত বাঙালীর কাছে বিদ্যাসাগর হতেন না যদি না তিনি লেখক হতেন।'[১৪] বিদ্যাসাগর আকারের ক্ষুদ্রতা ও বাঙালিজীবনের সমস্ত জড়ত্ব ভেদ করে আপন শক্তি নিয়ে কঠিন প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছেন। তাঁর সে যাত্রা 'হিন্দুত্বের দিকে নয়, সাম্প্রদায়িকতার দিকে নয়, করুণার অশ্রুসজল উন্মুক্ত অপার মনুষ্যত্বের অভিমুখে। বিদ্যাসাগর-চরিত-এর শেষ দিকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

> আজ আমরা বিদ্যাসাগরকে কেবল বিদ্যা ও দয়ার আধার বলিয়া জানি; এই বৃহৎ পৃথিবীর সংশ্রবে আসিয়া যতই আমরা মানুষ হইয়া উঠিব, যতই আমরা পুরুষের মতো দুর্গম বিস্তীর্ণ কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে থাকিব, বিচিত্র শৌর্য-বীর্য মহত্ত্বের সহিত যতই আমাদের প্রত্যক্ষ সন্নিহিতভাবে পরিচয় হইবে, ততই আমরা নিজের অন্তরের মধ্যে অনুভব করিতে থাকিব যে, দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের, চরিত্রে প্রধান গৌরব তাঁহার অমেয়, পৌরুষ, তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব।[১৬]

বিদ্যাসাগর শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ববোধ জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন। আমরা তাঁর সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রেও এর প্রতিফলন লক্ষ করি। রামমোহন রায় বিধবাদেরকে সহমরণের হাত থেকে রক্ষার যে আন্দোলন উনিশ শতকের গোড়ার দিকে শুরু করেছিলেন, বিদ্যাসাগর তা আরও বিকশিত করেছেন। তিনি বিধবাদেরকে পুর্নবিবাহের মধ্য দিয়ে সমাজে স্বাভাবিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন।

৩

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮২০ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর (১২ই আশ্বিন ১২২৭) পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে এক অসচ্ছল পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পারিবারিক নাম ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা। ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতায় মাসিক দশ টাকা বেতনে চাকরি করতেন। তাঁর মা ভগবতী দেবী সেই সামান্য আয় দিয়েই সংসার চালাতেন। নিজ গ্রাম বীরসিংহেই ঈশ্বরচন্দ্রের প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়। কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পাঠশালায় তাঁকে ভর্তি করে দেওয়া হয়। আট বছর বয়স পর্যন্ত সেখানে তাঁর পড়ালেখা চলল। কালীকান্ত মহাশয় বালক ঈশ্বরচন্দ্রের মেধার পরিচয় পেয়ে তাঁকে ইংরেজি পড়ানোর পরামর্শ দিলেন। অতীব মেধাবী ঈশ্বরচন্দ্র ইংরেজি বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে অচিরে বিত্তশালী ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবেন এ সম্ভাবনা তাঁর কাছে আকর্ষণীয় ছিল। কিন্তু 'সংস্কৃত ব্যবসায়ী' পরিবারের সংস্কৃত শিক্ষার ধারাটিকে বজায় রেখে ঈশ্বরচন্দ্র টোল-চতুষ্পঠী খুলে বিদ্যাদান করবে এই সম্ভাবনা ঠাকুরদাসকে পুলকিত করত। কারণ আর্থিক অনটনের ফলে পারিবারিক ঐতিহ্যানুযায়ী তাঁর উত্তমরূপে সংস্কৃত শিক্ষালাভ হয়নি বলে তিনি নগণ্য মাইনেতে সামাজিক বিচারে নিম্নজাতির অধীনে চাকরি করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁর পিতা রামজয় তর্কভূষণ, পিতামহ ভুবনেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, শ্বশুর রামকান্ত তর্কবাগীশ, মাতামহ উমাকান্ত তর্কসিদ্ধান্ত হলেও তিনি কেবল ঠাকুরদাস বন্দোপ্যাধ্যায়ই রয়ে গেছেন। টোল-চতুষ্পাঠীর কোনও উপাধি নিতে না পারায় তিনি নিরন্তর মর্মপীড়া অনুভব করতেন। এ অবস্থায় জ্যেষ্ঠপুত্র ঈশ্বরচন্দ্রের মাধ্যমে তাঁর সে আকাঙ্খা পূরণের স্বপ্ন দেখতেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রাম্য শিক্ষক কালীকান্তের পরামর্শ গ্রহণ করলেন না। তিনি বললেন,'উপার্জ্জনক্ষম হইয়া, আমার দুঃখ ঘুচাইবেক, আমি সে উদ্দেশ্যে ঈশ্বরকে কলিকাতায় আনি নাই। আমার একান্ত অভিলাষ, সংস্কৃত শাস্ত্রে কৃতবিদ্য হইয়া দেশে চতুষ্পাঠী করিবেক, তাহা হইলেই আমার সকল ক্ষোভ দূর হইবেক।'[১৭] তাছাড়া সেকালে ইংরেজি শিক্ষায় চাকরির সম্ভাবনা থাকলেও তা ছিল যথেষ্ট ব্যয়বহুল। কলকাতার দোকান কর্মচারী হয়ে ইংরজি স্কুলের খরচ বহন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না বলে ঠাকুরদাস বন্দোপ্যাধ্যায় শেষ পর্যন্ত ছেলেকে সংস্কৃত কলেজে পড়ানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। ১৮২৯ সালের ১লা জুন তিনি কলকাতার সরকারি

Dhaka University Institutional Repository

সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। পিতার শাসন ও চরম দারিদ্র্যের মধ্যে চলল তাঁর লেখা-পড়া। সংস্কৃত কলেজে একাধারে ১২ বছর ৫ মাস অধ্যয়নের পর ১৮৪১ সালের ৪ ডিসেম্বর তিনি 'বিদ্যাসাগর' উপাধি ও প্রশংসাপত্র অর্জন করলেন। সমালোচক লিখেছেন:

> যে নবম বর্ষীয় বালক বীরসিংহ গ্রাম থেকে উচ্চশিক্ষা লাভার্থে কলকাতার পথে যাত্রা করেছিল, সে যে এক যুগ পেরোতে না পেরোতে আজীবন পরের বোঝা কাঁধে করে বেড়াবার ব্রত নেবে এবং শিক্ষা দীক্ষা সদাচার ও বিবিধ মানবিক গুণে সমগ্র জাতির শিরোপরি স্থান গ্রহণ করবে, তা কি কেউ ভাবতে পেরেছিল? ....ঈশ্বরের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জগদীশ্বরের কি ইচ্ছা, তা তখন না জানা গেলেও আপাতত পিতার ইচ্ছাই পূর্ণ হল। ক্রমাগত পোড়নে ও পীড়নে কাঁচা লোহা এমন কঠিন ইস্পাত পরিণত হল যে, আজীবন তাতে জং ধরেনি, তার ধার কমেনি। তাঁর পরবর্তী জীবনের কার্যকলাপে দেখা গেছে তিনি কারো ইচ্ছাই অপূর্ণ রাখেননি।[১৮]

বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজ থেকে কাব্য, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, বেদান্ত, স্মৃতি, ন্যায় ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। ছাত্রাবস্থায় বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ পাননি। ফলে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে অধ্যাপনাকালে তিনি সেখানে ইংরেজি শিখতে শুরু করেন। বিদ্যাসাগর প্রথমে বন্ধু দুর্গারচণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নীলমাধব মুখোপাধ্যায়ের নিকট কিছু দিন ইংরেজি চর্চা করেন। তারপর রামগোপাল ঘোষ ও রাজনারায়ন বসুর কাছে ইংরেজি সাহিত্যের পাঠ নিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর ইংরেজি শিখেছিলেন ঐ ভাষা-সাহিত্যের সম্পদ আহরণ করে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার উদ্দেশ্যে। তিনি বাসায় শিক্ষক রেখে হিন্দি ভাষা শিখেছিলেন। বিদ্যাসাগর নিজের চেষ্টায় পাশ্চাত্য সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানে বহু বিষয় আয়ত্ব করেছিলেন।

৪

কর্মজীবন

বিদ্যাসাগর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শেষ করে শিক্ষকতা ও সমাজ সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর চাকরি-জীবনের সময়কাল ১৮৪১ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৮৫৮ সালের ৩ নভেম্বর পর্যন্ত। এর মধ্যে ১৬ জুলাই ১৮৪৭ থেকে ২৮ শে ফেব্রুয়ারি ১৮৪৯ সাল পর্যন্ত তিনি বিরতিতে ছিলেন। এই হিসেবে তাঁর চাকরি-কালের মেয়াদ সাকুল্যে ১৫ বছরের কিছু বেশি। এই অত্যল্প সময়ের মধ্যে তিনি শিক্ষার বিভিন্ন দিক ও পর্যায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ লাভ করেন। বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা সমাপ্ত করে উপাধি লাভের মাত্র ২৫ দিন পর ১৮৪১ সালের ২৯ শে ডিসেম্বর মাসিক ৫০ টাকা বেতনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা বিভাগের সেরেস্তাদার বা প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন। ১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়, বাংলা ভাষা ভাষী অঞ্চলে আধুনিক শিক্ষা বিকাশের উদ্দেশ্যে। কিন্তু এটি মূলত হয়ে ওঠে কোম্পানির সিভিলিয়ান কর্মচারীদের দেশিয় ভাষা শিক্ষা কেন্দ্র রূপে। বিদ্যাসাগর সে কলেজে ইংল্যাণ্ড থেকে নবাগত সিভিলিয়ানদের চলনসই বাংলা শিক্ষাদানে নিয়োজিত হন। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি এ কলেজের একজন দক্ষ শিক্ষক হয়ে উঠেন। তিনি প্রমাণ করে দেন যে, বিদ্যা–বুদ্ধি–চরিত্র বলে বাঙালিরাও সাহেবদের যথার্থ শিক্ষা দিতে পারেন। ইংরেজরা বাংলা শিখতো দেশ শাসনের সুবিধার্থে। আর বাঙালিরা ইংরেজি শিখতেন দেশ শাসনে ইংরেজের সহায়ক হবার আশায়।

ফোর্ট উইলিয়মে থাকা অবস্থায় বিদ্যাসাগর ZË‡ewabx মাসিক পত্রিকার পেপার কমিটির সদস্য নিযুক্ত হন। ১৮৪৩ সালের ১৬ই আগস্ট 'তত্ত্ববোধিনী সভার' (১৮৩৯) মুখপত্র হিসাবে অক্ষয়কুমারের সম্পাদনায় ZË‡ewabx মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৮৪৪ সালে গভর্নর জেনারেল হেনরী হার্ডিঞ্জ (১৮৪৪-১৮৪৭) বাংলা বিহার উড়িষ্যা অঞ্চলে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের জন্য স্কুল স্থাপন করলে স্কুলগুলোর পাঠ্যসূচী ও শিক্ষক নির্বাচন বিষয়ে বিদ্যাসাগর মার্শালের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। ১৮৪৬ সালে ৬ই এপ্রিল মাসিক ৫০ টাকা বেতনে তিনি সংস্কৃত কলেজের সহকারি সম্পাদক পদে যোগদান করেন। সেপ্টেম্বর মাসে সেক্রেটারি রসময় দত্তের নিকট তিনি সংস্কৃত কলেজের উন্নতির জন্য একটি পরিকল্পনা পেশ করেন। সেই প্রস্তাব নিয়ে রসময় দত্তের

Dhaka University Institutional Repository

সঙ্গে তাঁর মতান্তর ঘটে। ১৮৪৭ সালের ১৬ই জুলাই তিনি সংস্কৃত কলেজের সহকারি সম্পাদকের পদ ত্যাগ করেন। বিদ্যাসাগর চাকরি ছেড়ে দিয়ে ছয়শত টাকা ধার করে তাঁর বন্ধু মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কারের সঙ্গে সমান অংশীদারিত্বে 'সংস্কৃত প্রেস ও ডিপজিটরী' স্থাপন করেন। প্রেস স্থাপনের বছরেই বিদ্যাসাগর সম্পাদিত 'অন্নদামঙ্গলের ১০০ কপি ৬০০ টাকায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বিক্রি করে প্রেসের ঋণ শোধ করেন। কিছুদিন পরে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সঙ্গে মতবিরোধ দেখা দিলে বিদ্যাসাগর তাঁর অংশ কিনে নেন।

বিদ্যাসাগর ১৮৫০ সালের ৫ ডিসেম্বর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের চাকুরি ছেড়ে পরদিন ৬ই ডিসেম্বর সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। 'পুনরায় চাকরিতে নিয়োগ লাভের দশদিন পর ১৬ই ডিসেম্বর বিদ্যাসাগর কলেজের সংস্কারের জন্য Notes of Sanskrit College পেশ করেন।'[১৯] একবছর ১৮৫১ সালের ২২শে জানুয়ারি তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। '১৮৫৪ জানুয়ারি মাসে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অপ্রত্যাশিত মৃত্যু ঘটে।'[২০] তখন সিভিলিয়ানদের পরীক্ষা নেওয়ার জন্য বোর্ড অফ এগজামিনার্স গঠন করা হলে, বিদ্যাসাগর সেখানে সদস্য নির্বাচিত হন। এ বছর ৭ই ফেব্রুয়ারি তিনি এডুকেশন কাউন্সিলের প্রেসিডেন্টকে মাতৃভাষায় জনশিক্ষা সম্পর্কে যে নোট প্রদান করেন তাতে এদেশে জনশিক্ষা বিষয়ে তাঁর গভীর চিন্তার প্রকাশ ঘটে। একই বছর ১৯ শে জুলাই তৎকালীন সেক্রেটারী অফ ষ্টেট স্যার চালর্স উড-এর বিখ্যাত এডুকেশন ডেসপ্যাচে ভারতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। বিদ্যাসাগর ১৮৫৫ সালের ১লা মে শিক্ষাবিভাগের সহকারি ইন্সপেক্টর হিসেবে মেদিনীপুর, হুগলী, নদীয়া ও বর্ধমান জেলার ভারপ্রাপ্ত নিযুক্ত হন। তখন তাঁর মাসমাহিনা আরও ২০০ টাকা বাড়িয়ে ৫০০ টাকা করা হয়।

১৮৫৬ সালের নভেম্বর মাসে পদটিকে স্পেশাল ইন্সপেক্টর স্তরে উন্নীত করা হয়। সেই সময় ৪টি জেলায় বিদ্যাসাগর ১৯ টি মডেল স্কুল স্থাপন করেন। একই বছর '৪ঠা অক্টোবর বিদ্যাসাগর বিধবা-বিবাহ প্রচলনের জন্য এবং ২৭শে ডিসেম্বর বহুবিবাহ রহিত করার জন্য সরকারের নিকট গণস্বাক্ষরিত আবেদনপত্র পেশ করেন।'[২১] ১৮৫৭ সালের ২৪ শে জানুয়ারি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে বিদ্যাসাগর তাতে ফেলো নির্বাচিত হন।[২২] কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ আয়োজন চলছিল, তার অনেক আগে থেকেই বিদ্যাসাগর একজন সুদক্ষ অধ্যক্ষ, ধুরন্ধর স্কুল পরিদর্শক, অভিজ্ঞ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক, বিদগ্ধ শিক্ষাবিদ হিসেবে এদেশে অত্যন্ত সুপরিচিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শুভযাত্রার পর ১৮৫৭ সালের ৩ জানুয়ারি সেনেটের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়; অন্য ৪ জন ভারতীয় সদস্যের সঙ্গে বিদ্যাসাগরও সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। সেনেট সদস্যদের শিক্ষাগত বিশেষজ্ঞতানুসারে আর্টস, ইঞ্জিনীয়ারিং, মেডিক্যাল এবং ল' এই চার ফ্যাকাল্টিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। 'বিদ্যাসাগর আর্টস ফ্যাকাল্টির অন্তর্ভুক্ত হন।'[২৩] বিদ্যাসাগর ১৮৫৭ সালের ১ আগস্ট ও ১২ ডিসেম্বরের ফ্যাকাল্টি অফ আর্টসের সভাসহ ১৮৫৮ সালের ১৩ মে এবং ৫ জুন ফ্যাকাল্টি সভায় এবং ১৭ জুন সেনেট সভায় হাজির ছিলেন। এ সব সভায় গতানুগতিক কাজকর্ম অনুমোদন ছাড়া কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি। এই বছর ১৮ আগস্টের বৈঠকটি ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ঐ বৈঠকে '৩১ জুলাই'র সিণ্ডিকেট থেকে প্রেরিত ১২ নং নির্দেশ নিয়ে আলোচনা করা হয়।'[২৪] সেই আলোচনায় 'English and Classics' এর পাঠ্য বিষয় নির্ধারণে ৪ জন ইউরোপীয় সদস্য নিয়ে এক সাব কমিটি গঠন করে; আর বাংলা ভাষা বিষয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম গৃহীত হয়। সিদ্ধান্তে জানানো হয়: 'That for the same examination Pundit Eshwar Chandra Bidyasagar be requested to select a course in the Bengali language'.[২৫]

সাব-কমিটির সদস্যগণ এবং বিদ্যাসাগর যে পাঠ্যতালিকা তৈরি করেন, তা বিবেচনার্থ ফ্যাকাল্টির সভা ডাকা হয়। সে সভায় বিদ্যাসাগর উপস্থিত ছিলেন না। বৈঠকে রেজিস্ট্রারের পেশ করা সাব-কমিটির সুপারিশ আলোচনার পর, ১৮৫৯ সালের এন্ট্রান্স পরীক্ষার জন্য 'বিদ্যাসাগর যে বাংলা পাঠ্যসূচী নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন সেটি অনুমোদন লাভ করে।'[২৬] বিদ্যাসাগর ১৮৫৮ সালের এন্ট্রান্স ও বি.এ. উভয় পরীক্ষার বাংলার ভাষার প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষক ছিলেন। ১৮৬১ সালের বি.এ পরীক্ষার জন্য তাঁর তৈরি পাঠ্যসূচী গ্রহণ না করে ফ্যাকাল্টি পাদ্রীদের তৈরি বাংলা পাঠ্যসূচী অনুমোদন দেয়। 'বিদ্যাসাগর এর প্রতিবাদ করলে তা অগ্রাহ্য হয়।'[২৭] বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদ থেকে পদত্যাগ করেন এবং কয়েক দিনের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক পদ থেকে

অব্যাহতি চান। এই ঘটনার পর '১৮৬৫ সালের এম. এ পরীক্ষায় পরীক্ষক হতে সম্মতিদান এবং ১৮৯০ সালের ৭ই এপ্রিল এক চিঠিতে বিশ্ববিদ্যালয়কে ছাত্র হাজিরা সমস্যা সমাধানের জন্য পরামর্শ দান ছাড়া তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো কাজে জড়িত হননি।'[২৮]

১৮৫৮ সালের ৩ নভেম্বর তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদ থেকে পদত্যাগ করেছেন শুনে 'ক্যালকাটা ট্রেনিং স্কুল' কর্তৃপক্ষ তাঁকে স্কুলটির হাল ধরতে অনুরোধ করেন। ১৮৫৯ সালে প্রতিষ্ঠিত স্কুলটি উপযুক্ত পরিচালনার অভাবে তখন ধুঁকছিল। বিদ্যাসাগর রাজি হলেন এবং ১৮৬১ সালে সেই স্কুল পরিচালনার দায়িত্ব নিলেন। প্রাথমিক গোলযোগ মিটে যাবার পর তাঁর সুযোগ্য পরিচালনায় অল্প-দিনের মধ্যেই স্কুলের সার্বিক উন্নতি ঘটলো। ১৮৬৪ কলিকাতা ট্রেনিং স্কুলের নাম পরিবর্তন করে 'হিন্দু মেট্রোপলিটান ইন্সটিটিউশন' রাখা হয়। ১৮৬৬ সালে তিনি 'মেট্রোপলিটান ইন্সটিটিউশন' পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ বছর মে থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে বাংলা প্রেসিডেন্সী, বিশেষ করে মেদিনীপুর ও উড়িষ্যা অঞ্চলের বহু লোক দুর্ভিক্ষ–কবলিত হয়। বিদ্যাসাগর বীরসিংহ ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের দুর্গত মানুষদের জন্য একটি অন্নছত্র স্থাপন করেন। 'মেরী কার্পেন্টারের সঙ্গে উত্তরপাড়া থেকে কলকাতায় ফেরার সময় তাঁদেরকে বহনকারী ঘোড়ার গাড়ী দুর্ঘটনায় পড়ে।'[২৯] এতে বিদ্যাসাগর যকৃতে প্রচণ্ড আঘাত পান। সেই আঘাতজনিত অসুস্থতা থেকে তিনি আর সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেননি। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে বিদ্যাসাগর স্বপ্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটন কলেজ পরিচালনা ও তার উন্নতি সাধনাকেই ধ্যান জ্ঞান করেছিলেন। সরকারি চাকুরি থেকে অব্যাহতি নেওয়ার পর তিনি বিভিন্ন বিষয়ে সরকারকে মাঝে মাঝে পরামর্শ দিতেন। ১৮৯১ সালের ২৯ জুলাই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তাঁর ইহজাগতিক সমস্ত কর্মের পরিসমাপ্তি ঘটে। ১৮৯২ সালের ২৩ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় ভাইচ-চ্যান্সেলার স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সেনেট সভায় বিদ্যাসাগরের কীর্তিকে স্মরণ করে বলেছিলেন:

> Pandit Iswar Chandra Vidyasagar was a Fellow of this University ever since its establishment in 1857. ….. He was a great friend of female education, and a staunch advocate of women's rights and for the solid work he has done as an educationist, as a social reformer and as a generous heart and a resolute will impelled to action by an over-flowing love for humanity.The life of Vidyasagar is worthy of careful study by those who long for intellectual and moral greatness.[৩০]

স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের এ বক্তব্যে প্রশংসা থাকলেও, ভারতবর্ষের শিক্ষাগুরু বিদ্যাসাগর তাঁর অধিকার ও মর্যাদার যথাযোগ্য স্থান এবং স্বীকৃতি বিদেশি নিয়ন্ত্রিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাননি। বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে মানুষ গড়তে চেয়েছিলেন। আর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হতে লাগল বিদেশি সরকারের বিশ্বস্ত সেবক। তাঁর আশা ছিল বিশ্ববিদ্যালয় হবে বিশ্ব বিদ্যা বিতরণের পাঠশালা, কিন্তু বাস্তবে তা হল কেরানি তৈরির কামারশালায়। ফলে আশাহত হয়েই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন।

বিদ্যাসাগর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান পণ্ডিত, সংস্কৃত কলেজের অ্যাসিস্টানট সেক্রেটারি, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হেড রাইটার ও কোষাধ্যক্ষ, সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক, পরে অস্থায়ী সেক্রেটারি এবং অবশেষে সেক্রেটারি পদ তুলে দেওয়া হলে প্রথম প্রিন্সিপাল বা অধ্যক্ষ এবং পরে অধ্যক্ষপদের অতিরিক্ত দক্ষিণ বাংলার স্কুল ইন্সপেক্ট প্রভৃতি দায়িত্ব পালন করেন। চাকরিতে থাকাকালেই এ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং সেগুলো পরিচালনার সঙ্গে জড়িত হন। বিচিত্রমুখী অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা নিয়েই বাংলা ভাষায় বাঙালির শিক্ষা বিস্তারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

৫

শিক্ষাচিন্তায় আত্মনিয়োগ

উনিশ শতকে ইউরোপীয় রেনেসাঁসের প্রভাবে এদেশে নবজাগরণ দেখা দেয়। কলকাতা শহরকে কেন্দ্র করে'[৩১] এ জাগরণ সীমিত আকারে হলেও শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিক থেকে বাঙালির চিন্তাজগতে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করে। এ যুগের মর্মবাণী হয়ে উঠে যুক্তিবাদ। মানুষ প্রচলিত যাবতীয় শাস্ত্রীয় ও অন্ধ-কুসংস্কারমূলক অনড় চিন্তার পরিবর্তে বস্তুভিত্তিক যুক্তি-ধর্মী চিন্তা-ভাবনার সাহায্যে ঘটনাবলীর বিচার করতে শিখে । সেই পুরনো স্থবির, সংকীর্ণ ও রক্ষণশীল মনোভাবের বিসর্জন দিয়ে প্রগতিশীল মানসিকতা অর্জন করতে শুরু করে। এই নবজিজ্ঞাসার যুগে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব। তিনি রামমোহন রায়ের বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারাকে সামনে রেখে বাঙালির মুক্তির অগ্রদূতের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এ কাজের সঙ্গী হিসেবে তিনি পেয়েছিলেন অক্ষয়কুমার দত্তকে। উনিশ শতকের বাংলায় এঁদের অবদান সম্পর্কে বলতে গিয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ লিখেছেন:

> বাংলা গদ্য-সাহিত্যের প্রথম যুগে যে দুইজন শিল্পীর সাধনায় বাংলা ভাষা সাহিত্য-রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল, তাঁহাদের এক জন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অন্য জন অক্ষয়কুমার দত্ত। ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত, হিন্দী ও ইংরেজি সাহিত্য-পুস্তককে আদর্শ করিয়া যে-কার্য করিয়াছিলেন, অক্ষয়কুমার ইংরেজি বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক গ্রন্থের আদর্শে ঠিক সেই কার্যই সাধিত করিয়া গিয়াছেন। একজন রসসাহিত্যমূলক এবং অন্য জন বিজ্ঞান ও যুক্তিমূলক ভাষার সাহায্যে একই কালে মাতৃভাষার সাহিত্য-সম্পদ বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। আমরা একই কারণে এই দুই জন সাহিত্য-সাধকের এক জনকে স্মরণ করিতে গিয়া অন্য জনকেও স্মরণ করিয়া থাকি। গোড়ার দিকের অন্য সকলের নাম বিস্মৃত হইলেও যত দিন বাংলা ভাষা জীবিত থাকিবে, তত দিন ঈশ্বরচন্দ্র ও অক্ষয়কুমারকে স্মরণ রাখিতে হইবে।[৩২]

উনিশ শতকে বাংলাদেশে বাংলা ভাষা-সাহিত্যের উন্নয়নে, সামাজিক সংস্কারে এবং বাংলা ভাষায় শিক্ষা বিস্তারে বিদ্যাসাগরকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। তিনি সংস্কৃত কলেজ থেকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্তের পর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে সিবিলিয়ানদের বাংলা শিখাতে গিয়েই প্রথম বাংলা ভাষায় শিক্ষাবিস্তারের গুরুত্ব অনুধাবন করেন। এদেশে শিক্ষার উন্নতি ও প্রসার সম্পর্কে তাঁর চিন্তা পরিণতি লাভ করে ১৮৪২ থেকে ১৮৫২ সালের মধ্যে। ১৮৪৪ সালে মাতৃভাষায় শিক্ষা বিস্তারে বাংলা বিহার ও উড়িষ্যা অঞ্চলে গভর্নর জেনারেল হেনরী হার্ডিঞ্জ স্থাপিত স্কুলের পাঠ্যসূচী ও শিক্ষক নির্বাচনের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে শিক্ষা বিষয়ে তাঁর সে চিন্তা আরও দৃঢ়তা পায়। অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা সংস্কার ও নতুন শিক্ষাপদ্ধতিতে বাংলা পঠনপাঠনে পরিবর্তন আনার মাধ্যমে তাঁর শিক্ষাচিন্তা পরিপূণতা অর্জন করে।

শিক্ষাবিস্তারে বিদ্যাসাগর প্রথম অভিজ্ঞতা লাভ করেন ১৮৫৩ সালে বীরসিংহ গ্রামে একটি Anglo-Sanskrit স্কুল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। তিনি নিজেই এ স্কুলের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করতেন। এখানে সংস্কৃত, ইংরেজি এবং বাংলা শিক্ষা দেওয়া হতো। বাংলা পড়ানোর জন্য এস্কুলের সঙ্গে Vernacular স্কুল ছিল। এ ছাড়া এখানে স্থানীয়দের কাছে 'রাখাল স্কুল' নামে পরিচিত একটি নৈশ বিদ্যালয় ছিল। স্কুলের ছাত্র মধ্যে সংখ্যার দিক থেকে রাখালরা বেশি ছিল বলে স্কুলটি এরূপ নাম পেয়েছিল। Anglo-Sanskrit স্কুল প্রতিষ্ঠার অল্প দিনের মধ্যেই বিদ্যাসাগর একটি বালিকা বিদ্যালয় ও একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বীরসিংহ স্কুলের জন্য বিদ্যাসাগর গড়ে মাসিক ৩০০ টাকা খরচ বহন করতেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে এখানে শিক্ষার্থীরা আশানুরূপ উন্নতি করেছিল। ১৮৭০-৭১ সালে আর.এল. মার্টিন নামে একজন স্কুল-পরিদর্শক লিখেছিলেন যে, বিদ্যাসাগর স্কুলটির খরচপত্র সব বহন করেন। স্কুলটি সুপরিচালিত। অনেক ছাত্র এই স্কুলে উত্তম এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষালাভ করে থাকে।[৩৩] ১৮৭৫ সালে ম্যালেরিয়ার প্রকোপে বিদ্যাসাগরের এই স্কুলগুলি বন্ধ হয়ে যায়। ১৮৫৪ সালে উডের ডেসপ্যাচের সুপারিশ অনুসারে বিদ্যাসাগর দক্ষিণ বাংলার সহকারি স্কুল ইন্সপ্টেরের পদে নিয়োগ লাভ করার পর থেকেই তাঁর শিক্ষাচিন্তার প্রতিফলন ঘটে। এসব কাজের অংশ হিসেবে তিনি ভার্নাকুলার মডেল স্কুল, শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রভৃতি গড়ে তোলেন। তাঁর উৎসাহে অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬) প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং

Dhaka University Institutional Repository

উচ্চ স্তরের শিক্ষা নিয়ে কাজ করেন এবং মাতৃভাষায় গ্রন্থ রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর মাতৃভাষাকেন্দ্রিক যে শিক্ষার সুপারিশ করেছিলেন, তা ছিল সনাতন পদ্ধতি তুলনায় অনেক বেশি আধুনিক। সেই শিক্ষাক্রমে তিনি সাহিত্য, ইতিহাস, সংস্কৃতি, গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, দর্শন ও শারীরবিজ্ঞানকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। বাংলাদেশের নারীশিক্ষা ও জনশিক্ষা বিস্তারে তাঁর গভীর মনোযোগ ছিল।

৬

শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

প্রাচীনকাল থেকেই এদেশের শিক্ষাব্যবস্থা বিদেশি শাসকদের মর্জি অনুসারে হয়েছে। ১৮৩৫ সালে ইংরেজদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এদেশে যে পাশ্চত্যশিক্ষা প্রবর্তিত হয়েছিল তা বাঙালির জন্য উপযোগী হয়নি। কারণ তাতে এদেশের মানুষের জীবনের লক্ষ্যকে বিবেচনা করা হয়নি। সেই শিক্ষার লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে ঔপনিবেশিক শাসক মেকলে নিজেই বলেছেন:

> We must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern; a class of persons, Indian in blood and colour, but English in taste, in opinion, in morals and in intellect.[৩৪]

–এ শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য ছিল ইংরেজি-অভিজ্ঞ কর্মচারি তৈরি করা। ফলে পাশ্চত্যশিক্ষা বাঙালির জন্য কল্যাণ বয়ে আনতে পারেনি। ঔপনিবেশিক শাসকদের সেই অন্তসারশুন্য শিক্ষার বাইরে এসে অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ স্বদেশি ভাষায় শিক্ষার এক নতুন লক্ষ্য স্থির করেছিলেন। আমাদের শিক্ষা কীভাবে সামাজিক-রাজনৈতিক প্রভাবের শিকার হয়েছে সেই প্রেক্ষাপট বিদ্যাসাগর ছাত্র জীবনেই জেনেছিলেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সিবিলিয়ানদের বাংলা পড়াতে গিয়ে বিষয়টি তাঁর কাছে আরও পরিস্কার হয়েছে। এ সময় তিনি বিদেশিদের জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, স্বজাতীয় চরিত্রের দোষগুণ, জাতীয় ভাষা সাহিত্যের দুর্বলতা, যুগোপযোগী শিক্ষানীতির প্রয়োজনীয়তা, সামাজিক কদাচার কুসংস্কার প্রভৃতি বিষয়ে চিন্তাভাবনা, পর্যবেক্ষণ ও মতামত গঠনের অবকাশ পেয়েছিলেন। যার ফলে বাঙালির শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয়ে ভুল তাঁর ভুল হয়নি।

বিদ্যাসাগরের শিক্ষাদর্শের লক্ষ্য ছিল শিক্ষাকে বৃহত্তর জনসমষ্টির নিকট পৌঁছে দেওয়া এবং প্রাথমিক শিক্ষার একটি নির্দিষ্ট মান ঠিক করে দেওয়া। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই তিনি সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা সংস্কার ও পুনর্গঠনের কাজে অগ্রসর হয়েছিলেন। আর তখন থেকেই বাংলা ভাষায় জনশিক্ষা বিস্তারে তাঁর চিন্তাভাবনা দৃঢ়তা লাভ করে। বিদ্যাসাগর এমন একদল শিক্ষিত যুবক তৈরি করতে চেয়েছিলেন যারা মাতৃভাষায় পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা দিতে সক্ষম হবেন। এই লক্ষ্যে তিনি উপযুক্ত শিক্ষক তৈরি করতে ১৮৫৫ সালের ১৭ জুন কলকাতায় নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কারণ তখনকার দিনে নতুন কোনো আদর্শ স্কুলের জন্য উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া যেত না। শিক্ষক হতে যাঁরা প্রার্থী হতেন, তাঁদের বেশিরভাগেরই শিক্ষক হওয়ার যোগ্যতা ছিল না। যাঁদেরকে পাওয়া যেত তাঁরা জ্ঞান ও সমাজ-ধর্ম-ভাব-ভাষায় পরিশোধিত ছিলেন না। তাঁর বিশেষ অনুরোধ সেকালের চিন্তানায়ক অক্ষয়কুমার দত্ত নর্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

বিদ্যাসাগর মনে করতেন সমস্ত রকমের ভারতীয় দর্শন ছাত্রদের পড়ানো উচিত যাতে তারা একজন দার্শনিক কীভাবে অন্যের মত খণ্ডন করে নিজের মত প্রতিষ্ঠা করছেন তা জানতে পারে ও স্বাধীনভাবে নিজের মতামত তৈরি করতে পারে। ভাববাদী দর্শনের পরিমণ্ডলে থাকলেও এবং বস্তুবাদী দর্শনের অনুগামী না হলেও বিদ্যাসাগর সব রকম সংকীর্ণতা, কুপমণ্ডুকতা, রক্ষনশীলতা ও সংস্কারাবদ্ধতার উর্ধ্বে উঠে যুক্তিবাদী ও বিশ্লেষণী মনোভাবের দ্বারা গ্রহণযোগ্যতা যাচাই করে তাকে গ্রহণ ও বর্জন করেছেন। বিদ্যাসাগরের কাছে মানুষই ছিল

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। মানবিকতা তথা মানুষের কল্যাণসাধনই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। তাঁর শিক্ষাচিন্তা এবং সমাজভাবনায় সেই আদর্শের প্রভাব লক্ষ করা যায়। তিনি লিখেছেন:

> একথা ঠিক যে হিন্দু-দর্শনের অনেক মতামত আধুনিক যুগের প্রগতিশীল ভাবধারার সঙ্গে খাপ খায় না, কিন্তু তাহলেও প্রত্যেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের এই দর্শন সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা উচিত। ছাত্ররা যখন দর্শনশ্রেণীতে উত্তীর্ণ হবে, তার আগে ইংরেজি ভাষায় তারা যে জ্ঞান অর্জন করবে তাতে ইয়োরোপের আধুনিক দর্শনবিদ্যা পাঠ করারও সুবিধা হবে তাদের। ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দুই দর্শনের সম্যক জ্ঞান থাকলে, এদেশের পণ্ডিতদের পক্ষে আমাদের দর্শনের ভ্রান্তি ও অসারতা কোথায় তা বোঝা সহজ হবে। সমস্ত রকম মতামতের দর্শন ছাত্রদের পড়তে বলা উদ্দেশ্য হল, সেগুলি পড়লে তারা দেখতে পাবে কিভাবে এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের মত খণ্ডন করেছেন এবং এক দর্শনের পণ্ডিত ভিন্ন দর্শনের ভুলভ্রান্তি দেখিয়েছেন এবং প্রতিপাদ্যের যৌক্তিকতা খণ্ডন করেছেন। সুতরাং আমার ধারণা, সর্বমতের দর্শন পাঠ করবার সুযোগ দিলে ছাত্রদের নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত গড়ে উঠবে।[৩৫]

বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা সংস্কার প্রস্তাবে ছাত্রদের জন্য উন্নত বাংলা সাহিত্যসৃষ্টি, ব্যাকরণ, অলঙ্কার শাস্ত্র পাঠ, ইংরেজি ও সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থা এবং ইউরোপীয় আকর থেকে জ্ঞানবিদ্যার উপকরণ আহরণ করতে সক্ষম করে তুলতে শিক্ষা তত্ত্বাবধায়কদের আহবান করেছিলেন। এতে বিদ্যাসাগরের শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতিফলন ঘটেছে।[৩৬] যা বাংলা ভাষায় তাঁর শিক্ষাচিন্তার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। তিনি লিখেছেন:

১. বাংলাদেশে শিক্ষার তত্ত্বাবধানের ভার যাঁরা নিয়েছেন তাঁদের প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত, সমৃদ্ধ ও উন্নত বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি করা।

২. যাঁরা ইয়োরোপীয় আকর থেকে জ্ঞানবিদ্যার উপকরণ আহরণ করতে সক্ষম নন, এবং সেগুলিকে ভাবগম্ভীর, প্রাঞ্জল বাংলা ভাষায় প্রকাশ করতে অক্ষম, তাঁরা এই সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারবেন না।

৩. যাঁরা সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী নন, তাঁরা সুসংবদ্ধ প্রাঞ্জল বাংলা ভাষায় রচনা সৃষ্টি করতে পারবেন না। সেইজন্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের ভাষায় ও সাহিত্যে সুশিক্ষার প্রয়োজন।

৪. অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, যাঁরা কেবল ইংরেজি বিদ্যায় পারদর্শী, তাঁরা এত বেশি ইংরেজি ভাবাপন্ন যে তাঁদের যদি অবসর সময়ে খানিকটা সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহলেও তাঁরা শত চেষ্টা করেও পরিমার্জিত দেশীয় বাংলা ভাষায় কোন ভাবই প্রকাশ করতে পারবেন না।

৫. তাহলে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের যদি ইংরেজি সাহিত্য ভালোভাবে শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহলে তারাই একমাত্র সুসমৃদ্ধ বাঙলা সাহিত্যের সুদক্ষ ও শক্তিশালী রচয়িতা হতে পারবে।[৩৭]

বিদ্যাসাগর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্যার সমন্বয়ে মাতৃভাষার মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলনের চেষ্টায় নিয়োজিত ছিলেন। তিনি ছিলেন হিউম্যানিস্ট বিদ্যার সাধক ফলে তাঁর শিক্ষাদর্শের ভিত্তি ছিল হিউম্যানিজম। এ কারণেই প্রাচীন ভারতীয় ক্লাসিক্যাল বিদ্যায় তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য থাকলেও তিনি প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতি বা শিক্ষানীতির প্রতি অন্ধ অনুরাগী হয়ে উঠেননি। সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্য পুনশ্চর্চার আবশ্যকতা তিনি কখনো অস্বীকার করেননি। বিদ্যাসাগর সে ক্ষেত্রে চর্চার রীতি ও পদ্ধতি পরিবর্তনের কথা বলেছেন সবসময়। তিনি নিজেও সেই পরিবর্তন করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। শিক্ষাদর্শ ও শিক্ষাপদ্ধতির দিক থেকে বিদ্যাসাগর পুরোপুরি আধুনিকতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি শাস্ত্রনির্ভর অতীতমুখী শিক্ষানীতিকে গ্রহণ করেননি ।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা পরিকল্পনা ও পদ্ধতি

বিদ্যাসাগর তাঁর চিন্তারক্ষেত্রে এবং কর্ম জীবনে সব সময় স্বাধীন থাকতে চেয়েছেন। শিক্ষাসংস্কার কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে তিনি কারো আদেশ-অনুরোধের কোনো মূল্য দেননি। তিনি শিক্ষার্থীদের কল্যাণের দিক বিবেচনা করে এ কাজে ব্রতী হয়েছেন। তাদের প্রয়োজনকে শিরোধার্য করাই ছিল তাঁর শিক্ষা পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে তিনি কখনো নিজের ব্যক্তিগত সুবিধা-অসুবিধাকে গুরুত্ব দেননি। ১৮৪৭ সালে সংস্কৃত কলেজ থেকে বিদ্যাসাগরের পদত্যাগের কারণ অনুসন্ধানে দেখা যায়, এর অন্যতম একটি কর্তৃপক্ষের ছাত্রদের সুবিধা বিবেচনা না করা। ১৮৪৭ সালের ৩ মে, তিনি সেই কলেজের সেক্রেটারি রসময় দত্তকে যে পদত্যাগপত্র দিয়েছিলেন তাতে এই বিষয়টির প্রতিফলন ঘটেছে। তিনি লিখেছেন:

> I allude to the privilege assumed by the Principal of the Hindu College to take occasionally a portion of the stools and desks of the Sanscrit College for the accommodation of his own students at particular examination for 3 or 4 days together. Some of our Students are obliged to sit on the ground and it must be remembered the rooms are not matted. This irregularity has been frequently reported to you and although you have frequently promised to take efficient steps for putting a stop to such unjust interference, yet you do not appear to have taken any such either because you approve of such conduct or because you are not impressed with the inconvenience and unseemliness of our half of a class sitting on the bare ground whilst the other half sit on stools. Such a disregard of the comfort of the students and of the rights of the institution is to me highly distasteful.[৩৮]

পাঠ-ব্যবস্থা ও পাঠ্যক্রমকে পরিবর্তনের ব্যাপারে তাঁর সুচিন্তিত অভিমত এই পত্রটিতেই পরিস্ফুটিত। ইংরেজিকে সব ছাত্রের জন্য আবশ্যিক করাকেও তিনি বিশেষ প্রয়োজনের বলে উল্লেখ করেছেন। বিদ্যাসাগর শিক্ষার্থীদের সুবিধা-অসুবিধার দিকটিকে বেশি গুরত্ব দিতেন। তিনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক নিয়ম-শৃঙ্খলাকে যুগোপযোগী এবং ধর্মীয় সংস্কারমুক্ত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন । পরবর্তীতে রচিত শিক্ষা সংস্কারের প্রত্যক্ষ রিপোর্টগুলোতেও তাঁর এসব চিন্তভাবনার বিকাশ ঘটেছে। এর মধ্যে 'Notes on the Sanskrit College' তাঁর সবচেয়ে দীর্ঘ লেখা নোটস। বিদ্যাসাগর এটি ১৮৫২-এর ১২ এপ্রিল সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে লিখেছিলেন। সংস্কৃত কলেজ কতৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে লেখা এই Notes-এ শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রতিফলিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এর মধ্যে তাঁর শিক্ষাদর্শের সমগ্র রূপটি এমন সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে যা আর কোথাও পায়নি। সংস্কৃত কলেজের অপ্রকাশিত নথিপত্রের আলোকে মূল ইংরেজি থেকে বিনয় ঘোষ অনুদিত বিদ্যাসাগর রচিত ২৬ অনুচ্ছেদের নোটসটি নিম্নরূপ:

১. বাংলাদেশে শিক্ষার তত্ত্বাবধানের ভার যাঁরা নিয়েছেন তাঁদের প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত, সমৃদ্ধ ও উন্নত বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি করা।

২. যাঁরা ইয়োরোপীয় আকর থেকে জ্ঞানবিদ্যার উপকরণ আহরণ করতে সক্ষম নন, এবং সেগুলিকে ভাবগম্ভীর, প্রাঞ্জল বাংলা ভাষায় প্রকাশ করতে অক্ষম, তাঁরা এই সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারবেন না।

৩. যাঁরা সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী নন, তাঁরা সুসংবদ্ধ প্রাঞ্জল বাংলা ভাষায় রচনা সৃষ্টি করতে পারবেন না। সেইজন্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের ভাষায় ও সাহিত্যে সুশিক্ষার প্রয়োজন।

৪. অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, যাঁরা কেবল ইংরেজি বিদ্যায় পারদর্শী, তাঁরা সুন্দর পরিচ্ছন্ন বাংলা ভাষায় কিছু প্রকাশ করতে পারেন না। তাঁরা এত বেশি ইংরেজি ভাবাপন্ন যে তাঁদের যদি অবসর সময়ে খানিকটা সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহলেও তাঁরা শত চেষ্টা করেও পরিমার্জিত দেশীয় বাংলা ভাষায় কোন ভাবই প্রকাশ করতে পারবেন না।

৫. তাহলে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের যদি ইংরেজি সাহিত্য ভালভাবে শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহলে তারাই একমাত্র সুসমৃদ্ধ বাঙলা সাহিত্যের সুদক্ষ ও শক্তিশালী রচয়িতা হতে পারবে।

Dhaka University Institutional Repository

৬. পরের প্রশ্ন হল, এই উদ্দেশ্যে সংস্কৃত কলেজে কি ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করা যেতে পারে?

৭. সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের ব্যাকরণে ও সাহিত্যে খুব ভালভাবে শিক্ষা দিতে হবে। সাহিত্যের শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে কাব্য, নাটক ও গদ্য সবই থাকবে।

৮. অলঙ্কারশাস্ত্রে তাদের দু-একখানি ভাল বই পড়ালেই চলবে, যেমন 'কাব্যপ্রকাশ' ও 'সাহিত্যদর্পণ' গ্রন্থের দু-একটি অধ্যায়।

৯. ব্যাকরণ, সাহিত্য ও অলঙ্কারশাস্ত্র পাঠ করলে ছাত্রদের সংস্কৃত বিদ্যার ভিত দৃঢ় হবে।

১০. স্মৃতিশাস্ত্রে এইগুলি পাঠ্য হতে পারে: মনুস্মৃতি, মিতাক্ষরা–দায়ভাগ, দত্তকমীমাংসা ও দত্তকচন্দ্রিকা। এই শাস্ত্রগুলি পাঠ করলে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ব্যবস্থাদি সম্বন্ধে ছাত্রদের জ্ঞান সম্পূর্ণ হবে।

১১. বর্তমানে গণিতশাস্ত্রের পাঠ্য হল লীলাবতী ও বীজগণিত। গণিত-বিজ্ঞানের পক্ষে এই দুখানি বই যথেষ্ট নয়। তা ছাড়া এমন এক পদ্ধতিতে বই দুখানি রচিত, প্রচলিত ছড়া আর্যা ইত্যাদির সাহায্যে, যে আসল বিষয়বস্তু এক-একটি প্রহেলিকা হয়ে উঠেছে। সহজ বিষয় সরল করে না বলার জন্য ছাত্রদের অনেক বেশী সময় লাগে এই বিদ্যা আয়ত্ত করতে। প্রায় তিন চার বছর ধরে তাদের বই দুখানি পড়তে হয়। বইয়ের মধ্যে দৃষ্টান্ত না থাকার জন্য অনেক 'সমস্যা' ছাত্রদের বোধগম্য হয় না। আসল কথা হল, সংস্কৃত-গণিত ছাত্রদের পড়ানোর কোনও সার্থকতা নেই, কারণ এতে ছাত্রদের প্রচুর সময় ও শ্রমের অপব্যয় হয়। সেই সময়টুকু তারা অন্য প্রয়োজনীয় বিষয় পড়তে পারে।

১২. সেইজন্য সংস্কৃতে গণিতশিক্ষা না দেওয়াই বাঞ্ছনীয়।

১৩. এ থেকে একথা বুঝলে ভুল হবে যে আমি শিক্ষার ব্যাপারে গণিতবিদ্যার যথাযথ গুরুত্ব দিই না। তা আদৌ ঠিক নয়। আমি শুধু বলতে চাই যে সংস্কৃতের বদলে ইংরেজির মাধ্যমে বিদ্যালয়ে গণিত শিক্ষা দেওয়া উচিত, কারণ তাতে ছাত্ররা অর্ধেক সময়ে দ্বিগুণ শিখতে পারবে।

১৪. হিন্দু দর্শনের ছয়টি উল্লেখযোগ্য সম্প্রদায় আছে, ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত ও মীমাংসা। ন্যায়দর্শনে প্রধানত তর্কবিদ্যা, অধ্যাত্মবিদ্যা এবং মধ্যে মধ্যে কিঞ্চিৎ রসায়ন, আলোকবিদ্যা ও বলবিদ্যা সম্বন্ধে আলোচনা আছে। পাতঞ্জল ও মীমাংসা সম্বন্ধেও প্রায় ঐ একই কথা বলা যায়। মীমাংসায় উৎসবে-পার্বণের এবং পতঞ্জলে ঈশ্বরচিন্তা হল বিষয়বস্তু।

১৫. কলেজপাঠ্য হিসেবে এইসব বিষয় প্রয়োজনীয় কিনা, সে সম্বন্ধে ১৬ ডিসেম্বর ১৮৫০ আমি আমার রিপোর্টে যে মত ব্যক্ত করেছি আজও তাই সমর্থন করি।

১৬. এ কথা ঠিক যে হিন্দু-দর্শনের অনেক মতামত আধুনিক যুগের প্রগতিশীল ভাবধারার সঙ্গে খাপ খায় না, কিন্তু তা হলেও প্রত্যেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের এই দর্শন সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা উচিত। ছাত্ররা যখন দর্শন শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হবে, তার আগে ইংরেজি ভাষায় তারা যে জ্ঞান অর্জন করবে তাতে ইয়োরোপের আধুনিক দর্শনবিদ্যা পাঠ করারও সুবিধা হবে তাদের। ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দুই দর্শনের সম্যক জ্ঞান থাকলে, এদেশের পণ্ডিতদের পক্ষে আমাদের দর্শনের ভ্রান্তি ও অসারতা কোথায় তা বোঝা সহজ হবে। সমস্ত রকম মতামতের দর্শন ছাত্রদের পড়তে বলা উদ্দেশ্য হল, সেগুলি পড়লে তারা দেখতে পাবে কিভাবে এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের মত খণ্ডন করেছেন এবং এক দর্শনের পণ্ডিত ভিন্ন দর্শনের ভুলভ্রান্তি দেখিয়েছেন এবং প্রতিপাদ্যের যৌক্তিকতা খণ্ডন করেছেন। সুতরাং আমার ধারণা, সর্বমতের দর্শন পাঠ করবার সুযোগ দিলে ছাত্রদের নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত গড়ে উঠবে। তার সঙ্গে পাশ্চাত্য দর্শন সম্বন্ধে জ্ঞান থাকলে, দুই দর্শনের মধ্যে সাদৃশ্য ও পার্থক্য কোথায় তাও তারা বুঝতে পারবে।

১৭. এই শিক্ষার আর-একটি সুবিধা হল এই যে পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ভাবধারা আমাদের বাঙলা ভাষায় প্রকাশ করতে হলে যে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা (technical word) জানা দরকার, তা পণ্ডিতদের আয়ত্তে থাকবে।

১৮. এ-সব বিষয়ে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য থাকার প্রয়োজন নেই। ছাত্ররা যদি এইগুলি পড়ে তাহলেই যথেষ্ট হবে। ন্যায় দর্শন গৌতমসূত্র ও কুসুমাঞ্জলি , বৈশেষিকদর্শন কণাদের সূত্র , সাংখ্যদর্শন– কপিলে সূত্র এবং কৌমুদী , পতঞ্জল দর্শন পতঞ্জলের সূত্র , বেদান্তদর্শন বেদান্তসার এবং ব্যাসের সূত্র, প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ ; মীমাংসাদর্শন জৈমিনির সূত্র। এগুলি ছাড়া ছাত্ররা 'সর্বদর্শনসংগ্রহ' পড়বে, কারণ তার মধ্যে সব দর্শনের সারকথা পাওয়া যাবে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯. সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের ব্যাকরণ ও সাহিত্যশ্রেণিতে পড়বার সময় তিনভাগের দুইভাগ সময় সংস্কৃতের জন্য ও একভাগ সময় ইংরেজির জন্য দেওয়া উচিত। অলংকার, স্মৃতি ও দর্শনশ্রেণিতে পড়ার সময় তাদের প্রধান মনোযোগের বিষয় হবে ইংরেজি। অর্থাৎ তিনভাগের দুভাগ সময় ইংরেজি বিদ্যার জন্য নিয়োগ করা উচিত।

২০. বর্তমানে সংস্কৃত কলেজের সিনিয়ার বৃত্তি পরীক্ষায় সাহিত্য, অলংকার, গণিত, স্মৃতি, দর্শন ও সংস্কৃত গদ্যরচনা–এই বিষয়গুলি আছে। এগুলি এইভাবে পরিবর্তন করা যেতে পারে : সাহিত্য ও অলংকার যেমন আছে তেমনি থাকবে। সংস্কৃত-গণিত ও সংস্কৃত গদ্যরচনা বাদ দিতে হবে এবং তার বদলে ইতিহাস, গণিত ও প্রাকৃতিক দর্শন ইংরেজিতে পড়াতে হবে এবং সেইটাই হবে সিনিয়ার বৃত্তি পরীক্ষার বিষয়। দর্শনশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্রও বৃত্তিপরীক্ষার বিষয় হবে এবং প্রতিবছর একটি করে বিষয় নির্বাচন করা হবে।

২১. দু'জন শিক্ষক নিয়ে বর্তমানে যে ইংরেজি বিভাগ আছে, তা দিয়ে এই ধরনের শিক্ষাসংস্কার করা অসম্ভব। তা ছাড়া বর্তমান শিক্ষকরা গণিতে এবং বিজ্ঞানে বিশেষ পারদর্শী নন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস সংস্কৃত কলেজে এই ধরনের শিক্ষক দিয়ে কোনো কাজ হবে না। তাঁদের যদি অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে, যেখানে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে , সেখানে বদলি করে নেওয়া যায় তাহলে ভাল হয়।

২২. এই বিভাগটি সম্পূর্ণ পুনর্গঠন করতে হবে, চারজন শিক্ষক নিয়ে যথাক্রমে ১০০ টাকা, ৯০ টাকা, ৬০ টাকা এবং ৫০ টাকা বেতনে। এই বেতন দিয়ে ভাল শিক্ষক পাওয়া যেতে পারে। এই ব্যবস্থা করতে হলে ইংরেজি বিভাগের জন্য মাসে ৩০০ টাকা খরছ করা প্রয়োজন।

২৩. সংস্কৃত-গণিতশ্রেনি তুলে দিলে দু'জন শিক্ষক মাসিক ২৫০ টাকা বেতনে ইংরেজি বিভাগের জন্য পাওয়া যাবে। বাকি যে পঞ্চাশ টাকা মাসে লাগবে তা কলেজের বাৎসরিক গ্র্যান্ট ২৪০০০ টাকা, যা থেকে এখন ১৯০০০ টাকার কিছু বেশি হয়, তাই থেকেই নেওয়া যেতে পারবে।

২৪. যদি শিক্ষা খাতের তহবিল থেকে এই অতিরিক্ত ব্যয় এখন মঞ্জুর করা সম্ভব না হয়, তাহলে অন্য কোনো উপায়ে এই ব্যয় সংকুলানের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করতে হবে। বর্তমানে দু'জন 'রাইটার' আছে কলেজে, একজন বাংলার জন্য, একজন নাগরির জন। প্রত্যেকের বেতন মাসিক ১৬ টাকা। যে সব পাণ্ডুলিপি তারা কপি করে তা অপ্রয়োজনীয়। সাধারণত পাণ্ডুলিপিগুলিতে ভুল থাকে যথেষ্ট এবং যতবার সেগুলি কপি করা হয় ততবার ভুল ও ছাড় দ্বিগুণ হতে থাকে। সুতরাং কপিস্টের দ্বারা লিখিত পাণ্ডুলিপি আর একবার কপিস্টকে দিয়ে লেখবার ফলে প্রায় দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে। তা ছাড়া যে দু'জন কপিস্ট সংস্কৃত কলেজে আছে, তারা মাসে পাঁচ-ছয় টাকার মতো কপি করে, অথচ মাসে ৩২ টাকা করে বেতন পায়। এই কপিস্ট দুজনকে বরখাস্ত করা উচিত এবং তাদের বেতনের ৩২ টাকা অন্য ভাল কাজে লাগান উচিত। ইংরেজি বিভাগের জন্য মাসিক ৮ টাকা করে একটি জুনিয়র বৃত্তির ব্যবস্থা আছে। যদি ইতিহাস ও অন্যান্য বিষয়, যা আগে উল্লেখ করা হয়েছে সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহলে ইংরেজি বিভাগের জন্য আলাদা করে ৮ টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা করার দরকার হবে না। দু'জন কপিস্টের ৩২ টাকা এবং বৃত্তির ৮ টাকা যোগ করলে মাসে ৪০ টাকা হতে পারে। আগে যে ৫০ টাকা ঘাটতি পড়ছিল তা থেকে এইভাবে ৪০ টাকার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সুতরাং বাকি থাকে আর ১০ টাকা মাত্র এবং এই ১০ টাকা কলেজের তহবিল থেকে নিশ্চয়ই পাওয়া যেতে পারে।

২৫. ১৮৫০ সালে আমি যখন এই প্রতিষ্ঠানে কাজের যোগ দিই তখন সংস্কৃত কলেজের শিক্ষাসংস্কার সম্বন্ধে আমার মতামত আমি একটি রিপোর্টে শিক্ষা-সংসদের কাছে জানাই। তারপর কয়েক বছরের অভিজ্ঞতায় আমি আমার আগেকার মতামত কিছু কিছু অদল বদল করার প্রয়োজনবোধ করেছি। এর থেকে বোঝা যাবে কেন আমার এই পরিকল্পনার সঙ্গে আগেকার পরিকল্পনা খানিকটা তফাত আছে।

২৬. আমার ধারণা, যে সমস্ত বিষয় সংস্কারের কথা আমি এখানে বলেছি, সেগুলি কার্যকর না হলে সংস্কৃত কলেজের কোন প্রকৃত উন্নতি হবার সম্ভাবনা নেই এবং তার আসল আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করাও অসম্ভব। [৩৯]

উপরোল্লিখিত প্রস্তাবের প্রথম অনুচ্ছেদে বিদ্যাসাগর বলেছেন যে, যাঁরা শিক্ষার তত্ত্বাবধানের ভার নিয়েছেন তাঁদের প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত সমৃদ্ধ এবং উন্নত বাঙলা সাহিত্য সৃষ্টি করা। শিক্ষাক্ষেত্রে তিনি নিজের দৃষ্টিকে এই লক্ষ্যের প্রতিই সর্বদা নিবদ্ধ রেখেছিলেন। তাঁর দ্বিতীয় লক্ষ্য ছিলো, কুসংস্কারাচ্ছন্ন দেশিয় শিক্ষা, যাকে রবীন্দ্রনাথ 'গ্রাম্য পাণ্ডিত্য এবং গ্রাম্য বর্বরতা' বলে অভিহিত করেছিলেন তার হাত থেকে এদেশের শিক্ষার্থীদের উদ্ধার করে তাদের চিত্তকে প্রকৃত জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত করা। এই দুই প্রধান লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে একদিকে বাঙলা ও ইংরেজি উভয় ভাষাতেই শিক্ষার্থীদের দক্ষতা অর্জনের ওপর যেমন গুরুত্ব দিয়েছেন অন্যদিকে তেমনি

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচীন ভারতীয় কাব্যসাহিত্য, অলঙ্কার, ন্যায়, দর্শন ও ইউরোপীয় দর্শন, গনিত, বিজ্ঞান ইত্যাদি সুশৃঙ্খল অধ্যায়নের ওপর জোর দিয়েছেন। গনিত-শিক্ষা সংস্কৃত ভাষায় না দিয়ে ইংরেজি ভাষায় দেওয়ার জন্য তিনি পরামর্শ দিয়েছেন। গণিতচর্চা বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে একটি অপরিহার্য বিষয়। তাই গণিতচর্চাকে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত গণিত বিষয়ক পুস্তকের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে এবং একটি আধুনিক উপযোগী ভাষার পরিবর্তে সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে গণিত-শিক্ষা দেওয়া হলে ছাত্রদের প্রকৃত গণিত-শিক্ষা এবং বিজ্ঞানচর্চা সম্ভব হবে না। এই বিবেচনা থেকেই তিনি উপরোল্লিখিত প্রস্তাব করেছিলেন। বিদ্যাসাগর ছাত্রদের এই সমস্যা উপলব্ধি করেছিলেন বলেই সরকারের কাছে প্রদত্ত সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা-সংস্কার সংক্রান্ত নোটটির ১১, ১২ এবং ১৩ অনুচ্ছেদে গণিত-শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শিক্ষা সংস্কার পরিকল্পনায় হিন্দু শাস্ত্রীয় কুসংস্কার থেকে ছাত্রদের উদ্ধারের বিষয় প্রাধান্য পেয়েছিল। সেই সঙ্গে শিক্ষাকে ভাববাদী প্রভাব মুক্ত করতেও তিনি যত্নবান ছিলেন। এ কারণেই 'বিসপ বার্কলের বই পাঠ্য হিসেবে প্রচলন করতে তিনি ব্যালেন্টাইনের সঙ্গে একমত হতে পারেননি। এই বই পড়ালে ছাত্রদের জন্য সুফলের চেয়ে কুফলই বেশি হবে বলে তিনি মত দিয়েছিলেন।'[৪০] সংস্কৃত কলেজের পাঠ্য বিষয়, গঠন প্রণালী ও পরিচালন পদ্ধতির দিকে নজর দিলেই আমরা বিদ্যাসাগরের শিক্ষাচিন্তার অনুধাবন করতে পারি।

৮

আদর্শ বঙ্গ বিদ্যালয় স্থাপন

১৮৩৫ সালে বড়লাট লর্ড বেন্টিঙ্ক উইলিয়ম অ্যাডামকে দেশিয় শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান করে মতামত দেওয়ার কাজে নিযুক্ত করেন। অ্যাডাম তাঁর মতামত জানানোর আগেই লর্ড মেকলের পরামর্শে ইংরেজি ভাষাকে একমাত্র শিক্ষার বাহন করে সরকারি শিক্ষানীতি স্থির হয়ে যায়। কমিটি অফ পাবলিক ইন্সট্রাকসনের রিপোর্টে লেখা হয় যে, পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে এবং প্রশাসনিক কাজকর্মে সংস্কৃত, আরবি, ফার্সি অপেক্ষা অনেক সুবিধাজনক বলে ইংরেজিকে গ্রহণ করা হয়েছে। তবে সেই সিদ্ধান্তে মাতৃভাষার গুরুত্বকে ক্ষুন্ন করা বা অস্বীকার করা হয়নি। এর পরিপ্রেক্ষিতে মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থাকে সচল করার চেষ্টা শুরু হয়। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের লেঃ গভর্নর টোমাসন,১৮৪৩ সালে কতকগুলি 'মডেল স্কুল' স্থাপন করেন।'১৮৪৪ সালে গভর্নর জেনারেল হেনরী হার্ডিঞ্জ বাংলা প্রেসিডেন্সিতে ১০১টি বাংলা স্কুল স্থাপন করেন।'[৪১] উভয় ক্ষেত্রেই স্কুলগুলির তত্ত্বাবধায়ক ছিল সরকারের রেভেনিউ বিভাগ। এসব স্কুলের শিক্ষার অগ্রগতি সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানে দেখা গেল, সাফল্যের দিক থেকে হার্ডিঞ্জের স্কুলগুলি অপেক্ষা টোমাসনের স্কুলগুলি অনেক এগিয়ে। তখন 'বড়লাট ডালহৌসি 'টোমাসন পরিকল্পনার' অনুরূপ পরিকল্পনা বাংলাদেশেও প্রবর্তন করা উচিত বলে কোর্ট অফ ডিরেকটরদের জানান।'[৪২] গভর্নর জেনারেল হেনরী হার্ডিঞ্জ স্থাপিত স্কুলগুলি কয়েক বছরের মধ্যে বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণ অনুসন্ধান করেন এডুকেশন কাউন্সিল বিভাগ।

১৮৫১-৫২ সালের রিপোর্টে এডুকেশন কাউন্সিল হার্ডিঞ্জের স্কুলগুলির ব্যর্থতার তিনটি দুর্বলতা চিহ্নিত করে, উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব, উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তকের অভাব এবং উপযুক্ত তত্ত্বাবধানের অভাব। তখন শিক্ষক ও পাঠ্যপুস্তক সমস্যার দ্রুত সমাধান করা সম্ভব ছিল না। তবে তত্ত্বাবধানের মান উন্নত করা সম্ভব ছিল। সরকার তাই ১৮৫২ সালে হার্ডিঞ্জ স্কুলগুলিকে রাজস্ববিভাগের তত্ত্বধান থেকে সরিয়ে শিক্ষাবিভাগের অধীনে নিয়ে নেয়।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর এসব বিষয়ে অবগত ছিলেন। তিনি তখন এদেশে টোমাসন পরিকল্পনার অনুরূপ পরিকল্পনা নিয়ে আদর্শ বঙ্গ বিদ্যালয় স্থাপনে উদ্যোগী হন। তিনি অধ্যক্ষের কাজের ফাঁকে ফাঁকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়াতে থাকেন। এ কাজে তিনি নিজে সহকারী ইন্সপেক্টর নিযুক্ত হয়েই কাজের সুবিধার্থে চারটি জেলার জন্য চার জন সুশিক্ষিত সাহিত্যমোদী ও পরিশ্রমী ছাত্রকে সাব ইন্সপেক্টর নির্বাচিত করেন এবং 'তাদেরকে আদর্শ বঙ্গ-বিদ্যালয় স্থাপনের উপযুক্ত স্থান খুঁজে বের করার জন্য গ্রামাঞ্চলে পাঠিয়ে দেন।'[৪৩] তাঁদের

সহায়তায় বিদ্যাসাগর ১৮৫৫ সালের ২২ আগস্ট থেকে '১৮৫৬ সালের ১৪ জানুয়ারি তারিখ পর্যন্ত প্রত্যেক জেলায় ৫টি করে মোট ২০টি আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন করেন।'[৪৪] এসব বিদ্যালয়গৃহ নির্মাণের যাবতীয় খরচ তখন স্থানীয় অধিবাসীরাই বহন করেন। সরকার প্রতিটি বিদ্যালয়ের জন্য মাসিক পঞ্চাশ টাকা বরাদ্দ করেন। ছাত্ররা বিনা বেতনে এসব বিদ্যালয় পড়াশোনার সুযোগ লাভ করে। তবে শিক্ষা-অধিকর্তার নির্দেশ ছিল, সম্ভব হলে ছ' মাস পরে ছাত্রদের কাছ থেকে কিছু কিছু বেতন নেওয়া জন্য শিক্ষা-অধিকর্তার নির্দেশ ছিল। ১৮৫৩ সালে উডের শিক্ষা পত্রে ভারতবর্ষে 'স্ত্রী-শিক্ষা'র সমর্থন পাওয়ার পর, ১৮৫৭ সালে জে. হ্যালিডে এদেশে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য বিদ্যাসাগরকে আহ্বান জানান। 'তখন ১৮৫৭-৫৮ সালের মোট ৬ মাস সময়ে বিদ্যাসাগর হুগলি, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও নদীয়া জেলায় মোট ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।'[৪৫] তিনি নিজেই সেগুলি পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। 'বিদ্যালয়গুলি পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁর দক্ষতা বিচিত্রমুখী অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়।'[৪৬] এভাবে তিনি এদেশে আদর্শ বঙ্গ বিদ্যালয় স্থাপন করে বাংলা ভাষায় শিক্ষা বিস্তারের পথ সুগম করেন।

৯

শিক্ষা বিষয়ক পাঠ্যপুস্তক রচনা

বিদ্যাসাগরের সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভাব পাঠ্যপুস্তক রচয়িতা হিসেবে। ১৮৪১ সালে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে যোগদানের পর যেসব বাংলা বই তাঁকে পড়াতে হত, হয় নিত্যন্ত দুর্বোধ্য, আর না হয় আদি রসাত্মক্ ফলে এখানে যোগ দেবার পর থেকেই ছাত্রপাঠ্য পুস্তকের একটি অভাব তিনি অনুভব করতে থাকেন। এই অভাব পুরণের জন্য তাঁর মাথায় আসে। এ ব্যাপারে সব রকম উৎসাহ, সাহায্য-সহযোগিতা তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেক্রেটারি মার্শালের কাছ থেকে পান। প্রধানত মার্শালের উৎসাহেই ১৮৪৭ সালে 'বৈতাল পচীসী, নামক হিন্দি পুস্তক অবলম্বনে তিনি রচনা করেন 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'।[৪৭] বইটি ক্লার্ক মার্শমানের সহায়তায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পাঠ্যপুস্তক হিসেবে গৃহীত হয়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে চালু হবার পর, মার্শালের অনুরোধে সরকার 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' বইটি বাংলার বিভিন্ন স্কুল- কলেজে পাঠ্যপুস্তক হিসেবে মনোনীত করেন। কিন্তু হিন্দু কলেজের সেক্রেটারি রসময় দত্ত এটিকে তাঁর কলেজে পাঠ্যপুস্তক হিসেবে চালু না করে সরকারকে চিঠি দিয়ে জানালেন যে তা হিন্দু কলেজের ছাত্রদের জন্য উপযোগী নয়। বইটি হিন্দু কলেজের ছাত্রদের জন্য কেন পাঠোপযোগী নয় ,সরকার মার্শালের কাছে জানতে চাইলে, তিনি তাঁর মতামত জানান। কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁদের পূর্ব মনোভাব পরিত্যাগ করে এটিকে পাঠ্যপুস্তক হিসেবে চালু করেন।

উনিশ শতকের পঞ্চম দশকে দেশিয় ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রসারে অনুরাগী কয়েকজন বিদেশির সঙ্গে বিদ্যাসাগরের পরিচয় হয়। তাঁদের মধ্যে মার্শম্যান, মার্শাল ,বেথুন, হ্যালিডে, বিডন প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায় তিনি এদেশে বাংলা ভাষায় শিক্ষা বিস্তারে উৎসাহিত হয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর সব সময় ছাত্রদের মঙ্গল বিবেচনা করে তাদের মানসিক বিকাম উপযোগি বইপুস্তক রচনা করেছেন। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে জেমস লং এর নেতৃত্বে বাংলায় অশ্লীলতাবিরোধী যে আন্দোলন হয়, বিদ্যাসাগর তাতে সমর্থন দেন। যে কারণে তিনি 'ঋজুপাঠ'–এর প্রথম ভাগে পঞ্চতন্ত্রের কিছু অংশ সংকলন করলেও, অশ্লীল উপাখ্যানগুলি বাদ দিয়েছিলেন। এরপর ধারাবাহিকভাবে বিদ্যাসাগর পাঠ্যপুস্তক লিখে এবং তা সেগুলো বিদ্যালয়ে পাঠ্য করার ব্যবস্থা করে বাংলা ভাষায় শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে চলেন।

আদর্শ বঙ্গ বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকাভূক্ত বিষয়গুলির মধ্যে ছিল বাংলা সাহিত্য (গদ্য ও পদ্য), ব্যাকরণ, ভূগোল, ইতিহাস, গণিত, রসায়ন, পর্দার্থবিদ্যা, স্বাস্থ্যতত্ত্ব এবং ইংলন্ড ও গ্রীস-রোমের ইতিহাস। বিদ্যাসাগর দেখলেন যে, মাতৃভাষায় শিশু ও কিশোরদের উপযোগী উল্লিখিত বিষয়সমূহের জন্য উপযুক্ত পুস্তক নেই। যদিও

কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি দীর্ঘকাল ধরে বাংলা, ইংরেজি ও হিন্দি ভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করে আসছিলেন। বিদ্যাসাগরের বিবেচনায় সেগুলো যথোপযুক্ত ছিল না। এ কারণেও তিনি পাঠ্যপুস্তক রচনার প্রয়োজন অনুভব

করেছিলেন। পাঠ্যপুস্তক রচনায় তাঁর ব্যক্তিগত প্রচেষ্ঠার সঙ্গে অক্ষয়কুমার দত্ত, পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রমুখ যোগ দিয়েছিলেন। পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের রোম ও গ্রীসের ইতিহাস তখন উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তরূপে বিবেচিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বাংলা ভাষায় পাঠ্য পুস্তক রচনা প্রসঙ্গে অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন:

> 'বর্ণপরিচয়' থেকে 'আখ্যান-মঞ্জরী' পর্যন্ত, শিশু-বালক-কিশোর-পাঠ্য অনেকগুলি পুস্তক লিখে বিদ্যাসাগর জ্ঞানাঞ্জনশলাকা দিয়ে বাঙালী জাতিকে চক্ষুষ্মান করতে চেয়েছেন।' বিদ্যাসাগর শিশুদের বর্ণবোধের কথা ভেবেছেন, বালকদের চরিত্র- গঠনোপযোগী চরিতকাহিনি ও জ্ঞানগর্ভ পুস্তক প্রচলন করেছেন, কিশোরদের চিত্তনুকূল আখ্যান রচনা করে নীরস শিক্ষাগ্রন্থেও সরসতা সঞ্চার করেছেন। বিশাল প্রতিভাধর এই মনস্বী বালক-বালিকাদের শিক্ষার কথা যতটা গভীর, আন্তরিক ও বৈজ্ঞানিকভাবে ভেবেছিলেন, বোধ করি সে যুগে সে বিষয়ে অতটা মনোযোগ দিয়ে আর কেউ চিন্তা করেননি। শিশুশিক্ষা নিয়ে মদনমোহন তর্কালঙ্কারও যথেষ্ট চিন্তা করেছিলেন, পুস্তকও লিখেছিলেন। তবে তিনি ছিলেন বিদ্যাসাগরের পার্শ্বচর এবং তাঁরই আলোকে আলোকিত। শতসহস্র কর্মজালজড়িত হয়েও বিদ্যাসাগর বাংলাদেশের শিশুশিক্ষা এবং বয়স্কশিক্ষা সম্পর্কে সদাসর্বদা অবহিত ছিলেন। কারণ তিনি জানতেন শিশুশিক্ষার বুনিয়াদ সুদৃঢ় না হলে কোন জাতিই মননের ক্ষেত্রে সাবালকত্ব অর্জন করতে পারে না। এইজন্য তিনি মণিহর্ম্যে শিল্পসৌকুমার্য ও অলঙ্করণ স্থগিত রেখে শিক্ষার ভিত্তিমূলে হাত লাগিয়েছিলেন।[৪৮]

১৮৪৯ সালে বিদ্যাসাগর কয়েকজন পাশ্চাত্য মনীষীর জীবনকথা অবলম্বনে 'জীবনচরিত' প্রকাশ করেন। এটি চেম্বার্স প্রণীত Exemplary Biography- গ্রন্থের অনুবাদ। তিনি চেম্বার্সের স্কূলপাঠ্য গ্রন্থ থেকে বেছে নিয়ে কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও, নিউটন, হর্শেল, গ্রোশ্যস, লিনিয়স, ডুবাল ও উইলিয়ম জোন্স -এর জীবনচরিত সংকলন করেন। সেই সময় এদেশে ছাত্রদের জ্ঞানতৃষ্ণা মিটানো ও চরিত্রগঠন উপযোগী বিশেষ কোনো বাংলা পাঠ্যপুস্তক ছিল না। স্কুল বুক সোসাইটি, ভার্নাকুলার লিটারেচর সোসাইটি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান দ্বারা কয়েকখানি বাংলা পুস্তক রচিত হলেও তা বাংলা ভাষা শিক্ষার্থীদের জন্য ছিল অনুপযোগী । সেগুলোর বিষয়ও তাঁদের চরিত্র গঠনের অনুকূল বলে বিবেচিত হয়নি। 'এই জীবনচরিতগুলির অধিকাংশই কোন বৈজ্ঞানিকের জীবন-কথা। জ্যোতির্বিদ, উদ্ভিদতত্ত্বজ্ঞ, ভিষকশাস্ত্রজ্ঞ, শিক্ষাব্রতী,–বিবিধ পাশ্চাত্য মনীষীর কাহিনি অনুবাদ করে তিনি বালক-বালিকাদের চরিত্র গঠন উপযোগী পাঠ্যগ্রন্থ সঙ্কলন করেছিলেন। এই গ্রন্থে পদার্থবিদ্যা,বলবিজ্ঞান, উদ্ভিদতত্ত্ব ও জ্যোতির্বিদ্যা-সংক্রান্ত অনেক শব্দের পরিভাষার প্রয়োজন হয়েছিল। গ্রন্থের শেষে তিনি কয়েকটি ইংরেজি শব্দের বাংলা পরিভাষা তৈরি করে দিয়েছিলেন। 'পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা-সংক্রান্ত পরিভাষাগুলি তৈরি করতে গিয়ে তিনি অনেক চিন্তাভাবনা করেছিলেন।'[৪৯] এই পরিভাষার অনেকগুলি এখনও ব্যবহৃত হয়। তাঁর এ ধরনের জীবনচরিত রচনায় প্রধান উদ্দেশ্য ছিল– পরিশ্রম, অধ্যবসায়, উৎসাহ, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি মানসিক গুণের মাধ্যমে অতি সাধারণ ব্যক্তি কীভাবে অসাধারণ হয়ে উঠতে পারেন ছাত্রসমাজের কাছে তার আদর্শ তুলে ধরা।

বিদ্যাসাগর এ দেশের বহু ব্যক্তির গুণগ্রাহী ছিলেন, 'কর্মবীর মতিলাল শীল এবং দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনচরিত লিখবেন সিদ্ধান্ত করেছিলেন; কিন্তু সময়াভাবে তা কার্যে পরিণত করতে পারেননি।'[৫০] 'তিনি যদি তাঁর সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ বাঙালীদের সম্বন্ধে কিছু লিখে যেতেন, তাহলে বাংলার চরিতসাহিত্য যে অধিকতর বলশালী হত তাতে সন্দেহ নেই।'[৫১] ১৮৫১ সালে বিদ্যাসাগরের 'বোধদয়' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। 'তাঁর বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কার তিনভাগ 'শিশুশিক্ষা' রচনা করেছিলেন (১ম,২য়-১৮৪৯, ৩য়–১৮৫০) বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের বালিকাদের জন্য।'[৫২] সেই আদর্শে ও ধারাবাহিকতা বজায় রেখে তিনি প্রথমে 'বোধদয়'-কে 'শিশুশিক্ষা ৪র্থ ভাগ' হিসেবে নির্দিষ্ট করেছিলেন। মদনমোহনের 'শিশুশিক্ষা'র সুললিত ও সরস এই পুস্তিকাগুলি এককালে বালক-বালিকাদের স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ ছিল। বিদ্যাসাগরও বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের জন্যই 'শিশুশিক্ষা ৪র্থ ভাগ' রচনা

করেছিলেন। কারণ দীর্ঘকাল ধরে তিনি বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের সম্পাদকরূপে স্ত্রীশিক্ষা প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। বালিকাদের মনঃপ্রণালী গঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তিনি অবগত ছিলেন।

বাল্যশিক্ষা-সংক্রান্ত গ্রন্থ নির্বাচনে তিনি উইলিয়ম ও রবার্ট চেম্বার্স ভ্রাতৃদ্বয়ের রচিত ও সংকলিত ইংরেজি গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করতেন। ফ্রেডারিক জে. হ্যালিডে ছোটলাটপদে যোগ দেবার (১৮৫৪) পূর্বে কিছুকাল শিক্ষা-পরিষদের সদস্য ছিলেন। বাংলা ভাষায় কিভাবে অতিদ্রুত শিক্ষা বিস্তার করতে পারা যায় এ বিষয়ে তিনি (১৮৫৪, মার্চ) একটি রিপোর্ট প্রস্তুত করেন। সেই রিপোর্টের মূল হচ্ছে বিদ্যাসাগর প্রদত্ত তথ্য (১৮৫৪, ফেব্রুয়ারী)। বিদ্যাসাগর বাংলা শিক্ষা প্রচার ও বাংলা স্কুল-পাঠশালায় ছাত্রদের জন্য পাঁচভাগে শিশু-শিক্ষাবিষয়ক প্রাথমিক পুস্তক প্রচলনের কথা বলেন। 'শিশুশিক্ষা' তিনভাগে আছে-বর্ণপরিচয়, বানান এবং পঠনশিক্ষা; চতুর্থভাগে জ্ঞানোদয় সম্পার্কিত একখানি ছোট বই–এ খানাই 'বোধোদয়'। পঞ্চম ভাগে ছিল 'Chamber's Educational Course'-এর অন্তর্গত কয়েকটি নীতিপাঠের অনুবাদ। 'বোধোদয়' চেম্বার্সের Rudiments of knowledge অবলম্বনে রচিত হলেও বিদ্যাসাগর অন্য গ্রন্থ থেকেও এর উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন।'[৫৩] এতে পদার্থ, মানবজাতি, ভাষা, কাল, গণনা, বস্তুর আকার-পরিমাণ, নানা ধাতু, নদী-সমুদ্র, উদ্ভিদ, জন্তু, খনিজ-পদার্থ, শিল্পবাণিজ্য প্রভৃতি বালকদের অবশ্য- জ্ঞাতব্য বস্তুর সমাবেশ করা হয়েছিল। অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক-বালিকারা যাতে একখানি প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তক থেকেই জগৎ সম্বন্ধে মোটামুটি সংগ্রহ করতে পারে, এই ছিল বিদ্যাসাগরের উদ্দেশ্য। এই গ্রন্থটি যে কত জনপ্রিয় হয়েছিল– তার প্রমাণ এর অসংখ্য সংস্কারণ। 'তাঁর জীবিতকালের মধ্যেই এর প্রায় এক শ'সংস্করণ হয়েছিল।'[৫৪]

'বোধোদয়'-এর প্রথম সংস্করণে জগত ও জীবন সম্পর্কে অনেক তথ্য সংকলিত হলেও তাতে ঈশ্বর বিষয়ে কোনো বর্ণনা ছিল না। এতে করে ঈশ্বরভক্তরা ঈশ্বর বিষয়ে কোনো কথা না থাকার অভিযোগ করে। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি তাঁকে বলেন- 'যাঁহারা তোমার কাছে এরূপ বলেন, তাঁহাদিগকে বলিও এইবার যে বোধোদয় ছাপা হইবে, তাহাতে ঈশ্বরের কথা থাকিবেক।'[৫৫] পরবর্তী সংস্করণে তিনি প্রথমে পদার্থের সংজ্ঞাদি বর্ণনা করে দ্বিতীয় প্রস্তাবে 'ঈশ্বর' বিষয়ে লিখলেন–'ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ। তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না, কিন্তু তিনি সর্বদা সর্বত্র বিদ্যমান আছেন।....ঈশ্বর পরম দয়ালু; তিনি সমস্ত জীবের আহার-দাতা ও রক্ষাকর্তা'[৫৬] ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ' এই উক্তি নিয়ে দ্বিমত আছে।'[৫৭]

১৮৫১ সালে বিদ্যাসাগর 'সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা' লিখে সংস্কৃত কলেজের শিক্ষার্থীদের প্রথম সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার সহজ পথ নির্ধারণ করেছিলেন এবং সংস্কৃত সাহিত্য থেকে মূল্যবান দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করে 'ঋজুপাঠ' (১ম-১৮৫১, ২য়-১৮৫২, ৩য়-১৮৫৩) সঙ্কলন করেছিলেন । প্রত্যেক খণ্ডেই তিনি প্রসিদ্ধ সংস্কৃত কবি ও গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছিলেন। এর পর ১৮৫৫ সালে মাত্র দু-তিন মাসের ব্যবধানে তিনি 'বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ' (১৮৫৫, এপ্রিল) এবং দ্বিতীয় ভাগ (১৮৫৫, জুন) প্রকাশ করে প্রাথমিক স্তরের পুস্তিকা রচনার পথ দেখালেন। বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয়ের পূর্বেও ছাপার অক্ষরে এ ধরনের পুস্তিকা পাওয়া যেত। এর বহু আগে ১৮২১ সালে প্রকাশিত রাধাকান্ত দেবের 'বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থে' নানা বিষয়ের সঙ্গে বর্ণ ও বানান উল্লিখিত হয়েছিল।'[৫৮] ১৮৫৫ সালে কয়েক মাসের ব্যবধানে প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ প্রচারিত হয়।' বিদ্যাসাগর মফঃস্বলে স্কুল পরিদর্শনের সময় পথিমধ্যে পালকীতে বসে বর্ণপরিচয়ের পাণ্ডুলিপি তৈরি করেন।'[৫৯]

বিহারীলাল সরকারের মতে,'প্রথম প্রকাশে বর্ণপরিচয়ের আদর হয় নাই। ইহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয় নিরাশ হন; কিন্তু ক্রমে ইহার আদর বাড়িতে থাকে।'[৬০] বর্ণপরিচয় প্রথমভাগে বিদ্যাসাগর স্বর-ব্যঞ্জন হিসেবে বাংলা বর্ণমালাকে সাজাতে গিয়ে পূর্বপ্রচলিত ষোল স্বর ও চৌত্রিশ ব্যঞ্জনের মধ্যে দীর্ঘ ঋ-কার ও দীর্ঘ ঌ কার বাংলায় ব্যবহৃত হয় না বলে এ দুটি স্বরকে বাদ দিয়েছিলেন।'[৬১] অনুস্বার-বিসর্গকেও তিনি স্বরবর্ণমালা থেকে বহিষ্কৃত করে ব্যঞ্জনের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং চন্দ্রবিন্দুকে স্বতন্ত্র অক্ষরের (ঁ) মর্যাদা দেন। ক্ষ-কে (ক+ষ) তিনি ব্যঞ্জন বর্ণমালা থেকে বাদ দিয়েছেন, কারণ এটি হচ্ছে যুক্ত ব্যঞ্জন, অযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের প্রথমভাগে তার ঠাঁই হওয়া উচিত নয়। ড, ঢ, ও য ব্যঞ্জন তিনটি পদের মধ্যে বা অন্তে থাকলে যথাক্রমে ড়, ঢ় ও য় হয়, কিন্তু স্বতন্ত্র মর্যাদা ছিল না। কিন্তু বিদ্যাসাগর এদের উচ্চারণ-পার্থক্য ও গঠন-পার্থক্যের জন্য স্বতন্ত্র হরফের মর্যাদা দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগে দশটি পাঠ সংযোজিত হয়েছে। প্রথমে তিনি যুক্তব্যঞ্জনের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, তারপর একটি পাঠ সংযুক্ত করে তাতে যুক্তব্যঞ্জনের ব্যবহার করেছেন।

১৮৫৫ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে বিদ্যাসাগরের 'কথামালা' প্রকাশিত হয়। এই আখ্যানগ্রন্থ দীর্ঘদিন ধরে ছাত্রসমাজের পাঠ্যপুস্তক হিসেবে নির্ধারিত ছিল। য়ুরোপের ক্লাসিক আখ্যানগ্রন্থ ঈসপের গল্প (Esop's Fables) অবলম্বনে একখানি ছাত্রপাঠ্য আখ্যানগ্রন্থ লিখবার প্রয়োজন তিনি অনেকদিন থেকেই উপলব্ধি করছিলেন। শিক্ষাবিভাগের কর্ণধার গর্ডন ইয়ং-এর অনুরোধে বিদ্যাসাগর রেভাঃ টমাস জেমস কর্তৃক ইংরেজিতে অনূদিত ঈসপের অনেকগুলি গল্পের সরল বঙ্গানুবাদ করেন। প্রথম সংস্করণে মোট ৬৮টি গল্পের অনুবাদ গৃহীত হয়। কিন্তু সপ্তত্রিংশ সংস্করণে আরও কয়েকটি গল্প সংযোজিত হয়ে মোট সংখ্যা দাঁড়াল ৭৪টি। পরে তাঁর জীবিতকালে সর্বশেষ সংস্করণে গল্পের সংখ্যা হয় ৮৪টি। টমাস জেমস অনূদিত Esop's Fables (১৮৪৮)-এর একটি বর্ধিতায়তন ও মার্জিত সংস্করণ ১৮৭৪ সালে ইংলন্ড থেকে প্রকাশিত হয়। 'কথামালা' গ্রন্থটি বহু সংস্করণের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। ১৯২৮ সালের পুনর্মুদ্রিত যে সংস্করণটি পাওয়া যায় তাতে উপাখ্যানের সংখ্যা ছিল ২০৩ টি। 'বিদ্যাসাগর মোট ৮৪টি আখ্যান অনুবাদ করেছিলেন।'[৬২] ঈসপের গল্পগুলি সংক্ষেপে চমৎকার গদ্যে লেখা হয়েছে। অবশ্য 'জীবজন্তুগুলির ভাষা-ভঙ্গিমা, আচার-ব্যবহার–সবই মানুষের মতো। বোধ হয় জীবজন্তুর রূপকের মধ্য দিয়ে মানব- সমাজের কথাই প্রকারান্তরে বর্ণিত হয়েছে।'[৬৩]

সুকুমারমতি বালক–বালিকাদের শিক্ষা ও চরিত্রগঠনের জন্য বিদ্যাসাগর বহু চিন্তা করেছিলেন, নানা বিদেশি গ্রন্থ সন্ধান করে সেগুলোর সারবস্তু এ দেশের শিক্ষার্থীদের উপযোগী করে মাতৃভাষায় অনুবাদ করেছেন। 'জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর 'বর্ণপরিচয়-এর সঙ্গে শিশুর প্রথম পরিচয় হয়, তারপর সাধারণ জ্ঞানবর্ধনের জন্য, 'বোধোদয়' এবং তারপর 'কথামালা', 'চরিতাবলী', 'আখ্যানমঞ্জরী' প্রভৃতির মধ্য দিয়ে ক্রমে ক্রমে শিশু বালক হয়, বালক কিশোর হয়।[৬৪] তখন তাঁরা 'শকুন্তলা','সীতার বনবাস' প্রভৃতি পড়তে শুরু করে। ছাত্রদের ভাষাজ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার মনেরও প্রসার ঘটে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে 'পাঠ্যপুস্তক রচয়িতা' বলে বঙ্কিমচন্দ্র ব্যঙ্গ করলেও এই পাঠ্যপুস্তক রচনাও বিদ্যাসাগরের একটি বিশিষ্ট কীর্তি। বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের গুরুত্ব উপলব্ধি করে মাতৃভাষায় ছাত্রছাত্রীরা যাতে উপযুক্তভাবে শিক্ষিত হতে পারে তার জন্যে তাঁর উদ্যমের অভাব ছিলো না। এ জন্যই তিনি বর্ণপরিচয় থেকে উপক্রমণিকা পর্যন্ত সর্বস্তরের পাঠ্যপুস্তক রচনাতেই বিশেষ যত্নবান হয়েছিলেন। বাংলা ভাষায় শিক্ষা প্রচলনের ক্ষেত্রে তাঁর এসব প্রচেষ্টার মূলে ছিল সর্বসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলা। সাহিত্যসৃষ্টি অপেক্ষা সমাজ সংস্কার, নারীর আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি ও জনশিক্ষা তিনি প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়েছিলেন ।

১০

নারীশিক্ষা ও নারীর মর্যাদা

বিদ্যাসাগর শিক্ষা বিস্তারকে তাঁর জীবনের সর্বাপেক্ষা ভাল কাজ বলে মনে করতেন। এ মহৎ কাজের অংশ হিসেবে তিনি এদেশের সমাজে সবচেয়ে অবহেলিত নারীদের শিক্ষা দানের জন্য এগিয়ে এসেছিলেন। স্ত্রীলোকদের বিদ্যাশিক্ষা না দিয়ে তাদের বুদ্ধিহীন বলা যে যুক্তিসঙ্গত নয়, এ কথা বলে রামমোহন রায় স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন। এদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে প্রথম এগিয়ে আসেন ফিমেল 'জুভেনাইল সোসাইটি (১৮১৯), 'লেডিজ সোসাইটি'(১৮২৪), শ্রীরামপুর মিশন।[৬৫] ১৮০০ সালে উইলিয়াম কেরী, মার্শম্যান ও ওয়ার্ড কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামপুর মিশন স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের এগিয়ে আসেন। ১৮২১ সালের নভেম্বর মাসে 'মেরি অ্যান কুক' নামের এক মিশনারি মহিলার এদেশে আসার পর থেকে এদেমে স্ত্রীশিক্ষা শুরু হয়। কিন্তু স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে এসব মহিলা সংঘ ও মিশনারিদের প্রচেষ্টা সেকালে আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করতে পারেনি।

অন্যদিকে সেই সময় খ্রিস্টানদের সহায়তায় ইউরোপীয় মহিলাদের প্রচেষ্টায় এদেশে যে সব বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, সেগুলোও ধর্ম প্রচারের উগ্রতার কারণে লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেনি।

এ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে যোগেশচন্দ্র বাগল লিখেছেন:

> The endeavours on the part of the foreign agencies however failed to catch the imagination of the people. Along with three R's the missionaries and their famales as well as other European ladies made it a Point to inculcate Christian doctrines in the pliable mind of the young girls. We have already seen that such patrons of female education as Raja Radhakanta Deb and Raja Baidyanath Roy generally withdrew their cooperation as their extra-academic interition became more and more evident.[66]

তাঁদের এসব ব্যর্থচেষ্টার পর স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে এদেশের শিক্ষিত সচেতনরা এগিয়ে আসেন। অক্ষয়কুমার বিদ্যাদর্শন পত্রিকায় হিন্দুস্ত্রীদিগের বিদ্যাশিক্ষা, হিন্দুস্ত্রীদিগের দুঃখমোচনীয় সম্বাদ, বিদ্যাবুদ্ধির সৎপরামর্শ, বঙ্গদেশের বিদ্যাবুদ্ধি বিষয়ক প্রস্তাব, স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাভ্যাস প্রভৃতি প্রবন্ধের মাধ্যমে স্ত্রীশিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরেন। তাঁর সঙ্গে বিদ্যাসাগরও এ কর্মে আত্মনিয়োগ করেন। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে তাঁর কার্যক্রমের দুটি প্রধান স্তর লক্ষণীয়:

১. জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন সহকারী হিসাবে কলকাতায় স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের প্রচেষ্ঠা এবং
২. গ্রামাঞ্চলে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার মাধ্যমে সমগ্র দেশে ব্যাপক ভাবে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের অক্লান্ত প্রয়াস।

বিলাতের প্রখ্যাত আইন ব্যবসায়ী ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন ভারতবর্ষের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হয়ে ১৮৪৮ সালে এপ্রিল মাসে বড়লাটের শাসন পরিষদে ব্যবহার সচিবের পদ নিয়ে এ দেশে আসেন। তিনি নিজ ক্ষমতাবলে অল্পদিনের মধ্যেই শিক্ষা সংসদের (Council of Education) সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। তিনি এ দেশের মানুষ ও পরিবেশের সঙ্গে মিশে বুঝতে পেরেছিলেন যে, নারী জাতিকে শিক্ষিত করে তুলতে না পারলে এ দেশবাসী কখনো কুসংস্কারের নিগড় থেকে মুক্ত হতে পারবে না। তাই স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের উদ্দেশ্যে তিনি নব্যবঙ্গের রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপধ্যায় ও পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালংকারের সহায়তায় ১৮৪৯ সালে ৭ মে ২১ জন বালিকা নিয়ে Calcutta Female School বা কলিকাতা বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন।'[৬৭] এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রায় দেড় বছর পরে ১৮৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে বেথুন বিদ্যাসাগরকে উক্ত বালিকা বিদ্যালয়ের অবৈতনিক সম্পাদক নিযুক্ত করেন।

১৮৫২ সালে ১২ আগস্ট বেথুনের মৃত্যুর পর বড়লাট লর্ড ডালহৌসি বেথুন বিদ্যালয়টির ব্যয়ভার বহন করতে থাকেন। তাঁর ভারত-ত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত এই ব্যবস্থা কার্যকর ছিল। ১৮৫৪ সালে উডেন ডেসপ্যাচেই সর্বপ্রথম স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের প্রতি সরকারি সমর্থনের কথা জানা যায়। ১৮৫৬ সালের মার্চ মাসের পর থেকে এ বালিকা বিদ্যালয়টি সম্পূর্ণ সরকারি ব্যয়ে-ব্যবস্থাপনায় চলতে থাকে। ভারত সরকারের অন্যতম সেক্রেটারি স্যার সিসিল বিডনকে সভাপতি, নেতৃস্থানীয় কলিকাতাবাসীকে সদস্য এবং বিদ্যাসাগরকে অবৈতনিক সম্পাদক নিয়োগ করে ১৮৫৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এই বিদ্যালয়ের একটি পরিচালক সভা গঠিত হয়। বিদ্যাসাগর পরিচালক কমিটির সম্পাদক হিসেবে একই বছর ২৪ ডিসেম্বর এক বিজ্ঞাপ্তিতে কমিটির বিদ্যালয় পরিচালনার পরিকল্পনা ব্যক্ত করেন। সেই পরিকল্পনা অনুসারে এক বিজ্ঞপ্তিতে পাঠক্রম, বিনাবেতনে শিক্ষা ও বিনামূল্যে পুস্তক দেওয়ার কথা জানানো হয়েছিল। বিজ্ঞপ্তিটির মধ্যে যেমন বেথুন-পরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থার কথা ছিল, তেমনি ছিল স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের আধুনিক শিক্ষাচিন্তার পরিচয়। এখানে ১৮৫৭ সালের ১৩ জানুয়ারি সংখ্যায় প্রকাশিত সংবাদ প্রভাকর থেকে বিজ্ঞপ্তির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা যেতে পারে:

কলিকাতা ও তৎসান্নিধ্যবাসী হিন্দুবর্গের প্রতি বিজ্ঞাপন।

> বীটন প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয় সংক্রান্ত সমুদায় কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিবার নিমিত্ত গভর্নমেন্ট আমাদিগকে কমিটিতে নিযুক্ত করিয়াছেন। যে নিয়মে বিদ্যালয় কার্য্যসকল সম্পন্ন হয় এবং বালিকাদিগের বয়স ও অবস্থায় অনুরূপ শিক্ষা দিবার যে সকল উপায় নির্ধারিত আছে, হিন্দু সমাজের লোকদিগের অবগতি নিমিত্ত, আমরা সে সমুদায় নিম্নে নির্দেশ করিতেছি।
>
> উক্ত বিদ্যালয় এই কমিটির অধীন। বালিকা দিগকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত এক বিবি প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত আছেন। শিক্ষা কার্য্যে তাঁহার সহকারিতা করিবার নিমিত্ত আর দুই বিবি ও একজন পণ্ডিত নিযুক্ত আছেন।
>
> হিন্দু জাতীয় স্ত্রীলোকদিগের যথোপযুক্ত বিদ্যাশিক্ষা হইলে, হিন্দু সমাজেরও এতদ্দেশের কত উপকার হইবে, তদ্বিষয়ে অধিক উল্লেখ করা অনাবশ্যক। যাঁহাদের অন্তঃকরণ জ্ঞানালোক দ্বারা প্রদীপ্ত হইয়াছে, তাঁহারা অবশ্যই বুঝিতে পারেন ইহা কত প্রার্থনীয় যে যাঁহার সহিত যাবজ্জীবন সহবাস করিতে হয় সেই স্ত্রী সুশিক্ষিত ও জ্ঞানসম্পন্ন হন এবং শিশু-সন্তানদিগকে শিক্ষা দিতে পারেন, আর স্ত্রী ও কন্যাগণের মনোবৃত্তি প্রকৃতরূপে মার্জিত হইয়া অকিঞ্চিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ থাকে এবং যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠানে বুদ্ধি বৃত্তির উন্নতি ও পরিশুদ্ধি হইতে পারে তাহাতে প্রবৃত্ত হয়।
>
> অতএব আমারা এতদ্দেশীয় মহাশয়াদিগকে অনুরোধ করিতেছি, এ সকল গুরুতর উদ্দেশ্য সাধনের যে উপায় নিরূপিত রহিয়াছে, সেই উপায় অবলম্বন করিয়া তাহার ফলভাগী হউন।এই সকল উদ্দেশ্য সাধন হিন্দু ধর্মের অনুযায়ী ও হিন্দু সমাজের প্রকৃত মঙ্গল সাধন।[৬৮]

উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তি থেকেই স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে বিদ্যাসাগরের বাস্তববুদ্ধির পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠে। এই বিদ্যালয়ের মাধ্যমে তিনি স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে যুগোপযোগী কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। যেমন:

১. স্ত্রীশিক্ষাকে জনপ্রিয় করার জন্য তাঁর পরামর্শে পালকী গাড়ীর গায়ে 'মহানির্বাণতন্ত্রের' একটি শ্লোকাংশ-কন্যাপ্যেবং পালনীয় শিক্ষানিয়তি যত্নতঃ-লেখা হয়েছিল।

২. তাঁর প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তির শেষে উল্লিখিত হয়েছে-'এই সকল উদ্দেশ্য সাধন হিন্দুধর্মের অনুযায়ী ও হিন্দুসমাজের প্রকৃত মঙ্গল সাধন।

৩. ধর্মসংস্রবহীন শিক্ষার মাধ্যমে বাঙালি শিক্ষয়িত্রী গড়ে তোলা সম্পর্কে তাঁর মতামত। মানবতাবাদী বিদ্যাসাগর নারী-জাতির মঙ্গল সাধনের জন্য অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন বলেই তাঁর উদ্দেশ্যকে বাস্তবে পরিণত করার জন্য তিনি শাস্ত্রের দোহাই দিতেও পশ্চাৎপদ হননি। যদিও তিনি জানতেন শাস্ত্রের চেয়ে মানুষ অনেক বড়। দেশের রীতি ও সংস্কার কোথায় আঘাত দিতে হবে এবং কোথায় কাজে লাগাতে হবে-সে বাস্তব বুদ্ধি তাঁর ছিল।'[৬৯]

বিদ্যাসাগরের বাস্তব বুদ্ধিই শুধু ছিল না, তার সময়োপযোগী প্রয়োগও তিনি জানতেন। দেশীয় শিক্ষায়িত্রী গড়ে তোলার জন্য মিস্ কার্পেন্টার যখন কলিকাতা বালিকা বিদ্যালয় (বেথুন স্কুল) সংলগ্ন একটি নর্মাল স্কুল খোলার জন্য চেষ্টা শুরু করলেন। 'বিদ্যাসাগর তখন সেই উদ্যোগকে সমর্থন জানালেন না।'[৭০] তৎকালীন বাংলার ছোটলাট স্যার উইলিয়াম গ্রে-র এক চিঠির উত্তরে ১৮৬৭ সালে ১ অক্টোবরে তিনি লিখেছিলেন:

> I need hardly assure you that I fully appreciate the importance and desiableness of having female teachers for female learners; but if the social prejudice of my countrymen did not offer an insuperable and lend my hearty cooperation towards its furtherance. But when I see that success is by no means certain and that the Goverment it likely to place itself in a false and disagreeable position. I cannot persuade myself to support the experiment.[৭১]

দেশজুড়ে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের আগ্রহ বিদ্যাসাগরের এত বেশি ছিল যে, এ ব্যাপারে সরকারের শাসনতান্ত্রিক স্বীকৃতিকে তিনি কর্তৃপক্ষের জনকল্যাণমূলক প্রচেষ্টা বলে ভুল করেছিলেন। তাই ১৮৫৪ সালে 'এডুকেশন ডেসপ্যাচ'-এ স্ত্রীশিক্ষা সমর্থন ও ১৮৫৭ সালের গোড়ার দিকে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে ছোটলাট হ্যালিডের আগ্রহকে সম্বল করে তিনি গ্রামাঞ্চলে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এদেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের একটা

ভিত্তি ছিল। কারণ বর্ধমান জেলার জৌগ্রামে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করে বিদ্যাসাগর ১৮৫৭ সালে ৩০ মে তারিখে ডি.পি. আই-কে জানালে তিনি বিদ্যালয়টির জন্য মাসিক ৩২ টাকা মঞ্জুর করেন।

এই মহৎ কাজে শিক্ষাকর্তৃপক্ষের অনুকূল মনোভাবের পরিচয় পেয়ে তিনি আরো এগিয়ে গেলেন। ১৮৫৭ সালের ২৪ নভেম্বর থেকে ১৮৫৮ সালের ১৫ মে পর্যন্ত সময়সীমায় তিনি হুগলি জেলায় ২০টি, বর্ধমান জেলায়, ১১টি, মেদিনীপুর জেলায় ৩টি ও নদীয়া জেলায় ১টি, মোট ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন। এই বিদ্যালয়গুলোর মোট ছাত্রী সংখ্যা ছিল ১,৩০০ এবং এগুলো চালাতে মাসিক ৮৪,৫০০ টাকা ধার্য হয় । বালিকা বিদ্যালয়গুলো সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য বিদ্যাসাগর সরকারের কাছে আর্থিক সাহায্যের আবেদন করেছিলেন।

পূর্বে অনুমতি না নেওয়ায় এবং সিপাহী বিদ্রোহ জনিত অর্থাভাবের অজুহাতে সরকার বিদ্যালয়গুলোতে অর্থ মঞ্জুর করতে রাজি হননি। অনেক লেখালেখির পর শেষে সরকার ১৮৫৮ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত শিক্ষকদের ৩,৪৩,৯৯৫ টাকা পাওনা পরিশোধ করে বিদ্যাসাগরকে দায়মুক্ত করতে সম্মত হন। এর পর সরকারি সাহায্য থেকে বঞ্চিত হলেও তিনি স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়নি। 'তিনি 'নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভাণ্ডার' খুলে বে-সরকারি চাঁদায় সেই বিদ্যালয়গুলি পরিচালনা করেছেন।'[৭২] অমিয়কুমার সামন্ত লিখেছেন:

> অনেক শিক্ষানুরাগী এবং বিদ্যাসাগরের গুণমুগ্ধ কিছু সিভিলিয়ান এই তহবিলে নিয়মিত চাঁদা দিতেন। এই তহবিলের টাকা ছাড়াও সরকারী অনুদানের সীমিত দাক্ষিণ্যও মাঝে মাঝে মিলত। বিদ্যাসাগর প্রায়ই তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাবের সাহায্যে বালিকা বিদ্যালয়গুলির জন্য অনুদান আদায় করে দিয়েছেন। বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও গ্রামের ভদ্রলোকশ্রেণির উৎসাহের ফলে বালকদের মডেল স্কুলগুলির থেকে বেশ কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়েছিল। ১৮৬২ সালের ১লা মে স্যার বার্টল ফ্রিয়ারকে লেখা একটি চিঠিতে বিদ্যাসাগর জানাচ্ছেন, 'যে সকল বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য আপনি চাঁদা দিয়াছিলেন, সেগুলি ভালই চলিতেছে। নিকটবর্তী জেলাগুলির মানুষ স্ত্রীশিক্ষার সমাদর করা আরম্ভ করিয়াছে। মাঝে মাঝে নতুন বিদ্যালয়ও খোলা হইতেছে।'[৭৩]

বিদ্যাসাগরের উদ্যোগের ফলে নারী শিক্ষার বিকাশ, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ রোধ এবং বিধবা বিবাহ আইন (১৮২৯) প্রবর্তিত হয়। তাঁর অমরকীর্তি বিধবা বিবাহের প্রচলন কিন্তু এটি করতে গিয়ে তিনি স্ব-জাতির দ্বারা নিপিষ্ট হয়েছিলেন। তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে নির্মম যাতনা। এই তিক্ততার বহিঃপ্রকাশ তিনি অনেককে চিঠি লিখে ঘটিয়েছেন। তাঁর জীবনের শেষদিনগুলোতে এ বেদনা আরো ঘণীভূত হয়েছিল। সমাজের কাছে তিনি একঘরে হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে স্বপন বসু লিখেছেন:

> বিধবা বিবাহ উপলক্ষে বিদ্যাসাগর সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন। তিনি নিজেই নাকি একজায়গায় লিখে গেছেন, ৬০টি বিধবা বিবাহের জন্য তাঁর ৮২ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছিল। জীবনসায়াহ্নে এ ব্যাপারে হতাশাগ্রস্ত হয়ে তিনি ডা. দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্ষেপ করে লেখেন, আমার দেশের লোক এত অসার ও অপদার্থ বলিয়া পূর্বে জানিলে আমি কখনই বিধবাবিবাহ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতাম না। অনেকে অর্থলোভে তাঁকে প্রবঞ্চনা করে বিধবাবিবাহের সুযোগ নিয়ে বহুবিবাহ করত। এই বজ্জাতি বন্ধ করার জন্য তিনি শেষপর্যন্ত বিধবাবিবাহকারী পাত্রকে দিয়ে একটি অঙ্গীকারপত্র লিখিয়ে নিতেন। মানবপ্রেমিক বিদ্যাসাগর কি মর্মান্তিক আঘাত পেয়ে তা করতে বাধ্য হয়েছিলেন সহজেই অনুমেয়। জীবনসায়াহ্নে তিনি বুঝেছিলেন, বহুবিবাহ রহিত না হলে এবং লোকের মনে সামাজিক দায়িত্ববোধ না জাগলে শুধু আইনের জোরে বিধবাবিবাহ প্রচলিত হলেও, তা সার্থক হবে না। তা যে হয়নি, বাঙালি সমাজ জীবনই তার সাক্ষ্যবহ।[৭৪]

বিদ্যাসাগরের সংস্কার আন্দোলন যে শুধু শাসক ইংরেজকে আঘাত করেছেন তাই নয় রক্ষণশীল মৌলবাদী সনাতন জীবনব্যবস্থাকেও তিনি প্রত্যাখ্যান করেছে। বৈধব্যকে তিনি মধ্যযুগীয় বর্বরতার সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। তিনি স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে ধর্মান্ধ সমাজনিয়ন্তাদের বিরুদ্ধে তিনি রুখে দাঁড়িয়েছেন। সেই সঙ্গে সমাজে নারীর বিশেষ মূল্য ও মর্যাদা নিশ্চিত করতে জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

১১

জনশিক্ষা

বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের পুনর্গঠনের সময় থেকেই এদেশে জনশিক্ষা বিস্তারের কথা ভেবেছিলেন। সেই কলেজের সংস্কার প্রস্তাবের মধ্যে তার আবাস পাওয়া যায়। পরবর্তীতে উডের 'শিক্ষা সনদ' তাঁর এই শিক্ষাচিন্তাকে বাস্তাবে রূপদানের পথে একটা অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। তিনি ভাবলেন, উডের শিক্ষা সনদকে যদি শাসক-গোষ্ঠীর 'কাগুজে কল্যাণ নীতি'তে পর্যবসিত হতে না দিয়ে বাস্তবে রূপায়িত করা যায়, তাহলে শিক্ষার ক্ষেত্রে এ দেশের জনসাধারণের অসামান্য কল্যাণ সাধন হবে। সংস্কৃত কলেজের সংস্কার কার্যকরী হওয়ার পরই তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষকের পদাধিকার বলে মাতৃভাষার স্কুলগুলির পরিদর্শক নিয়োগের প্রস্তাব করেন। পরে তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের চাকুরি ছেড়ে দিয়ে সর্বক্ষণের জন্য স্কুল পরিদর্শকের চাকুরি নিতেও আগ্রহী হয়েছিলেন।

জনশিক্ষা বিষয়ে বিদ্যাসাগরের পরিকল্পনা, প্রয়োগ এবং ফলাফল মূলত: Notes on Vernacular Education ও হ্যালিডের পরিকল্পনা, ১৮৫৫ সালের ৮ই অক্টোবর, তৎকালীন উড ও গর্ডন ইয়ংকে পাঠানো রিপোর্টের অংশ বিশেষ, ১৮৫৬-৫৭ সালে কাউন্সিলকে পাঠানো বিদ্যাসাগরের রিপোর্টের অংশবিশেষ এবং ১৮৫৯ সালের ২৯শে ডিসেম্বর বাংলা সরকারের এক জুনিয়র সেক্রেটারীকে লেখা একটি চিঠি, এই চারটি উৎস থেকে পাওয়া যায়। শিক্ষানুরাগী স্যার ফ্রেডরিক হ্যালিডে ১৮৫৪ সালে বাংলাদেশের প্রথম ছোটলাট নিযুক্ত হন। তিনি লেফটেন্যান্ট গভর্নর বা ছোটলাট হওয়ার দু'মাস আগে Council of Education এর সদস্য হিসেবে বিদ্যাসাগর বাংলায় শিক্ষাদান বিষয়ে মতামত প্রকাশ করেন। পরে হ্যালিডের অনুরোধে তিনি বাংলায় শিক্ষাদান সম্পর্কে ১৮৫৪ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯ অনুচ্ছেদের Notes on Vernacular Education রচনা করেন।[৭৫]

বিদ্যাসাগর শিক্ষা পরিষদের সদস্য ফ্রেডরিক হ্যালিডের কাছে শিক্ষাদান প্রসঙ্গে যে পরিকল্পনা পেশ করেন,তাতে বাংলা ভাষায় শিক্ষার বিস্তার এবং শিক্ষার সুব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজনীয় বলে উল্লেখ করা হয়। তিনি জানান যে তা না হলে দেশের জনসাধারণের কল্যাণ হবে না । আর বাংলা শিক্ষাকে কেবল তাঁদের লিখন পঠন, গণনা ও সরল অঙ্ক কষার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। বাংলা ভাষাতেই তাঁদের সম্পূর্ণ শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। সেই পরিকলাপনায় ভূগোল, ইতিহাস, জীবন-চরিত, পাটিগণিত, জ্যামিতি, পদার্থবিদ্যা, নীতিবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও শরীরবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা প্রদানের মতামত অন্তর্ভূক্ত ছিল। বিদ্যাসাগরের নোটে যে শিক্ষার পাঠ্যসূচী দেওয়া হয়েছে, তা প্রকৃতপক্ষে একটি সম্পূর্ণ প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যসূচি। সেখানে স্কুলগুলির প্রয়োজনীয় সংখ্যক এবং উপযুক্ত শিক্ষক, শিক্ষকদের উপযুক্ত সম্মানি, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, ছাত্রদের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ, শিক্ষার পরিবেশ প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়। বিদ্যাসাগর লিখেছেন:

> Vernacular Education on an extensive scale, and on an efficient footing is highly desirable, for it is by this means alone that the condition of the mass of the people can be ameliorated.…..Mere reading and writing, and a little of Arithmetic, should not comprise the whole of this Education; Geography, History, Biography, Arithmetic, Geometry, Natural Philosophy, Moral Philosophy, Political Economy, and Physiology should he taught to render it complete. … One Teacher for each school will not be sufficient. Two each at least will be required. Every school will very likely contain from three to five classes, which for one teacher to manage efficiently is impracticable. ….Arrangement should be made for the teachers receiving their salaries regularly every month, in their own Stations, without being required to quit their posts. …The preparation and adoption of class-books, and the selection of teachers to be entrusted to the Head Superintendent. ….. Thus the training of teachers, preparation and adoption of class-books selection of

> teachers and general superintendence will be united in one office. This circumstance will remove many inconveniences.[৭৬]

তাঁর এসব প্রস্তাব হ্যালিডে কর্তৃক অনুমোদিত হলে মাতৃভাষায় জনশিক্ষা বিস্তারের পথ প্রশস্ত হয়। বিদ্যাসাগর তাঁর কাছে বাংলা শিক্ষা ও দেশীয় বিদ্যালয় সমূহের উন্নতির জন্য গঠনমূলক অভিমত ব্যক্ত করে পূর্ণ সমর্থন লাভ করেন। উডের শিক্ষা সনদের বাস্তবায়নে বাংলা শিক্ষা উপেক্ষিত হওয়ায় হ্যালিডে সাহেব ক্ষুণ্ন হয়েছিলেন। তাই তিনি এ ব্যাপারে 'সিলেক্ট কমিটি'র কাছে একটি বিবৃতি পেশ করেন। সেই সঙ্গে বাংলা শিক্ষা প্রসারে বিদ্যাসাগরের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে তিনি ১৮৫৪ সালেই ১৬ নভেম্বর বড়লাটকে এক কার্যবিবরণিতে (Minute) জানান:

> I append a memorandum on the subject, drawn up by the energetic and able Principal of the Sanskrit College who, as is well-known, has long been zealous in the cause of vernacular education, and has done much to promote it, both by his improved system in the Sanskrit College and by elementary works which he has published for the use of schools.I approve generally of the plan which is contained in the principal's memorandum, and would wish to see it carried into effect.[৭৭]

সরকারি প্রচেষ্টায় সমগ্রদেশে মাতৃভাষার মাধ্যমে, বিদ্যালয়ে শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলন ও আদর্শ বঙ্গ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত হলে ছোটলাট ফ্রেডরিক হ্যালিডে বিদ্যাসাগরকে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্বের অতিরিক্ত এসব বিদ্যালয়-পরিদর্শকের কাজে নিয়োগ করার জন্য নবনিযুক্ত শিক্ষা অধিকর্তাকে অনুরোধ করেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল স্থায়ী বিদ্যালয় পরিদর্শক প্রাট্‌কে না পাওয়া পর্যন্ত বিদ্যাসাগরকে ঐ পদে অস্থায়ী রূপে গ্রহণ করা। এ নিয়ে হ্যালিডের সঙ্গে তাঁর কয়েকটি পত্র বিনিময় হয়। কিন্তু হ্যালিডের ইচ্ছাই শেষ পর্যন্ত জয়যুক্ত হলো। বিদ্যালয় পরিদর্শক পদে বিদ্যাসাগরের সেই নিয়োগ যে দেশবাসীর কতটা অভিপ্রেত ছিল তার প্রমাণ ১৮৫৪ সালের ৬ সেপ্টেম্বরের সংবাদ প্রভাকরের একটি উদ্ধৃতি থেকে জানা যায়। 'সংবাদ প্রভাকর' লিখেছেন:

> বঙ্গ ভাষানুশীলন বিষয়ে যে যে নিয়ম হইয়াছ আমরা তত্তাবৎ পাঠ করিয়া অশেষানন্দ সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি। সেই নিয়মানুসারে বঙ্গভাষায় শিক্ষা প্রদত্ত হইলে অল্পকালের মধ্যেই এই বঙ্গদেশে বঙ্গভাষার বিলক্ষণ প্রভাব উদ্দীপন হইবেক, পণ্ডিতবর পরম বিদ্যানুরাগী শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্গভাষায় শিক্ষা-প্রদানের তত্ত্বাবধায়কের পদে অভিষিক্ত হইবেন। অতএব তিনি জাতীয় ভাষানুশীলনের প্রাচুর্য নিমিত্ত বিশিষ্টরূপে উদ্যোগী ও মনোযোগী হইবেন তাহার সন্দেহ নাই।[৭৮]

১৮৫৫ সালের ১ মে থেকে বিদ্যাসাগর অধ্যক্ষের কাজের অতিরিক্ত দক্ষিণবঙ্গের চারটি জেলা– নদীয়া, হুগলি, বর্ধমান ও মেদিনীপুরে বাংলা শিক্ষাব্যবস্থার জন্য সহকারী ইন্‌সপেক্টর নিয়োগ লাভ করলেন। 'তিনি মাতৃভাষার উন্নয়ন ও প্রসারের মহান ব্রত গ্রহণ করেই তা পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়িত করার জন্য উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে লাগলেন।'[৭৯] বিদ্যাসাগর কয়েকটি কর্মসূচির মধ্য দিয়ে এ দেশে বাংলা ভাষায় জনশিক্ষা বিস্তারের পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে প্রয়াসী হন। তাঁর প্রধান কর্মসূচির মধ্যে ছিল:

এক. উদ্দিষ্ট কর্মসম্পাদনের জন্য উপযুক্ত জনবল নিয়োগ–

এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে বিদ্যাসাগর কাজের সুবিধার্থে উল্লিখিত চারটি জেলায় চার জন সুশিক্ষিত ও পরিশ্রমী ছাত্রকে সাব ইন্‌সপেক্টর নির্বাচিত করেছিলেন । তাদেরকে গ্রামাঞ্চলে পাঠিয়ে বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন।

দুই. আদর্শ বঙ্গ-বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য স্থান নির্বাচন–

বিদ্যাসাগর আদর্শ বঙ্গ বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য অধ্যক্ষের কাজের ফাঁকে ফাঁকে গ্রামান্তরে ঘুরে ঘুরে তাঁর সহকারীদের সহায়তায় উপযুক্ত স্থান নির্ধারণ করেছিলেন। ১৮৫৫ সালের ২২ আগস্ট থেকে ১৮৫৬ সালের ১৪ জানুয়ারি পর্যন্ত তিনি প্রত্যেক জেলার পাঁচটি করে মোট ২০টি আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। ইংরেজি শিক্ষার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বাংলা বা যে কোনো ভারতীয় ভাষাই পিছু হঠাতে যে বাধ্য হবে, এই সত্যটি বিদ্যাসাগর তাঁর প্রখর বাস্তববোধের দ্বারা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই বাংলাস্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য এমন জনপদ বেছে নিয়েছিলেন, যেখানে ইংরেজির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের সম্ভাবনা ছিল না। তাঁর সুপারিশ ছিল:

'These [schools] should be established in towns and villages, not in the vicinity of English colleges and schools. In the neighbourhood of English colleges and schools, the vernacular education is not properly appreciated.[৮০] প্রকৃতপক্ষে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণিই মাতৃভাষায় শিক্ষায় আগ্রহ দেখাবে। সেই ধরনের জনপদই মাতৃভাষায় শিক্ষার পক্ষে আদর্শ স্থল।

তিন. বিদ্যালয়ে পাঠদানের জন্য উপযুক্ত শিক্ষক নির্বাচন–

হার্ডিঞ্জ স্কুলগুলির শিক্ষক নির্বাচনে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন মার্শাল। বিদ্যাসাগর স্কুলগুলির জন্য শিক্ষক নির্বাচন করতে গিয়েই সম্ভবত উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব সম্পর্কে সচেতন হন। তিনি শুরু থেকেই এ বিষয়টি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, বাংলা শিক্ষাব্যবস্থায় পরিপূর্ণ সফলতার জন্য উপযুক্ত শিক্ষক প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যেই তিনি ১৮৫৫ সালের মে মাসে শিক্ষক নির্বাচনের জন্য সংস্কৃত কলেজে একটি পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন। সেখানে দুশোর বেশি প্রার্থীর মধ্যে অধিকাংশই সেই পরীক্ষায় তাঁদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারেনি। ফলে শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য একটি নর্মাল স্কুলের প্রয়োজনীয়তা তিনি বিশেষভাবে অনুভব করলেন। ১৮৫৫ সালের ১৭ জুলাই তাঁর তত্ত্বাবধানে কলকাতায় একটি নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। এ স্কুল সকালে দু-ঘন্টার জন্য সংস্কৃত কলেজেই বসত। এ স্কুলে বিদ্যালয়ের জন্য উপযুক্ত শিক্ষক তৈরির শিক্ষাকার্যক্রম চলত। হিন্দু কলেজ সংলগ্ন বাংলা পাঠশালাটিকে সংস্কৃত কলেজের কর্তৃত্বাধীনে এনে প্রশিক্ষণরত শিক্ষকদের বিদ্যালয় পরিচালনা শিক্ষার জন্য তিনি সেটিকে আদর্শ বিদ্যালয় পরিণত করেন। মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার জন্য শিক্ষকের অভাব দূর করার জন্য বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজকেই মাতৃভাষায় উপযুক্ত শিক্ষক তৈরির জন্য প্রস্তুত করলেন। এই প্রস্তুতির লক্ষ্য ছিল মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ করে দেশে মাতৃভাষায় জনশিক্ষাবিস্তার।

চার. পাঠ্যপুস্তক রচনা ব্যবস্থাপনা–

আদর্শ বঙ্গ-বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকাভূক্ত বিষয়গুলি হচ্ছে বাংলা সাহিত্য, ব্যাকরণ, ভূগোল, ইতিহাস, গণিত, রসায়ন, পর্দাথবিদ্যা, স্বাস্থ্যতত্ত্ব এবং ইংলন্ড ও গ্রীস-রোমের ইতিহাস। বিদ্যাসাগর লক্ষ করলেন যে, মাতৃভাষায় শিশু ও কিশোরদের উপযোগী উল্লিখিত বিষয়সমূহের উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক নেই। তখন পর্যন্ত কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি বাংলা, ইংরেজি ও হিন্দি ভাষায় যত পাঠ্য -পুস্তক প্রকাশ করেছে সেগুলিও বিশেষ মানের নয়। তাই তিনি যথোপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক রচনার প্রয়োজন অনুভব করেন । এ কাজে তিনি সঙ্গে পান সেকালের চিন্তানায়ক অক্ষয়কুমার দত্তকে।

আদর্শ বঙ্গ-বিদ্যালয় স্থাপন করে মাতৃভাষার মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে বিদ্যাসাগরের স্বপ্ন যে অনেকটা বাস্তবায়িত হয়েছিল তা তিন বছর পরে লিখিত তাঁর একটি রিপোর্ট থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি লিখেছেন:

It is now about three years since our operations commenced and the Model Vernacular Schools have been established. During this Short period. The progress of this institution has really been satisfactory. The puplis have gone throgh all the vernacular books suited to such institutions and may be said to have acquird a thorough knowledge of the language and to have made respoectable progress in several branches of useful studies. At the Commencement of our operations, doubts were entertained several quarters as to whether the Model School could as duly appreciated by the people in the interior. There doubts, Iam happy to state, have long since been fully removed by the almost complete success of those institutions. The people of the villages in which they are located, as well as those of contiguous places who are also benefited by them, look upon for them, That the institutions are highly prized is evident from the number of pupils attending each of them.'[৮১]

বিদ্যাসাগর স্বভাবতই ছিলেন স্বাধীনচেতা। তিনি অব্যাহতভাবে আপন ইচ্ছায় কাজ করতেন। কর্তৃপক্ষের প্রভাবে তিনি কখনো নিজের কর্মপ্রবাহ পরিবর্তন করতেন না। 'শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে সরকারি শিক্ষা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অনেক সময় তাঁর মতের মিল হত না। 'এই মতান্তরের কারণ অবশ্যই শাসকের নীতির সঙ্গে মানব প্রেমিকের নীতির পার্থক্যের মধ্যেই নিহিত।'[৮২] ইংরেজ শাসকবর্গের চরিত্র সম্পর্কে তাঁর স্পষ্ট ধারনা ছিল।

শিক্ষা সম্পর্কীয় দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তিনি সর্বদা সরকারের কাছ থেকে পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব দাবি করেছেন। তাই আট বছর দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে ১৮৫৮ সালের ৫ আগস্টে তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ থেকে সরে দাঁড়ান। সেই পদত্যাগ পত্রে স্বাস্থ্যভঙ্গ'-কে কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হলেও পরের মাসে ১৫ সেপ্টেম্বর ছোটলাট হ্যালিডেকে লিখিত একটি পত্র থেকে এর প্রকৃত কারণ জানা যায়। তিনি লিখেছেন:

> It is true that ill-health is one of the principle causes which have induced me to resigh. But I can conscientiously say that that is the sole cause. If is so. I could have applied for long leave and renovated my health. I had often represented to you, that I frequently felt it disagreeable and inconvenient to serve Government under existing circumstance and that I considered that the present system upon which the department of Vernacular Education was conducted, was a mere waste of money. You are aware that I often met with discouragement in my way. I saw besides no prospects of advancement and more than once I felt my just passed over. Thus I hope you will be pleased to admit that I had reasonable grounds of complaint.[৮৩]

এই চিঠি থেকে বিদ্যাসাগরের পদত্যাগের যে সব কারণ পাওয়া যায়, যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতা থাকা সত্ত্বেও দেশি কর্মচারী হওয়ায় পদোন্নতি না পাওয়া এবং শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতবিরোধ। বিদ্যাসাগরের শিক্ষাদর্শ ছিল ব্যক্তিগত লাভক্ষতির উর্ধ্বে। বিদ্যাসাগর মানবকল্যাণের জন্য জ্ঞানাগ্নি সংগ্রহ করেছিলেন। সমালোচক লিখেছেন:

> জ্ঞান, বিদ্যা, শিক্ষা ছেড়ে দিলেও হৃদয়ের দিক থেকে তিনি দুঃখহত মানুষকে নিজের আতপ্ত আশ্লেষে আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন। কার্মাটাড়ের অশিক্ষিত সাঁওতালদের তিনি শিক্ষিত মানুষের চেয়ে অনেক বেশী ভালোবাসতেন, কারণ তাদের শিক্ষা না থাকলেও মনুষ্যত্ব ছিল।[৮৪]

বিদ্যাসাগর দেখেছেন যে ইংরেজি শিক্ষা আমাদের ঐশ্বর্য দান করলেও চরিত্র ও মনুষ্যত্ব অপহরণ করেছেন। সাঁওতালদের কাছে তাঁদের সেই ইংরেজি সংস্কৃতি তখনো পৌঁছেনি। আর তাঁরা সহসা যে ইংরেজি সংস্কৃতি গ্রহণ করবেন তাও নয়। তাই তিনি তাঁদেও মধ্যে মাতৃভাষায় শিক্ষার কথা ভেবেছিলেন।

উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই বাংলাদেশের শিক্ষানীতিতে উচ্চশিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষার মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছিল। ইংরেজরা একদিকে উচ্চশিক্ষা তথা জ্ঞানবিজ্ঞানের যথার্থ চর্চাকে যেমন ভয় করত, সেটা চাইত না, অন্যদিকে তেমনি তারা নিজেদের দেশে কাঁচামাল রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর ক্ষেত্রে কৃষকদের মধ্যে কিছুটা প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের প্রয়োজনীয়তাও বোধ করত। এই চাহিদা পুরনের জন্য তারা জমিদারের ওপর রেট বা শিক্ষা-ট্যাক্স বসানোর পরিকল্পনা করেছিল। তাদের সেই পরিকল্পনা জমিদারদের প্রবল বিরোধিতায় শেষ পর্যন্ত কার্যকর হয়নি। ভূস্বামীশ্রেণির কোনো কোনো মুখপাত্র অবশ্য কৃষির উন্নতিকল্পে কৃষি পদ্ধতির পরিবর্তন এবং তার জন্য কৃষকদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটানো যে প্রয়োজন তা অস্বীকার করতেন না। কিন্তু সে সমস্যা সমাধানের জন্যে তাঁরা কি ধরনের পথনির্দেশ করতেন সেটা উনিশ শতকের শেষ পাদে 'সংবাদ প্রভাকর'-এর নিম্নোক্ত সম্পাদকীয় বক্তব্য থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়।'সংবাদ প্রভাকর' লিখেছেন:

> কৃষিকার্যের প্রতি আমরা নিজেরা যেমন দৃষ্টিশূন্য গর্ভনমেন্টও সেইমত দৃষ্টিশূন্য। কৃষিকার্যের ভার বহুদিন হইতে মুর্খ, অজ্ঞ এবং দীন চাষাদিগের হস্তে রহিয়াছে। সুতরাং ইহার ক্রমিক কোনও উন্নতিই হইতেছে না। চাষারা জ্ঞানাভাবে শিক্ষাভাবে এবং অর্থাভাবে কৃষিকার্যের কোনও উন্নতিই করিতে পারিতেছে না। তাহারা সেই মান্ধাতার আমলের অস্ত্রত লইয়া সেই একভাবে কৃষিকার্য করিয়া আসিতেছে। কিন্তু কৃতবিদ্য সমাজ যতদিন না এই কৃষিকার্যে হস্তক্ষেপ করিবেন ততদিন বিভাগের এইরূপ অবস্থাই থাকিবে। বর্তমান কৃষকদিগের দ্বারা কৃষিকার্যের উন্নতি কোনক্রমে সম্ভব না। আমাদিগের মতে কৃষিকার্যে বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপ্রাপ্ত ভদ্র সন্তানেরা যখন বর্তমানের কৃষককুলকে নিজ নিজ অধীনে নিযুক্ত করিয়া বাহুল্যরূপে কৃষিকার্য আরম্ভ করিবেন, তখন একদফা দেশের অনেক কৃতবিদ্যের অর্থোপার্জনের উপায় হইবে, এবং দেশের ধনবৃদ্ধিসহ বর্তমান কৃষকদিগের দুরবস্থা দূর এবং কৃষি বিভাগের ক্রমোন্নতি হইতে থাকিবে।[৮৫]

১৮৭০ সালের জুন মাসে কলকাতায় (টাউন হলে) শিক্ষাসংক্রান্ত এক সভা হয়। সেই সভায় রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কিশোরীচাঁদ মিত্র, জয়কৃষ্ণ মুখার্জী, মহেন্দ্রলাল সরকার প্রমুখ বিশিষ্ট বাঙালি এদেশে 'ইংরেজি শিক্ষাকে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়ার দাবি জানান।'[৮৬] তাঁদের দাবী অনুসারে ইংরেজি শিক্ষার যে যথেষ্ট প্রসার হয়েছিল তা নয়। শাসক এদেশে ইংরেজি শিক্ষা চালু করেছিল বাঙালিকে চাকুরি লোভ দেখিয়ে। সেই চাহিদা অনুপাতে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আগ্রহ কমে এসেছিল। কারণ ভারতের ঔপনিবেশিক অর্থনীতি শিল্পায়ন, দেশিয় ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি নানা দিক থেকে পিছিয়ে পড়েছিল। তাই ইংরেজি শিখলেও কর্মসংস্থান সম্ভব ছিল না। এসব কারণে ইংরেজি শিক্ষা তখন গুটিকতক উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। অন্যদিকে গ্রামের মানুষ প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত হলে গ্রামে চাষের কাজ, ছোট কুটীরশিল্প ও বৃত্তিজীবীরা কাজ বন্ধ করে দিয়ে চাকুরির প্রত্যাশা করলে সরকারের পক্ষে যেমন বিপদ হবে, তেমনি গ্রামের কৃষি উৎপাদনেও তার প্রভাব পড়বে, এই আশঙ্কায় সরকার প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারেও আগ্রহ হারান। এছাড়াও একটি বড় কারণ ছিল জনগনের মধ্যে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ। সেকালে আর্থিকভাবে সচ্ছলরা ইংরেজি শিক্ষায় আগ্রহ দেখাতেন। আর যারা শ্রমজীবী নিম্ন শ্রেণি তারা শিক্ষা গ্রহণ করে স্কুলে গিয়ে সময় ব্যয় করে আরও আর্থিক সমস্যায় পড়তে চাইতেন না।

বিদ্যাসাগর যখন দক্ষিণবঙ্গের ৪টি জেলার মডেল স্কুলগুলির স্পেশাল ইন্সপেক্টর, তখন দক্ষিণবঙ্গের ৫টি জেলার সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত Anglo-Vernaunlar এবং Vernacular school গুলির পরিদর্শক ছিলেন হজসন প্রার্ট (Hodgson Pratt) নামে এক ব্যক্তি, সেখানকার ৮৭টি সাহায্যপ্রাপ্ত বাংলা স্কুল এবং ৩৬টি সাহায্যপ্রাপ্ত Anglo-Vernacular স্কুলের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৫৬ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর ডি. পি. আই.-কে পাঠানো একটি রিপোর্টে '[৮৭] মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রসারের বর্তমান অবস্থাটি বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। Grants-in-aid- এর দাক্ষিণ্য যে শিক্ষায় স্থানীয় উদ্যোগকে বিশেষ উৎপাদিত করতে পারেনি তার প্রমাণ আছে প্রাটের সেই রিপোর্টে। তিনি এবং তাঁর অফিসাররা ৬০ লক্ষ লোক অধ্যুষিত ৫টি জেলার প্রায় সবকটি শহর ও বড় গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ করে আপন আপন এলাকায় স্কুলস্থাপনের জন্য উৎসাহিত করেছিলেন। তাঁদের আহবানে খুব অল্পই এগিয়ে এসেছিল। সেসব অঞ্চল থেকে ৯৩০ টি গ্রাম ও শহরের মধ্যে মাত্র ২৪টির সাড়া পাওয়া গিয়েছিল। বাকী ৯০৬টি জায়গা থেকে Grants-in-aid নেওয়ার মতো আর্থিক সঙ্গতি কিংবা শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ কোনোটাই পাওয়া যায়নি। শিক্ষার প্রতি এই প্রায়-সার্বিক অনীহার কারণ অনুসন্ধান করে হজসন প্রাট লিখেছেন:

> The immense majority of the population regard them (measures to improve education) with supreme indifference, because the majority viz. teh ryots are too poor to pay the gooroomahasaya his quarter of a seer of rice per month or to deprive themselves of the labour of their children in tending cattle etc., in tillage or rope making, while in their present condition they are quite unable to see any possible benefit from teaching them to read and write. [৮৮]

তখন রায়ত বা দিনমজুর, দরিদ্র চাষিদের উপরের স্তরে ছিল ছোট দোকানদার ও ব্যবসায়ী। তাদের সামান্য অক্ষরজ্ঞান এবং যোগ-বিয়োগের অঙ্ক জানলেই চলত, তার বেশি শিক্ষার প্রয়োজন ছিল না। উপরের স্তরের ছোট-বড় জমিদার, মহাজন, শহরের উকিল, ডাক্তার প্রভৃতির লক্ষ্য ছিল ইংরেজি শেখার। কারণ ইংরেজি শিখলে জীবনের উন্নতি করা সহজ হবে। হজসনের ভাষায়– in obtaining, what is the high pinacle of Bengali ambition, employment under the Government.[৮৯] তাঁর এই আর্থ-সামাজিক শ্রেণি বিভাজন বাস্তব ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র কৃষিজীবী শ্রেণি মূলত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে সৃষ্টি। এঁদের নিকট অবৈতনিক শিক্ষাও আকর্ষণীয় ছিল না। কারণ শিক্ষার জন্য একটি দিন নষ্ট হলে পরিবারের একদিনের মজুরি নষ্ট হয়।

১৮৫৬-৫৭ সালের বার্ষিক রিপোর্ট বিদ্যাসাগরও ছাত্রদের'শ্রেণীবিভাজন করে লিখেছেন'[৯০] যে মডেল স্কুলে নিম্নতম শ্রমজীবী শ্রেণি থেকে আগত ছাত্রসংখ্যা ছিল কম। তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, শিক্ষা সম্পূর্ণ অবৈতনিক না করলে, তাদের আকর্ষণ করা যাবে না। ১৮৫৯ সালে সরকারকে লেখা একটি চিঠিতেও'[৯১] তিনি এই বিষয়টি সরকারকে জানান। তিনি লিখেন যে শ্রমজীবী শ্রেণির পক্ষে শিক্ষার খরচ তা সে যত কমই হোক না কেন, বহন করা অসম্ভব। এদের বালকরা কিছু কাজ করার উপযুক্ত হলেই, এমনকি বিনা বেতনে শিক্ষার জন্যও

স্কুলে আসবে না। তাছাড়া তাদের কী লাভ হবে সামান্য পড়া, লেখা এবং দু-একটা অঙ্ক শিখে? এতে তো তাদের অবস্থার পরিবর্তন হবে না। তবুও সরকার যদি তাদের প্রস্তাবিত শিক্ষাই দিতে চান, যা সাক্ষরতার নামান্তর, তবে তার সমস্ত ব্যয়ভার সরকারকেই বহন করতে হবে। তখন সেই ব্যয়ভার বহন করতে সরকার রাজি হয়নি। সরকারের সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক পার্থক্য ছিল। তাঁর লক্ষ্য ছিল অবৈতনিক এবং মাতৃভাষায় সুসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা, যা অন্তত কিছু নিম্নবর্গের চাকুরিতে নিয়োগের যোগ্য করে জীবনযাত্রার মানে অল্প হলেও একটা মৌলিক পরিবর্তন আনবে। অন্যদিকে সরকার চেয়েছিল সামান্য ব্যয়ে সবেতন শিক্ষা, যার মান হবে সাক্ষরতার থেকে সামান্য বেশি। তিনি আত্মস্বার্থসিদ্ধির জন্য শাসনবর্গের কাছে কখনো মাথা নত করেননি। ফলে তাঁর জনশিক্ষা কার্যক্রম আশানুরূপ লক্ষ্য অর্জন করতে পারেনি। এখানে বিদ্যাসাগর আর্থ-সামাজিক অবস্থাটি অসাধারণ দূরদৃষ্টি এবং কর্মোদ্যম কয়েকটি গুরুত্বপূর্ন বাধা ও অসংগতিকে চিহ্নিত করে ভবিষ্যতে জনশিক্ষা প্রসারের পথটি প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগরের জনশিক্ষা বিস্তারের এই ধারা প্রবাহ পরবর্তীতে গ্রামবার্তা সম্পাদক কাঙাল হরিনাথ, বঙ্গদর্শন সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখের প্রচেষ্টায় আরও বেগবান হয়ে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারায় গিয়ে মিশেছে। বিদ্যাসাগর আমাদের কর্মপ্রেরণার উৎস হয়ে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

> ক্ষুধিত-পীড়িত অনাথ-অসহায়দের জন্য আজ তিনি বর্তমান নাই, কিন্তু তাঁহার মহৎ চরিত্রের যে অক্ষয় বট তিনি বঙ্গভূমিতে রোপণ করিয়া গিয়াছেন তাহার তলদেশ সমস্ত বাঙালি জাতির তীর্থস্থান হইয়াছে। আমরা সেইখানে আসিয়া আমাদের তুচ্ছতা, ক্ষুদ্রতা, নিস্ফল আড়ম্বর ভুলিয়া সূক্ষ্মতম তর্কজাল এবং স্থূলতম জড়ত্ব বিচ্ছিন্ন করিয়া সরল-সবল-অটল মাহাত্ম্যের শিক্ষা লাভ করিয়া যাইব। আজ আমরা বিদ্যাসাগরকে কেবল বিদ্যা ও দয়ার আধার বলিয়া জানি, এই বৃহৎ পৃথিবীর সংস্রবে আসিয়া যতই আমরা মানুষ ইইয়া উঠিব, যতই আমরা পুরুষের মত দূর্গমবিস্তীর্ণ কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে থাকিব, বিচিত্র শৌর্য-বীর্য-মহত্ত্বের সহিত যতই আমাদের প্রত্যক্ষ সন্নিহিতভাবে পরিচয় হইবে, ততই আমরা নিজের অন্তরের মধ্যে অনুভব করিতে থাকিব যে, দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রে প্রধান গৌরব তাহার অজেয় পৌরুষ তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব–এবং যতই তাহা অনুভব করিব ততই আমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ ও বিধাতার উদ্দেশ্য সফল হইবে এবং বিদ্যাসাগরের চরিত্র বাঙালির জাতীয় জীবনে চিরদিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইবে।[৯২]

বিদ্যাসাগর জনশিক্ষা বা মাতৃভাষায় শিক্ষা বলতে কেবল সাক্ষরতা বা যোগ-বিয়োগ করার শিক্ষাকে মনে করতেন না। তার প্রস্তাবিত প্রাথমিক শিক্ষায় মানসিক বিকাশের পথ উন্মুক্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। বিদ্যাসাগর প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক শিক্ষা হবে বলে ধরে নিয়েছিলেন। যদিও হ্যালিডে তার চিঠিতে বলেছিলেন যে তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ এবং অন্যান্যদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন এবং এই স্কুলগুলি অদূরবর্তী ভবিষ্যতে ‘স্বনির্ভর’ হবে বলে তাঁরা আশা করেন, বিদ্যাসাগরের নোটে এ সম্পর্কে কোনো কথা নেই। তিনি শিক্ষকদের যে মাসমাহিনা নির্দেশ করেছেন, এবং মাহিনা দেওয়ার যে পদ্ধতি নির্দেশ করেছেন, তাতে মনে করা অযৌক্তিক নয় যে অন্তত প্রথমদিকে সরকার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করবে বলেই তাঁর ধারনা ছিল। শিক্ষাবিস্তারে বিদ্যাসাগরের পরীক্ষা-নিরীক্ষা লক্ষ্যে পৌঁছতে পারল না।

তৃতীয় অধ্যায় : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শিক্ষাচিন্তা

তথ্যসূত্র :

১. কবীর চৌধুরী, অতুলনীয় বিদ্যাসাগর (প্রবন্ধ), wbeÜgvj, ২০০৩ দ্বাদশ খণ্ড, উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ.২৬১
২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৩
৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, we'`vmvMi PwiZ, প্রথম প্রকাশ-১৯০৯, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিতান প্রকাশকাল-১৯৭২, কলকাতা, পৃ.-১৫
৪. পূর্বোক্ত, পৃ-২৮
৫. বাঙালি মধ্যবিত্তের উত্থান ও প্রাথমিক যুগে তিনটি স্বভাব বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়, ১.বিদেশি ইংরেজ শাসনের প্রতি আনুগত্য। ২.অর্থনৈতিক জীবনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সৃষ্ট সামন্ত ভূমি ব্যবস্থারওপর একান্ত নির্ভরশীলতা। ৩.সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কিত চিন্তার ক্ষেত্রে ধর্ম ও ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রবল প্রাধান্য। [দ্র. বদরুদ্দীন উমর, CkiP›`' we'`vmvMi I Dwbk kZ‡Ki evOvjx mgvR, চলন্তিকা বইঘর, ফেব্রুয়ারি ১৯৯০, ঢাকা, পৃ.২০]
৬. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী , বিদ্যাসাগর ও বাঙালী মধ্যবিত্ত, wbeÜgvj, ২০০৩ দ্বাদশ খণ্ড, উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৯৭
৭. এ বক্তব্য মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের নয়, এ কণ্ঠস্বরও তাঁর নয়। মধ্যবিত্তের চরিত্র ছিল মুৎসুদ্দীর। বিদ্যাসাগরের পছন্দ ছিল জাতীয় বুর্জোয়া হওয়া এবং তিনি স্বাধীন ব্যবসায়ী উদ্যোগও নিয়েছিলেন বৈকি। বই লিখেছেন নিজের ছাপাখানা থেকে, তা ছেপেছেন এবং বইয়ের দোকান খুলে পুস্তক ব্যবসায়ী হয়েছেন। এসব কাজ ভদ্রলোকের নয়। [দ্র.সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী , বিদ্যাসাগর ও বাঙালী মধ্যবিত্ত, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৯৮]
৮. ১৮৫১ সালে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ লাভ করে কলেজে অনেক নতুন রীতি-পদ্ধতির পরিবর্তন করেন, যার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, আগে সংস্কৃত কলেজে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ছাড়া অন্য কোনও জাতির ছাত্রদের পড়ার সুযোগ ছিল না। বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের দরজা সমস্ত ছাত্রের জন্য উন্মুক্ত করে দিলেন। তখনকার দিনের পক্ষে এ এক রীতিমত বৈপ্লবিক কাজ, যা করতে গিয়ে তাঁকে দারুণ বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। [দ্র. সুনীল আচার্য -ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (প্রবন্ধ), সম্পদক নান্টুরায়, fviZ wePÎv, জুলাই ২০১১, ঢাকা, পৃ.২৬
৯. সুনীল আচার্য, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (প্রবন্ধ), সম্পাদক নান্টুরায়, fviZ wePÎv, জুলাই ২০১১, ঢাকা, পৃ.২৭
১০. ভবতোষ দত্ত, evOvjxi gbe ag, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, প্রথম প্রকাশ, পৌষ ১৪০৬, কলকাতা, পৃ.৩৬
১১. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, AvZ¥Rxebx ১৯৬২, পৃ.৪১১-৪১২.
১২. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যে 'ঈশ্বর' নিয়ে চিন্তা করার অবকাশ পাননি, তা ঠিক। কিন্তু তবু তাঁকে †ev‡av'q-এ বলতে হয়েছিল, 'ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ'। তবে 'অক্ষয়কুমার যেমন বাহ্যবস্তু ঈশ্বরের উল্লেখ করেছেন নিস্পৃহ যান্ত্রিকভাবে, বিদ্যাসাগরের উল্লেখও তেমনি ভাবাবেগহীন বাস্তববোধহীন।' [দ্র. evOvjxi gvbeag, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬]
১৩. বিনয় ঘোষ, we'`vmvMi I evOvj mgvR, কলকাতা, ওরিয়েন্ট লংম্যান, ১৯৯৩, পৃ. ১৩৫
১৪. কবীর চৌধুরী, অতুলনীয় বিদ্যাসাগর (প্রবন্ধ), পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬২
১৫. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী , বিদ্যাসাগর ও বাঙালী মধ্যবিত্ত (প্রবন্ধ), পূর্বোক্ত,পৃ.৪০৪
১৬. পূর্বোক্ত, কবীর চৌধুরী, অতুলনীয় বিদ্যাসাগর (প্রবন্ধ), পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬২
১৭. ড.দীনেশচন্দ্র সিংহ সম্পাদিত, cm½: KjKvZv wekwe'`vjq, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,২০০৭,পৃ. ৬
১৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬
১৯. অমিয়কুমার সামন্ত, cm½ we'`vmvMi,ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানি, জানুয়ারি ১৯৯৪ কলিকাতা, পৃ.১৫০
২০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫০
২১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫১
২২. ৩৯ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে স্থাপয়িতা-সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাশ হয়। বিদ্যাসাগর সরকারি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ রূপে তার মধ্যে স্থান লাভ করেন। ৩৯ জন সদস্য নিয়ে গঠিত বিশ্ববিদ্যালয় সেনেটের ৩৩ জন সদস্যই শাসন, শিক্ষা, সামরিক, পুলিশ, বিচার বিভাগ এবং মিশনারি সংস্থা ও তাদের পরিচালিত স্কুল কলেজের সঙ্গে জড়িত ইউরোপিয়ান সদস্য। বাকি ৬ জন মাত্র ভারতীয়। এঁরা হলেন−প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রমাপ্রসাদ রায়, রামগোপাল ঘোষ, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অধ্যক্ষ, কলকাতা সংস্কৃত কলেজ এবং মৌলবী মুহম্মদ ওয়াজী ,অধ্যক্ষ, কলকাতা মাদ্রাসা। [দ্র. cm½: KjKvZv wekwe'`vjq, পূর্বোক্ত, পৃ ৮]
২৩. ড.দীনেশচন্দ্র সিংহ সম্পাদিত, cm½: KjKvZv wekwe'`vjq, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,২০০৭,পৃ.৮
২৪. That it be referred to the Faculty of Arts to consider the subjects in Languages for the Entrance Examination of December 1859 and for the B.A Degree Examination of 1861[[দ্র.পূর্বোক্ত, পৃ. ৮]
২৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮

Dhaka University Institutional Repository

২৬. বিদ্যাসাগর ১৮৫৯ সালে এন্ট্রান্স পরীক্ষার জন্য বিদ্যাসাগর নির্ধারিত বাংলা পাঠ্যসূচিতে ছিল- এক.জীবন চরিত–ডুবাল ,গ্রাটিয়াস এবং হার্সেলের জীবনী , দুই. টেলেমাকাস– ১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড, তিন. শকুন্তলা– ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ,৭ম পরিচ্ছেদ, চার. মহাভারত– ১ম খণ্ডের ১৩১-১৪২ [দ্র.ড.দীনেশচন্দ্র সিংহ সম্পাদিত, cm½: KjKvZv wekwe‘¨vjq, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,২০০৭,পৃ.৮]

২৭. ড.দীনেশচন্দ্র সিংহ সম্পাদিত, cm½: KjKvZv wekwe‘¨vjq, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৭,পৃ.১০

২৮. সিন্ডিকেটে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বিদ্যাসাগরের পরীক্ষকের পদত্যাগ সম্পর্কে ১৮৫৯ সালের ১ জানুয়ারি লিখেন: A letter was read from Pandit Ishwaf Chandra Vidyasagar stating that at the time of the examination he would be absent from Calcutta and requesting to be relieved from his offece as examiner in Sanskrit, Bengali, Hindi and Oriya. পরীক্ষা চলাকালে অনুপস্থিতি, নির্দেশিত পাঠ্যসূচি বাতিল কিংবা অধ্যক্ষতা থেকে পদত্যাগ যে কারণেই হোক এর পর থেকে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো পরীক্ষায় প্রশ্নকর্তা বা পরীক্ষক নিযুক্ত হননি। তবে ১৮৬৫ সালে এম. এ পরীক্ষায় পরীক্ষক হতে সম্মত হয়েছিলেন এবং ছাত্র হাজিরা সম্পর্কে ১৮৯০ সালের ৭ই এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি চিঠি লিখেছিলেন। তিনি ছাত্র হাজিরার বিষয়টি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করে লিখেছিলেন: ১. রোল ডাকতে প্রচুর সময় নষ্ট হয়। ২. দুর্নীতি বাড়বে, কোন কলেজে কোন ছাত্রের হাজিরা কম থাকলে সে অন্য কলেজে টান্সফার নিয়ে ভর্তি হয়ে পরীক্ষা দেবে। ৩.বর্তমানে জোর করে নিয়ম-শৃঙ্খলা চাপাতে গেলে উল্টো ফল হবে, এমনিতেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অধিকাংশই ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান হয়ে দাড়িঁয়েছে। ৪. কোন আইন করলে তা যথাযথ পালিত হয় কিনা বিশ্ববিদ্যালয় সেই ব্যবস্থা করুক, নচেৎ সেই আইন তুলে দিক। ৫.ক্লাস হাজিরার নিয়ম পরিবর্তন করে শতকরা ৫০ বাধ্যতামূলক ও বাকীটা ঐচ্ছিক করা হোক। কম থাকলে অন্যদিকে থেকে পুষিয়ে নেওয়া যাবে। অধ্যক্ষকে পুরো দায়িত্ব অপর্ণ করা হোক। [দ্র.ড.দীনেশচন্দ্র সিংহ সম্পাদিত, cm½: KjKvZv wekwe‘¨vjq, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,২০০৭, পৃ.১০,১২]

২৯. অমিয়কুমার সামন্ত, cm½ we‘¨vmvMi, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫২

৩০. ড.দীনেশচন্দ্র সিংহ সম্পাদিত, cm½: KjKvZv wekwe‘¨vjq, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩

৩১. ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ইতিহাসের দিক থেকে চার্নকই অবশ্য কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা। কিন্তু বাংলাদেশ ও বাঙালির ইতিহাসের দিক থেকে কলকাতার প্রতিষ্ঠার গৌরব শেঠ-বসাকদেরও খানিকটা প্রাপ্য। ১০ জানুয়ারি ১৬৯৩ চার্নকের মৃত্যু হয়। তিনি সূতানুটিতে আসার পর প্রায় আড়াই বছর বেঁচে ছিলেন, কিন্তু বাণিজ্যকুটির প্রসারের জন্য বিশেষ কিছু কাজ করেননি। এ দেশের লোকদের সঙ্গে মিশে তিনি নাকি প্রায় আধা-বাঙালি আধা-ইংরেজ হয়ে গিয়েছিলেন। কলকাতা শহরের উৎপত্তিকেন্দ্র, চার্নকের আমলে, কয়েকটি মাটির কুঁড়েঘর ছাড়া আর কিছুই ছিল না। ধর্ম বলেও তাঁরা বিশেষ কিছু মানতেন না। অধিকাংশ ইংরেজ 'মার্চেন্ট' ও 'ফ্যাক্টর' black wives' বিয়ে করে মনের আনন্দে জীবন কাটাতেন। ১৬৯৬ সালে শোভা সিং ও রহিম খাঁর বিদ্রোহের ফলে পশ্চিমবঙ্গে বর্ধমান-হুগলি অঞ্চলে যে অরাজকতার সৃষ্টি হয়, তাতে সন্ত্রস্ত হয়ে নবাব (ইব্রাহিম খাঁ) ইংরেজ ফরাসি ও ডাচদের কলকাতা চন্দননগর ও চুঁচুড়ায় সামরিক বাহিনী ও দুর্গ গঠন করে আত্মরক্ষার অনুমতি দেন। ১৬৬৮ সালে জুলাই মাসে মাত্র ১৬,০০০ টাকার বিনিময়ে ইংরেজরা কলকাতা-গোবিন্দপুর-সূতানুটির জমিদারি উপস্বত্ব লাভের অধিকার পান। এই অধিকার পাওয়ার পর স্থানীয় জমিদার সাবর্ণ চৌধুরী পরিবারের রামচাঁদ, মনোহর রায় প্রভৃতির কাছ থেকে সামান্য ১৩০০ টাকা নজরানা দিয়ে ইংরেজরা কলকাতা-গোবিন্দপুর- সূতানুটির জমিদারি উপস্বত্ব হস্তান্তরিত করে নেন।' কলকাতা নগর রূপায়ণ এইভাবে আরম্ভ হয়। [দ্র. বিনয় ঘোষ, উদ্ধৃত, evsjvi mvgvwRK BwZnv‡mi aviv, ঢাকা , বুক ক্লাব, নভেম্বর ১৯৬৮, পৃ. ৫৮]

৩২. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, A¶qKgvi ‘Ë (চরিতমালা-১২),কলকাতা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ১৩৮৮, পৃ ৪১-৪২

৩৩. বিদ্যাসাগর বীরসিংহের স্কুলে অন্তত তিনশত ছাত্রকে বইখাতা শ্লেট-পেনসিল ইত্যাদি পড়াশুনার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম দিতেন। প্রয়োজনে কাউকে কাউকে জামাকাপড়ও দিতেন। তাঁর জীবনীকার শম্ভুচন্দ্রের হিসেব অনুসারে, বিদ্যাসাগরকে বীরসিংহ স্কুলের জন্য গড়ে মাসিক ৩০০ টাকা দিতে হতো। বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য মাসিক ৩০ টাকা, রাখাল স্কুলের জন্য মাসিক ১৫ টাকা এবং দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য মাসিক ১০০ টাকা খরচ হতো। ১৮৬৪-৬৫ সালে এইচ.এল. হ্যারিসন্ বীরসিংহ স্কুল পরিদর্শন করে লিখেছিলেন যে, স্কুলগুলি ছিল অবৈতনিক। Grants in aid- এর কৃপণ করুণা ছাড়া বাকী সমস্ত খরচ বিদ্যাসাগরকে যোগাতে হয়। প্রায় ৬০ জন বিদ্যাসাগরের বাড়িতে খেয়ে স্কুলে পড়াশুনা করত। ১৮৭০-৭১ সালে আর.এল. মার্টিন নামে আর একজন স্কুল-পরিদর্শকও লিখেছিলেন যে, বিদ্যাসাগর স্কুলটির খরচপত্র সব বহন করেন। স্কুলটি সুপরিচালিত। অনেক ছাত্র এই স্কুলে উত্তম এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষালাভ করে থাকে। [দ্র.Unpublished Letters of Vidysagar Ed. A. Guha, Ananda Publishers, 1971, পৃ. ৫৫]

৩৪. ঔপনিবেশিক শাসনের অনিবার্য প্রয়োজনেই ভারতবর্ষীয় শিক্ষাক্ষেত্রে ইংরেজদের হস্তক্ষেপ ঘটেছিল- এ কথা উচ্চারিত হতে হতে আজ প্রায় বর্ণহীন হয়ে দাঁড়িয়েছে। লর্ড মেকলের ১৮৩৫ সালের সেই বিখ্যাত উক্তিটি যাতে বলিষ্ঠ বাক-ভঙ্গিমায় প্রথমবারের মতো মূর্ত হয়ে উঠেছিল এক mimic Englishman যিনি হবে 'Indian in bold and colour, but English in taste, in opinions in morals and intellect"। এমন নকল ইংরেজ তৈরি করবার জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিপ্রসূত পাশ্চাত্য শিক্ষা নয়, সাহিত্য ও কৃষ্টিনির্ভর ইংরেজি শিক্ষার সুপারিশ মেকলে কেন করেছিলেন তারও উত্তর

আমাদের অজানা নয়। [দ্র. কাশীনাথ রায়, সত্যের দ্বিভাজনঃ এস.এম.লুৎফর রহমান সম্পাদিত, সাহিত্য পত্রিকা, ৪৫ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, কার্তিক ১৪০৮,অক্টোবর-২০০১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।]

৩৫. বিদ্যাসাগর, শিক্ষার লক্ষ্য (প্রবন্ধ) তপন বাগচী ও মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম সম্পাদিত, evsjv‡'‡k D"Pwkÿvi '‡kv eQi, সূচীপত্র, ২০০৬, ঢাকা, পৃ.৪৯

৩৬. নোটসটি মূল ইংরেজি থেকে বিনয় ঘোষ অনুবাদ করেছেন। [দ্র. বিনয় ঘোষ, we'¨vmvMi I evOvwj mgvR,পৃ. ১৭৩]

৩৭. evsjv‡'‡k D"Pwkÿvi '‡kv eQi, পূর্বোক্ত, পৃ.৪৮

৩৮. প্রবীর মুখোপাধ্যায়, সম্পাদিত, evOvwji wkÿvwPšÍv, c_g LÐ : c_g fvM, কলকাতা, ১৪০৩ বঙ্গাব্দ, গ্রন্থে বিদ্যাসাগরের এই পদত্যাগ পত্রটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

৩৯. gyRvbi ingv‡bi ˆÎgvwmK cwÎKv,ত্রয়োদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, এপ্রিল জুন, ১৯৯৭, ৪৮ খণ্ড,পৃ.৪২৮-৪৩২

৪০. বদরুদ্দীন উমর, CkiP›' we'¨vmvMi I Dwbk kZ‡Ki evOvjx mgvR, চলন্তিকা বইঘর, ফেব্রুয়ারি ১৯৯০, ঢাকা, পৃ.৫০

৪১. These schools were distributed among 30 or 32 of the districts so as to allow at least three schools in each district". *Hundred years of the University of Calcutta,* P. 32.

৪২. cm½: KjKvZv wekwe'¨vjq, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪

৪৩. এই চার জন সাব ইন্সপেক্টর হলেন–হরিনাথ বন্দ্যোপধ্যায়, মাধবচন্দ্র গোস্বামী, তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য ও দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন। এই কাজের জন্য প্রত্যেককে পথ-খরচ বাদে মাসিক একশ টাকা করে বেতন দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। [দ্র.খোন্দকার সিরাজুল হক, বাংলার শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষাব্রতী বিদ্যাসাগর চতুর্বিংশ বর্ষ : ৩য়-৪র্থ সংখ্যা/জিজ্ঞাসা; শিক্ষাঃ বিশেষ সংখ্যা, পৃ.৮৪]

৪৪. নদীয়া জেলায় বেলঘরিয়া, মহেশপুর, ভজনঘাট, কুশদহ ও দেবগ্রামে; বর্ধমান জেলায় আমাদপুর, জৌগ্রাম, খণ্ডঘোষ, মানকর ও দাঁইহাটে; হুগলি জেলায় শিয়াখালা, কৃষ্ণনগর, কামারপুকুর, ও ক্ষীরপাইতে এবং মেদিনীপুর জেলায় গোলাপনগর, বাসুদেবপুর, মালঞ্চ, প্রতাপপুর ও জক্পুরে।[দ্র.খোন্দকার সিরাজুল হক, বাংলার শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষাব্রতী বিদ্যাসাগর চতুর্বিংশ বর্ষ : ৩য়-৪র্থ সংখ্যা/ wRÁvmv; wk¶v: we‡kl msL¨v, পৃ.৮৪]

৪৫. নমিতা চক্রবর্তী, e½‡'‡k wkÿv cwi, কলকাতা, ১৯৮০,পৃ. ৩২৩- ২৪

৪৬. cm½: KjKvZv wekwe'¨vjq, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭

৪৭. বিদ্যাসাগরের সুহৃদ মদনমোহন তর্কালঙ্কারের মৃত্যুর পর তার জামাতা যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ১৮৭১ সালে মদনমোহনের একটি ক্ষুদ্র জীবনী প্রকাশ করেন। এই বইয়ে তিনি অভিযোগ করেন যে বিদ্যাসাগরের বেতালপঞ্চবিংশতি' বস্তুতপক্ষে বিদ্যাসাগর ও মদনমোহনের যৌথ রচনা; বিদ্যাসাগর অন্যায় ভাবে একা নিজের নামে এই গ্রন্থ প্রচার করেছেন। বিদ্যাসাগর বেতালপঞ্চবিংশতির পরবর্তী সংস্করণের ভূমিকায় এর জবাব দেওয়ার পর যোগেন্দ্রনাথের মুখ বন্ধ হয়। কিছুদিন পরে যোগেন্দ্রনাথ আবার দাবি করলেন যে শিশুশিক্ষার গ্রন্থস্বত্বের অংশ মদনমোহনের উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য। এমনকি তিনি বিদ্যাসাগরকে উকিলের চিঠিও দেন। কিন্তু বিদ্যাসাগরের নিকট মদনমোহন লিখিত চিঠিপত্র পড়ে প্রকৃত সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করে যোগেন্দ্রনাথ বিষন্নবদনে মৌন থাকলেন। যোগেন্দ্রনাথ তার অভিযোগ প্রত্যাহার করতে বাধ্য হলেন। বিদ্যাসাগর অনেক কুণ্ঠার সঙ্গে, যোগেন্দ্রনাথের কুৎসার জবাবে সত্য ঘটনা বিবৃত করেছেন তাঁর নিস্কৃতিলাভ প্রয়াস (এপ্রিল, ১৮৮৮) পুস্তিকায়।

৪৮. পূর্বোক্ত,৭৯ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় , বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর , দে'জ পাবলিশিং , কলকাতা পুনর্মুদ্রণ,২০০৫ পৃ.৭৮

৪৯. বিদ্যাসাগরের তৈরিকৃত পরিভাষাগুলো হচ্ছেঃ State–মণ্ডল, Index–শঙ্কু, Heraldry–কুলাদর্শ, Museum–চিত্রশালিকা, Ticket–প্রবেশিকা,Optics–দৃষ্টি-বিজ্ঞান,Mineralogy–ধাতুবিদ্যা, strology–নক্ষত্রবিদ্যা, Perspective–পরিপ্রেক্ষিত, Metaphysics–মনোবিজ্ঞান,Revolution–রাজবিপ্লব,Elasticity–স্থিতিস্থাপক, Reflecting Telescope –প্রতিফলিক দূরবীক্ষণ, Numismatics–টঙ্কবিজ্ঞান ।...অনুবাদ করতে গিয়ে বিদ্যাসাগর দেখলেন, "বাঙ্গালা ভাষায় ইংরেজি পুস্তকের অনুবাদ করিলে প্রায় সুস্পষ্ট ও অনায়াসে বোধগম্য হয় না।" (জীবনচরিতে'র ২য় সংস্করণের বিজ্ঞাপন)। তাই তাঁর মনে হয়েছিল, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক চিন্তাযুক্ত ইংরেজি গ্রন্থের সরল বাংলায় অনুবাদকর্মের তখনও সময় হয়নি। এইজন্য এই 'জীবনচরিত' অনুবাদ করতে গিয়ে তিনি সিদ্ধান্ত করেন, তিনি আর কোন ইংরেজি গ্রন্থের অনুবাদ করবেন না। [দ্র. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, evsjv mvwn‡Z¨ we'¨vmvMi , দে'জ পাবলিশিং , কলকাতা পুনর্মুদ্রণ,২০০৫ পৃ.৭৯]

৫০. বিহারীলাল ও সুবলচন্দ্র মিত্র (Iswar Chandra Vidyasagar-Story of his Life and Works) বিশুদ্ধ হিন্দু আদর্শের দ্বারা বিদ্যাসাগরের জীবন ও কর্মপ্রচেষ্টা বিচার করতে গিয়ে বিড়ম্বনার মধ্যে পড়েছিলেন। তাঁদের অভিযোগ, বিদ্যাসাগর জীবন ও কর্মে হিন্দু আচার-আদর্শের অনুগমন করতেন না। 'জীবনচরিতেও তিনি হিন্দুর জীবনাদর্শের অনুকূল কোন আখ্যান সংযোজিত করেননি। শুধু পাশ্চাত্ত্যের কয়েকজন কর্মে-সফল বিশেষ ব্যক্তির জীবনী লিখেছিলেন। এঁদের মতে, 'চরিতকথা'র অনেকটা নাকি, হিন্দু-সন্তানের শিক্ষণীয় বা অনুকরণীয়' নয়। [দ্র.পূর্বোক্ত, –পৃ. ২৩৪]

৫১. বিদ্যাসাগরের তৃতীয় ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন বোধহয় সেই ক্ষোভ নিবারণেই 'চরিতমালা' (১ম–১৩০০, ২য়– ১৩০১) গ্রন্থে বিশিষ্ট বাঙালীর জীবনচরিত লিখেছিলেন। এই চরিত্রের মধ্যে রাধাকান্ত দেব, বিদ্যাসাগর, দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ, মদনমোহন, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, দ্বারকানাথ মিত্র, কৃষ্ণদাস পাল, রামগোপাল ঘোষ, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী,

অক্ষয়কুমার দত্ত, প্যারীচরণ সরকার, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সমসাময়িক বিখ্যাত বাঙালীর নাম উল্লেখ করা যায়। শম্ভুচন্দ্র এর সঙ্গে আবার মধ্যযুগের বাঙালী এবং দু-এক জন অবাঙালীরও [দ্র. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত পৃ.৮০]

৫২. তখন এ বালিকা বিদ্যালয়ের নাম ছিল হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়। ১৮৫০ সালের ২৯ মার্চ বীঠন সাহেব এই বিদ্যালয় সম্পর্কে গভর্নর জেনারেল ডালহৌসীকে যে পত্র দিয়েছিলেন তাতে মদনমোহনের এই পুস্তক সম্বন্ধে বলেছিলেন, "Pundit Madan Mohon Tarkalunkar...has employed his leisure in the compilation of series of elementary Bengali books expressly for their use." [দ্র.সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা, ১৩ সংখ্যক পুস্তিকা]

৫৩. বিহারীলাল বলেছেন "বিদ্যাসাগর মহাশয় চেম্বার্স সাহেবের 'Rudiments of Knowledge' নামক গ্রন্থের অনুবাদ প্রচার করেন" [দ্র.পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৮]। কিন্তু চণ্ডীচরণ এ বিষয়ে অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করে লিখেছিলেন, "১৮৫১ সালে চেম্বার্স রুডিমেণ্টস অব নলেজ' নামক গ্রন্থের ছায়াবলম্বনে বালিকাদিগের পাঠোপযোগী করিয়া 'শিশুশিক্ষা চতুর্থ ভাগ' বা 'বোধোদয়' রচনা করেন।" বিদ্যাসাগর 'বোধোদয়ে'র প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে লিখেছিলেন, "বোধোদয় ইংরেজী পুস্তক হইতে সঙ্কলিত হইল। পুস্তকবিশেষের অনুবাদ নহে।"[দ্র.পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৯]

৫৪. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় , evsjv mwn‡Z¨ we‘¨vmvMi, পূর্বোক্ত পৃ.৮২

৫৫. চণ্ডিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই গল্পটি বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর মুখেই শুনেছিলেন, সুতরাং এ ঘটনার সততায় অবিশ্বাস করবার কারণ নেই ।[দ্র. পূর্বোক্ত পৃ.৮২]

৫৬. তাঁর পুত্র নারায়ণচন্দ্র পিতার মৃত্যুর পর 'বোধোদয়'-এর কিছু পাঠ সংস্কার করেছিলেন। হয়তো তিনিই এই পরিবর্তন করে থাকবেন। [দ্র.বিহারীলাল , পাদটীকা, পূর্বোক্ত পৃ. ২৪৮]

৫৭. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বরচিত জীবনচরিত'-এর সম্পাদক (৩য় সংস্করণ) বলেছেন, " ১৮৪১ সালে প্রদত্ত কোন বক্তৃতায় দেবেন্দ্রনাথের 'ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ' এই মহাবাক্য কয়েক বৎসর পরে (১৮৫১) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কর্তৃক তাঁহার 'বোধোদয়' পুস্তকে গৃহীত হয়।"[দ্র. পূর্বোক্ত পৃ. ৬২]

৫৮. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় , evsjv mwn‡Z¨ we‘¨vmvMi, পূর্বোক্ত পৃ.৮২

৫৯. বিহারীলাল সরকার, বিদ্যাসাগর, ৪র্থ সংস্করণ, পূর্বোক্ত পৃ. ৩৩৪

৬০. পূর্বোক্ত, পৃ.৩৩৪

৬১. অবশ্য এদেশে কোনকালেই খুঁত ধরার লোকের অভাব হয় না। বিদ্যাসাগর কেন ঋ ও ৯ স্বরবর্ণ থেকে তুলে দিলেন তার জন্য ঢাকার কালিপ্রসন্ন ঘোষ ('বান্ধব') পত্রিকার সম্পাদক, ভাটপাড়ার পঞ্চানন তর্করত্ন–এঁরা তাঁর সমালোচনা করেছিলেন। কেউ কেউ বলেছিলেন, দীর্ঘ ঋ-কারযুক্ত দুটি একটি শব্দ বাংলাতেও ব্যবহৃত হয়, যেমন–'পিতৃণ'। কিন্তু দীর্ঘ ৯-কারযুক্ত কোন শব্দই বাংলার নেই, সংস্কৃতেই বা কটা আছে? বিদ্যাসাগর বাস্তব প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে বাংলা ভাষার পক্ষে সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় বর্ণটিকে তুলে দিয়েছিলেন ।[দ্র. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় , evsjv mwn‡Z¨ we‘¨vmvMi, পূর্বোক্ত পৃ.৮৫]

৬২. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় , বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর, পূর্বোক্ত পৃ.৯১

৬৩. ঈসপের অনেকগুলি আখ্যানেই সমসাময়িক মানবসমাজ ও রাজনৈতিক আবহাওয়ার সাঙ্কেতিক উল্লেখ আছে। জীবজন্তুর আখ্যানের মধ্য দিয়ে তিনি মানবসমাজের কথাই বলতে চেয়েছেন। টমাস জেমস'র Esop's Fables-এর ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

৬৪. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় , বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর, পূর্বোক্ত পৃ.৯৭

৬৫. The Female Juvenile Society for the Establishment and Suport of Bengali Female School, Ladies Society for Native female Education in Calcutta and its Vicinity, শ্রীরামপুর মিশন [দ্র. পূর্বোক্ত, পৃ.৮৭]

৬৬. পূর্বোক্ত, পৃ.৮৭

৬৭. পূর্বোক্ত, পৃ.৮৮

৬৮. পূর্বোক্ত, পৃ.৮৯

৬৯. পূর্বোক্ত, পৃ.৮৯

৭০. ছোটলাট স্যার জর্জ ক্যাম্পবেল ১৮৭২ সালে ২৪ জানুয়ারি ডিরেক্টরের কাছে এক আদেশ পত্রে 'নারীদের ধর্মসংস্রবহীন শিক্ষা ও সঙ্গে সঙ্গে কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা দেওয়া বড়ই বিপজ্জনক'-এ সম্পর্কে একমত হয়ে 'ফিমেল নর্মাল স্কুল-টি তুলে দিতে বললেন। তিনি আদর্শবাদী হলে ও কতটা বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি ও দুরদৃষ্টি সম্পন্ন ছিলেন এ ঘটনা থেকেই তা প্রমাণিত হয়। [পূর্বোক্ত, পৃ.৮৯]

৭১. পূর্বোক্ত, পৃ.৮৯

৭২. পূর্বোক্ত, পৃ.৯০

৭৩. অমিয়কুমার সামন্ত, cm½ we‘¨vmvMi, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩

৭৪. স্বপন বসু , evsjvi be †PZbvi BwZnvm, পুস্তক বিপণি,কলকাতা অক্টোবর ২০০০, পৃ.১৪৭

৭৫. Notes on Vernacular Education: (১.) Vernacular Education on an extensive scale, and on an efficient footing is highly desirable, for it is by this means alone that the condition of the mass of the people can be ameliorated.(২.) Mere reading and writing, and a little of Arithmetic, should not comprise the whole of this Education; Geography, History, Biography, Arithmetic, Geometry,

Natural Philosophy, Moral Philosophy, Political Economy, and Physiology should he taught to render it complete. (৩.) The elementary works already published, and fit for adoption as class-books, are the following:1ST Shishushikha, in 5 parts. The first three parts teach Alphabet, Spelling, and Reading; the fourth is a little treatise on the Rudiments of Knowledge;the fifth, a free translation of the Moral Class Book of "Chamber's Educational Course.'2nd.Pashwabali,orNatural History of Animals.3rd.History of Bengal, free translation of Marshman's work. 4th. Charupath, or Lessons on useful and entertaining subjects.5th. Jeebuncharita, a free translation of the Lives of Copernicus, Galileo, Newton, Sir William Hcrschel, Grotius, Lianoeus, Duval, Sir William Jones, and Thomas Jenkins, in "Chamber's Exemplary Biography." (৪.) Treatises on Arithmetic, Geometry, Natural Philosophy are in the course of preparation. Treatises on Geography, Political Economy, and Physiology, and the Historical-Works and a series of Biographies will have to be compiled. For the present, the Histories of India, Greece, Rome and England will suffice. (৫.) One Teacher for each school will not be sufficient. Two each at least will be required. Every school will very likely contain from three to five classes, which for one teacher to manage efficiently is impracticable. (৬.) The salary of Pundits should be at least Rupees 30, 25, 20 per month qualification and other circumstances being taken into consideration. When all the books enumerated above shall be ready for adoption, every school should have a Head Pandit at.Rupees 50 a month. (৭.) Arrangement should be made for the teachers receiving their salaries regularly every month, in their own Stations, without being required to quit their posts. (৮.) Four Zilas for the present should be selected for operation, namely, Highly, Nadia, Burdwan, and Midnapur. There should be 25 schools for the present, to be distributed as expediency suggests. These should be established in towns and villages not the vicinity of English colleges and schools. In the neighborhood of English colleges and schools. Vernacular education is not properly appreciated. (৯.) The success of Vernacular education greatly depends on an active and efficient supervision, as well as the amount of encouragement given to the successful pupils. With Natives in general, the acquisition of knowledge, for the sake of knowledge itself, has not as yet become a motive. It is therefore necessary, that Lord Harding's Resolution, which has so long been in abeyance, should be strictly enforced. (১০.) The following plan of superintendence appears to be much less expensive and far more efficient than any other could possibly be.(১১.) Two Native Superintendents, each on a salary of Rs. 150 a month, including their traveling charges, to be employed, one for Midnapur and Highly, the other for Nadia and Bardwan. They are frequently to visit the schools, examine the classes, and rectify the mode of teaching. (১২.) The Principal, of the Sanskrit College to be nominated, the Ex-officio Head Superintendent with no other additional allowance than his traveling charges, which at the most will not exceed Rs. 300 per annum. He is to visit thes chools once a year, and to report to the authorities, with who will rest the management of Vernacular Schools. (১৩.) The preparation and adoption of class-books, and the selection of teachers to be entrusted to the Head Superintendent. (১৪.) The Sanskrit College, besides being a seat of general education, to be also considered as the Normal School, for the training of Vernacular teachers. (১৫.) Thus the training of teachers, preparation and adoption of class-books selection of teachers and general superintendence will be united in one office. This circumstance will remove many inconveniences. (১৬.) An Assistant Head Superintendent to be appointed with Rs. 100 a month. His duty will be to assist the Principal of the Sanskrit College in training up the teachers and preparation of class-books, and to officiate for him while visiting the Vernacular schools. (১৭.) The Patshalas, or indigenous schools under Gurumohashoys, such as they are now. are very worthless institutions. Being in the hands of teachers, generally incompetent for the task they undertake, these schools require much improvement. It will be the. duty of the Superintendents to inspect these Schools and give the teachers as much instruction as they can as to the mode of teaching. It will also form a part of the duty of the Superintend to watch opportunities to introduce, as far as practicable, the class-books above-mentioned. In fact, the Superintendents will take every care to make these schools, as far as possible, useful institutions. (১৮.) Those schools founded by Natives, or Missionaries, which are in the hands of competent teachers, of course deserve attention and encouragement. The Superintendents will be required to visit such schools and to report on their respective claims to encouragement. (১৯.) The Superintendents will also be required to consider it as part of their duty to persuade the inhabitants

of towns and villages, within their respective beats, to establish schools upon the model of Government schools.
The 7th February 1854 (Signed) Ishwar Chandra Surma.

[দ্র. *Selections from the Records of the Bengal Government. No. XXII, pp. 65-74.* এবং অমিয়কুমার সামন্ত, cm½ we'¨vmvMi, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৬–৮৯]

৭৬. Nots on Vernacular Education: ১,২,,৫,৭,১৩,১৫ [দ্র. Proceedings of the Lieutenant-Governor of Bengal, Education Department, October No. 58 58, প্রসঙ্গ বিদ্যাসাগর, পূর্বোক্ত, পৃ.২০৮]
৭৭. খোন্দকার সিরাজুল হক, বাংলার শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষাব্রতী বিদ্যাসাগর (প্রবন্ধ) , wRÁvmv; wk¶v: we‡kl সংখ্যা, চতুর্বিংশ বর্ষ, (৩য়-৪র্থ সংখ্যা) পৃ.৮৩
৭৮. পূর্বোক্ত, পৃ.৮৪
৭৯. পূর্বোক্ত,পৃ.৮৪
৮০. ইন্দ্র মিত্র, KiæYvmvMi we'¨vmvMi, আনন্দ পাবলিশার্স, কলিকাতা ,১৯৭১, পৃ.৭৪৭
৮১. খোন্দকার সিরাজুল হক, বাংলার শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষাব্রতী বিদ্যাসাগর (প্রবন্ধ) , পূর্বোক্ত পৃ.৮৬
৮২. পূর্বোক্ত পৃ.৮৬
৮৩. পূর্বোক্ত পৃ.৮৬
৮৪. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় , evsjv mvwn‡Z¨ we'¨vmvMi, পূর্বোক্ত, ভূমিকা-নতুন সংস্করণ, পৃ.৮,৯
৮৫. ÔmsevÓ cfvKiÕÑGi সম্পাদকীয়ঃ ৮.১২.১৮২ (উদ্ধৃত হয়েছেঃ সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র' গ্রন্থেও প্রথম খণ্ডের ৩৮৭ পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃত)
৮৬. বিনয় ঘোষ সম্পাদিত, mvgwqK c‡Î Ôevsjvi mgvRwPÎÕ , পঞ্চম খন্ড, পৃঃ ৫৪৩-৫৪৪
৮৭. *General report on Public Instruction in the Lower Province of Bengal Presidency from 1856-57 Calcutta, John Grey*, Calcutta Gazette Office, 1857, Pp 113-135
৮৮. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৭।
৮৯. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২৫
৯০. *Upublished Letters of Vidyasagar* ,পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৯
৯১. ইন্দ্র মিত্র, KiæYvmvMi we'¨vmvMi, পূর্বোক্ত, ১৯৭১, ৭৬২-৬৩
৯২. gxRvbi ingv‡bi ˆÎgwmK cwÎKv,ত্রয়োদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, এপ্রিল জুন, ১৯৯৭, ৪৮ খণ্ড,পৃ.১২৮

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের শিক্ষাচিন্তা

১. পরিচয়
২. আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মানস বৈশিষ্ট্য
৩. প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও কর্মজীবন
৪. শিক্ষাচিন্তায় আত্মনিয়োগ
৫. শিক্ষার লক্ষ্য ও শিক্ষানীতি পরিকল্পনা
৬. শিক্ষা পরিকল্পনায় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব
৭. জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন ও শিক্ষা সংস্কার প্রস্তুতি
৮. মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কার
৯. উচ্চশিক্ষা পরিকল্পনা ও গবেষণা স্থাপন
১০. শিক্ষক নিয়োগ ও বিজ্ঞান শিক্ষার বিকাশ
১১. মাতৃভাষায় শিক্ষার মাধ্যমে জাতীয় ঐক্য
১২. মহীশূর ভাষণে জনশিক্ষার গুরুত
১৩. শিক্ষা সংস্কার ও বিকাশের মৌলিক দিক

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের শিক্ষাচিন্তা

পরিচয়

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (১৮৬৪-১৯২৪) বিচক্ষণ বিচারক, গণিতজ্ঞ এবং মহান শিক্ষাবিদ হিসেবে খ্যাতিমান। তিনি জাতীয় সাহিত্যের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন । তিনি মনে করতেন ভাষা– সাহিত্যের মধ্য দিয়ে ভারতের ঐক্য স্থাপন করা সম্ভব। উচ্চশিক্ষার বিস্তারকে তিনি 'প্রগতির পথে প্রথম পদক্ষেপ' হিসেবে দেখেছেন। তিনি বাংলা ভাষাকে উচ্চশিক্ষার কক্ষে স্থান দিয়েছিলেন । তাঁর লক্ষ্য ছিল মাতৃভাষায় শিক্ষার মাধ্যমে সাধারণের উন্নতি করা এবং তাঁদের অর্থনৈতিক মুক্তির পথ সুগম করা। পৃথিবীর সব জাতির মধ্যে ভারতবর্ষকে জ্ঞানে বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ আসন লাভে সক্ষম করে তোলই ছিল তাঁর জীবন সাধনা। সমকালীন শিক্ষাব্যবস্থার দোষ-ত্রুটি, সমস্যা–সংকট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির গলদ প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে তাঁর স্পষ্ট ধারণা ছিল। ফলে সেই সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে তিনি সমাধানে ব্রতী হয়েছিলেন। আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের স্বাধীনতায় সরকারের কোনো হস্তক্ষেপ মানতে পারেননি। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকারি নিয়ন্ত্রণ মুক্ত রাখার সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বয়ংকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার সেই সংগ্রামে তাঁর সহকর্মী শিক্ষকগণ তাঁকে সমর্থন যুগিয়েছিলেন। বিজ্ঞান ও আইন কলেজ স্থাপন, স্কুল-কলেজের সিলেবাসে বাংলা পত্র চালু, বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ক্লাস প্রবর্তন প্রভৃতি তাঁর শিক্ষা সংস্কার আন্দোলনের ফসল। বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষায় উচ্চ শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে আশুতোষের চিন্তাধারা বাঙালিকে উচ্চ শিক্ষার পথ দেখেয়েছিল। মাধ্যমিক শিক্ষাকে জনসাধারণের দ্বারাপ্রান্তে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে তিনি গভীর মনোযোগী ছিলেন। তিনি বাংলা ইংরেজি, ফরাসি, রুশ, পালি প্রভৃতি ভাষা জানতেন। জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতি কল্পে শিক্ষানুরাগীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং তাঁদের সহায়তা নিয়ে শিক্ষার উন্নতি বিধানে নিঃসংকোচে তিনি তাঁদের দান গ্রহণ করেছেন। তাঁর চেষ্টায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার নতুন পরিবেশ ও মৌলিক পরিবর্তন সূচিত হয়। এ অধ্যায়ে বাংলা ভাষায় শিক্ষাচিন্তার ক্রমবিকাশ ধারায় আমরা তাঁর অবদান আলোচনা করব।

২

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মানস বৈশিষ্ট্য

১৮৮৩ সালে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি নরিস আদালতে হিন্দুদের পবিত্র শালগ্রাম শিলা সাক্ষ্যগ্রহণের জন্য নিয়ে আসার নির্দেশ দেন। বেঙ্গলী পত্রিকার সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখনীমুখে হিন্দু সমাজের প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। সুরেন্দ্রনাথকে দুমাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হলে দেশ জুড়ে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। কারাগার থেকে সুরেন্দ্রনাথ যেদিন মুক্তিপান, কলকাতার ছাত্ররা তাঁর গাড়ি টেনে নিয়ে যায়। আশুতোষ এই ছাত্রদলে যোগ

Dhaka University Institutional Repository

দিয়েছিলেন। এই সময়েই আশুতোষের জাতীয়তাবাদী চেতনার বলিষ্ঠ প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। তাঁর স্বাদেশিকতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে সমালোচক লিখেছেন:

> তাঁর জীবন-মর্মকথা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মনে হয়েছে যে তিনি একটি আলোক-উৎস, যা থেকে উৎসারিত আপসারি আলোকশঙ্কু বাংলাকে অভিস্নাত করে ভারতবর্ষ হয়ে পৃথিবীকে আলোকিত করার স্পর্ধা দেখিয়েছে। আর এভাবেই বাঙালি হয়ে, বিদেশে না গিয়েও, তিনি প্রবলভাবে মননে ও দর্শনে আন্তর্জাতিক। তাঁর স্বাদেশিকতার বৈশিষ্ট্যই এখানে।[১]

আশুতোষের এই স্বাদেশিকতা কখনো উগ্র জাতীয়তাবোধে পরিণত হয়নি। দেশের মানুষ এবং পৃথিবী জুড়ে থাকা অন্য দেশের মানুষের মধ্যে কোনো ভেদ নেই, এই ছিল তাঁর ধারণা। তাঁর মতে প্রকৃত দেশপ্রেম জাত্যভিমানী করেও মানুষকে ভালোবাসতে শেখায়। জাত্যভিমানকে তিনি দোষের মনে করেননি। তিনি এটিকে সদম্ভ প্রকাশে অন্তর তেজের দ্যোতক হিসেবে দেখেছেন।

আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বিদ্যাসাগরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছিলেন যে, 'বাঙালি বলেই তাঁর মধ্যে একটা দম্ভ ছিল, আর এই দম্ভের বশেই কখনো তিনি ধুতি চাদর-চটি ছাড়া অন্য পোষাক পরেননি।[২] আশুতোষও তেমনি পোষাককে তাঁর বাঙালিয়ানার প্রকাশক করে নিয়েছিলেন। বাঙালি ধুতি-চাদরই ছিল তাঁর পোষাক। আদালতে বিচারকের আসনে বসার সময়ই তিনি বিশেষ পোষাক পরতেন। তারপর কাজ শেষ হলে নিজের পক্ষে এসে পোষাক পরিবর্তন করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসতেন। 'হাইকোর্ট থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতেন তিনি বাঙালী পোষাক পরেই।[৩]

রবীন্দ্রনাথ সভ্যতার সংকট প্রবন্ধে লিখেছিলেন–ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারতসাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে? কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আর্বজনাকে?'[৪] আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ১৯২৫ সালে বাঁকুড়ায় দেওয়া বক্তৃতায় বলেছিলেন– 'কোন মুখে আমরা নিজেদের স্বরাজলাভের যোগ্য বলি?'[৫] বিবেকানন্দ বলেছিলেন:

> তোমরা শূন্যে বিলীন হও আর নতুন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে।' অর্থাৎ ছুৎমার্গের পথ ধরে, কুসংস্কারে বদ্ধ থেকে, ... দেশের স্বাধীনতা আসবে না। স্বাধীন হবার জন্য দরকার নতুন অধিকারী এক "ভারতবর্ষ।'[৬]

এই সংকট থেকে উত্তরনের উপায় কী ? এই বিষয় নিয়ে তখন এই তিন বরেণ্য ব্যক্তি কী ভেবেছিলেন ? রবীন্দ্রনাথ উত্তর বলেছিলেন:

> আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে।'[৭] .....যে বাইরের থেকে কেউ আমাদের স্বাধীনতা দেবে না; আর স্বাধীনতা পেলে পৃথিবীর সামনে আমাদের যে পরীক্ষা দিতে হবে তাতে উত্তীর্ণ হওয়ার প্রস্তুতি নিতে হবে।'[৮]

সরাসরি না বললেও এটা পরিষ্কার যে তিনি জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে শিক্ষার কথাই বলেছেন। অন্য দু-জন সরাসরি 'শিক্ষার' কথাই উচ্চারণ করেছেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বলেছেন:

> বিজ্ঞান ও শিল্পশিক্ষার মধ্য দিয়েই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।...দেশের শিল্পোন্নতির কার্যে আমাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করা আবশ্যক। একমাত্র এই উপায়েই বর্তমান অর্থকষ্টের প্রতিকার হইতে পারে।[৯]

একই কথা বিবেকানন্দ আরো কঠোর ভাষায় বলেছেন–'আমাদের চাই কী জিনিস? স্বাধীনভাবে স্বদেশী বিদ্যার সঙ্গে ইংরেজি আর বিজ্ঞান পড়ানো, চাই কারিগরী শিক্ষা, চাই যাতে শিল্প (Industry) বাড়ে; লোকে চাকরি না করে দু-পয়সা করে খেতে পারে।[১০]

আশুতোষ তাঁদের এসব বক্তব্য অনুধাবন করে দেশের স্বরাজ বা স্বাধীনতা ব্যাপারে তাঁর কর্ম পন্থা টিক করে নিয়েছিলেন। এ কারণেই তাঁর সমস্ত চিন্তায় বাঙালির শিক্ষা এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এ দুটো বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। শিক্ষাকে তিনি দেশবাসীর মুক্তির মন্ত্র এবং বিশ্ববিদ্যালয়কে দেশসেবার মঞ্চ হিসেবে ভেবেছিলেন । দেশমাতৃকার নামে তাঁর শপথ : ধাত্রীমাতৃকা (Alma Mater)-র দেবী-সুষমা অক্ষুন্ন রাখার বিষয়ে তিনি লিখেছেন:

"I vow to three, my country-
all earthly things above-
Entire and whole and perfect,
the service of my love-

The love that asks no questions,
the love that stands the test,
That lays upon the altar
the deartest and the best;

The love that never falters,
the love that pays the price,
The love that makes undaunted
the final sacrifice. [১১]

আশুতোষের মানস বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে মনোতোষ দাশগুপ্ত লিখেছেন:

> আশুতোষকে বিশেষিত করতে অনেক রকম অভিধা ব্যবহার করা যায়-কৃতী গণিতজ্ঞ, সফল ব্যবহারজীবী, অনুসরণীয় বিচারক, অনুকারণীয় বিধায়ক ও পুর-প্রতিনিধি, শিক্ষা-সংস্কারক, সফল প্রশাসক, দরদী শিক্ষক. সম্মোহক, বাগ্মী, দক্ষ সংগঠক, তীক্ষ্ণধী সাহিত্য-আলোচক আর দেশের সফলতম এবং পৃথিবীর এক আদর্শ উপাচার্য। আসলে তিনি ছিলেন এই সবরূপের এক সুসমন্বিত মূর্ত বিগ্রহ। আর তাঁকে বিশেষিত করতে একটি অভিধাই প্রযুক্ত হতে পারে, সেটা হলো, 'কর্মযোগী'। তাঁর কাছে জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ অভিন্ন হয়ে গিয়েছিল, বা বলা যায় কর্মযোগের মধ্য দিয়েই তিনি জ্ঞানযোগে পরমতম রূপ ও রস আস্বাদন করতে চেয়েছিলেন।[১২]

১৯২৮ সালে সর্বপ্রথম এ দেশে ছয়টি সরকারি কলেজে 'বাংলা' ভাষার জন্য ৬ জন লেকচারার নিযুক্ত করার আদেশ হয় । এখানে লক্ষণীয়, আশুতোষ কীভাবে বাংলায় পাশ করা ছাত্রদের জন্য চাকরির বাজার উন্মুক্ত করার চেষ্টা করছিলেন। আর একটা বিষয় আমাদের মনে রাখা দরকার তা হলো– আশুতোষ 'বাংলা' না বলে 'মাতৃভাষা' কথাটা ব্যবহার করেছেন। এখানেই তিনি তাঁর সমালোচকদের উচিত জবাব দিয়েছিলেন। যাঁরা তাঁর কর্মোদ্যোগকে কেবল বাংলাকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে বলে মনে করতেন। ভারতবর্ষের অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও একই ভাবে মাতৃভাষার পাঠক্রম প্রবর্তন করুক, এটাই চেয়েছিলেন আশুতোষ। তাঁর প্রত্যাশা করতেন মাতৃভাষার মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষ একটা ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ হবে।

আশুতোষ ধর্ম সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। কারণ তিনি জানতেন ভাষার মতো ধর্মও মানুষের দুর্বলতম জায়গা। তিনি বুঝেছিলেন, ভারতবর্ষ স্বাধীন হলে এই দুটি সংবেদশীল স্থানে আঘাতে ক্ষত সৃষ্টি হতে পারে। তাই পাঠক্রমের অভিনবত্ব ছাড়াও তিনি আরো দুটি পদক্ষেপ নিতে চেয়েছিলেন। তার একটি–একাধিক ভাষা শিখে অনুবাদের মাধ্যমে ভারতবর্ষের আঞ্চলিক ভাষার সাহিত্যসমূহকে পরস্পরের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং অন্যটি বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে তুলনামূলক ধর্মালোচনাকে গুরুত্বদান। তিনি তাঁর কৃতী অধ্যাপকদের দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুবাদকর্ম শুরু করেছিলেন।

৩

প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও কর্মজীবন

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ১৮৬৪ সালের ২৯ জুন কলকাতার মলঙ্গা লেনের এক ভাড়া বাড়িতে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (এম. বি.) মা জগত্তারিণী। আশুতোষের পিতামহ বিশ্বানাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন হুগলী জেলার জিরাট গ্রামের অধিবাসী। পরবর্তীকালে এই পরিবারটি এবং তার শাখা-প্রশাখা বাংলার সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক জগতে তা আইন, শিক্ষা, প্রশাসন, কিংবা রাজনীতি, যেদিক থেকেই বিচার করা যাক শুরু এই বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় থেকে। বিশ্বনাথ নিমক মহলের দারোগা ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বনাথের অকাল প্রয়াণের ফলে এই পরিবারটি সেই গ্রাম ত্যাগ করেছিল।[১৩] পিতাকে হারিয়ে পারিবারিক বিপর্যয় অতিক্রম করে দুর্গাপ্রসাদ চিল সাহেবের সাহায্যে ইঞ্জিনিয়ার হন। তিনি অন্যান্য ভাইদের লেখা পড়া শিখিয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করেন। হরিপ্রসাদ ছিলেন লাইসেন্স প্রাপ্ত চিকিৎসক। তিনি গ্রামের অবহেলিত মানুষের চিকিৎসা করে জীবন অতিবাহিত করেন। রাধিকাপ্রসাদও ইঞ্জিনিয়ার হয়েছিলেন এবং ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের ফেলো। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৮৬১ সালে গঙ্গাপ্রসাদ (১৮৩৬-১৮৮৯) স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। ১৮৬৭ সালে তিনি ডাক্তারী পাশ করে সেকালের কলকাতার উপকণ্ঠে অবস্থিত ভবানীপুরে স্বাধীনভাবে চিকিৎসা ব্যবস্যা শুরু করেন। গঙ্গাপ্রসাদ সম্পর্কে একজন সমালোচক লিখেছেন:

> চিকিৎসকরূপে গঙ্গাপ্রসাদ সফল হয়েছিলেন। চিকিৎসকরূপে সফল হতে হলে দিনরাত কাজে ডুবে থাকতে হয়। একজন পরিশ্রমী এবং আদর্শনিষ্ঠ চিকিৎসক হয়েও গঙ্গাপ্রসাদ ছিলেন গভীরভাবে সাহিত্য প্রেমী। বাংলাসাহিত্যের প্রতি তাঁর ছিল অগাধ শ্রদ্ধা। তিনি বাল্মিকী রামায়ণের পদ্যে পূর্নাঙ্গ অনুবাদ করেছিলেন। ....তিনি সেকালের মানে ছিলেন অতি আধুনিক। মাতৃস্বাস্থ্য সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি, এবং নিত্যদিনের চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ে বাংলায় পুস্তক রচনা করেছিলেণ। গঙ্গাপ্রসাদ সেকালের রীতি মেনে পাঠ্যাবস্থায় বিবাহ করেন। কলকাতার শাখারিপাড়ার হরলাল চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা জগত্তারিনীর সঙ্গে তার বিবাহ হয়।[১৪]

১৮৭৩ সালে আশুতোষের বয়স যখন প্রায় নয় বছর তখন গঙ্গাপ্রসাদ ৭৭ নং নর্থ রসারোডের নিজের বাড়িতে থাকতে শুরু করেন। বর্তমানে এটি আশুতোষ মুখার্জি রোড নামে পরিচিত। পাঁচ বছর বয়সে আশুতোষকে ভবানীপুরের একটি স্কুলে ভর্তি করা হয়। সেখানে বাংলা মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হতো। দুবছর পর স্কুলের পড়া ছাড়িয়ে গঙ্গপ্রসাদ তাঁর জন্য দীর্ঘকাল গৃহশিক্ষার আয়োজন করেন। পরে আশুতোষকে সাউথ সুবারবান স্কুলে ভর্তি করা হয়। তখন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ছিলেন সেই স্কুলের প্রধান শিক্ষক। আশুতোষের জীবনে তাঁর গভীর প্রভাব পড়েছিল। আশুতোষ ১৮৭৯ সালে কলকাতা সাউথ সুবারবান স্কুল থেকে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে এন্ট্রান্স পাস করেন এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। ১৮৮২ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে তৃতীয় স্থান অধিকার করে এফ. এ. পাস করেন। ১৮৮৪ সালে প্রথম স্থান অধিকার করে বি. এ. এবং ১৮৮৫ সালে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে অঙ্কে এম. এ. ডিগ্রি লাভ করেন। ১৮৮৬ সালে প্রতি পেপারে গড়ে শতকরা ৯৬ ভাগ নম্বর পেয়ে তিনি পদার্থ বিজ্ঞানে দ্বিতীয় বার এম. এ. পাস করেন। একই বছর প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে দশ হাজার টাকা বৃত্তি এবং আইন পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক লাভ করেন। ভারতে শিক্ষিত অধ্যাপককে ইংল্যান্ডে শিক্ষিত অধ্যাপকের সমমর্যাদা প্রদানে ভারতীয় ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ অস্বীকৃত হওয়ায় তিনি শিক্ষাবিভাগের প্রস্তাবিত চাকরি প্রত্যাখ্যান করে কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় যোগদান করেন। ওকালতিতে তাঁর অসাধারণ প্রসার ঘটে। তাঁর ছোটকাকা রাধিকাপ্রসাদ এই সময়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালন-সংক্রান্ত যেসব কাজগপত্র পেতেন, আশুতোষ সেগুলি যত্নসহকারে পাঠ করতেন। এভাবেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করেন।

আশুতোষ কর্মজীবনের শুরু থেকেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য স্যার কোর্টনী ইলবার্ট-এর সহাযতায় তিনি ১৮৮৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সদস্য মনোনীত হন। ১৮৮৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠাকুর আইন অধ্যাপক নির্বাচিত হয়ে সম্পত্তির উত্তরাধিকার বিষয়ে তিনি বক্তৃতা প্রদান করেন। ১৮৯৪ সালে তিনি ডক্টর অব ল' ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর কিছুকাল তিনি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকেন। ১৮৯৮ সাল থেকে ১৯০৪ সাল পর্যন্ত তিনি কলকাতা কর্পোরেশনের সদস্য, ১৮৯৯ থেকে ১৯০৪ সাল পর্যন্ত বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য এবং আইনসভায় আশুতোষ ১৮৯৯ সাল থেকে ১৯০৩ সাল পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯০৩ সাল থেকে ১৯০৮ সাল পর্যন্ত এ বাংলার প্রতিনিধি হিসাবে তিনি বড়লাটের কাউন্সিলের অতিরিক্ত সদস্যের দায়িত্বও পালন করেন। ১৯০৪ সালে রাজনীতি ত্যাগ করে কলকাতা হইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন। একই সঙ্গে তিনি ১৯০৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ অলঙ্কৃত করেন। দুই বছর মেয়াদি এ পদে চারবার (১৯০৬-১৯১৪) দায়িত্ব পালন করেন। ১৯২১ সালে তিনি পঞ্চম বার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে নিযুক্তি লাভ করেন। এ সময় তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন সাধনে ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুনর্গঠনে কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

Dhaka University Institutional Repository

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্টগ্রাজুয়েট ক্লাস চালু, বিজ্ঞান ও আইন কলেজ স্থাপন, স্কুল-কলেজে বাংলা পত্র চালু, বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ক্লাস প্রবর্তন, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বয়ংকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন। সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ হস্তক্ষেপ করতে পারবেন' এমন আপত্তিকর শর্ত থাকায় তিনি ষষ্ঠবার উপাচার্য নিয়োগের প্রস্তাবে রাজি হননি। ইংরেজ গভর্নর লর্ড লিটন যখন (১৯২৩-১৯২৪) বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন খর্ব করতে চান তখন তিনি গভীর আত্মবিশ্বাস ও সাহসের সঙ্গে রাজশক্তিকে প্রতিহত করেন । এই তেজস্বিতার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি জনগণের কাছ থেকে 'বেঙ্গল টাইগার' উপাধি লাভ করেন। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তিনবার এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। এ ছাড়া তিনি ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি কাউন্সিলের সভাপতি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহ-সভাপতি এবং ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি পদে দায়িত্ব পালন করেছেন।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় গণিত ও আইন শাস্ত্রে অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। গণিত শাস্ত্রে তাঁর পারদর্শিতা ও দুরূহ সমাধান ক্ষমতার স্বীকৃতি আছে 'ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাস' ও ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন'-এ। তিনি টেগোর 'ল' অফ পারপিটুইটিজ' শীর্ষক মহামূল্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর প্রবন্ধের সংকলন 'জাতীয় সাহিত্য' একখানি মননশীল গ্রন্থ। তিনি ইংরেজি, ফরাসি, রুশ, পালি ও বাংলা ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। সুবক্তা ও তার্কিক। তাঁর দেশপ্রেম, পাণ্ডিত্য, তেজস্বিতা ও মাতৃভক্তি সম্পর্কে বহু কাহিনী প্রচলিত। ভারতের ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক সি.এস.আই.ও নাইট, নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজ কর্তৃক 'সরস্বতী, পূর্ববঙ্গের সুধীসমাজ এর 'শাস্ত্রবাচস্পতি' ও সিংহল (বর্তমানে শ্রীলঙ্কা)-এর মহাবোধি সোসাইটি কর্তৃক 'সম্বুদ্ধাগমচক্রবর্তী' উপাধি লাভ করেন। ১৯২৩ সালে বিচারপতির পদ থেকে পদত্যাগ করে তিনি পুনরায় ওকালতি পেশায় যোগদান করেন এবং প্রসিদ্ধ ডুমরাঁয় মোকদ্দমা পরিচালনার জন্য পাটনা গমন করেন। সেখানে তাঁর জীবনাবসান হয়। কিন্তু জীবদ্দশায় তিনি যে কর্ম সম্পাদন করেছেন তা তাঁকে আজো বাঁচিয়ে রেখেছে।

৪

শিক্ষাচিন্তায় আত্মনিয়োগ

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের এই অগাধ পাণ্ডিত্য ও শিক্ষার ব্যাপ্তি তাঁকে উচ্চতর শিক্ষাবিস্তারে অনুপ্রাণিত করেছিল। তিনি চেয়েছিলেন দেশের প্রতিটি ঘরে ঘরে, সুদূর পল্লীতেও যেন জ্ঞানের আলো পৌঁছায়; অসংখ্য দরিদ্র পরাধীনে ভারতবাসী সেই আলোয় আলোকিত হয়। এর জন্য তাঁকে অনেক দুঃখকষ্ট সহ্য করতে হয়েছে, বহু বিরুদ্ধাচরণের সম্মুখীন হতে হয়েছে, বিদেশি রাজপুরুষের তীব্র অসহযোগিতা লাভ করতে হয়েছে। তবু তিনি থেমে যাননি, হতাশ হননি। তাঁর অবিচলিত নিষ্ঠা, অধ্যবসায়, প্রচণ্ড ও দুর্বার কর্মস্রোতের প্রবাহের সামনে সমকালের কোনো প্রতিবন্ধকতাই টিকতে পারেনি। এইজন্য তিনি কর্মবীর, বাংলার বাঘ'[১৫] প্রভৃতি হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছেন। তিনি বাঙালির মুক্তি ও উন্নতির জন্য স্বেচ্ছায় শিক্ষাচিন্তায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন ।

১৮৫৭ সালে শিক্ষাপ্রসারের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। Advancement of Learning মুখে বললেও কার্যক্ষেত্রে তা প্রমাণিত হয়নি। সাহিত্য, বিজ্ঞান ও কলা বিষয়ে শুধু পরীক্ষা গ্রহণ ও ডিগ্রিদানের কাজের মধ্যেই এ প্রতিষ্ঠানের সীমাবদ্ধতা প্রকাশ পেয়েছিল। ১৯০৬ সালের ৩১ মার্চ বঙ্গভঙ্গের বিক্ষুব্ধ রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে প্রতিষ্ঠানটি 'ফিরিঙ্গির গোলামখানা' হিসেবে প্রচারিত হলো। এই সময় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে নিয়োগ লাভ করেন। ব্রিটিশ শাসিত পরাধীন দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের কাছ থেকে দেশের সর্বসাধারণ কী অপার্থিব দান গ্রহণ করতে পারে, তিনি সেই পথ দেখালেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালকে নিয়ে তাঁর অভিপ্রায়ের সেকথা স্মরণ করে ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৮৯-১৯৭৭) লিখেছেন:

> বিশ্ববিদ্যালয়কে সত্য সত্যই বিশ্ববিদ্যার আলয় করার সংকল্প ছিল তাঁর। এটুকু আমাদের ভুললে চলবে না যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আজ যে ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ হয়ে দাঁড়িয়েছে. এখানে আজকাল এত

Dhaka University Institutional Repository

> বেশি বিষয় আলোচনার সুযোগ হয়েছে, এ কেবল তাঁরই সাধনায়। আর আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় যে জগৎকে নানা বিষয়ে, কিছু না কিছু নতুন কথা শোনাতে পেরেছে, এও তাঁর শুভেচ্ছায়, তাঁরই প্রেরণায়।[১৬]

আশুতোষ উপাচার্যের পদ গ্রহণের পর তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা, ব্যাপক অধ্যায়ন. নিরলস শ্রম, অসাধারণ বাগ্মিতা, শান্ত স্বভাব এবং দ্রুত অনুধাবন ক্ষমতা দিয়ে শুধুমাত্র পরীক্ষাগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানকে ভারতের প্রধানতম বিদ্যামন্দিরে পরিণত করেছিলেন। পবিত্র লক্ষ্যে অবিচল থাকার প্রচণ্ড সাহস ছিল তাঁর । তার জোরেই তিনি শিক্ষাকে সাধারণের দরজার সামনে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন। আশুতোষ বহু ব্যস্ততার মধ্যেও Department of Modern Indian Languages' প্রতিষ্ঠার কথা ভুলে যাননি। বিস্মৃতও হননি বাঙালির জন্য মাতৃভাষায় শিক্ষার কথা। মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে ১৮৮৯ সালে আশুতোষ শিক্ষার সেই লড়াই শুরু করেছিলেন। ১৮৯১ সালের ২৪ জানুয়ারি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় উপাচার্য স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বার্ষিক সমাবর্তন ভাষণে উচ্চশিক্ষায় দেশিয় ভাষার ব্যবহার প্রসঙ্গে বলেন:

> The Bengali language has now rich literature that is well worthy f study, and Urdu and Hindi are also progressive fairly in the same direction. In laying stress upon the importance of study of our Vernaculars, I am not led by any mere patriotic sentiment, excusable as such sentiment may be, but I am influenced by more substantial reasons. I firmly believe that we cannot have any thorough and extensive culture as a nation unless it is disseminated through our own vernaculars…[১৭]

এই বক্তৃতা শুনে সেনেটের সর্বকনিষ্ঠ সদস্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায় গভীরভাবে আলোড়িত ও প্রভাবিত হন। সেই বক্তৃতায় মাসখানেক পর তিনি এপ. এ. বি. এ এবং এম. এ. পাঠক্রমে বিভিন্ন স্তরে দেশিয় ভাষাকে পঠন-পাঠনের মাধ্যম করার জন্য আবেদন জানিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার বরাবর এক চিঠি লিখেন। ১৪ মার্চ ১৮৯১ সিন্ডিকেটে তাঁর সেই চিঠি আলোচিত হয়। সিন্ডিকেটের নির্দেশ অনুসারে ১১ জুলাই ১৮৯১ এ কলা অনুষদ (Faculty of Arts)-এর সভায় চিঠিটি উপস্থাপন করা হয়। সেদিনের সেই আলোচনায় মতানৈক্য দেখা দিলে, ভোট গ্রহণ করা হয়। প্রস্তাবের পক্ষে ১১ ভোট এবং বিপক্ষে ১৭ ভোট পড়লে, আশুতোষের প্রস্তাবটি নাকচ হয়ে যায়। সেদিনের সেই প্রস্তাবের পক্ষে স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, মহেন্দ্রনাথ রায়, চন্দ্রনাথ বসু, রেভারেন্ড ড. ম্যাকডোলান্ড প্রমুখ নামী সিন্ডিকরা তাঁকে জোরালো সমর্থন দিয়েছিলেন। তাঁর এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করেছিলেন– পিয়ারীমোহন মুখোপাধ্যায়, মৌলভী সিরাজুল ইসলাম, নবাব আবদুল লতিফ, নীলমনি মুখোপাধ্যায়, মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, কর্নেল এইচ. এস. জ্যারেট প্রমুখ।

আশুতোষ হাল ছাড়লেন না, সময়ের এবং সুযোগের অপেক্ষায় থাকলেন। এই পরাজয়ের স্মৃতিকে স্মরণ রেখে তিনি তাঁর কর্মপ্রচেষ্টা চালিয়ে গেলেন। এ ঘটনার দুই বছর পর, ১৮৯৩ সালের ২৩ জুলাই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানটিও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে বাংলা ভাষাকে পঠন-পাঠনের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করার আবেদন জানালেন। রবীন্দ্রনাথসহ সাতাশ জন সদস্যের সেই প্রস্তাবও সিন্ডিকেটে ২২-২১ ভোটে বাতিল হয়ে যায়। ১৮৯১ সালের প্রথম চেষ্টায় পরাজয়ের পনেরো বছর পর আশুতোষ সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের আসনে বসে সেদিনের প্রস্তাবটি সিনেট সভায় অনুমোদন করিয়ে নেন। একটা আইন পাশ করেই তিনি বসে থাকলেন না। আইনটিকে কার্যকর করতে পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। তাঁর স্বপ্ন পূরণ করতে তিনি মনোযোগী হলেন এবং ভাষার সাধনা সম্পূর্ণ করতে ধীরে ধীরে প্রস্তুত হলেন। তাঁর সেই অসামান্য প্রস্তুতির প্রাণবন্ত বিবরণ দিয়েছেন দীনেশচন্দ্র সেন (১৮৬৬-১৯৩৯)। তিনি লিখেছেন:

> এই বিশ্ববিদ্যালয় হইবে প্রাচ্য-বিদ্যার মহাকেন্দ্র, এই ছিল তাঁহার সঙ্কল্প। ...একাধারে কবি ও সাধকের ন্যায় বিরাট কল্পনা, অপর দিকে মহাকর্ম্মীর বিশাল কার্যকুশল বাহুর শক্তি, এই দুই গুনের অপূর্ব মিলনে আশুতোষ বরেণ্য হইয়াছিলেন।...শত শত ভূর্জ্জপত্র ও প্রাচীন কাগজের লিখিত পুঁথি তিনি সমস্ত এশিয়া হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিতেছিলেন। অসংখ্য তিব্বতীয় পুঁথি, জাপানি পুঁথি, ৭,০০০ বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথি, দ্বারভাঙ্গা গৃহের কোনায় কোনায় পড়িয়া রহিয়াছে - তাহাদের জন্য আলমারী তৈরি হইতেছে। ইহা ছাড়া কত যে বিরল বহুমূল্য পুস্তক তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন, ঈজিপ্টের প্রাচীন মূর্তির ছবি, কত দেশের মানচিত্র, অতি দুর্লভ সংস্কৃত পুঁথি যে কত তাহার অবধি নাই। প্রাচ্যবিদ্যা শিক্ষার্থীকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসিতে হইবে, এখানে না আসিলে তাহার শিক্ষা পূর্ণ হইবে না, এইভাবে বিশ্ববিদ্যালয়টিকে গড়িয়া তোলা ছিল-তাঁহার

> সঙ্কল্প।...উচ্চশিক্ষার কেন্দ্রে এই অবজ্ঞাত বঙ্গভাষাকে তিনি অতি সাবধানে ধীরে ধীরে প্রবিষ্ট করাইয়াছেন। পাছে সহসা এই ভাষাকে অনেকটা অধিকার দিলে প্রবল প্রতিপক্ষীয়েরা ইহাকে অঙ্কুরে উপড়াইয়া ফেলে - এই ভয়ে শনৈঃ শনৈঃ তিনি ভয়ে ভয়ে ইহার জন্য দ্বার মুক্ত করিয়া গিয়াছেন।... হঠাৎ ৪/৫ বৎসর পূর্বে একদিন আমার ডাক পড়িল। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "দীনেশবাবু, এইবার এম. এ. তে বাঙলা ভাষা চালাইব, সিলেবাস তৈরি করুন, এক্সারসনকে চিঠি লিখুন...আপনাকে দিয়া এই ৪/৫ বৎসর যাবৎ যে আমি বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের ইংরেজি ইতিহাস লিখাইয়াছি, দাসগুপ্তকে দিয়া সপ্তদশ শতাব্দীর বাঙ্গালা প্রভৃতি বই লিখাইয়াছি, তাহার মানে জানেন না। এই বইগুলি না থাকিলে এম. এ. পীক্ষার্থদের কী পড়াইব? আপনারা যতক্ষণ সোরগোল করিয়াছেন, অমি ততক্ষণ জমি তৈরি করিয়াছি।[১৮]

দীনেশচন্দ্র সেনের এই বর্ণনা থেকেই আমরা অনুমান করতে পারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা চালুর ব্যাপারে উপাচার্য আশুতোষ কত গভীর চিন্তার পরিচয় দিয়েছিলেন।'কতটা ছিল প্রাণের টান, অন্তরের আকুলতা অনুভব করেছিলেন। ১৯০৯ সালে আশুতোষ দীনেশচন্দ্র সেনকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য ধারাবাহিক বক্তৃতা দেওয়ার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে Special Reader পদে নিযুক্ত করেছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সমাবর্তনে উপাচার্য হিসাবে প্রদত্ত তাঁর ভাষণগুলি থেকে আমরা শিক্ষা বিষয়ে আদর্শ উপলব্ধি করতে পারি। উপাচার্য হিসেবে আশুতোষ তাঁর শেষ ভাষণে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মনকে জাগিয়ে তুলে প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাঁদের সম্পূর্ণ আনুগত্য দাবি করেন। তিনি বলেছেন:

> Councils will come and go, ministers will blossom and perish, parties will develop and disappear of change their nature and survive. But your university, my university, will live on forever, if her children b thousands and ten-thousands stand by her with steadfast loyalty and devotion, alike in her days of triumph and affliction. [১৯]

আশুতোষ সরকারি নিয়ন্ত্রণ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়কে মুক্ত রাখতে চেয়েছিলেন। সেই উদ্দেশ্যে সাধনে তিনি যখন সংগ্রাম করেছেন, তখন জাতীয়তাবাদী নেতারা তা অনুধাবন করতে না পেরে, বুল ব্যাখ্যা করে, তাঁর সমালোচনা করেছেন। নিন্দুকের কথায় তিনি তাঁর সংকল্প থেকে সরে দাঁড়াননি। ১৯২১ সালে দেশ জুড়ে অসহযোগ আন্দোলনের সময় স্বদেশি নেতারা তাঁদের সঙ্গে ছাত্রদের সামিল করতে স্কুল-কলেজ বর্জনের পরামর্শ দিলেন। এ

আন্দোলনের ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিদিনের রুটিন মাফিক কাজ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট ভাষাতত্ত্ববিদ সুকুমার সেন সে সময়ের অবস্থা বোঝাতে লিখেছেন:

> কলকাতায় নন-কো-অপারেশন আন্দোলনের ঢেউ এসে লাগল বিশ্ববিদ্যালয়ে সেনেট হলে আইন পরীক্ষার সময়ে। চিত্তরঞ্জন অসহযোগী দলের নেতা। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা ভেঙে তিনি আশুবাবুর বিপক্ষে বিশেষ কিছু বলতে পারলেন না। আশুবাবু তখন ভাইস-চ্যান্সেলার বোধ হয়। তিনি পরীক্ষার্থীদের বাড়ি যেতে দিলেন না। সকলকেই ইউনিভার্সিটির মধ্যে-হার্ডিঞ্জ হোস্টেলে রেখে দিলেন।[২০]

আন্দোলনের পরবর্তীতে সম্পর্কে মতপার্থক্য সত্ত্বের আশুতোষের চরিত্রমহিমা জ্ঞাত হয়ে তা নতমস্তকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। আশুতোষের মৃত্যুর পর তাঁকে স্মরণ করে চিত্তরঞ্জন বলেন :

> His heart was with the nation. He was a builder. He tried to build the great Indian nation and honour it with his activities. [২১]

১৯১০ সালে আশুতোষ ম্যাট্রিকুলেশন থেকে স্নাতক-স্তর পর্যন্ত বাংলা পাঠ্য ও পরীক্ষার বিষয়রূপে গ্রহণ করেন। এ কাজের সার্থকতা দেখা গেল ১৯২১ সালে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য স্নাতকোত্তর পাঠ-বিষয়রূপে গৃহীত হওয়ার এগারো বছর পর। ১৯২২ সালের সমাবর্তন ভাষণে তিনি এই সাফল্যের দিকটি তুলে ধরেছেন। তিনি সেই ভাষণে তাঁর আত্মতৃপ্তির কথা জানিয়েছেন। তিনি বলছেন:

> Let me turn for a moment to the great Department of Indian Vernaculars which is a special feature of our University and which should constitute its chef glory in the eyes of all patriotic and public spirited citizens… For the first time in the history of Indian Universities it thus became possible for a person to take the highest University degree on the basis of his knowledge of his mother tongue. [২২]

বিরোধীদের সমালোচনা হলো বাংলা ভাষায় এম. এ করে চাকরির বাজারে কী মূল্য পাওয়া যাবে। এর মোক্ষম জবাবটা আশুতোষ দিলেন কথায় নয়, কাজে। ছেলে শ্যামাপ্রসাদ প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজি

Dhaka University Institutional Repository

অনার্সে প্রথম হ্যাঁ, চাকরির বাজারও ছিল খুবই সীমিত। অধ্যাপক জর্নাদন চক্রবর্তী তাঁর 'স্মৃতিভারে' গ্রন্থে লিখেছেন :

> তখন বাংলা দেশের কলেজসমূহে বাংলা পড়ানোর জন্য স্বতন্ত্র পদের সৃষ্টি হয়নি।....এই সময়ে (১৯২৮ সালে) জনশ্রুতি শোন গেল সদ্য লোকান্তরিত স্যার আশুতোষ বাংলায় এম. এ. প্রবর্তন ও বাংলা বিভাগ সৃষ্টি করেই নিরস্ত থাকেনি। সরকারি এবং বেসরকারি কলেজসমূহে বাধ্যতামূলকভাবে অন্তত একটি করে বাংলার অধ্যাপক সৃষ্টি করবার জন্যে তিনি কিছুদিন থেকে জোর তাগাদা দিচ্ছিলেন।[২৩]

৫

শিক্ষার লক্ষ্য ও শিক্ষানীতি পরিকল্পনা

বিশ শতকের শুরুতে যখন শিক্ষা ও উন্নয়নের যোগসূত্র সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে উঠেনি তখন ১৯১৮ সালে স্বাধীন মহীশূর রাজ্য-বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে প্রধান অতিথির ভাষণে আশুতোষ 'বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা' তথা উচ্চশিক্ষার বিস্তারকে 'প্রগতির পথে প্রথম পদক্ষেপ' বলে চিহ্নিত করেছিলেন। মহীশূর রাজ্য-বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন-ভাষণে তিনি আরো বলেছিলেন–' শিক্ষা ঠিক জলাধারের মতো... কেবলমাত্র ভিত্তিমূলে বইয়ে দিলে তা জলমগ্ন হবে, জলবদ্ধ হয়ে সব বিনাশ করবে।'[২৪] কৈশোর থেকে জীবনাবসান পর্যন্ত তিনি বাংলার জনজীবনের বিপন্নতার দিকটি প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি দেখেছেন– ভূমিহীন কৃষকের উদ্ভব, কুটীর-শিল্পের ধ্বংস, কৃষি-ঋণগ্রস্ততার বৃদ্ধি, শহর ও শহর-সন্নিহিত অঞ্চলে পাটকল স্থাপনের কারণে অভিবাসন বৃদ্ধির প্রভৃতি। সেই দারিদ্র নিরক্ষরতার দেশে পরাধীন সময়ে উচ্চশিক্ষা যখন মুষ্টিমেয়র অধিকার, তখন তিনি বাংলার 'ঘরে ঘরে গ্রাজুয়েট' চেয়েছিলেন। তাঁর শিক্ষার মূল লক্ষ্য ছিল মাতৃভাষায় জনশিক্ষা ও উচ্চশিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে বাঙালির জীবনকে অভাব মুক্ত ও উন্নত করা। আশুতোষ পরিকল্পিত শিক্ষানীতিতে শিক্ষার সঙ্গে কলেজ ও স্কুল শিক্ষার সার্বিক উন্নয়ন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তাঁর শিক্ষানীতিতে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পরস্পর সম্পূরক। এই তিন ধাপের মধ্যে কীভাবে সমন্বয় সাধন করে এক স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা যায় তা বিচার-বিবেচার উদ্দেশ্যে ১৯১৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্যাডলারের সভাপতিত্বে একটি কমিশন গঠন করে। এই কমিশনের সদস্য ছিলেন স্যার আশুতোষ। স্যাডলার কমিশন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা, মান-পরীক্ষা ও শিক্ষক বিতরণ সম্পর্কে সরেজমিনে তদন্ত করে সুপারিশ করেন। কমিশনের এই রিপোর্ট তৈরিতে আশুতোষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। আশুতোষের শিক্ষাচিন্তাই প্রকৃতপক্ষে তাঁর শিক্ষাদর্শন। আলাদা করে কোনো শিক্ষাতত্ত্ব বা শিক্ষাপদ্ধতির প্রচলন তিনি করেননি। নতুন কোনো শিক্ষাতত্ত্বের প্রবর্তক না হয়েও তিনি ছিলেন এদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষাচিন্তক। শিক্ষা-সংগঠক ও শিক্ষা-সংস্কারক হিসেবে তাঁর তুল্য কেউ ছিলেন বলে জানা নেই। ব্রিটিম শাসিত বাংলায় বহু সীমাবদ্ধতার মধ্যে সর্বোচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা এবং তাতে মাতৃভাষায় উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করে তিনি অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে তিনি যে সব অপূর্ণতা ও প্রতিবন্ধকতা লক্ষ্য করেছেন সেসব প্রত্যক্ষলব্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তা সমাধান করেছেন। সেই অনুসরণীয় বিষয়গুলোই তাঁর শিক্ষানীতি হিসেবে মূল্যবান হয়ে উঠেছে। কাজেই ১৮৮৯ সাল থেকে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ৩৬ বছরের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই তাঁর শিক্ষানীতি । আশুতোষ মুসলমানদের জন্য উচ্চশিক্ষার কথা ভেবেছিলেন। আশুতোষ তাঁর উপাচার্য কার্যকালের প্রথম থেকেই উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলমানদের নিয়ে আসার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা করতে থাকেন। তিনি লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন ভাষণে তাঁর এই পরিকল্পনার কথা জানান। তিনি বলেন:

> আমি মনে করি না যে বিশ্ববিদ্যালয় জাতির জীবন থেকে আলাদা থাকবে। শিক্ষা একটা পবিত্র জাতীয় বিশ্বাস। যে সব লোক শিক্ষার জন্য জীবন উৎসর্গ করেন, তাঁরা জাতির জন্য কাজ করেন- তাঁদের যদি জাতীয় ক্রিয়াকলাপের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়, তবে তা হবে চরম দুঃখজনক ঘটনা।[২৫]

তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে কলকাতার মুসলমানরা- বিশেষ করে আর্থিকভাবে সচ্ছল পরিবারের- লেখাপড়া শেখার সুযোগ পান, এবং তা ব্যবহার করেন। আর গ্রামের মুসলমানা সেই সুযোগ থেকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বঞ্চিত থাকে। তাই তিনি বহিরাগত মুসলমান ছাত্রদের কলকাতায় থাকার ভাল ব্যবস্থা করে এবং উচ্চশিক্ষায়

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমানী ঐতিহ্যকে নিয়ে আসার মাধ্যমে তাঁদেরকে পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে চাইলেন। তাঁরা যাতে না ভাবেন যে পাশ্চাত্য শিক্ষা তাঁদের শিকড়-ছাড়া করছে কিংবা ইসলামী মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যকে পেছনে ফেলে দিচ্ছে। ১৯০৯ সালের সমাবর্তন ভাষণে তিনি জানালেন :

> আর একটি প্রশ্ন আছে যার গুরুত্ব অনেক বেশি এবং এটাকে আমরা কোনভাবেই উপেক্ষা করতে পারি না। এটা কোনভাবেই সমর্থনযোগ্য নয় যে, এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অর্ধশতাব্দী পরেও আরবী ও পারসী ভাষার উন্নতির জন্য একটাও অনুমোদিত কলেজ নেই।[২৬]

এ ক্ষেত্রে তিনি মুসলমান ছাত্রদের উচ্চশিক্ষার জন্য আলাদা কোনো কলেজ করতে চাননি। এর কারণ সম্ভবত শিক্ষায় বৈচিত্র আনয়ন করা। পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে মুসলমান ছাত্ররা আরবি –ফারসি শিখবে এবং পাশ্চাত্যের নামী পণ্ডিতদের দিয়ে আরবি –ফারসি শেখাতে হবে, যাতে ওই শিক্ষাও আধুনিক ও যুগোপযোগী হয় । শিক্ষার উৎকর্ষের জন্য তিনি অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে উন্নতমানের গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন:

> It is safe to say that the educational Institutions of the future, quite as much as those of the present will be largely controlled, if not dominated, by three factors – teachers, instruments and books. In each of these vital elements, the deficiency of our institution is remarkable. They are, without exception, undermanned; of Libraries and Laboratories there are only a few, if any, which can satisfactorily stand the scrutiny of the most reasonable test applied according to Western ideals. [২৭]

গ্রন্থাগারের মান উন্নয়নে তিনি অত্যন্ত আন্তরিক ছিলেন। রমেশচন্দ্র মজুমদারের আশুতোষ স্মৃতিচারণে সে কথা বলেছেন। শ্রী মজুমদার তাঁর স্মৃতিচারণে দুটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেছেন। তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের বই খুব বেশি ছিল না। এ কারণে প্রায়ই ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে যেতে হতো। এক সাক্ষাতে এই খবর জানতে পেরে আশুতোষ তাঁকে একটা বইয়ের তালিকা তৈরি করতে বললেন। তিনি তখন বইয়ের একটি তালিকা তৈরি করে "ভয়ে ভয়ে" তাঁর হাতে দিয়েছিলন। ভয়ের কারণ সেই বইয়ের মূল্য তখনকার দিনে প্রায় পাঁচ হাজার টাকা হয়েছিল। শ্রী মজুমদার লিখেছেন– 'তিনি (আশুতোষ) একবার চোখ বুলাইয়া দেখিয়া তৎক্ষণাৎ 'Approved' বলিয়া লিখিয়া নাম সই করিয়া দিলেন- সেই দিনই বই কিনিবার জন্য Cambray কোম্পানির নিকট হুকুম গেল।'[২৮]

আশুতোষ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেওয়ার প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল ভারতীয় ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটিয়ে স্বজাতির কল্যাণ সাধন করা। বিশেষ করে মাতৃভাষার প্রতি তাঁর প্রবল অনুরাগ ছিল। তিনি জানতেন এ দেশে মাতৃভাষা ছাড়া বংলার ঘরে ঘরে শিক্ষার আলোকবর্তিকা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব নয়। তাই মাতৃভাষাকে তাঁর শিক্ষাচিন্তা ও শিক্ষা সংস্কার আন্দোলনের কেন্দ্রে স্থান দিয়েছিলেন। যতদিন পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজ উপাচার্য ছিলেন ততদিন এটা হবার ছিল না। কারণ তাঁরা কেউ মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগী বুদ্ধিজীবী শ্রেণির জন্য ইংরেজি ভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভারতীয় ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন না। বরং পদে পদে বাংলা ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

৬

শিক্ষা পরিকল্পনায় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব

মাতৃভাষার প্রতি আশুতোষের এই অনুভব অনুরাগ জন্মেছিল তাঁর পূর্বসূরীদের কর্মপ্রচেষ্টা থেকে। ব্রিটিশ সরকারের কর্মকাণ্ড তিনি গভীর মনোযোগের সঙ্গে প্রত্যক্ষ করেছেন। ইংরেজি ভাষার সামনে বাংলা ভাষাকে শিক্ষার ভাষা হিসেবে দাঁড় করানোর চেষ্টায় নিবেদিত অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ শিক্ষাচিন্তক তাঁর কাছে অসামান্য আদর্শের মানুষ ও কর্মবীর হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি এঁদের দ্বারা নানাভাবে প্রভাবিত ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষায় উচ্চ শিক্ষা প্রবর্তনে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রত্যক্ষ সমর্থন লাভ করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বাংলা গদ্য সাহিত্য তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল। এ ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার ভূমিকা ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

Dhaka University Institutional Repository

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) উনিশ শতকের সেরা সাহিত্যিক, বাংলা উপন্যাসের জনক। রস-সাহিত্যের স্রষ্টা, সাহিত্য সম্রাট, ঋষি প্রভৃতি নামে তিনি খ্যাত। বাংলা গদ্যের আদর্শ রীতির দৃষ্টান্ত স্থাপন করে তিনি অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি সৃষ্টি কৌশল জানা জীবনশিল্পী। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে সমাজের উপযোগীতার মাধ্যমে এগিয়েছেন। তাঁর নৈয়ায়িক দৃষ্টিভঙ্গি ও সরল চিন্তা ও গদ্য ভাষা আমাদের মুগ্ধ করে। বাংলার ইতিহাস, বাঙালির সমাজ, ন্যায়-নীতি ও কর্তব্য-অকর্তব্য নিয়ে তাঁর মতো এতো গভীরভাবে সেকালে কেউ ভাবেননি। স্বজাতির মঙ্গল সাধনই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান লক্ষ্য । আত্মশুদ্ধিতে তিনি মনুষ্যত্বের উদ্‌বোধন প্রত্যাশা করেছেন।

মানুষের মুক্তি ও উন্নতির জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের এ আত্মনিবেদন আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করে। তিনি সাহিত্য, সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে গভীরভাবে ভেবেছেন। তাঁর রচনা সমগ্র, ব্যক্তিগত-জীবন-দর্শন, পত্র-পত্রিকা সম্পাদনা প্রভৃতি বিষয় অনুসন্ধানে দেখা যায়, তিনি মূলত বাংলা গদ্য সাহিত্যের একনিষ্ঠা সেবক। বাংলা ভাষায় এক অসাধারণ গদ্যশিল্পী। শিল্প সৃষ্টির তুলনায় বঙ্কিম চন্দ্রের শিক্ষা বিষয়ক চিন্তাভাবনা কম। বঙ্গদর্শনের পত্র-সূচনা, শিক্ষা, লোকশিক্ষা, অনুকরণ,আমার মন, প্রাকৃতিক নিয়ম, জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি, প্রাচীনা এবং নবীনা এই কয়েকটি প্রবন্ধের মধ্যেই তাঁর শিক্ষাচিন্তা সীমাবদ্ধ। তবে সমকালের অন্যান্য শিক্ষাচিন্তকদের সঙ্গে তিনি চিন্তার যে ঐক্য সাধন করেছেন তা প্রশংসনীয়। বঙ্কিমচন্দ্র লোকশিক্ষা বিকাশের মাধ্যমে আমাদের লোকহিতের পরামর্শ দিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বাঙালি গ্রাজুয়েট । ডিগ্রি লাভের মাস তিনের মধ্যেই তিনি ইংরেজ সরকারের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে সরকারি চাকুরিতে নিযুক্ত হন। এটি তাঁর প্রথম পরিচয়, কিন্তু প্রকৃত পরিচয় নয়। তাঁর প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় ১৮৬৫ সালে দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশের পর। দুর্গেশনন্দিনী এবং বঙ্গদর্শন আমাদের কাছে তাঁর প্রতিভার বার্তা নিয়ে হাজির হয়েছিল। সাহিত্যের বিচারে তিনি তাঁর পূর্বসুরী অক্ষয়কুমার দত্তকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে সমালোচক লিখেছেন:

> অক্ষয় কুমার যত বড় চিন্তা স্রষ্টা-সাহিত্য স্রষ্টা হিসেবে তত বড় নন। বঙ্কিমের সঙ্গে সেখানে তাঁর তুলনা চলতে পারে না। আমরা দেখেছি, বঙ্কিমচন্দ্র অক্ষয়কুমার দত্তের চিন্তায় প্রভাবিত ও দীক্ষিত ছিলেন। উনিশ শতকের বাংলায় অক্ষয়কুমার দত্তের পরে চিন্তার বলিষ্ঠতায় বঙ্কিমচন্দ্রের সমতুল্য প্রতিভা আর নেই বললেই চলে।[২৯]

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে ইতিহাস ইতিহ্যের সঙ্গে নিসর্গপ্রীতি যেমন পাওয়া যায়, তেমনি পাওয়া যায় শিক্ষার উপাদান। তিনি ন্যায়বোধ জাগ্রত করার পাশাপাশি অন্যায় অধর্মের স্বরূপ নির্দেশ করলেন তাঁর সাহিত্যে তিনি। সমাজের নানা সমস্যা, সংকট সাহিত্যের মধ্য দিয়ে তিনি পাঠকের কাছে পৌঁছে দেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যের শিক্ষা সেকালে বাঙালি মনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। ইংরেজি ভাষায় সাহিত্য চর্চা শুরু করলেও বাংলা ভাষাতেই তাঁর সাহিত্য প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে। এই দিক থেকে দুর্গেশনন্দিনী তাঁর প্রথম সার্থক পদক্ষেপ। এ গ্রন্থ প্রকাশের ফলে তৎকালীন বাঙালি সমাজে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, বহু স্থানে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে ঊনিশ শতকের অন্যতম মনীষী রমেশচন্দ্র দত্তের মন্তব্যটি গ্রহণ করা যেতে পারে। তিনি লিখেছেন:

> যখন দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হইল, তখন যেন বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশে সহসা একটি নতুন আলোকের বিকাশ হইল। দেশের লোক সে আলোকচ্ছটায় চমকিত হইল, সে বালার্ককিরণে প্রফুল্ল হইল, সে দীপ্তিতে স্নাত হইয়া স্তুতিগান করিল। কলিকাতা ও ঢাকা এবং পশ্চিম ও পূর্বদেশ হইতে আনন্দরব উত্থিত হইল, বঙ্গবাসিগণ বুঝিল সাহিত্য একটি নুতন যুগের আরম্ভ হইয়াছে। একটা নতুন ভাবের সৃষ্টি হইয়াছে–নূতন চিন্তা ও নূতন কল্পনা বঙ্কিমচন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া আবির্ভূত হইয়াছে।[৩০]

–এমন উচ্চ প্রশংসা পাবার যথার্থ কারণ আছে। তা হলো সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের গভীর আত্মবিশ্বাস। তাঁর আত্মবিশ্বাসের মূলে ছিল ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি গভীর অনুরাগ এবং তাঁর পূর্বসুরীদের গদ্যের ভাষা ও রীতি সম্পর্কে নিবিড় পরিচয়। ফলে তিনি এসেই বঙ্গসাহিত্যে নব যুগের সূচনা করতে পেরেছিলেন। আর তাঁর সে ক্ষমতা প্রকাশ পাওয়া মাত্রই বিজ্ঞজনের বিচারে স্বীকৃতি পেল। বাঙালি তাঁর স্বজাতীয় ভাষায় সাহিত্যরস তাঁর রসসাহিত্যের মাধ্যমেই লাভ করল। এর ফলে তাদের মধ্যে পূর্বাপেক্ষা বাংলা ভাষা প্রীতি অনেকাংশে বৃদ্ধি পেল। 'বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন জীবনশিল্পী। জীবনের কেবল প্রকাশরুপ নয়, মর্মবস্তুকে তিনি ভাষার মাধ্যমে চিত্ররুপ দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। উপন্যাসের মধ্য দিয়ে যেমন, তেমনি

Dhaka University Institutional Repository

ব্যঙ্গ রচনা,প্রবন্ধ, প্রভৃতির মধ্য দিয়ে। 'জীবনের যদি লেখার সামর্থ্য থাকত তাহলে জীবনের কথা জীবন যেভাবে লিখত, বঙ্কিমচন্দ্র সেভাবেই লিখেছেন। লেখা তাঁর কাছে বিলাসের ব্যাপার ছিল না, ছিল জীবনের ব্রত। বঙ্কিম নিজের বিবেকের প্রতি অন্তরের নির্দেশের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে লিখেছেন।'[৩১] শুধু লেখা নয়, 'বঙ্গদর্শন' নামে বাংলা পত্রিকা সম্পাদনা করে তিনি সেকালে বাংলা ভাষার যে উন্নতি সাধন করেছেন তা প্রশংসার দাবী রাখে। তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে উন্নতচিন্তার আশ্রয় করেছিলেন 'বঙ্গদর্শন'– কে। এই পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর যুক্তি নিষ্ঠ সমালোচনা ও তর্কবিতর্ক বাঙালির দূর্বল চিত্তকে সবল করেছে । উনিশ শতকে রস সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রযাত্রা তাঁর জীবন পর্যন্ত চলেছিল। মানবিক বিদ্যার খুব কম দিকই আছে যা বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তার বাইরে ছিল। তিনি বাংলা গদ্যের ভাষার জন্য যেমন তাঁর পূর্বসূরী অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন, তেমনি তাঁর উত্তরসুরীরাও তাকে দিয়েছেন যথোপযুক্ত মর্যাদার আসন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তাঁর 'বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' প্রবন্ধে লিখেছেন:

> আজিকার দিনে বঙ্কিমচন্দ্রের অদৃশ্য হস্ত আমাদের জাতীয় জবিনকে যেরুপে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিতেছে তাহাতে ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র যতই উচ্চ স্থানে অবস্থান করুন, বঙ্কিমচন্দ্রের অন্য মূর্তির পদপ্রান্তে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে আজ ব্যগ্র হইব ইহা স্বাভাবিক। বঙ্কিমচন্দ্র কতদিক হইতে আমাদের জীবনের উপর প্রভুত্ব করিতেছেন,তাহার গণনা দুষ্কর। ইংরেজিতে একটি বাক্য চলিত হইয়াছে, যাহার মূলে গ্রীক নাই, সে জিনিস জগতে অচল। বলা বাহুল্য এখানে জগত অর্থে কেবল পাশ্চাত্য দেশ বুঝায়। আমরা যদি ঐ বাক্যকে ইষৎ পরিবর্তিত করিয়া বলি যে, যাহার মূলে বঙ্কিমচন্দ্র নাই, সে জিনিস বাঙ্গলাদেশে অচল, তাহা হইলে নিত্যান্ত অত্যুক্তি হয় না। ইংরেজি গতিবিজ্ঞানে একটা শব্দ আছে-মোমেন্টম্ বাঙ্গলায় উহাকে 'ঝোঁক' শব্দে অনুবাদ করিতে পারি। যে কয়েকটা জিনিসকে ঝোঁক দিয়া ঠেলিয়া দিয়া গিয়াছেন, সেই কয়টা জিনিস বাঙ্গলাদেশে চলিতেছে । সেই জিনিসগুলা গতি উপার্জনের জন্য যেন বঙ্কিমচন্দ্রের হস্তের প্রেরণায় অপেক্ষায় ছিল; বঙ্কিমচন্দ্র হাত দিয়া ঠেলিয়া দিলেন, আর উহা চলিতে লাগিল, তাহার পর আর উহা থামে নাই। [...] বাঙ্গলা সাহিত্যে তাঁহার কোন্ কাজ সর্বাপেক্ষা বৃহৎ , তাহা জিজ্ঞাসা করিলে আমি বলিব, তিনি সাহিত্য উপলক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে আপন ঘরে ফিরিতে বলিয়াছেন এবং সে বিষয়ে তিনি যেমন কৃতকার্য হইয়াছেন, অন্য কেহই সেরুপ হন নাই।[৩২]

কবি ঈশ্বরগুপ্তের রচনার আদর্শে 'সংবাদ প্রভাকর ও সংবাদ-সাধুরঞ্জন' পত্রিকায়-গদ্য পদ্য লিখে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য সাধনার সূত্রপাত হয় । আর তাঁর প্রদীপ্ত মনীষা প্রকাশ পায় তাঁর সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' মাসিক পত্রিকায়। আমরা আগেই বলেছি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ নন। কারণ তিনি তাঁর পূর্বসুরী অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখের মতো শিক্ষক ছিলেন না। শিক্ষা বিষয়ে কাজকর্মও তাঁদের মতো বঙ্কিমের ছিল না। তবে সমকালের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে তিনি উদাসীন ছিলেন না। সমাজ-সংস্কৃতির নানা অসংগতি পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন দোষ ত্রুটিও তাঁর চোখে ধরা পড়েছে। তখন তিনি তা পাম কাটিয়ে যাননি। তাকে সমস্যা বলে চিহ্নিত করে তা সমাধানের উপায় খুঁজেছেন।

উনিশ শতকের একজন চিন্তাশীল মানুষ হিসেবে শিক্ষা ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের অবদান আমরা 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা সম্পাদনা এবং সমকালের শিক্ষাচিন্তকদের প্রতি তাঁর পূর্ণ সমর্থন-এ দু'দিক থেকে বিবেচনা করতে পারি। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে (বৈশাখ ১২৭৯ সনে)। প্রথম সংখ্যাতেই বঙ্কিমচন্দ্রের শিক্ষা বিষয়ক চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্গদর্শন পত্রিকার পত্র-সূচনা প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন:

> এই পত্র আমরা কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের হস্তে আরো এই কামনায় সমর্পণ করিলাম যে, তাঁহারা ইহাকে আপনাদিগের বার্তাবহস্বরূপ ব্যবহার করুন। বাঙ্গালী সমাজে ইহা তাঁহাদিগের বিদ্যা, কল্পনা, লিপিকৌশল এবং চিত্তোৎকর্ষের পরিচয় দিক। তাঁহাদিগের উক্তি বহন করিয়া ইহা বঙ্গ মধ্যে জ্ঞানের প্রচার করুক।[৩৩]

সেকালের এদেশের শিক্ষাব্যবস্থা এবং তাতে মাতৃভাষার উপযুক্ত আসন সম্পর্কে বঙ্কিমন্দ্রের এই অভিমত গুরুত্বপূর্ণ। তখনকার শিক্ষিত সমাজ এর মর্ম কিছুটা অনুধাবন করেছিল । কিছুটা বলছি এ কারণে যে ইংরেজের আস্তাবলের দ্বার রক্ষার উপযোগী শিক্ষাপ্রাপ্তদের পক্ষে তা সহজে বুঝা সহজ ছিল না। প্রকৃত শিক্ষিত প্রসঙ্গে আমরা হিসেবে অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগ অধ্যায়ে আগেই আলোচনা করেছি। সেই বিবেচনায় বঙ্কিমের এ মতামত যথার্থ।'বঙ্গদর্শন' যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন বঙ্কিম পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের পুরোধা রবীন্দ্রনাথের বয়স এগার। সেই বয়সেই তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের অনুরাগী হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবন স্মৃতিতে লিখেছেন:

> অবশেষে বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন আসিয়া বাঙালির হৃদয় একেবারে লুট করিয়া লইল। একে তো তাহার জন্য মাসান্তের প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতাম, তাহার পরে বড়োদের পড়ার শেষের জন্য অপেক্ষা করা আরো বেশি সুঃসহ হইত। বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর এখন যে-খুশি সেই অনায়াসে একেবারে একগ্রাসে পড়িয়া ফেলিতে পারে, কিন্তু আমরা যেমন করিয়অ মাসের পরে মাস, কামনা করিয়া, অপেক্ষা করিয়া, অল্পকালের পড়াকে সুদীর্ঘকালের অবকাশের দ্বারা মনের মধ্যে অনুরণিত করিয়া—তৃপ্তির সঙ্গে অতৃপ্তি, ভোগের সঙ্গে কৌতুহলকে অনেক দিন ধরিয়া গাঁথিয়া গাঁথিয়া পড়িতে পাইয়াছি, তেমন করিয়া পড়িবার সুযোগ কেহ পাইবে না।[৩৪]

বঙ্গদর্শন' বাঙালির কাছে কতটা গ্রহণের বস্তু হয়ে উঠেছিল রবীন্দ্রনাথের এ বক্তব্যই তার প্রমাণ। যদিও তা বঙ্গদর্শনের গুনাগুণ বিচার নয়। কারণ নিতান্ত বালক বয়সে রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্গদর্শন' সম্পর্কে এ ধারণা ব্যক্ত করেছিলেন । কিন্তু পরবর্তীতে পরিণত বয়সে এসেই কী তা তাঁর পরিবর্তন হয়েছিল ? প্রমাণদৃষ্টে তা মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অভিজ্ঞতা দিয়ে বঙ্গদর্শনের গুরুত্ব গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন। অনুসন্ধান করে জানা যায় যে তিনি বিভিন্ন প্রসঙ্গে এই বঙ্গদর্শনের বিশেষ ঋণ কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করেছেন। তিনি বলেছেন:

> তার (বঙ্গদর্শনের) আগে বাংলাভাষায় গদ্যপ্রবন্ধ ছিল ইস্কুলে পোড়োদের উপদেশের বাহন। বঙ্কিমের আগে শিক্ষিত সমাজ নিশ্চিত স্থির করেছিলেন যে তাঁদের ভাবরসভোগের ও সত্যসন্ধানের উপকরণ একান্তভাবেই য়ুরোপীয় সাহিত্য হতেই সংগ্রহ করা সম্ভব, কেবল অল্পশিক্ষিতদের ধাত্রীবৃত্তি করবার জন্যই দরিদ্র বাংলাভাষার যোগ্যতা। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজী শিক্ষার পরিণত শক্তিকেই রূপ দিতে প্রবৃত্ত হলেন বাংলাভাষায় বঙ্গদর্শন মাসিকপত্রে। বস্তুত নবযুগপ্রবর্তক প্রতিভাববানের সাধনায় ভারতবর্ষে সর্বপ্রথমে বাংলাদেশেই য়ুরোপীয় সংস্কৃতির ফসল ভাবীকালের প্রত্যাশা নিয়ে দেখা দিয়েছিল, বিদেশ থেকে আনীত পণ্য আকারে নয়, স্বদেশের ভূমিতে উৎপন্ন শস্যসম্পদের মতো।[৩৫]

বঙ্গদর্শনের আগেও অনেক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে রাজা রামমোহান রায়ের সম্পাদনায়-সম্বাদ কৌমুদী (১৮১৯),ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর (১৮৩০),তত্ত্ববোধিনী (১৮৪৩) রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বিবিধার্থ সংগ্রহ (১৮৫১) দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের 'সোমপ্রকাশ'(১৮৫৬) প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলা গদ্য ভাষার সূচনা পর্বে এসব পত্রিকার অসামান্য ভূমিকা ছিল। 'তত্ত্ববোধিনী' সম্পর্কে আমরা আগেই জেনেছি এর মাধ্যমে দেবেন্দ্রনাথ ধর্ম-বিষয়ক গভীর আলোচনার সূত্রপাত করেছিলেন এবং সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত তাতে একটি সমাজ—সচেতন ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গি আনার প্রাণান্ত চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তুতা গ্রহণ করার মতো জাতীয় মানস তখনও উপযোগী হয়ে উঠেনি। ফলে তা অক্ষয়কুমার দত্তের আশানুরুপ সফলতা অর্জন করতে পারেনি। সেই তুলনায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' যথেষ্ট সফল হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে ভবতোষদত্ত লিখেছেন:

> এই পত্রিকাগুলি বাংলা গদ্যভাষা সৃষ্টির প্রথম যুগে নানা বিষয়ের আলোচনা দ্বারা ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে। কিন্তু কোনো পত্রিকাই সম্ভবত সর্বব্যাপী চিত্তজাগরণের কার্যে এমন ভাবে নিযুক্ত হয়নি। বঙ্গদর্শন পূর্ণাঙ্গ জীবনতত্ত্বকে তুলে ধরেছিল, তার পূর্বে যে চিন্তাগত বিচ্ছিন্নতা ছিল এবং বাগত অপূর্ণতা ছিল বঙ্গদর্শন তাকে ঐক্য সূত্রে গেঁথে দিল। তারই থেকে গড়ে উঠল আধুনিক জীবন-মূল্যবোধ। বঙ্গদর্শন একটি অসামান্য দীপ্ত প্রতিভাকে আশ্রয় করে সারা বাংলাভাষা ও সাহিত্যে আলো বিচ্ছুরিত করেছে। সে-আলো অন্ধ-বুদ্ধিকে বিপর্যস্ত করল আর বিশ্বব্যাপ্ত প্রাকৃতিক সত্যের স্বরূপকে উদ্‌ঘাটিত করল। ব্যক্তিচেতনাকে সার্বভৌম নীতি-নিয়মে অবহিত করে তুলল। বস্তুত বঙ্গদর্শনকে দেখতে হবে ঊনিশ শতকে বাংলা ও বাঙালির নবজাগরণের পটভূমিতেই। বঙ্গদর্শন কোনো একক আকস্মিক আবির্ভাব নয়। বঙ্গদর্শন বাঙালির দর্শন-অভিলাষকে প্রতিফলিত করেছে। রামমোহন থেকে শুরু হয়েছিল যুক্তিবাদের যাত্রা, অক্ষয়কুমার-বিদ্যাসাগর থেকে শুরু হয়েছিল গদ্যভাষাবাহন গড়ে তুলবার প্রয়াস, বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত সাহিত্যের কাহিনির পুনর্বর্ণনায় এবং প্যারীচাঁদের উপন্যাস-কল্প রচনায় শুরু হয়েছিল রস-সাহিত্যসৃষ্টির আয়োজন, বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনে সেই সব বিচিত্র প্রবাহ একট পূর্ভ সিদ্ধিতে এসে পৌঁছল।[৩৬]

অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগরের পরে বাংলা ভাষায় শিক্ষার বিস্তারের ক্ষেত্র প্রস্তুতে বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন বাঙালির মানস গঠনে সহায়ক হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তা দারুনভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন:

> যখন প্রথম বঙ্কিমবাবুর বঙ্গদর্শন একটি নূতন প্রভাতের মতো আমাদের বঙ্গদেশে উদিত হইয়াছিল তখন দেশের সমস্ত শিক্ষিত অন্তর্জগৎ কেন এমন একটি অপূর্ব আনন্দে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল? য়ুরোপের দর্শনে বিজ্ঞানে ইতিহাসে যাহা পাওয়া যায় না এমন কোনো নূতন তত্ত্ব,নূতন আবিষ্কার বঙ্গদর্শন কি প্রকাশ করিয়াছিল ? তাহা নহে। বঙ্গদর্শনকে অবলম্বন করিয়া একটি প্রবল প্রতিভা আমাদের ইংরাজি শিক্ষা ও

Dhaka University Institutional Repository

> আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যবর্তী ব্যবধান ভাঙিয়া দিয়াছিল, বহুকাল পরে প্রাণের সহিত ভাবের একটি আনন্দসম্মিলন সংঘটন করিয়াছিল, প্রবাসিকে গৃহের মধ্যে আনিয়া আমাদের গৃহকে উৎসবে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। এতদিন মথুরায় কৃষ্ণ রাজত্ব করিতেছিলেন, বিশ-পঁচিশ বৎসর কাল দ্বারীর সাধ্যসাধন করিয়া তাহার সুদূর সাক্ষাৎলাভ হইত ; বঙ্গদর্শন দৌত্য করিয়া তাঁহাকে আমাদের বৃন্দাবনধামে আনিয়া দিল। এখন আমাদের গৃহে, আমাদের সমাজে, আমাদের অন্তরে একটা নূতন জ্যোতি বিকীর্ণ হইল। আমরা আমাদের ঘরের মেয়েকে সূর্যমুখী কমলমণি-রূপে দেখিলাম, চন্দ্রশেখর এবং প্রতাপ বাঙালি পুরুষকে একটা উচ্চতর ভাবলোকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিল, আমাদের প্রতিদিনের ক্ষুদ্র জীবনের উপরে একটি মহিমরশ্মি নিপতিত হইল। বঙ্গদর্শন সেই-যে এক অনুপম নূতন আনন্দের আস্বাদ দিয়া গেছে তাহার ফল হইয়াছে এই যে, আজকালকার শিক্ষিত লোকে বাংলা ভাষায় ভাব প্রকাশ করিবার জন্য উৎসাহী হইয়া উঠিয়াছে।এটুকু বুঝিয়াছে যে, ইংরাজি আমদের পক্ষে কাজের ভাষা কিন্তু ভাবের ভাষা নহে।[৩৭]

বঙ্গদর্শন' প্রকাশের আগে বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজিতে চারটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। আমরা দেখি যে, ঐসব প্রবন্ধের কোনো কোনোটির মধ্যে বঙ্গদর্শন পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্যে বিবৃত হয়েছে। তিনি পপুলার লিটারেচার' প্রবন্ধটিতে লোক প্রিয় সাহিত্য বলতে বাংলা সাহিত্যকেই নির্দেশ করেছেন। সেখানে তিনি সাধারণ বাঙালির জন্য জনপ্রিয় বাংলা সাহিত্য প্রত্যাশা করেছেন। তিনি লিখেছেন:

> It is only through the Bengali that the people can be moved. We preach in English and harangue in English and write in English, perfectly forgetful that the great masses, whom it is absolutely necessary to move in order to carry out any great project of social reform, remain stone-deaf to all our eloquences. To me it seems that a single great idea, communicated to the people of Bengal in their own language, circulated among them in the language that alone touches their hearts, vivifying and permeating the conceptions of all ranks, will work out grander results than all our English speeches and preaching will ever be able to achieve.[৩৮]

বঙ্কিমচন্দ্রের এসব প্রবন্ধের বিষয়বস্তু অনুধাবণ করলে আমরা সহজে বুঝতে পারি যে, তিনি প্রথম জীবনে ইংরেজি ভাষায় সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে মূলত স্বদেশ স্বজাতির মঙ্গল সাধন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বিজাতীয় ভাষায় তা কোনো ভাবেই করা সম্ভব নয়। তিনি বুঝেছিলেন স্বদেশি ভাষা ভিন্ন অন্য কোনো ভাষায় সাহিত্য চর্চা করলে তা স্বজাতির কাছে পৌঁছাবে না। শুধু সাহিত্য নয়, কোনো চিন্তাই বাঙালির কাছে গ্রহনের বস্তু হবে না। তাই তিনি স্বযত্নে অত্যন্ত সচেতনভাবেই সেই পথ পরিহার করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা ভাষাকে আশ্রয় করেই তাঁর সমস্ত চিন্তার পূর্ণতা দানে মনোযোগী হয়েছিলেন। এ বিষয়টি ভবতোষদত্তের ব্যাখ্যায় আরো স্পষ্ট হয়েছে। তিনি লিখেছেন:

> ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গদর্শন পত্রিকা প্রকাশের মূলে বঙ্কিমচন্দ্রের মনে ছিল যে, উদ্দেশ্য, দেখা যাচ্ছে দু-বছর আগেই তাঁর মনে সেই চিন্তা দেখা দিয়েছে। হয়তো তখনও এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য স্বয়ং পত্রিকা প্রকাশের কথা ভাবেননি কিন্তু তরুণ বঙ্কিম আকণ্ঠ ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করেও সন্তুষ্ট থাকতে পারেননি। এই শিক্ষার মহত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর মনে বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না, কিন্তু উৎকণ্ঠিত ছিলেন শিক্ষাকে কেমন করে বাঙালি জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া যায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি চাকরিতে ঢুকলেন বটে কিন্তু বৃহত্তর এবং মহত্তর চিন্তায় তিনি মগ্ন। আধুনিক বিদ্যাকে দেশে সার্থক করে তুলতে হবে, শুধু তাঁর মতো কয়েকজন ইংরেজি শিক্ষিত ব্যক্তি সমাজে থাকলেই সমাজের রূপান্তর ঘটে না। এই শিক্ষাকে সমাজের সর্বদেহে রক্তের সঙ্গে সঞ্চারিত করে দিতে হবে। 'শিক্ষা' অর্থে তো কেবল তথ্য সঞ্চয় বোঝায় না, শিক্ষা একটা দৃষ্টিভঙ্গি; প্রশস্ত উদার মানবিক যুক্তিবাদী এবং সহৃদয় চেতনার অধিকারী হওয়াই শিক্ষা। যারা ইংরেজি ভাষা জানে না, তাদের ক্ষেত্রে কি নবজাগরণের নির্দেশ ব্যর্থ হবে? বঙ্কিমচন্দ্র এই চিন্তাতেই পীড়িত হচ্ছিলেন।'[৩৯]

বঙ্কিমচন্দ্রের এই পীড়িত হওয়ার মধ্যেই বাংলা ভাষার অনেকখানি সুস্থতা ও শৃঙ্খলা লুকানো ছিল বলেই আমাদের ধারণা। আমরা তার প্রমাণ পেয়েছি শম্ভুচন্দ্র মুখার্জীর-মুখার্জিস ম্যাগাজিনে লেখার আমন্ত্রণ সরিয়ে রেখে বঙ্কিমচন্দ্রের বাংলা পত্রিকা 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের পর। প্রথম সংখ্যার পত্র সূচনাতেই তিনি দীর্ঘপোষিত প্রত্যাশা যখন আমাদের কাছে ব্যক্ত করলেন, তখনই আমরা বুঝলাম তিনি দূরের কেউ নন, আমাদের নিজের লোক, আমাদের বাংলা ভাষার পুষ্টিবিধায়ক । এ পত্রিকায় তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদান পদ্ধতির যুক্তিনিষ্ঠ সমালোচনা করলেন। শিক্ষা যে 'জল বা দুগ্ধ নহে' তা তুলে ধরলেন সবার সামনে। শুধু তিনি নন, বহুজনকে এ পত্রিকায় লেখক হিসেবে টেনে আনলেন। যাঁরা নতুন লেখক বা অন্যভাষার লেখালেখি করেন

Dhaka University Institutional Repository

তাঁরা বঙ্কিমচন্দ্রের অনুপ্রেরণায় বাংলা ভাষায় লিখতে শুরু করলেন বঙ্গদর্শনে। প্রত্নতাত্ত্বিক রামদাস সেন কবিতা লেখা ছেড়ে বঙ্কিমচন্দ্রের অনুপ্রেরণায় ভারত বিষয়ক প্রবন্ধ লিখতে আরম্ব করেন 'বঙ্গদর্শনে'। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস সংস্কৃত সাহিত্য, বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম, সংগীতশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে লেখা তাঁর বহু প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায়। রামদাস বাংলা ভাষায় এসব প্রবন্ধ লিখে বাংলার জটিল ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব চর্চার সূত্রপাত করেন। এদেশে বাংলা ভাষায় ইতিহাস চিন্তা এবং ইতিহাস শিক্ষার ক্ষেত্রে এর মূল্য আছে। সংস্কৃত ও ইংরেজি গ্রন্থ থেকে সংকলন করে রামদাস সেন বাংলা ভাষায় 'ঐতিহাসিক রহস্য ১ম ভাগ' (১৮৭৪) লিখেছিলেন। এ রচনাটির ভূমিকায় তিনি লিখেছেন:

> আমার পরম সুদৃদ্ বঙ্গদর্শনের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহোদয়ের অনুরোধক্রমে আমি এই প্রস্তাবগুলি বহু পরিশ্রম ও বহ্যায়াস স্বীকার-পূর্বক নানাবিধ প্রাচীন সংস্কৃত ও ইংরেজি গ্রন্থ হইতে সংকলন করিয়া বঙ্গদর্শনে প্রকাশ করি।[৪০]

এই রামদাসের দেহ বেঁচে ছিল বিয়াল্লিশ বছর, কিন্তু তাঁর চিন্তা বেঁচে আছে এখনো। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত ঐ প্রবন্ধগুলো সেকালে রামদাসকে শুধূ খ্যাতিই এনে দেয়নি,তাঁকে বাংলা ভাষায় ইতিহাস-পুরানের পৃষ্ঠপোষকও বানিয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র রামদাসের মতো আরো অনেককেই তাঁর বঙ্গদর্শনে লিখতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। এঁদের মধ্যে রাজকৃষ্ণ অন্যতম। বঙ্কিমচন্দ্র নিজের যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, বাঙালি-চিত্তে সঞ্চারিত করার যে স্বপ্ন সেকালে দেখেছিলেন তাঁর অনেকখানিই সফল হয়েছিল রাজকৃষ্ণের লেখার মধ্য দিয়ে। বঙ্গদর্শনে রাজকৃষ্ণের ষোলোটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর এসব প্রবন্ধে নীতি, ইতিহাস, দর্শন, সমাজতত্ত্ব সংস্কৃত, সাহিত্য, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয় স্থান পেয়েছিল। যদিও অক্ষয়কুমার দত্ত বহু আগেই এসব বিষয়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় লিখেছিলেন। তবে সেগুলোর সঙ্গে রাজকৃষ্ণের লেখার বৈশিষ্ট্যগত ভিন্নতা আছে। বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্য রীতির চিন্তা ধারার সঙ্গে বাঙালি চিত্তের যে নতুন কর্মযোগ সাধন করতে চেয়েছিলেন রাজকৃষ্ণের প্রবন্ধে তার প্রতিফলন ঘটেছিল। রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বঙ্গদর্শনে 'প্রথম শিক্ষা বাঙলার ইতিহাস' (১৮৭৪) লিখেছিলেন। ইতিহাস-ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগী বঙ্কিমচন্দ্র রাজকৃষ্ণের এই গ্রন্থকে 'সুবর্ণের মুষ্টি' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। আকারে ছোট হলেও বইটি তাঁর কাছে ছিল মহামূল্যবান। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন:

> মুষ্টিভিক্ষা হউক, কিন্তু সুবর্ণের মুষ্টি। গ্রন্থখানি মোটে ৯০ পৃষ্ঠা, কিন্তু ঈদৃশ সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ বাঙ্গালার ইতিহাস বোধহয় আর নাই। অল্পের মধ্যে ইহাতে যত বৃত্তান্ত পাওয়া যায়, তত বাঙ্গালা ভাষায় দুর্লভ। সেই সকল কথার মধ্যে অনেকগুলি নতুন; এবং অবশ্যজ্ঞতব্য। ইহা কেবল রাজগণের নাম ও যুদ্ধের তালিকামাত্র নহে; ইহা প্রকৃত সামাজিক ইতিহাস। বালাক শিক্ষার্থ যে সকল পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় নিত্য নিত্য প্রণীত হইতেছে, তন্মধ্যে ইহার ন্যায় উত্তম গ্রন্থ অল্প। ইংরেজীতেও যে সকল ক্ষুদ্র ইতিহাস বালক শিক্ষার্থ প্রণীত হয়, তন্মধ্যে এইরূপ ইতিহাস দেখা যায় না। কেবল বালক নহে, অনেক বৃদ্ধ ইহাতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতে পারেন।[৪১]

রাজকৃষ্ণের প্রথম শিক্ষা বাঙলার ইতিহাস গ্রন্থ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের এ প্রশংসার সমর্থন জানিয়েছিলেন, সেকালের বিখ্যাত মানুষ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি লিখেছেন:

> His little work on the History of Bengal throws a flood of light upon an unexplored region of historical research. It is a little unpretentious work which more ambitions authors would hesitate to call a book, but in point of research and learning, it stands unsurpassed among the modern works on the History of Bengal.[৪২]

আকারে ক্ষুদ্র হওয়া সত্ত্বেও এর বিষয়বস্তু পর্যবেক্ষণে সুরেন্দ্রনাথের এমন ধারণা হয়েছিল। সুরেন্দ্রনাথের বিচার, বইটি 'বালকপাঠ্য' হলেও তাতে লেখক এমন সব তথ্যের সমাবেশ ঘটিয়েছেন যে, এর আগে প্রকাশতি অন্য কোনো গ্রন্থে তা দেখা যায়নি। তাঁর এ ধারণা ভুল ছিল না। কারণ রাজকৃষ্ণ দর্শনে পড়াশুনা করলেও স্বেচ্ছায় তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহু শাখায় বিচরণ করেছিলেন। তাঁর সে জ্ঞানের প্রতিফলন ঘটেছিল ঐ ছোট বইটিতে । ১৮৮৬ সালের সংস্করণে যেসব সহায়ক গ্রন্থের পরিচয় তিনি দিয়েছিলেন তার মধ্যে এমন প্রবন্ধ ও বইয়ের নাম ছিল, সেগুলো ইংরেজিতে লেখা বাংলার ইতিহাসে আর কেউ ব্যবহার করেননি। তার মধ্যে এমন প্রবন্ধ ও বইয়ের নাম ছিল, যেগুলি তখনকার দিনে বিখ্যাত মার্শম্যান স্টুয়ার্ট লেথব্রিজও ব্যবহার করেননি। একদিকে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিপোর্ট, সেন্সাস রিপোর্ট, ফাহিয়েন হিউএন সাঙের স্মৃতিকথা, আইন-ই-আকবরী, সিয়রউল মুতাখরীন, এলফিনস্টোন অর্স ব্লকম্যান, হান্টার, ওয়েস্টম্যাকট প্রভৃতি আর-একদিকে মূইরের সংস্কৃত গ্রন্থমালা ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত, মহাবংশ, রামগতি ন্যায়রত্নের বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব, রজনীকান্ত গুপ্তের জয়দেবচরিত, বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত শ্রীহর্ষ ও বিদ্যাপতি-বিষয়ক প্রবন্ধ,

কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের ভারতবর্ষের ইতিহাস, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কিশোরীচাঁদ মিত্রের প্রবন্ধ প্রভৃতি ছিল। মার্শম্যান স্টুয়ার্টের ঋণ স্বীকারেও তিনি কার্পণ্য করেননি।[৪৩] এ গ্রন্থ বঙ্কিমচন্দ্রকে স্বদেশের মহিমা চিন্তায় নতুন করে আলোড়িত করেছিল। 'প্রথম শিক্ষা বাঙলার ইতিহাস' মূল অনুধাবনে তাঁর চিত্তে বঙ্গচেতনা নবজন্ম লাভ করে। দেশাত্ববোধে তিনি আরো বেশি সুগঠিত হন। বঙ্কিমচন্দ্রের এই নবতর দৃষ্টিভঙ্গি এবং স্বদেশানুরাগ পরবর্তীতে বাংলাভাষায় জনশিক্ষা বিস্তারে তাঁকে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ ভূমিকায় অবতীর্ণ করেছে। ' লোক শিক্ষা' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন:

> লোকসংখ্যা গণনা করিয়া জানা গিয়াছে যে, বাংলাদেশে না কি ছয় কোটি ষাট লক্ষ্য মনুষ্য আছে। ছয় কোটি ষাটি লক্ষ মনুষেক্যর দ্বারা সিদ্ধ না হইতে পারে, বুঝি পৃথিবীতে এমন কোনও কার্যই নাই। কিন্তু বাঙালির দ্বারা কোনও কার্যই সিদ্ধ হইতেছে না। ইহার অবশ্য কোনও কারণ আছে। লৌহ অস্ত্রে পরিণত হইলে তদ্বারা প্রস্তর পর্যন্ত বিভিন্ন করা যায়, কিন্তু লৌহমাত্রেরই ত সে গুণ নাই। লৌহকে নানাবিধ উপাদানে প্রস্তুত, গঠিত, শাণিত করিতে হয়। তবে লৌহ ইস্পাত হইয়া কাটে। মনুষ্যকে প্রস্তত, উত্তেজিত, শিক্ষিত করিতে হয়, তবে মনুষ্যের দ্বারা কার্য হয়। বাংলার ছয় কোটি ষাটি লক্ষ লোকের দ্বারা যে কোনও কার্য হয় না, তাহার কারণ এই যে, বাংলায় লোকশিক্ষা নাই। যাঁহারা বাংলার নানাবিধ উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত, তাঁহারা লোকশিক্ষার কথা মনে করেন না, আপন আপন বিদ্যাবুদ্ধি প্রকাশেই প্রমত্ত। ব্যাপার বড় অল্প আশ্চর্য নহে। ইহা কখনও সম্ভব নহে যে, বিদ্যালয়ে পুস্তক পড়াইয়া, ব্যাকরণ জ্যামিতি শিখাইয়া, সপ্তকোটি লোকের শিক্ষাবিধান করা যাইতে পারে। সে শিক্ষা শিক্ষাই নহে এবং সে উপায়ে এ শিক্ষা সম্ভবও নহে। চিত্তবৃত্তি সকলের প্রকৃত অবস্থা, স্ব স্ব কার্যে দক্ষতা, কর্তব্য কার্যে উৎসাহ, এই শিক্ষাই শিক্ষা।[৪৪]

আশুতোষ লোক শিক্ষা এবং লোকসাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা ও গভীরতা বুঝতেন। লোক শিক্ষায় শিক্ষিত চন্দ্রকুমার দে–কে মর্যাদা যেমন দিয়েছিলেন তেমনি বাংলার এম.এ.পাঠ্যক্রম তৈরির শুরুতেই লোকসাহিত্য পাঠ্যবিষয় হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। বাংলার গ্রাম-গ্রামান্তরে ঘুরে তার আগেই পুঁথি সংগ্রহের কাজ করে রেখেছিলেন চন্দ্রকুমার দে। তাঁর অনুপ্রেরণা এবং প্রত্যক্ষ সহায়তায় দীনেশচন্দ্র সেন চন্দ্রকুমারের অমর সংগ্রহ 'মৈয়মনসিংহ গীতিকা' সম্পাদনা ও ব্যাখ্যা করেছিলন। আশুতোষ এটিকে 'জমি তৈরি' করা বলে অভিহিত করেছিলেন। কিন্তু সেকালে খুব অল্প সংখ্যই এর মর্যাদা বুঝতেন। কারণ তাঁরা তখন ইংরেজি নিয়ে মেতে উঠেছিলেন। বাঙালির তাঁর নিজস্ব ভাষা সংস্কৃতিকে যথার্থরূপে ব্যবহার না করে ইংরেজি প্রীতির ও আভিজাত্যের নিদর্শনরূপে ইংরেজি ভাষাকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিল। ফলে বাংলা ভাষা সংকটে পড়েছিল। এই বিষয়টিকে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'বঙ্গদর্শনের পত্র-সূচনা' প্রবন্ধে লিখেছেন:

> আমরা ইংরেজি বা ইংরাজের দ্বেষক নহি। ইহা বলিতে পারি যে, ইংরাজ হইতে এদেশের লোকের যত উপকার হইয়াছে, ইংরেজি শিক্ষাই তাহার মধ্যে প্রধান। অনন্ত রত্নপ্রসূতি ইংরাজি ভাষার যতই অনুশীলন হয়, ততই ভাল। আরো বলি, সমাজের মঙ্গল জন্য কতকগুলি সামাজিক কার্য্য রাজপুরুষদিগের ভাষাতেই সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। আমাদিগের এমন অনেকগুলিন কথা আছে, যাহা রাজপুরুষদিগকে বুঝাইতে হইবে। সে সকল কথা ইংরাজিতেই বক্তব্য। এমন অনেক কথা আছে যে, তাহা কেবল বাঙ্গালীর জন্য নহে; সমস্ত ভারতবর্ষ তাহার শ্রোতা হওয়া উচিত। সে সকল কথা ইংরাজিতে না বলিলে, সমগ্র ভারতবর্ষ বুঝিবে কেন? ভারত বর্ষীয় নানা জাতি একমত, একপরামর্শী, একোদ্যম, কেবল ইংরাজির দ্বারা সাধনীয়; কেন না, এখন সংস্কৃত লুপ্ত হইয়াছে। বাঙ্গালী, মহারাষ্ট্রী, তেলঙ্গী, পাঞ্জাবী, ইহাদিগের সাধারণ মিলনভূমি ইংরাজি ভাষা। এই রজ্জুতে ভারতীয় ঐক্যের গ্রন্থি বাঁধিতে হইবে। অতএব যতদূর ইংরাজি আবশ্যক ততদূর চলুক। কিন্তু একেবারে ইংরাজ হইয়া বসিলে চলিবে না। বাঙ্গালী কখন ইংরাজ হইতে পারিবে না।[৪৫]

বঙ্কিমচন্দ্র শিক্ষিতের সঙ্গে অশিক্ষিতের পার্থক্য তৈরির জন্য ইংরেজি শিক্ষাকে দায়ী করেছিলেন। আর সেটাই ছিল এদেশে লোক শিক্ষা বিলুপ্তর প্রধান কারণ। তিনি সুশিক্ষিত এবং অশিক্ষিতের মিলন প্রত্যাশা করেছিলেন। অশিক্ষিতের প্রতি সুশিক্ষিতে সমবেদনা চেয়েছিলেন তিনি তিনি লিখেছেন:

> ..... ইংরেজি শিক্ষার গুণে লোকশিক্ষার উপায় ক্রমে লুপ্ত ব্যতীত বর্ধিত হইতেছে না।কিন্তু আসল কথা বলি। কেন যে এ ইংরেজি শিক্ষা সত্ত্বেও দেশে লোকশিক্ষার উপায় হ্রাস ব্যতীত বৃদ্ধি পাইতেছে না, তাহার স্থূল কারণ বলি–শিক্ষিতে অশিক্ষিতে সমবেদনা নাই। শিক্ষিত, অশিক্ষিতের হৃদয় বুঝে না। শিক্ষিত, অশিক্ষিতের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না। মরুক রামা লাঙল চষে, আমার ফাইলকারি সুসিদ্ধ হইলেই হইল। রামা কিসে দিনযাপন করে, কি ভাবে, তার কি অসুখ, তার কি সুখ, তাহা নদের ফটিকচাঁদ তিলাধ মনে স্থান দেন না। বিলাতে কাণা ফসেট সাহেব, এ দেশে সার অসলি ইডেন ইহারা তাঁহার বক্তৃতা পড়িয়া কি বলিবেন, নদের ফটিকচাঁদের সেই ভাবনা। রামা চুলোয় যাক, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। তাঁহার মনের ভিতর

Dhaka University Institutional Repository

> যাহা আছে, রামা এবং রামার গোষ্ঠী– সেই গোষ্ঠী ছয় কোটি ষাটি লক্ষ্যের মধ্যে ছয় কোটি ঊনষাটি লক্ষ নব্বই হাজার নয় শ'–তাহারা তাঁহার মনে কথা বুঝিল না। যশ লইয়া কি হইবে? ইংরেজ ভালো বলিলে কি হইবে? ছয় কোটি ষাটি লক্ষ্যে ক্রন্দন ধ্বনিতে আকাশ যে ফাটিয়া যাইতেছে– বাংলায় লোক যে শিখিল না! বাংলায় লোক যে শিক্ষিত নাই, ইহা সুশিক্ষিত বুঝেন না। সুশিক্ষিত যাহা বুঝেন, অশিক্ষিতকে ডাকিয়া কিছু কিছু বুঝাইলেই লোকশিক্ষিত হয়। এই কথা বাংলার সর্বত্রে প্রচারিত হওয় আবশ্যক। কিন্তু সুশিক্ষিত, অশিক্ষিতের সঙ্গে না মিশিলে তাহা ঘটিবে না। সুশিক্ষিতে সমবেদনা চাই।[৪৬]

শিক্ষা ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের এসব মূল্যবান কথা আশুতোষকে ব্যাপকভাবে আলোড়িত করেছিল। তিনি নিজে সুশিক্ষিত হয়েছিলেন, শিক্ষার মর্যাদা এবং গুরুত্ব তিনি বুঝতেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর পক্ষে ছিলেন বলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অনেক কাজই সহজে করতে পেরেছিলেন।

৭

জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন ও শিক্ষা সংস্কার প্রস্তুতি

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে ব্রিটিশ সরকারের অধীনে আনার জন্য সরকার মনোনীত ব্রিটিশ কর্মচারিদের অনুপ্রবেশ, কার্লাইল সার্কুলারে স্কুল-কলেজে 'বন্দেমাতরম' গানের উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি এবং বঙ্গবাসী, সিটি, রিপন প্রমুখ স্বদেশি কলেজের সরকারি অনুমোদন বাতিল করা–এই তিনটি'[৪৭] বিষয়কে সামনে রেখেই স্বদেশি শিক্ষা-আন্দোলনের শুরু হয়। জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন যখন প্রবল হয়, তখন কার্জন কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন গঠন করে আইনের মাধ্যমে স্বদেশি শিক্ষার কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা করে। তখন বহু স্বদেশি কলেজের স্বীকৃতি তুলে নেওয়া হয়। তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সরকারের কুক্ষিগত হয়। শুরু হয় 'বঙ্গভঙ্গ' আন্দোলন। বাঙালি শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্তদের উপর চরম আঘাত আসে । জাতীয় আন্দোলনের তীব্রতা দিন দিন বাড়তে থাকে। এ অবস্থার মধ্যে ১৯০৬ সালে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠিত হয়। তার অধীনে 'বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ' এবং 'বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট' স্থাপিত হয়। জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের পুরোহিত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে 'গোলদীঘির গোলামখানা' বলে বর্ণনা করেন। এর ফলে ব্রিটিশ সরকার নাজেহাল হন। সরকার তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে শক্ত হাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য এই প্রতিষ্ঠান অনুরাগী একজন বাঙালি মনীষীকে উপাচার্য করার কথা ভাবেন। প্রখ্যাত আইনবিদ এবং গণিতজ্ঞ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তখন স্বদেশি ঝড়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বিসর্জন দিতে রাজি ছিলেন না। এ কারণে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে উপাচার্য হিসেবে মনোনীত করার প্রস্তাব তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন না। তিনি অত্যন্ত দৃঢ় চিত্তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাল ধরলেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর কাছ থেকে সরকার যা আশা করেছিলেন তিনি সে আশার সবটা পুরণ করতে রাজি ছিলেন না। অন্যদিকে স্বদেশি আন্দোলনের নেতারা তাঁর কাছে যা দাবী করলেন সেটাও তিনি রাখতে পারলেন না। চিত্তব্রত পালিত লিখেছেন:

> উপাচার্য হবার পরে আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের খোলনলচে বদলে দেন। আশুতোষের মত ছিল যে, উচ্চশিক্ষায় রাজনীতির হস্তক্ষেপ বাঞ্ছনীয় নয়, স্বদেশী নেতারা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বর্জন করে অবিমৃষ্যকারিতার পরিচয় দিয়েছিলেন।[৪৮]

আশুতোষের সেসব বিষয়ে কোনো আগ্রহ ছিল না। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কারে বেশি মনোযোগী ছিলেন। ব্রিটিশ সরকার সরকার মনে করেছিলেন যে, আশুতোষ আর যাই করুক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে অন্তত বিপ্লবের সূতিকাগারে পরিণত করতে পারবেন না। তাই আশুতোষের শিক্ষা সংস্কারের কাজে সরকার কোনো হস্তক্ষেপ করেননি। এই সুযোগে তিনি বিদ্যালয়ের জাতীয়করণে মন দিলেন। তাঁর চেষ্টায় এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্রমান্বয়ে বাংলা, সংস্কৃত, পালি ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি বিভাগ খোলা হলো । প্রাচীন, মধ্যযুগীয় এবং আধুনিক ভারতের ইতিহাস বিভাগও খোলা হলে এখানে। আশুতোষ বিখ্যাত পণ্ডিত মনীষীদের এনে বিশ্ববিদ্যালয়কে নতুন করে গড়ে তুলতে চাইলেন। তাঁর চেষ্টায় রাধাকৃষ্ণণ, ভাণ্ডারকর, গণেশ প্রসাদ, আবদুল্লাহ রসুল এবং হাসান সুরাবর্দি প্রমুখ এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত হলেন ।

আশুতোষের শিক্ষাসংস্কার কর্মতৎপরতা তখনকার ছাত্রদের মনে যে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। সমকালের বহু পণ্ডিতের চিন্তায়,লেখায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ভারততত্ত্ববিদ হিসাবে বিখ্যাত অধ্যাপক কালিদাস নাগ তাঁর ১২.২.১৯১৪ তারিখের দিনলিপিতে লিখেছেন :

> আশুবাবুর regime এ আমরা প্রথম বিশ্ববিদ্যামন্দিরে প্রবেশ করি এবং আমরাই বোধহয় শেষ দল, আমাদের নিষ্ক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে বুঝি আশুবাবুকে যেতে হয়–তিনিও যাবেন এবং officialisation of education শুরু হবে - ইতিমধ্যে এই ক'বছরে একজন লোকা যে কতটা কাজ করে গেলেন, তা কিছুদিন পর সকলে বুঝবে - সহস্র দোষ থাকলেও স্বীকার করতে হবে তিনি এত অল্পকালের মধ্যে দেশের জন্য যে কাজ করে গেলেন এমন খুব কম লোকেই করেছে - যাবার সময়ে তাঁর অনুগ্রহে নকতক পাশ্চাত্য জ্ঞানযোগীকে দেখে নিলুম- Paul Vinogradoff (Corpus Professor of Jurisprudence, Oxford), "Kingship in early Law," Herman Jacobi (Professor of Sanskrit, Bonn) "Evolution of Indian Alankara শাস্ত্র" সম্বন্ধে Relationship Lactures দিলেন (গত বৎসর এই রকমেই Herman Oldenburg "Methods of Western Antiquarians in the field of Indian Research" সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। এইসব লোকেদের দেখে শিক্ষা ও সাধনার আদর্শ যে কতটা উচ্চ হয়ে গেছে, তা বলতে পারি না- মনে হচ্ছে, কিছুই শেখা হয়নি, এবার ক খ গ আরম্ভ করতে হবে।[৪৯]

এই ক্ষেত্রে আশুতোষের মহৎ কর্মপ্রচেষ্টা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

> লোকের অভাব, অর্থের অভাব, স্বজন-পরজনের প্রতিকুলতা, কিছুই তিনি গ্রাহ্য করেননি। বিশ্ববিদ্যালয়ের আত্মশ্রদ্ধার প্রবর্তন হয়েছে এইখানেই। তার প্রধান কারণ, বিশ্ববিদ্যালয়কে আশুতোষ আপন করে দেখতে পেরেছিলেন, সেই অভিমানেই এই বিদ্যালয়কে তিনি সমস্ত দেশের আপন করে তোলবার ভরসা করতে পারেন।[৫০]

উনিশ শতকের বাংলায় শিক্ষার মাধ্যমে ম্যানুষের সার্বিক মুক্তি চিন্তকদের মধ্যে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কর্মকাণ্ড এখনো অম্লান। তিনি যথার্থই কর্মবীর ছিলেন। বিচারালয়, আইনসভা, বিশ্ববিদ্যালয়, এশিয়াটিক সোসাইটি, শিক্ষা কমিশন প্রতি প্রতিষ্ঠানেই তিনি তাঁর কর্ম দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর মতো এমন কর্মময় জীবনের সাক্ষাৎ খুব কম ব্যক্তির জীবনেই ঘটে। পিতার এই সর্বব্যাপী কর্মোদ্যমের, অফুরন্ত কর্মশক্তির কথা বলতে গিয়ে শ্যামাপ্রসাদ লিখেছেন:

> তাঁহার ধারণায় মানুষই কর্তা-সে অবস্থার দাস নহে। যাঁহারা তাঁহার সান্নিধ্যে আসিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিয়াছেন, তিনি গঠনকারী একটি বিরাট প্রতিভা, তিনি ভাগ্যের স্রষ্টা এবং জাতি ও সমাজের ভবিষ্যতের নিয়ন্তা।....তাঁহার ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য দুইভাবে প্রকাশ পাইয়াছে-একদিকে তিনি ছিলেন কর্মবীর, অপরদিকে ভাবপ্রবণ ও কল্পনাশীল।....যাহারা স্থূলদর্শী তাঁহাদের নিকট আশুতোষ প্রচণ্ড ও অফুরন্ত কর্মশক্তির একটি আবাস-স্বরূপ; কিন্তু অতি অল্প লোকই জানিতেন যে তিনি স্বপ্নরাজ্যের লোক এবং এক সুমহান স্বপ্নদ্রষ্টা।[৫১]

আশুতোষের সেই স্বপ্ন–কল্পনা বাস্তব-রাজ্যের বাইরে নয়। তা একান্তই প্রত্যক্ষ, বাস্তব জীবনের, মানুষের উন্নতি ও অগ্রগতির। তিনি জীবনে কখনো বৃথা কল্পনাশীলতার পরিচয় দেননি। তিনি যা চিন্তা করতেনতা কর্মে পরিণত করতেন। তিনি তাঁর কাজের প্রতি যেমন একাগ্রচিত্ত ছিলেন তেমনি ছিলেন আত্মবিশ্বাসী। সেই স্বপ্ন পুরণের সাহস এবং শক্তি দুটোই তাঁর ছিল। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন:

> তিনি যে সকল স্বপ্ন দেখিতেন, তাহা সংসারক্ষেত্রে যুঝিয়া তিনি সফল করিতে পারিতেন-তাঁহার স্ব-ক্ষমতার উপর এতটা প্রত্যয় ছিল যে, তিনি বিজয়ী হইবেন, ইহা জানিয়াই তিনি কর্মের পরিকল্পনা করিতেন-তাঁহার সঙ্কল্পগুলি কৃতকার্যতার পথস্বরূপ ছিল।[৫২]

আশুতোষের পরিকল্পিত শিক্ষানীতিতে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার সঙ্গে কলেজ ও স্কুল শিক্ষার সার্বিক উন্নয়ন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষার ধারা বহন করে আনার জন্য স্কুল কলেজগুলিকে পুরাণের ভগীরথ হতে হবে। তারাই পারবে শাখা নদী উপনদীর মতো শিক্ষা-স্রোতধারায় সারা দেশ পরিপ্লাবিত করে সে শিক্ষা জনসমুদ্রে মিলিয়ে দিতে। আশুতোষ মনেপ্রাণে তাই শিক্ষার পরিশ্রুতিবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর শিক্ষাতত্ত্বে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পরস্পর সম্পূরক। তিনি বিশ্বাস করতেন এই তিন ধাপের মধ্যে সম্পূর্ণ সংহতি না থাকলে কোন শিক্ষাই স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে না।

Dhaka University Institutional Repository

৮

মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কার

আশুতোষ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে জড়িত হওয়ার সময় থেকেই এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা ব্যবস্থার নানা রকম অসংগতি, দোষত্রুটি, শিক্ষার গলদ, অসম্পূর্ণতা প্রভৃতি বিষয়ে ওয়াকিবহাল ছিলেন। ফলে শিক্ষা সংস্কারের সময় শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর এসব ধারণা সহায়ক হয়েছিল। তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে প্রায় ছয়শত হাই স্কুল ছিল। বাংলা বিহার উড়িষ্যা আসাম এবং ব্রহ্মদেশব্যাপী বিস্তৃত অঞ্চলে অবস্থিত এসব স্কুল পরিদর্শনের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। ফলে এসব স্কুল পরিচালনা, শিক্ষক নিয়োগ, কমিটি গঠন, শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও মাহিনা দান, উপযুক্ত ঘরবাড়ি, আসবাব পত্র, পাঠাগার, খেলার মাঠ, সাহিত্য-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা প্রভৃতি বিষয়ে কোনো নিয়মনীতি ছিল না। এমন কি স্কুলগুলোর শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্যও কোনো উদ্যোগও লক্ষ করা যায় না। এক কথায় বেশির ভাগ স্কুলেই তখন বিশৃঙ্খলা এবং চরম দুরবস্থা বিরাজ করছিল।আশুতোষ দায়িত্ব গ্রহণের পর স্কুল শিক্ষার এই অবস্থার প্রতি সুনজর দেন। ১৯০৮ সালে দ্বিতীয় সমাবর্তন ভাষণে তিনি এদেশের স্কুলগুলির করুন দশা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন:

> It is safe to say that the educational Institutions of the future, quite as much as those of the present will be largely controlled, if not dominated by three factors, teachers, instruments and books. In each of these vital elements, the deficiency of our institutions is remarkable. They are, without exception, undermanned; of Libraries and Laboratories there are only a few any, which can satisfactorily stand the scrutiny of the most reasonable test applied according to western ideals. [৫৩]

শিক্ষা সংস্কারে আশুতোষ কোনো বিশেষ নীতি–পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন বা নিজে কোনো উপায় ঠিক করে দিয়েছেন এমনটি বলা যায় না। তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর তিনি তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই সেগুলোর সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছেন। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে তিনি একজন সুচিকিৎসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি সেকালের শিক্ষাব্যবস্থার অপূর্ণতা ও বিভিন্ন গলদ লক্ষ্য করেছেন। সেগুলো কেন সৃষ্টি হয়েছে? তা কীভাবে দূর করা যায় ? এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়েই তাঁর মনে শিক্ষার স্বরূপ, শিক্ষার উদ্দেশ্য, আদর্শ ও লক্ষ্য সম্পর্কে নিজস্ব এক সুদৃঢ় ধারণা গড়ে উঠেছে। শিক্ষার ব্যাপারে তিনি ভাববাদী (Theoretician) ছিলেন না, ছিলেন বাস্তববাদী প্রয়োগবিদ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে গিয়ে হাতেকলমে অভিজ্ঞতার আলোকে প্রয়োজন অনুসারে নীতি প্রণয়ন ও প্রয়োগ করেছেন। অনিল বিশ্বাস লিখেছেন:

> আশুতোষের শিক্ষাচিন্তাই প্রকৃতপক্ষে তাঁর শিক্ষাদর্শন। যদিও এ সম্বন্ধে কোন প্রণানলীবদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেননি, দীর্ঘ ৩৫ বছরের (১৮৮৯–১৯২৪) সাধনায় এ হয়েছে ধীরে ধীরে, আস্তে আস্তে ফুটেছে শিক্ষা-পদ্মের পাপঁড়িগুলি। এই শিক্ষাদর্শন সংরক্ষিত রয়েছে তাঁর সমাবর্তনী বক্তৃতায়, অন্যান্য ভাষণে এবং অধিষদ ও নিষদের কার্যক্রমে। কার্যক্রম থেকে এক সুস্পষ্ট শিক্ষাদর্শন ভেসে উঠেছে, বিধৃত হয়েছে জীববিদ্যা, সমাজবিদ্যা, ইতিহাস ও ধর্ম। এত দিকে জ্ঞান তাঁরই ছিল।[৫৪]

আশুতোষ মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন–'Education in the University is the development, the amplification, of School education, and on some issues its complement any. [৫৫] এ কারণেই স্কুল শিক্ষাকে উন্নত, গতিশীল এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ রুপদান করে ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের জন্য তৈরি করে তোলাই ভাইস চ্যানসেলর হিসাবে তিনি তার প্রাথমিক এবং আবশ্যিক কর্তব্য বলে মনে করেছিলেন। তিনি বলতেন:

> মৃত্তিকার তলদেশ থেকে প্রাণরস আহরণ ভিন্ন যেমন গাছের জীবনীশক্তি বৃদ্ধি পায় না, গাছ সতেজ হয় না, ফল দেয়না, তেমনি স্কুল-কলেজগুলি যদি সুগঠিত ও সুপরিচালিত না হয়, যদি সেখানকার শিক্ষা ব্যবস্থা ত্রুটিহীন ভাবে না গড়ে ওঠে এবং ছাত্রদের মানসিক ও শারীরিক উৎকর্ষ বিধানে গোড়া থেকে মনোযোগ না দেওয়া হয়, তা হলে বিশ্ববিদ্যালয় তার প্রাণরস আহরণ করবে কোথা থেকে? [৫৬]

তখন স্কুলগুলির উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের তেমন কোনো কর্তৃত্ব ছিল না । সরকার অল্প সংখ্যক স্কুল তদারকি করতেন। আর বিশাল সংখ্যক স্কুল চলত 'যদৃচ্ছা চলো' নীতিতে। একারণে স্কুলগুলির অবস্থা ছিল না ঘরকা, না ঘাটকা। এই অবস্থার যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য থেকে। তিনি বলেছেন:

> The relation of the University to its recognized schools is a matter of some difficulty, and has beaver been hitherto satisfactorily dealt with. Under the system which has prevailed for many years past, by far the largest majority of the schools recognized by the University have been practically without any control and supervision. The limited number of schools which are maintained by the Government or which, though owned by private individuals, are in enjoyment of aid from the Government, are periodically inspected by Government Inspectors, though the inspection is, perhaps, not as frequent and systematic as may be desired. There are, however, hundreds of schools throughout the Province, which are neither owned nor aided by the Government, which prepare candidates for the Entrance Examination, and are recognized by the University as qualified for the purpose. Many of these schools are maintained in a state of deficiency, but there are many more, which are much below the standard of efficiency contemplated by the new Regulations. The Regulations, therefore, provide for adequate control and supervision of all schools which enjoy the privilege of presenting candidates at he Entrance Examination. The University has conferred upon them this valued privilege, and the University is entitled to demand of them that they be maintained as places where sound education is imparted and discipline is enforced.....If the preliminary training is not adequate, if young men whose attainments do not plainly indicate that they are qualified to profit by a course of University Studies, are allowed to enter Colleges, it would be impossible to keep University education at the proper standard. [৫৭]

এ মতাবস্থায় তিনি চাইলেন এসব স্কুলকে সম্পূর্ণভাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মের অধীনে নিয়ে আসতে। শিক্ষকদের প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করে, শিক্ষার মান উন্নয়ন করতে। স্কুলে ভর্তির নিয়ম, শিক্ষা কারিকুলাম, পরীক্ষা পদ্ধতি, প্রশাসনিক কার্যক্রম প্রভৃতিতে পরিবর্তন করে শিক্ষাকে একটি উন্নত পরিকাঠামোতে দাঁড় করাতে। তাঁর মানসলোকের সেই আদর্শ স্কুল শিক্ষা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন:

> It is required at this stage of the career of the students that his power of expansion, reasoning and observation should have adequately developed. He should in the first place, have a place, have a through command over his vernacular; he may be reasonably expected to possess an accurate knowledge of its grammatical structure and a fairly wide acquaintance with acquaintance with the best specimens of its literature; he should also have regularly cultivated the art of composition and be able to express his ideas with care, elegance, clearness and precision.[৫৮]

আশুতোষ তাঁর এ স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদান করতে ১৯০৪ সালে ব্রিটিশের তৈরি শিক্ষা সংকোচনকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইনকে নিজের নিয়মনীতিতে কৌশলে ক্রমশ অকেজো করে তোলেন এবং নতুন রেগুলেশনের বলে বিশ্ববিদ্যালয় যে ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে তা প্রয়োগ করেন। তিনি স্কুল পরিলচালনার পদ্ধতি, শিক্ষার বিষয়, স্কুলে শিক্ষারপরিবেশ, স্কুল-অবকাঠামোর পরিবর্তন ও উন্নয়ন প্রভৃতি দিকে দৃষ্টিপাত করেন। তিনি অনুধাবন করলেন যে স্কুরগুলো উন্নতি নিশ্চিত করতে না পারলে, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার মানোন্নয়ন করা সম্ভব নয়। তাই শিক্ষার ভিত্তি তৈরি করার কাজে তিনি মনোযোগী হলেন। কারণ তিনি জানতেন, ঘরের বনিয়াদ যদি মজবুত না হয়, তাহলে তার উপর প্রাসাদ নির্মাণ করা যায় না। এই বিবেচনায় তিনি বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শকদের দ্বারা পর্যায়ক্রমে প্রায় ছয়'শতাধিক হাইস্কুল পরিদর্শনের পরিকল্পনা এবং তা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করলেন। এখানে কয়েকটি স্কুল সর্ম্পকে পরিদর্শকের রিপোর্ট '[৫৯] উল্লেখ করা যায়:

১. গড়বাটি হাই স্কুল (১৯১৪)- লাইব্রেরীর বরাদ্দ মাসে আট আনা এবং ছাত্রদের টিফিনের ছুটি মাত্র ৫ মিনিট।
২. মালিয়ারা হাইস্কুল, বর্ধমান (১৯১৩)- দশজন ছাত্র স্কুলেই বসবাস করে এবং রাত্রে ঘুমায়।
৩. হাতুগঞ্জ হাইস্কুল (১৯১২)- খাবার জল কাঠকয়লা ও বালি দিয়ে ফিলটার করে নিতে হবে।
৪. দিনাজপুর হাই ইংলিশ স্কুল (১৯১৪)- হেডমাষ্টার লাইব্রেরীঘরকে বেডরুম হিসেবে ব্যবহার করেন। স্কুল বোডিং একেবারে বাজারের মধ্যে।

Dhaka University Institutional Repository

৫. বিদ্যানন্দকাটী হাই স্কুল (১৯১৪)- It is located in a small golpata shed which is open on one side. The walls are of indifferent hogla mats
৬. বকসার হাই ইংলিশ স্কুল (১৯১০)- পানীয় জলা গঙ্গানদী থেকে সংগ্রহ করা হয়, তা ফুটিয়ে নেওয়া দরকার।
৭. কুমার রাধাপ্রসাদ ইনষ্টিটিউশন (১৯১০)- To remove the house of ill fame situated in the north of the school premises.
৮. গড় ভবানীপুর হাই ইংলিশ স্কুল (১৯১৪) Cremation ground nuisance has not yet been emoved.
৯. সিজগ্রাম হোসেনাবাদ হাই ইংলিশ স্কুল (১৯১৪)- Guru gets Rs. 5/-a month and clerk Rs. 7/- per mensem.
১০. জাসমেদপুর ভুপেন্দ্ররানায়ণ হাই ইংলিশ স্কুল (১৯১১) ক্লার্ককে দিয়ে ক্লাস নেওয়া বন্ধ করতে হবে।
১১. আকিয়াব গভঃ হাই স্কুল, বার্মা (১৯১৬) প্রধান শিক্ষক অন্য শিক্ষকদের ক্লাস নেওয়া নিয়ে সমালোচনা করেন, অতএব, তাকেও ক্লাস নিতে হবে।
১২. লক্ষীকান্তহাই স্কুল, ঢাকা (১৯১৫)- স্কুলের মাঠ ৬ মাস জলের তলায় ডুবে থাকে।
১৩. রাহাৎ আলি হাই ইংলিশ স্কুল (১৯১৬) ১৫০০ টাকা খরচ করে একটি নতুন ভবন তৈরী করত হবে।
১৪. বেনিয়াচোঙ হরিশচন্দ্র হাই ইংলিশ স্কুল, সুরমা উপত্যকা (১৯১৬) A rival school has been opened detachinga large number of pupils from the school.
১৫. সেন্ট পলস হাই ইংলিশ স্কুল, রাচী (১৯১৭)- The desks should be provided with China Ink Pots.
১৬. বুদ্ধ তথাগত নোগগাহা হাই স্কুল (১৯১৭) Steps to be taken to improve moral tone of the school.

স্কুল পরিদর্শকের উল্লিখিত রিপোর্ট থেকে সেকালের স্কুল শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যা লক্ষ্য করা যায়। এসব স্কুলের অবস্থা দেখে আশুতোষ মর্মাহত হন। কারণ তিনি উচ্ছৃঙ্খলা বিশৃঙ্খলা এবং অনিয়মকে কখনো প্রশ্রয় দেননি, সেটা তাঁর ছাত্র জীবনেও না, কর্ম জীবনেও না। ১৯০৯ সালের সমাবর্তন ভাষণে আশুতোষ ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিলেন– 'এটা দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে ছাত্রদের মধ্যে নিয়ম শৃঙ্খলা বহুক্ষেত্রে শিথিল হয়েছে, অথবা কার্যত নষ্ট হয়ে গেছে। অন্যদিকে স্বদেশি আন্দোলনের ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি আরো কোনঠাসা হয়ে পড়ে। এ প্রসঙ্গে সমালোচক লিখেছেন:

> স্বদেশী আন্দোলন তুঙ্গে। একেই তো স্কুলগুলিতে নিয়মশৃঙ্খলার বালাই ছিল না; এখন জননেতাদের আবেগমথিত কণ্ঠের ডাকে স্কুল কলেজ ছাড়ার হিড়িক পড়ে গেল। লেখা পড়া রসাতলে যাবার দাখিল। খ্যাতনামা বাগ্মী ও জননায়ক বিপিন পাল স্বভাবসিদ্ধ আবেগ মথিত কণ্ঠে বলতেন, "তোমরা কি আসবে না ভাই ওই গোলামখানার মোহ কাটিয়ে? ওই একখানা চোতা কাগজের লোভে আকাশচারী হয়ে শুধু ভাগাড়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে থাকবে? বয়কট করো ওদের স্কুল কলেজ।" সুরেন্দ্র নাথ বললেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হবে। শ্রদ্ধেয় হীরেন্দ্রনাথ দত্ত পন্ডিত ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অসাধারণ কৃতী ছাত্র ছিলেন। তিনি বক্তৃতায় সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি ঘৃনা উৎপাদক অনেক কথা বললেন। ওর সার্টিফিকেট বা চোতা কাগজের মোহ কাটাতে বললেন।[৬০]

এর মধ্যে আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী পূর্ববঙ্গের স্কুলগুলির অনুমোদন বাতিল করতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর চাপ সৃষ্টি করা হয়। অভিযুক্ত ছাত্রদের স্কুল থেকে বহিষ্কার করারও নির্দেশ দেওয়া হয়। তখন বঙ্গভঙ্গের ফলে যে সব স্কুল পূর্ববঙ্গের অধীনে ছিল সেসব স্কুলের ছাত্র-শিক্ষক উভয়ই ছিল বিভাগ- বিরোধী আন্দোলের পুরোভাগে। সব স্কুলই কমবেশি ঐ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে। এ ক্ষেত্রে বিখ্যাত স্কুলগুলির ছাত্রদের এবং শিক্ষকদের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত সক্রিয়।[৬১] এমতাবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যখন স্কুলগুলির পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়, তখন পরিদর্শকদের উপর অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। সরকারি নিষেধাজ্ঞা উপক্ষো করে যে সকল স্কুলের ছাত্র শিক্ষক পরিচালক মন্ডলী রাজনৈতিক আন্দোলনে সামিল হয়, তদন্তরিপোর্টে সেসব স্কুলের সম্পর্কে প্রতিকুল মন্তব্য থাকলে কিংবা সরকারের পক্ষ থেকে কোনো স্কুল সম্পর্কে অভিযোগ এলে, তার ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয় সরকারি নির্দেশ লঙ্গনকারী স্কুলগুলির পরিচালকমন্ডলীকে চিঠি দিয়ে জানান যে তারা এখন থেকে সরাসরি নির্দেশে মতো আইনশৃঙ্খলা বজায় রেখে স্কুল পরিচালনা করবে- এতদর্থে এক একরারনামা বা প্রতিশ্রুতিপত্র দিতে হবে। সিন্ডিকেট সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে যে সব স্কুলে জোরদার আন্দোলন চলছিল তাঁদের কাছে কড়া ভাষায় কৈফিয়ৎ এবং মুচলেকা দাবী

করা হয়। বিশেষভাবে চিহ্নিত স্কুলগুলি থেকে যে যে বিষয়ে মুচলেকা চাওয়া হয়েছিল। এখানে দৃষ্টান্ত স্বরূপ মাদারিপুর এইচ. ই. স্কুলের রিপোর্টাদেশটি[৬২] তুলে ধরা যায়।

> (নং–১০৮১). Read a report from the University Inspector on Madaripur H.E. School. Ordered:
>
> (1).That a copy of the report be forwarded to the authorities of the school with the intimation that the syndicate have learned with much regret that students as well as teachers of the School have been allowed to take active part in political movements and they accordingly demand as a preliminary condition for the continuance of recognition of the school that a declaration signed by the members of the Managing Committee as well as by all the members of the teaching staff be submitted to the Syndicate within three weeks from the receipt of this communication to the effect that they are prepared to manage the school in full and loyal compliance with the terms of the Circular letter No. 332 dated the 4th May, 1907, from Sir Herbert Risley, K.C.I.E., C.S.I., Secretary to the Government of India, Home Department to the Chief Secretary to the Government of Bengal, General Department and will, accordingly, use their best endeavors to discourage the boys from "associating themselves, in any way, with political agitation or demonstration of any kind. That the Committee be further asked to call upon all the teachers formally to pledge themselves not to make any attempts to disseminate their political views among the boys, and to use their influence in a way likely to further the action of the committee demanded above. A report on the steps taken by the committee in this latter matter should accompany the declaration.

এই নির্দেশ অমান্য করলে স্কুলের অনুমোদন বাতি হওয়ার ভয়ে সামান্য কয়টি স্কুল ছাড়া প্রায় সব স্কুল কর্তৃপক্ষ সময় ক্ষেপণ না করে দ্রুত তাঁদের মুচলেকা দিয়ে আত্মরক্ষা করে। এখানে অঙ্গীকার পত্র দানকারী দুটি স্কুলের নাম উল্লেখ করা যায়।[৬৩] তাঁরা লিখেছেন:

১. (নং–১০৮১) Read a letter from the Secretary, Edward Institution. Brahmanbaria, stating with reference to this office letter No. 391, dated the 30th July, 1907 that the Managing Committee of the School are prepared fully and faithfully to observe all the terms laid down for High Schools by the Government of India m their Notification No. 332. Dated the 4th May, 1907.Ordered - To be recorded.

২. (নং–১২২১) Read a letter from the members of the Managing Committee of the Nabinagar H.E. School giving a definite assurance to fully and faithfully observe all the terms laid down for High Schools by the Government of India in their Notification No. 332 dated the 4th May, 1907.Ordered — To be recorded

এই স্পর্শকাতর বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় আশুতোষের বুদ্ধিকৌশলে স্কুলগুলির সঙ্গে কঠোর কোমল ব্যবহার করে ইতিবাচক সুফল পেয়েছে। এতে এক দিকে সরকারও খুশি হয়েছে অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা অক্ষুন্ন থেকেছে। আশুতোষের চেষ্টায় তখন স্কুলগুলোতে নিয়ম–শৃঙ্খলা ফিরে আসে এবং লেখাপড়ার মান বৃদ্ধি পায়। বিশ্ববিদ্যালয় কার্য বিবরণী থেকে তার প্রমাণ পাাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে একটি প্রতিবেদন দেখা যায়:

> In the course of this enquiry, the University found itself confronted with the vital question of discipline in our schools. It was painfully evident, though fortunately in a comparatively small number of instances, that discipline amongst boys had in some places either become lax or been practically destroyed. In every instance in which there were materials before the Syndicate to justify the inference of laxity of discipline, they have without hesitation taken action but that action has been of a most considerate character. The Syndicate decided not to punish the schools for past misconduct, but rather to give the offending institutions a fair chance for improvement. They insisted in such cases upon a reconstitution of the governing body and satisfactory guarantee by the members and the staff that they •would in future use their best endeavors to maintain discipline and to discourage the boys under their

> charge from associating themselves in any way with political agitation or demonstration of any kind. It is a matter for congratulation that good sense has prevailed in most instances; except in some isolated cases, schools have complied cheerfully with the requirements of the varsity, and subsequent enquiry has shown that the assurances given for the maintenance of discipline have been generally faithfully carried out[৬৪].

আশুতোষের উচ্চ শিক্ষায় উৎসাহ দান এবং উচ্চ শিক্ষা প্রসারে নিয়োজিত থাকলেও তাঁর চিন্তাধারা ছিল জনশিক্ষামুখী, একথা বঙ্কিমচন্দ্রের 'লোক শিক্ষার' প্রভাব আলোচনাতে আমরা আগেই জেনেছি। সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে তিনি তৎপর ছিলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি 'জাতীয় সাহিত্য' প্রবন্ধে লিখেছেন:

> শাখা প্রশাখা, পত্র পুস্প পল্লব প্রভৃতি লইয়াই প্রকৃত বৃক্ষ, এই সব ত্যাগ করিয়া, মাত্র মূল স্থানটিকে কেহ বৃক্ষ বলে না, বা বৃক্ষের আশা ঐ স্থানুতে চরিতার্থ হয় না। সুতারাং যাহাদিগকে বাদ দিলে বাঙ্গালী জাতি একান্তমুষ্টিমেয় ও দুর্বল হইয়া পড়ে, বঙ্গের সেই অশিক্ষিত জনরাশির মধ্যে যাহাতে শিক্ষার আলোকচ্ছাটা নিপতিত হয়, উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত সুধীমন্ডলীর পার্শ্বে যাহাতে বঙ্গের নিরক্ষর জনসঙ্ঘ আসিয়া অকুতোভয় ও অসঙ্কোচে দাঁড়াইতে পারে, যতদিন তাহা না করিতে পারিব, ততদিন আমাদের মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই।[৬৫]

আমাদের মঙ্গলের জন্য আশুতোষ যে নীতি উদ্ভাবন করেছেন, যে পন্থা অবলম্বন করেছেন, তা পরবর্তীতে অনেকে ঐতিহাসিক মনীষী স্বীকার করে নিয়েছেন। তাঁরা সাদরে গ্রহণ কওে নিয়ে বলেছেন–'সেদিনকার বিশ্ববিদালয়ের শিক্ষায় দেশের মুষ্টিমেয় লোকের মন আলোকিত হত। যারা উচ্চ শিক্ষা নিয়ে বেরিয়ে আসতেন তারা ছিলেন তথাকথিত সীমিত এনলাইটেন সম্প্রদায়। এই সীমা পেরিয়ে জ্ঞানের আলো বাইরের দুঃসহ অন্ধকারের দুর করত না। এক কথায় বলা যেতে পারে শিক্ষার বিবিকরণ ও স্বভাবীকরণের যথেষ্ট অভাব ছিল। আশুতোষ তার প্রথম জীবনেই এই দুইটি সমস্যাকে গভীরভাবে চিন্তা করেছিলেন। সে সময় দেশের মাধ্যমিক শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ছিল। দেশের যথেষ্ট সংখ্যক সেকেন্ডারী স্কুল প্রবর্তনের উৎসাহ দিয়ে তিনি মাধ্যমিক শিক্ষাকে জনসাধারণের দ্বারাপ্রান্তে আনবার চেষ্টা করেছিলেন।'[৬৬] তাঁর চেষ্টা সফল হয়েছিল । হাই স্কুলের সংখ্যা এবং প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীর সংখ্যা আগের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৯০৭ সালে অনুষ্ঠিত (তাঁর আমলে) প্রথম এন্ট্রান্স পরীক্ষায় ছাত্র সংখ্যা ছিল ৫৮৯০ জন। ১৯২৩ সালের আশুতোষের জীবিতাবস্থায় অনুষ্ঠিত শেষ ম্যাট্রিকুলেশন (এন্ট্রান্সের নামান্তর) পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়ে হয়েছিল ১৮, ৮৬৭ জন। ছাত্র সংখ্যার এই আধিক্যই আশুতোষের মাধ্যমিক স্কুল সংস্কারনীতির সার্থকতা প্রমাণ করে।

৯

উচ্চশিক্ষা পরিকল্পনা ও গবেষণা স্থাপন

১৮৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালে এর আইনে বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে দেশে শিক্ষা প্রসারের কোনো প্রকার ক্ষমতা ও বিধান ছিল না। তখন বিশ্ববিদ্যালয় ছিল একটি বিরাট পরীক্ষা কেন্দ্র, ছাত্রদের পরীক্ষা নেওয়া এবং ডিগ্রি প্রদানই ছিল তার মুখ্য কাজ। বিশ্ববিদ্যালয় আইনের এই সীমাবদ্ধতা বুঝতে প্রায় ৫০ বছর বছর লেগেছিল। অবশেষে ১৯০৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয় আইন সংশোধন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন আদর্শ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ কল্পে ঘোষণা করা হয়:

> The University shall be and shall be deemed to have been incorporated for the purpose of making provision for the instruction of students, with power to appoint University Professor and Lecturers, to hold and manage educational endowments, to erect, equip and maintain University Libraries, Laboratories and Museums, to make regulations relating to the residence and conduct of students, and to do all acts consistent with the Act of Incorporation and this Act, which tend to the promotion of study and research.[৬৭]

আইন হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা গ্রহণ এবং সার্টিফিকেট বিতরণের কর্মকাণ্ডের বাইওে জ্ঞান বিতরণের বিশেষ ব্যবস্থা গড়ে উঠল না। সেটা শুরু হল আশুতোষ এর উপাচার্য হিসেবে হিসেবে যোগদানের পর।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যাবিতরণের কাজ শুরু হল তাঁর হাতে। বিদ্যা অর্জন ও বিতরণের জন্য প্রয়োজন ছিল ছাত্রদের স্কুল জীবনের বনিয়াদ। সেটা আশুতোষের হস্তক্ষেপে গড়ে উঠে। দীর্ঘদিন বেশিরভাগ স্কুলই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েও তাদের পরিচালনা বা তত্ত্বাবধানের বাইরে ছিল। আশুতোষের প্রচেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন নিয়মাবলীতে স্কুলগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক্ষ তত্ত্বাবধানে আসে। ফলে মাধ্যমিক শিক্ষার রূপ ও রীতির ক্ষেত্রে আমুল পরিবর্তন ও উন্নতি ঘটে। আশুতোষের শিক্ষানীতির এই অমর অবদানের কথা স্মরণ করে ঐতিহাসিকের ড. নীহাররঞ্জনরায় বলেছেন:

> দেশ তখন পরাধীন, শিক্ষার প্রসার যত বেশী, শিক্ষিতের সংখ্যা যত বেশী, পরাধীনতা সম্বন্ধে সচেতনতা তত বেশী, তার জ্বালা তত বেশী। আশুতোষের সজ্ঞান চেষ্টায় নতুন স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠার নিয়ম কানুন যথাসম্ভব শিথিল হওয়ার ফলে ক্রমশ প্রচুর স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু হল, ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় বছর বছর হাজার ছেলে মেয়ে পাশ করতে লাগল। দেশে তখন প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার কিছু ছিলনা বললেই হয়, কোনও কার্যক্রমই ছিল না। কাজেই মাধ্যমিক স্কুলগুলিই তখন প্রায় নিম্নতম শিক্ষার কেন্দ্র। সেই শিক্ষাকে যতটা নানাদিকে ছড়িয়ে দেওয়া যায়, সেটাই হলো আশুতোষের প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যকে তিনি সার্থকও করে গেলেন তার জীবিতকালের মধ্যেই। কলেজগুলি সম্বন্ধেও তিনি মোটামুটি একই নীতি অনুসরণ করেছিলেন, যার ফলে দেখতে দেখতে উচ্চ শিক্ষার সংখ্যা দ্রুত এগোতে লাগল, এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশে নতুন ও ব্যাপকতর সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক চেতনার সৃষ্টি হওয়া শুরু হলো।[৬৮]

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে বলা হত বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ সন্তান। তিনি তাঁর জীবনের মূল্যবান সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সেবায় দান করে গেছেন। ১৯২০ সালে মার্চ মাসে আশুতোষ ভারত সরকার কর্তৃক কলকাতা হাইকোর্টের 'অ্যাকটিং' প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন। তখনও তিনি সেনেট সিন্ডিকেট সদস্য। ২৭শে মার্চ (১৯২০) তারিখের সিনেটে তৎকালীন উপাচার্য স্যার নীলরতন সরকার এই দুলর্ভ সম্মান লাভের জন্য আশুতোষকে সিনেটের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন:

> The Hon'ble the Vice-Chancellor: ... I should take this opportunity to offer on behalf of the Senate and of myself our warmest congratulations to the recipient of this high honour. We most heartily rejoice that Sir Asutosh Mookerjee has been appointed to preside over the High Court of Calcutta, of which he has all these years been so brilliant an ornament. It is our pride and pleasures that one who has so intimately identified himself with the affairs of this University from his early manhood, should now be called upon to fill the highest judicial appointment in the land. Whatever position Sir Asutosh has filled, he has adorned by his transcendent abilities and brilliant attainments. In him the University has one of its most gifted students. In his remarkable career, in various spheres of life in which he has worked, he has by his rare powers of organization, by his unwearied energy and wonderful devotion to duty, and by his unique, idealism always supported by a resourceful practical common sense, and above all by his strong personality spread far and wide the fame of this University no less than that of this Presidency and this country. As a Syndic and Fellow, as an Examiner, as Vice- Chancellor, as President of the Post Graduate Councils, of the Faculties of Arts and Law, and of various Boards of Studies, in whatever capacity Sir Asutosh has worked, he has advanced the cause of education a's no other person in this generation has done. We, members of this University, have, therefore, special reasons to congratulate Sir Asutosh on signal honour that has been conferred on our illustrous colleague. He has served the University with his whole herat, and the University congratulates him to day with her whole heart. [৬৯]

এই প্রস্তাব সমর্থন করে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি আশুতোষের অনুরাগ ও অবদানের কথা অনুষ্ঠ চিত্তে স্মরণ করে অকৃত্রিম আন্তরিকতার সঙ্গে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক এইচ স্টিফেন, অধ্যক্ষ জে.আর. ব্যানার্জী, ডঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, অধ্যক্ষ গিরীশচন্দ্র বসু প্রমুখ সিনেট সদস্যবৃন্দ। তাঁদের এই আন্তরিক অভিন্দনে অভিভুত আশুতোষ জবাবী ভাষণ দেন। এতে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার সঙ্গে তাঁর জড়িয়ে পড়া, শিক্ষার উন্নতি সাধনে নানা কর্মকান্ড পরিচালনা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দান প্রভৃতি বিষয়ের গোপন রহস্যটি প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বলেছেন:

> Mr. Vice Chancellor and my colleagues in the Senate, you will believe me when I tell you that I was not prepared for this reception, and you will not misunderstand me if I am unable by reason of lack of suitable words, to give full expression to my feelings of deep gratitude to all of you. Nothing is dearer to me, nothing has been dearer to me, than my University. I began life as a research student in Mathematics when research was practically unknown in this country, and I hoped that die mission of my life was to be a Research Professor in my University. Mr. Justice Banerjee, who was then Vice-Chancellor of dais University, made a desperate attempt to create a chair for me, but such were the times that he failed to collect even such sum as would give a modest income of Rs. 4,000 a year which was all diet he and I thought would be sufficient to maintain me as a Research professor. The consequence was that I drifted into Law, but I made a determination at die time that, Heaven willing, I would devote myself to the service of the University so that in the next generation any aspiring scholars in my position might not drift into Law and might have adequate opportunities to devote themselves to the cause of Letters and Science. It has been given to me through the inspiring help of many distinguished countrymen of mine, foremost amongst them men like Sir Rashbehary Gose, Sir Taraknath Palit, The Maharaja of Cossimbazar, and the Maharaja of Darbhanga, to lay the foundations of a Teaching University in Calcutta[৭০]

আশুতোষের আন্তরিক কামনা ছিল একজন গবেষকরূপে জীবন অতিবাহিত করা। কিন্তু বছরে সামান্য ৪০০০ টাকার একটা স্কলারশিপের ব্যবস্থা না হওয়ায় তিনি সে আশা জলাঞ্জলি দিয়ে আইন ব্যবসায়কে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। অথচ বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার সঙ্গে জড়িত থাকলেন অঙ্গাঙ্গীভাবে। তখন থেকেই তিনি ভাবতেন সুযোগ পেলে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন ব্যবস্থা করে যাবেন, যাতে কোনো ছাত্র-গবেষককে তাঁর মতো গবেষণা কর্ম ছেড়ে যেন অন্য দিকে ছুটতে না হয়। এই প্রসঙ্গে ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেন লিখেছেন:

> বিশ্ববিদ্যালয়ের এতগুলি সম্মানলাভ করিয়াও আশুতোষ জজিয়াতিলাভের পথে চলিতে প্রথমে রাজি হন নাই। তিনি স্যার গুরুদাস, মহেন্দ্রলাল সরকার ও বুথ সাহেবের নিকট প্রস্তাব করিলেন যে, বার্ষিক ৪০০০ টাকা বেতন পাইলেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে আজীবন গণিতের অধ্যাপনা করিবেন। তখনকার দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভান্ডারে আশুতোষের ন্যায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছাত্রের জন্যও হাজার টাকা জুটে নাই। তাই অনন্যচিত্ত হইয়া গণিত আলোচনার সুযোগও আশুতোষের ভাগ্যে ঘটে নাই। ইহা দেশের সৌভাগ্যে কি দুভার্গ্যে বলিতে পারি না। কারণ তাহার সেই বাসনা পূর্ণ হয় নাই বলিয়াই তিনি এমন ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন যে, প্রতিভাবান কোনো বাঙ্গালী ছাত্রের গবেষণার পথে আজ আর অর্থাভাবের কন্টন নাই। আশুতোষ গণিতের গবেষণার জীবনপাত করিতে পারেন নাই বলিয়াই বোধ হয় মেঘনাদ সাহা, জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ প্রমুখের গবেষণার পথ সহজ সরল নিস্কন্টক হইয়াছিল।[৭১]

আশুতোষ উপাচার্য হিসেবে যোগদানের পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবজন্ম এবং শিক্ষাক্ষেত্রে নবযুগের সুচনা হয় বলা চলে। আর কার্যভার গ্রহণ করে তিনি প্রথম সমাবর্তন ভাষণেই বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে তাঁর অভিপ্রায় স্পষ্টভাষায় ব্যক্ত করে বলেন:

> কোন বিশ্ববিদ্যালয় যদি সবচেয়ে মেধাবী ছাত্রদের গবেষণা কার্য চালাবার জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা এবং কোথাও দুর্লভ প্রতিভার সন্ধান পেলে তাকে পরিপূর্ণ স্ফূরনের ব্যবস্থা করতে না পারে, তবে সেই বিশ্ববিদ্যালয় তার অস্তিত্ব বজায় রাখার উদ্দেশ্য সাধন করছে বলা যায় না।[৭২]

আশুতোষের মতে গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ। আর সেই গবেষণা বিষয়টি কি তারও এক সুন্দর সংজ্ঞা দিয়েছেন তিনি:

> নতুন আইনে উচ্চ শিক্ষার প্রত্যেক শাখায় গবেষণার স্থান স্বীকৃত হয়েছে। অবশ্য কিছু লোকের মনে 'গবেষনা' শব্দটির উচ্চারণেরই আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। কিন্তু বংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোর্চ ডিগ্রীর অচ্ছেদ্য অঙ্গ গবেষণার মূল্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ ও তর্ক করা প্রশ্নাতীত। অনুসন্ধান, জ্ঞানের অগ্রগতি, সৃজনশীল কাজ, গঠনমুলক পন্ডিত্য ইত্যাদি যে নামেই কথিত হোন না কেন, উচ্চতম শিক্ষার গবেষণার গুরুত্ব সম্পর্কে কোন দ্বিমত থাকতে পারে না।[৭৩]

অথচ স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্থাৎ এম এ, এ.এসসি. ডিগ্রিধারী না হলে গবেষণা করার সুযোগে তো ঘটবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব তত্ত্বাবধানেস্নাতকোত্তর শিক্ষা দানের ব্যবস্থা তখন পর্যন্ত কিছুই ছিল না। দু-চারটা

কলেজে সে ব্যবস্থা থাকলেও প্রয়োজনের তুলনায় তা অপ্রতুল। আশুতোষ কলা বিভাগের কিছু বিষয়ে (যে সব বিষয়ের জন্য ল্যাবোরেটরি বা পরীক্ষাগারের কোনো প্রয়োজন নেই) বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. ক্লাস চালু করেছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর অভিপ্রায়ের কথা তিনি ১৬ অক্টোবর ১৯১২ তারিখে লিখিত এক পত্রে প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক এইচ.এম পার্সিভালকে অবগত করেন। তিনি লিখেছেন:

> Since you left this country, I have endeavored to develop post-graduate study in this University. Since the New Regulations came into force, M.A. teaching has been attempted into two or three colleges, and even that on a somewhat limited scale. This I have felt, if allowed to continue, is likely to hamper the progress of high education in this country. We have seven hundred schools within our jurisdiction, and the time may be far distant when it will be possible to have in many of them good teachers. But what about the fifty colleges affiliated to the University? We have been insisting that each college should have on its staff at least two good M.A's in each subject. How can this be realized unless the University turns out year after year a fairly large number of well-trained M.A's? I have consequently organized this year University M.A lectures on a somewhat extensive scale in Pure Mathematics, History, Economics, Arabic, Persian, Sanskrit, Mental and Moral Philosophy and English. We have in each subject a number of paid lecturers, who lecture regularly so as to be able to cover the course in their respective subjects in two years. The system has been very successful, and at the present moment there are more than five hundred students reading for the MA. Degree under the direct control of the University.[৭৪]

উপাচার্য হিসেবে প্রথম পাঁচ বছর আশুতোষকে কঠিন সংগ্রাম করতে হয়েছিল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর ক্লাস চালু করার জন্য। তখন পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে বিজ্ঞান শিক্ষার কোনো ব্যবস্থাই গড়ে উঠেনি। এর প্রধান প্রতিবন্ধক ছিল অর্থাভাব। সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে দানবীর তারকনাথ পালিতের নিকট থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে তিনি নগদে ও বাড়ি-জমি সমেত সাত লক্ষ টাকার দানপত্র পেলেন। এই প্রাপ্তির ১১ দিনের মাথায় আনন্দে অভিভুত আশুতোষ সে সময় বিলাতে অবস্থানরত আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে ২৫জুন ১৯১২ তারিখে এক পত্রে লিখেছেন:

> আপনার স্মরণ থাকিতে পারে যে, গত ২৪শে জানুয়ারি তারিখে সিনেটের সম্মুখে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদের জন্য কোন ব্যবস্থা হইবে। আপনি শুনিয়া সুখী হইবেন যে, আমার ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছে। আমরা একটি পদার্থ বিদ্যার ও আর একটি রসায়ন শাস্ত্রের এই দুইটি অধ্যাপক-পদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। মিঃ পালিতের মহৎ দান এবং তাহার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের রিজার্ব ফান্ড হইতে আরো আড়াই লক্ষ টাকা দিয়া আমরা এই সব ব্যবস্থা করিতে সক্ষম হইয়াছি।

চার মাস পরে দ্বিতীয় দফায় স্যার তারকনাথ বিশ্ববিদ্যালয়কে আরো সাত লক্ষ টাকা দান করেছিলেন বিজ্ঞান শিক্ষার সম্প্রসারণের জন্য দ্বিতীয় পত্রটি স্যার রাসবিহারী ঘোষের নিকট থেকে, তিনি লিখেছেন:

> For some time past, it has been my desire to place at the disposal of my University, a substantial sum for the promotion of Scientific and Technical Education and for the Cultivation and advancement of Science, Pure and Applied, amongst my countrymen by and through indigenous agency. I have now decided to make over to the University a sum of ten lakes of Rupees in furtherance of the University College of Science projected by you with sanction of the Senate.[৭৫]

আশুতোষের কাছে মাত্র দু মাসের ব্যবধানে এই পত্র দুখানি এদেশে বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার দ্বার উন্মোচন করেছিল। তিন দফায় স্যার রাসবিহারীর দানের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ২৩ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা। আশুতোষের প্রচেষ্টায়, শিক্ষানুরাগী দেশবাসীর দানে এবং সামান্য সরকারি সাহায্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয়ে 'চেয়ার' অধ্যাপক পদ সৃষ্টি হয়েছিল। সেগুলির নাম ও প্রথম পদাধিকারী অধ্যাপকদের তালিকা থেকে বোঝা যায় আশুতোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ও বিজ্ঞান বিভাগকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কযুক্ত এক সর্ব ভারতীয় প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করেছিলেন। এখানে সেই অধ্যাপক পদ ও প্রথম পদাধিকারীদের নাম উল্লেখ করা যায়।[৭৬] যেমন:

A. Professorship created in the name of Taraknath Palit:

1. Taraknath Palit Professor of Chemistry - Prafulla Chandra Ray.
2. Taraknath Palit Professor of Physics - C.V.Raman.

Dhaka University Institutional Repository

B. Professorship created in the name of Rashbehary Ghose:

1. Rashbehary Ghose Professor of Applied Mathematics - Ganesh Prasad.
2. Rashbehary Ghose Professor of Physics - Debendramohan Basu.
3. Rashbehary Ghose Professor of Chemistry - Prafulla Chandra Mitra.
4. Rashbehary Ghose Professor of Botany - S.P. Agarkar.
5. Rashbehary Ghose Professor of Applied Physics - Phanindranath Ghosh.
6. Rashbehary Ghose Professor of Applied Chemistry - Hemendrakumar Sen.

C. Professorship created out of Khaira Fund :

1. Rani Bagiswari Professor of Fine Arts - Abamndranath Tagore.
2. Guruprasad Singh Professor of Philology - Sumti Kumar Chatterjee.
3. Guruprasad Singh Professor of Physics - Meghanad Saha.
4. Guruprasad Singh Professor of Chemistry - Jnanendranath Mukherjee.
5. Guruprasad Singh Professor of Agriculture - Nagendranath Ganguli.

এবং অন্যান্য[৭৭] পদে–

A. Professorships created with financial assistance from the Government:

1. Minto Professor of Economics - Manohar Lal
2. King George V Professor.of Mental & Moral Science - Brajendranath Sil/S. Radhakrishnan.
3. Hardinge Professor of Advanced Mathematics - A. R. Forsyth/W.H. Young,

B. Professorship created out of University fund :

1. Carmaichael Professor of Ancient Indian History & Culture - George Thibaut.
2. University Professor of Comparative Philology Otto Strauss L.J.S. Taraponyala.
3. University Professor of English - Robert Knox/Henry Stephen.
4. University Professor of Mental and Moral Philosophy - Hiralal Haldar.
5. University Professor of Botany - P. Bruhl.
6. University Professor of Biology - S.N.Maulik.

C. 1. Emeritus Professor C.E. Cullis.

D. 2. University Professor of International Law - Arther Brown.

১০

শিক্ষক নিয়োগ ও বিজ্ঞান শিক্ষার বিকাশ

১৯১০ সালে স্যার তারকানাথ পালিত তাঁর রাজাবাজারের বাড়ি ও ৪ লক্ষ টাকা জাতীয় শিক্ষা পরিষদের বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট থেকে তুলে নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয় খোলার জন্য আশুতোষের হাতে দেন। আশুতোষ এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেন। তিনি বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের প্রধান প্রধান শাখা চালু করে,এটিকে মনের মতো গড়ে তোলেন । গণিতে গণেশ প্রসাদ, প্রেসিডেন্সি মহাবিদ্যালয় থেকে জগদীশচন্দ্র-প্রফুল্লচন্দ্র অবসর নিলে তিনি তাঁদের যথাক্রমে পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন বিভাগে পালিত অধ্যাপক পদে নিয়োগ নির্ধারণ করেন। জগদীশচন্দ্র 'বসু বিজ্ঞান মন্দির' নিয়ে ব্যাপৃত থাকায় সি. ভি. রমন সেই পদে নিযুক্ত হন। স্যার আশুতোষের সুষ্ঠু পরিচালনায় বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয় এক জাতীয় মন্দিরে পরিণতি লাভ করে। তখনকার ইংরেজ সরকার যদিও বিজ্ঞানচর্চার এই বাড়াবাড়ি সুনজরে দেখেননি। সেই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারের অতিরিক্ত হস্তক্ষেপের ফলে আশুতোষকে সাময়িকভাবে উপাচার্যের পদ থেকে সরে যেতে হয়। আশুতোষ বুঝতে পেরেছিলেন, একক প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষে বিজ্ঞানকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। অথচ বিজ্ঞানই ভারতকে বৈষয়িক উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি ভারতবর্ষের পশ্চাৎপদতার কথা স্মরণ করিয়ে বলেছেন যে এতে লজ্জা পাওয়ার কিছুই নেই। তাঁর কথা :

> That our Indian Universities have failed conspicuously to come up to standard of the Western Universities …cannot be doubted. To say that they have filed to do so is, perhaps, not a very accurate expression, for one can hardly be said to fail in something at the accomplishment of which one has never aimed.[৭৮]

আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে আশুতোষ ছিলেন বদ্ধপরিকর। রাজাবাজার বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠা করে তিনি অসাধ্যসাধন করেছিলেন। স্যার রাসবিহারী ঘোষ, স্যার তারকানাথ পালিত, গুরুপসন্ন সিং খয়রা প্রমুখের সহায়তায় তিনি এ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেন। প্রথম দফায় উপাচার্যের পদ থেকে অবসরের সামন্য আগে ১৯১৪ সালের ২৭ মার্চ বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। 'শুধুমাত্র এই কাজটার জন্যই ইতিহাস তাঁকে বুকে জড়িয়ে রাখতো, যদি আর কিছু নাও করতেন।'[৭৯] বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠা করেই তিনি থামলেন না। তিনি খুঁজে খুঁজে বিজ্ঞান শিক্ষাদানে যোগ্য শিক্ষকও নিয়ে আসলেন। গণিতের জন্য আনলেন গণেশ প্রসাদকে; চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরামন, দেবেন্দ্রমোহন বসু, মেঘনাথ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, শৈলেন ঘোষ, সুশীল আচার্য, শিশির মিত্র, যোগেন মুখোপাধ্যায়, ফণীন্দ্র ঘোষদেব প্রমুখকে আনলেন পদার্থবিদ্যা পড়ানোর জন্য; আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়দের নিয়োজিত করলেন রসায়ন বিজ্ঞানে দায়িত্বে।

আশুতোষ তাঁর মেধা ও বুদ্ধিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় এক নব জাগরণ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। তাঁর চেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এক ঝাঁক তরুণ শিক্ষকের সমাবেশ ঘটেছিল। তিনি জানতেন কাকে দিয়ে কী করানো যাবে, কাকে দিয়ে নয়। তিনি সদ্য এম.এ. পাশ করা সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যাকে ডেকে নিয়েছিলেনন এম. এ. ক্লাসেই পড়াতে এবং তাঁকে অভয় দিয়ে তিনি বলেছেন–'সাহস কর, উচ্চসঙ্কল্প নিয়ে নেমে যাও, যাতে নিজের ইউনিভার্সিটির নাম দেশের নাম উজ্জ্বল করতে পার।[৮০] আশুতোষ মুখোপাধ্যায় একেবারে শূণ্য থেকে একটি বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ণ করে তুলেছিলেন। কারণ তিনি জানতেন–'একটি প্রাণবন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বলতম চিহ্নগুলির একটি হল জ্ঞানের প্রসারে উৎসাহ। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ শুধু জ্ঞান বিতরণ নয়, জ্ঞান অর্জন এবং জ্ঞান সংরক্ষণও তার কাজ।'[৮১] আশুতোষ সব-সময় নবীনদের উপর ভরসা রাখতেন। তিনি গর্বের সঙ্গে বলতেন যে, নবীনরাই নতুন ভারতবর্ষ গড়বে। যাঁরা বলেন 'অতীতই সুবর্ণময়' তিনি তাঁদের বাইরে। তাঁদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছিলেন :

> আমাদের পরিষ্কার হয়ে যাওয়া দরকার, নিজেদের ও অন্যদের কাছে সৎ হওয়ার। একথা মনে করার কোনোই কারণ নেই প্রাচীন ভারতবর্ষের সবাই ছিলেন সম্পূর্ণ নির্ভুল ও আদর্শ মানুষ, তাঁরাই শিল্প ও বিজ্ঞানের আবিষ্কার করেছিলেন সর্বপ্রথম আর পুরোনো যুগ ছিল সোনায় গড়া, ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য ছিল সুমিষ্ট ফল আর কুপে ছিল অমৃত।[৮২]

১৯০৬ সাল থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত ৮ বছরে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছয়টি নতুন স্নাতোকোত্তর বিভাগ খুলেছিলেন। তাঁর চেষ্টায় ১৯১৩ সালের মধেই বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতোকোত্তর পঠন-পাঠন ও গবেষণার ব্যবস্থা সম্পন্ন হয়। তিনি ১৯১৩ সাল থেকে ১৯২১ সালের মধ্যে কলাবিভাগে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি অধ্যাপক পদ সৃষ্টি করেন। ১৯১৩ সালে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক পদ, ১৯১৪ সালে ইংরেজিতে বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক পদ, ১৯২১ সালে মানসিক ও নৈতিক দর্শনে অধ্যাপক পদ এবং রানী বাঘীশ্বরী ও খয়রার যুবরাজ গুরুপ্রসাদ সিং-এর নামে আরো দুটি অধ্যাপক পদ সৃষ্টি করেন। ভাস্কর মৃধা লিখেছেন:

> মনে হয় আশুতোষ বাংলা ভাষায় এম. এ. শুরু করার ব্যাপারে সমস্ত প্রস্তুতি বা জমি তৈরি করার কাজ সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও, কিছুটা সময় নিয়ে সম্পূর্ণ ঝুঁকিহীন পরিস্থিতিতে তা চালু করেন। কেন না দেখতে পাচ্ছি প্রেসিডেন্সি থেকে ইংরেজি অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হওয়া পুত্র শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে দৃষ্টান্তমূলকভাবে বাংলা বিভাগ এম. এ.র প্রথম ব্যাচে (১৯২০) ভর্তি করাচ্ছেন তিনি, যেমনভাবে রথীন্দ্রনাথকে কৃষিবিদ্যার দিকে ঠেলে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বাংলা ভাষাকে শিক্ষার বাহনরূপে প্রতিষ্ঠিত করে, তার উচ্চতম স্তরের পঠন-পাঠন ও গবেষণার ব্যবস্থা সম্পন্ন করে আশুতোষ নিশ্চয়ই গভীর আনন্দ ও শান্তি পেয়েছিলেন।[৮৩]

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে অভূতপূর্ব মর্যাদা দিয়েছিলেন আশুতোষ। তিনি বলতেন–'মানুষের কত স্বপ্ন থাকে, আমার ঐ একই স্বপ্ন ছিল, একটা ধারণা আমরা দৃঢ় ছিলে যে, যে জাতির মাতৃভাষা যত সম্পন্ন সে জাতি তত উন্নত।'[৮৪]

আশুতোষ উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশ যাননি। সায়েন্স কলেজে সেই আমলে যাঁরা নিজেদের বিজ্ঞানী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশজনের শিক্ষাদীক্ষা এদেশে। প্রতিভার স্ফুরণ এই দেশের মাটিতে। সে যুগের দুই বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসু এবং প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের উচ্চশিক্ষার পাঠ সমাপ্ত হয় বিদেশে। এর কিছু পরে পরিসংখ্যানবিদ প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ অল্প সময় বিদেশে কাটান। এ ছাড়া অন্যান্যদের প্রতিভা আক্ষরিক অর্থেই দেশজ। বিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষা এবং গবেষণার জন্য বিদেশযাত্রা আশুতোষের খুব পছন্দসই ছিল না। প্রকৃত অর্থে মৌলিক গবেষণার সুযোগ বিদেশের গবেষনাগারে মেলে কিনা, সে বিষয়েও তাঁর কিছুটা সংশয় ছিল। ছাত্রাবস্থায় তিনি জানতে পারেন, প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিধারীকে উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার জন্য ইংলান্ডে পাঠাবার চেষ্টা চলেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলোদের কাছে ছদ্মনামে চিঠি লিখে তিনি ওই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধীতা করেন। তাঁর যুক্তি ছিল, স্কলারশিপের টাকায় তিন বছর ইংল্যান্ডে থেকে পড়াশোনা চালানো সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত এদেশের গবেষণার সুযোগ এতই সীমিত যে উচ্চশিক্ষা শেষে প্রত্যাগত মেধাবী ছাত্রটির পক্ষে গবেষনা চালিয়ে যাওয়াও সম্ভব নয়। তিনি প্রস্তাব দেন, যদি উচ্চশিক্ষা প্রসারে সরকার বাহাদুরের যথার্থ আগ্রহ থাকে তবে 'কাল্টিভেশান অব সায়েন্সকে' সাহায্য করতে পারেন।[৮৫]

আশুতোষের মহান কীর্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কলেজ অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি' স্থাপন। ১৯১২ সালে আপার সার্কুলার রোড (বর্তমানের আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড) এবং বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে দুটি সায়েন্স কলেজ প্রতিষ্ঠার আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ প্রেসিডেন্সী এবং সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের বিজ্ঞানের পঠন-পাঠন সীমাবদ্ধ ছিল । সেখানে উন্নত পরীক্ষাগার এবং বিজ্ঞানের সব শাখায় অধ্যাপনা করার মত উপযুক্ত শিক্ষক ছিল না। তখন প্রেসিডেন্সী কলেজের পদার্থ বিজ্ঞানের কয়েকটি নির্বাচিত শাখায় অধ্যাপনা চলত, গাণিতিক পদার্থ বিজ্ঞানের মত গুরুত্বপূর্ণ শাখাটি ছিল অবহেলিত। আশুতোষ মনে করতেন, বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণার যথেষ্ট সুযোগ থাকা উচিত। তাঁর মতে গবেষণার সঙ্গে উচ্চশিক্ষার সম্পর্ক এতই নিবিড় যে দুটিকে পরস্পর এবং প্রায় অবিচ্ছেদ্য বলা চলে। গবেষণার সুযোগবিহীন বিশ্ববিদ্যালয়কে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় হবার অযোগ্য বলে মনে করতেন।

আশুতোষ তাঁর জীবনের একটা বড় সময় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে ভারতের প্রতিনিধি স্থানীয় বিদাপীঠ করে তুলতে তিনি ঐকান্তিক আগ্রহ নিয়ে নিরলস পরিশ্রম করেছেন। তাঁর উদ্দেশ্যে তিনি সফলও হয়েছিলেন। তাঁর চেষ্টায় তখনকার দিনে ইংলান্ডের বাইরে এই বিশ্ববিদ্যালয়ই সবচেয়ে বেশি খ্যাতি অর্জন করেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আশুতোষের সম্পর্ক এতই প্রগাঢ় ছিল যে অনেক সময়ে নাম দুটি প্রায় সমার্থক হয়ে ওঠে। লর্ড লিটনের বলেছেন:

> In the eyes of his countrymen and in the eyes of the world, he represented the university so completely that for many Sir Asutosh was in fact the university and the university Sir Asutosh [৮৬]

১৯২০ সাল থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত সময়কে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান গবেষণার স্বর্ণযুগ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। রসায়নে তখন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র এবং তাঁর ছাত্রেরা জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, নীলরতন ধর এবং জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বিশ্বের দরবারে সায়েন্স কলেজকে প্রতিষ্টিত করেছেন। পদার্থবিদ্যায় সি.ভি রমন, মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বসু এবং কে এস কে কৃষ্ণণের নাম বিদেশের বিজ্ঞানী মহলে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে। বলাই বাহুল্য, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই কর্মযজ্ঞের প্রধান আয়োজক আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান এবং অন্যান্য বিষয়ে গবেষণা প্রসারে তাঁর অবদানের কথা সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করেছেন উচ্চতর গণিতের হার্ডিঞ্জ অধ্যাপক সি ই কালিস। তিনি বলেছেন:

> The conversion of the university from a purely examining and inspecting body into a teaching institution would no doubt have been effected even without his efficient help but he addition of numbers us schools of active research was almost entirely due to his effort.[৮৭]

এই শতকের দ্বিতীয় দশকে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের মিলনমেলা 'ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস অ্যাসোসিয়শেন' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১৪ সালের ১৫ জানুয়ারি এর প্রথম অধিবেশন হয় কলকাতায়, এশিয়াটিক সোসাইটির ভবনে । এই অধিবেশনে প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন আশুতোষ মুখোপাধ্যায় । সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন:

Dhaka University Institutional Repository

> নিছক লৌকিক বিনয়শত নয়, আমার সত্যই মনে হচ্ছে এই সভাস্থলে এমন অনেক প্রখ্যাত বিজ্ঞানী আছেন যাঁরা আজীবন একমনা হয়ে বিজ্ঞানের সাধনা করে এসেছেন। তাঁদের একজন যদি সভাপতির আসন গ্রহণ করতেন তাহলে অনেক বেশি যুক্তিযুক্ত হত। তত্রাচ উদ্দেশ্য আপনারা নিশ্চিতি দিয়ে বলতে পারি যদিচ আমার অন্য অনেক ত্রুটি থাকেও, যে উদ্দেশ্য আপনারা এই কংগ্রেস আহ্বান করেছেন, সেই উদ্দেশ্য সফল করার জন্য আমি কারো চাইতে কম ব্যাকুল নই। [৮৮]

বিশিষ্ট বিজ্ঞানী সি ভি রমন তাঁর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে একবার সখেদে বলেছিলেন:

> Bengal in gaining a distinguished Judge and a great Vice-chancellor lost in him a still greater mathematician.[৮৯]

আশুতোষ পাশ্চাত্য শিক্ষার বিরোধী ছিলেন না। পাশ্চাত্য শিক্ষা অনুসরণে তাঁর আপত্তি ছিল না, তাঁর আপত্তি ছিল সেই শিক্ষার অন্ধ অনুকরণে। তাঁর সুস্পষ্ট রায় ছিল, উচ্চশিক্ষা এবং গবেষণার ক্ষেত্রে ইউরোপীয় শিক্ষাধারাকে আমাদের দেশের প্রয়োজনভিত্তিক করে গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষার বাহন হিসাবে মাতৃভাষার অনকুলে তারঁ রায় ছিল। প্রসঙ্গত তাঁর ব্যবহৃত উপমাটি উল্লেখ করা যেতে পারে-'দশভুজার পাদপদ্মে রক্তজবার অর্ঘ্যই মানায়, গোলাপ শত সুন্দর হইলেও মাতৃপূজার অযোগ্য।'[৯০]

১১

মাতৃভাষায় শিক্ষার মাধ্যমে জাতীয় ঐক্য

আশুতোষ সুবক্তা এবং তার্কিক। তিনি ১৯১৭ তে বাকিপুরে, ১৯২০ তে হাওড়ায় এবং ১৯২২ এ উত্তরবঙ্গে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে ভাষণ দেন। কৃত্তিবাস স্মারক ভাষণ ও মাইকেল মধুসূধন স্মৃতি বক্তৃতাও তিনি করেছেন। এসব ভাষণ বক্তৃতায় তিনি ঘোষণা করেন ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের মধ্য দিয়ে জাতীয় ঐক্য হওয়ার কথা। এ বিষয়ে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে অগ্রণী ভূমিকা পালনের অনুরোধ জানান। আশুতোষ বিশ্বাস করতেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত ছাত্ররাই এগিয়ে আসবেন জাতীয় সাহিত্যের মাধ্যমে জাতীয় ঐক্য সাধনের জন্য। তাঁর এই অভিমতকে রবীন্দ্রনাথ কার্যকরী মনে করতেন। আশুতোষের জাতীয় সাহিত্যের ভাব পরিকল্পনার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

> ভারতীয় সাহিত্যের ভবিষৎ- নামক প্রবন্ধে আশুতোষ ভারতব্যাপী বিশাল ভুমিকায় তার মনের সবোর্চ্চ কামনার ও সাধনার যে চিত্র একেছেন, তাতে এই কর্মবীরের ধ্যানের মহত্ত্ব আমি সুস্পষ্টরুপে অনুভব করছি। তার বলিষ্ঠ প্রকৃতি শিক্ষানিকেতনে দুরুহ বাধার বিরুদ্ধে আপন সৃষ্টিশক্তির ক্ষেত্র অধিকার করেছিল। এইখানে তিনি সমস্ত ভারতের চিত্তমুক্তি ও সমস্ত জ্ঞানসম্পদের ভিত্তিস্থাপন করতে প্রবৃত্ত ছিলেন। তার অসামান্য কৃতিত্ব ও উদার কল্পনাশক্তি সমস্ত দেশের ভবিষ্যতকে ধ্রুব আশ্রয় দেবার অভিপ্রায়ে সেই বিদ্যানিকেতনের প্রসারীকৃত ভিত্তির উপর স্থায়ী কীর্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ করেছিল। এই প্রবন্ধে তার সেই মহতী ইচ্ছার সম্পূর্ণ স্বরূপটি দেখে সেই পরলোকগত মনস্বী পুরুষের কাছে শ্রদ্ধা নিবেদন করি। আশুতোষ ইংরাজি ভাষার বিরুদ্ধে ছিলেন না। তিনি মনে করতেন এই ভাষা একটি যোগসুত্র স্থাপন করে, তবু ভারতের কোটি কোটি লোক ইংরেজী জানে না, তাই দেশীয় ভাষা শিক্ষার প্রয়োজন থাকে। আধুনিক বিশিষ্ট ব্যক্তিরা যথা রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, সুরেন্দ্রনাথ, প্রফুল্লচন্দ্র বসু প্রমুখ ইংরাজিতে কৃতবিদ্য হয়ে মাতৃভাষার সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। আশুতোষ মুলত আত্মনির্ভরতার পক্ষে ছিলেন, পরনির্ভরতার নন। তবে আমাদের শেখাতে হবে অন্য ভাষাও মনে করতেন আশুতোষ, যেমন বাঙ্গালীরা শিখুন হিন্দী বা উর্দ্দু বা কোন ভারতীয় ভাষা। এই উদ্দেশ্যে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে Department of Modern Indian Languages শুরু করেন। জাতীয় সাহিত্যের মাধ্যমে পরস্পরকে জানতে হবে। ভাষার মিলন না হোক, সাহিত্যের মধ্য দিয়ে ভাবের মিলন ঘটাতে হবে এই ছিল তাঁর স্পষ্ট অভিমত। প্রাদেশিক সাহিত্য থাকুক, তবু জাতীয় সাহিত্য গড়ে উঠুক, এই মত তিনি প্রকাশ করেছিলেন। পরস্পরের মধ্যে বিবাদ বিসস্বাদ তুলে ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য থেকে মণিমুক্তা নিজেদের মাতৃভাষায় সংগ্রহ করে নিতে হবে। এ ব্যাপারে শিক্ষিত নরনারীদের কাছে ছিল আশুতোষের উদাত্ত আহ্বান। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের এই মুল্যবান অভিমতগুলি আজও প্রাসঙ্গিক। [৯১]

আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়কে দেশ ও জাতিগঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে দেখতেন। হাওড়া বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে প্রদত্ত (১৩২৬) সভাপতির অভিভাষণে এ বিষয়ে তিনি বলেছেন–'শিক্ষার প্রকৃত কেন্দ্র

Dhaka University Institutional Repository

দেশে এখন বিশ্ববিদ্যালয়। ..যখন বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া দেশে অন্য কোনো শিক্ষার কেন্দ্র নাই বা থাকিলেও তাহা গনণার মধ্যেই নাহে, তখন যদি দেশের শিক্ষা সম্বন্ধে কোনরূপ কিছু অদলবদল করিতে হয়, বা নতুন কিছু করার দরকার হয় তবে তাহা ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্য দিয়াই করিতে হইবে।[৯২]

বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব নেবার পর তিনি শিক্ষার উন্নতিকল্পে নানা পরিকল্পনা নিয়েছেন, কিন্তু বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনার চাপ সত্ত্বেও শিক্ষার মাতৃভাষার প্রয়োগ সম্পর্কে তাঁর যে পরিকল্পনা ছিল তা তিনি কখনও বিস্মৃত হন নি। বরং তিনি সচেষ্ট থেকেছেন এ ব্যাপারে আগে তাঁর যে চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে নতুন আইনের সাহায্যে তাকে কীভাবে রূপ দেওয়া যায় তার কৌশল নির্ণয়ে। তাঁর বিচক্ষণ ও সুদক্ষ ব্যবস্থাপনায় শিক্ষায় মাতৃভাষার প্রয়োগ সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরপর কতকগুলি কর্মসূচি গৃহীত হয়।[৯৩] যেমন:

১. ম্যাট্রিকুলেশন থেকে বি. এ. স্তর পর্যন্ত স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে বাংলা সাহিত্যের পঠন-পাঠন ও পরীক্ষা গ্রহণ।
২. বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে গবেষণার জন্য রামতুন লাহিড়ী রিসার্চ ফেলোশিপ প্রবর্তন। প্রথম ফেলো হিসাবে দীনেশচন্দ্র সেনকে নিয়োগ (১৯১৩)।
৩. নোবেল পুরষ্কার প্রাপ্তির আগে রবীন্দ্রনাথকে বাংলাভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে সম্মানিক ডি.লি ডিগ্রি দান।
৪. মাতৃভাষায় মৌলিক সাহিত্য সৃষ্টির স্বীকৃতি হিসাবে জগত্তারিণী স্বর্ণপদক প্রবর্তন (১৯২১)।
৫. বাংলাসহ চারটি ভারতীয় ভাষায় এম. এ পরীক্ষার ব্যবস্থা।

এই প্রসঙ্গে আশুতোষের শিক্ষাচিন্তার অন্যতম একটি বিষয় ছিল ভাষাভাবনা। তাঁর ভাষা পরিকল্পনার সামগ্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপ চিহ্নিত করা যায়। যেমন:

১. আশুতোষ জাতীয় সংহতির পক্ষপাতী হলেও ভাষাভাবনায় উগ্র জাতীয়তাবাদী ছিলেন না। তাইজাতীয় ঐক্যেও অজুহাতে ভাষাগত আধিপত্যবাদকে তিনি মোটেই সমর্থন করেননি।
২. আশুতোষ ভারতের প্রাদেশিক ভাষঅগুলি স্বাধীন বিকাশ পক্ষপাতী হলেও এ ব্যাপারে কোনোরকম প্রাদেশক সংকীর্ণতাকে প্রশয় দেননি
৩. ভারতের বিভিন্ন ভাষার মানুষের মধ্যে ভাষাভিত্তিক ভাব-ঐক্য গড়ে উঠুক এমন ভাবনা আরো কারো কারো রচনায় প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু অন্যদের সঙ্গে আশুতোষের পার্থক্য এই যে, অন্যরা চিন্তা করেন, কিন্তু তা কাজে রূপায়িত করার ব্যাপারে সচেষ্ট হন না, কিন্তু আশুতোষ তা করেছেন।
৪. আশুতোষের ভাষাচিন্তার অপর বৈশিষ্ট্য তাঁর অসামান্য ভবিষ্যৎদর্শিতা। তিনি যখন উচ্চশিক্ষায় ভাষা পরিকল্পনা করেছেন দেশ তখন পরাধীন। একারণে তিনি বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা ও ভাষাতত্ত্ব চর্চার ব্যবস্থা করেছিলেন।

১২

মহীশূর ভাষণে জনশিক্ষার গুরুত্ব

শিক্ষা সম্পর্কে আশুতোষের এই সুচিন্তিত অভিমত তাঁর নিজস্ব স্বচিন্তিত অনুভূতি ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা প্রসূত। তাঁর এই শিক্ষাচিন্তা ও পরিকল্পনার মূলানুসন্ধান করতে গেলে মনীষী বিপিনচন্দ্র পালের প্রসঙ্গ এসে পড়ে। ১৯১৮ সালের শেষ দিকে এক দিন তিনি আশুতোষের বাসভবনে দেখা করতে যান। এই সাক্ষাতকারের কিছুদিন আগে আশুতোষ মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে এক ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়ে আসেন। কথা প্রসঙ্গে সেই ভাষণের উল্লেখ করে তিনি বিপিন পালকে বলেন:

> মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি যেসব কথা বলে এসেছি কর্তাদের তা ভাল লাগবে না জানতাম। কিন্তু ব্রিটিশ ভারতে যে সকল কথা বলার সুযোগ এবং অধিকার নেই, ভারতের এই সামন্ত রাজ্যে সেসব কথা বলা যায়। আমার Mysore Address'টা পড়ে দেখবেন। সেখানে আমার মুখে মুখোশ ছিল না। প্রাণ খুলে সব কথা বলে এসেছি।[৯৪]

আশুতোষের এই প্রাণখোলা কথার মধ্যে সরকারি শিক্ষানীতির সুতীব্র সমালোচনা ছাড়াও ছিল শিক্ষা-সংস্কারক ও শিক্ষা-প্রবর্তক আশতোষের প্রাণের কথা। এরই মধ্যে আশুতোষ আট বছরের উাপাচার্যকাল সমাপ্ত করে

পোস্ট-গ্যাজুয়েট কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট হিসেবে বিজ্ঞান ও কলা বিভাগে বিভিন্ন বিষয়ে স্নাতোকোত্তর শিক্ষা ও গবেষণা প্রবর্তনের কাজ নিবিড়ভাবে লিপ্ত রয়েছেন। অন্যদিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন তথা 'স্যাডলার কমিশন'-এর সদস্যরূপে সারা দেশে শিক্ষাব্যবস্থা পর্যালোচনা করে বেড়াচ্ছেন এবং হাইকোর্টের অন্যতম প্রধান ও বিচক্ষণ বিচারক হিসেবে সারা ভারতে খ্যাতিদ্যুতির তুঙ্গে অধিষ্ঠিত। কাজেই শিক্ষাক্ষেত্রে দীর্ঘদিনব্যাপী প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ বহুমুখী চিন্তাধারাকে বিচারকসুলভ নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার-বিবেচনা করে দেশ ও দশের পক্ষে উপযোগী ও হিতকরী যে শিক্ষাপ্রণালীর ছক মনে মনে গড়ে তোলেন, মহীশূর ভাষণে তা সবার সামনে প্রকাশ করেন। তিনি বলেন:

> I shall presume the existence of a net-work of well-organised schools, training pupils for real university education, which is a development, an amplification and in many respects, a complement of school education. Such pupils when they seek admission into the university should be required to pass a fairly searching test, but the standard need not be ideally exacting and undoubtedly neither capricious nor arbitrary. It is required at this stage of the carrer of the student that his power of expansion reasoning and observation should have adequately developed. He should, in the first place, have to thorough command over his vernacular; he may be reasonably expected to possess an accurate knowledge of its grammatical structure and a fairly wide acquaintance with the best specimens of its literature; he should also have regularity cultivated the art of composition and be able to express his ideas with care, elegance, clearness and precision; he should have acquired a sound working knowledge of English language, as distinguished from English literature. In the second place, his power of reasoning should have been developed by a practical study of select branches of the experimental sciences, including experimental mechanics, if possible. Finally, his mental vision should have been widened by a study of a classical language the geography of the World, the history of India and England and if possible, also by a rudimentary knowledge of modern history. A student of average ability and industry, who has had proper training in such a course through the medium of his vernacular, has by the age of 17, been equipped with the elements of liberal education and should be fully qualified to receive the benefit of a three-year course for the first degree at a University. Ample provision should be made for liberal, for processional and for mental studies, under the guidance of first-rate teachers, the most eminent, the earnest; the most independent in their work, for it is the eagle alone that is fit to teach the eaglets. [৯৫]

সেকালের সমাজ ও সরকারি নীতির পরিপ্রেক্ষিতে তিনি উচ্চশিক্ষা প্রসারের মাধ্যমে জনশিক্ষা প্রচারের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে উক্ত মহীশূর ভাষণে বলেছেন:

> Let us expand our university; that is the first step in upward progress; from them will flow an irresistible steam of educational facilities for the elevation of the masses. Education is like water; to fructify it must descend. Pour out flood at the base of society and only at the base, it will saturate, stagnate and destroy. Pour it out on the summit; it will quietly and constantly percolates and descend, terminate every seed, feed every root, until over the whole area form summit to vase will spring. Offer education free of charge to your student. Demolish the toll gates which bar the passage of light; Let knowledge reach the ignorant mind, as air goes to the tired lungs and water the parched lips.[৯৬]

–অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা সম্প্রসারিত হোক-প্রগতির পথে তাই হবে প্রথম পদক্ষেপ। তা থেকেই জনশিক্ষার অনুকূল সুযোগসুবিধার পথ প্রসস্ত হবে। শিক্ষা ঠিক জলধারার মতো: ভূমিকে উর্বরা ও ফলবতী করতে তাকে নিচে নামতেই হবে। কেবলমাত্র ভিত্তিমূলে জলস্রোত বইয়ে দিলে তা জলমগ্ন হবে, জলবদ্ধ হয়ে সব বিনষ্ট করবে। শীর্ষদেশে জল সিঞ্চন করলে তা নীরবে ক্রমাগত নিষিক্ত করতে করতে নিচে নামবে, ফলে প্রতিটি আঙ্কুর উদগম হবে, প্রতিটি বীজমূলকে তা আহার যোগাবে-শীর্ষদেশ থেকে মূলদেশ পর্যন্ত মুকুলিত করবে। বিনা ব্যয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হোক। কর আদায়ে যে উচ্চ দেউড়ি জ্ঞানালোকের পথ অবরোধ

Dhaka University Institutional Repository

করছে তা উৎপাটিত হোক। যেমন করে শ্রান্ত হৃৎপিণ্ডে বায়ু প্রবেশ করে এবং শুষ্ক ওষ্ঠ জলসিক্ত হয়, তেমনিভাবে অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন মনোভূমিতে জ্ঞানরশ্মি প্রবিষ্ট হোক।

আশুতোষের পরিকল্পিত শিক্ষানীতিতে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার সঙ্গে কলেজ ও স্কুল শিক্ষার সার্বিক উন্নয়ন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষার ধারা বহন করে আনার জন্য স্কুল কলেজগুলিকে পুরাণের ভগীরথ হতে হবে। তারাই পারবে শাখা নদী উপনদীর মতো শিক্ষা-স্রোতধারায় সারা দেশ পরিপ্লাবিত করে সে শিক্ষা জনসমুদ্রে মিলিয়ে দিতে। আশুতোষ মনেপ্রাণে তাই শিক্ষার পরিশ্রুতিবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর শিক্ষাতত্ত্বে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পরস্পর সম্পূরক। এই তিন ধাপের মধ্যে সম্পূর্ণ সংহতি না থাকলে কোন শিক্ষাই স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে না।

১৩

শিক্ষা সংস্কার ও বিকাশের মৌলিক দিক

এই দেশে উচ্চ শিক্ষা বিস্তারে তিনি জীবনের সর্বাধিক সময় ব্যয় করেছিলেন। ১৯০৬ সাল থেকে ১৯১৪ সাল এবং ১৯২১ সাল থেকে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত দশ বছরকাল উপাচার্য হিসেবে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর বহুমুখী চিন্তাভাবনার প্রকাশ ঘটে সেনেট সভা, অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল এবং সমাবর্তন সভায় প্রদত্ত ভাষণগুলিতে। তিনি বাণী দিয়েই দায়িত্ব শেষ করেননি, কথায় এবং কাজে সমন্বয়ও ঘটিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের মাধ্যমেই প্রকাশ পেয়েছে জাতির শিক্ষার চিত্র ও চরিত্র সম্পর্কে তাঁর চিন্তাভাবনা এবং তাকে রূপদানের অনন্যসুলভ প্রয়াস। বিভিন্ন ভাষণ ও বক্তৃতায় তিনি শিক্ষা সংস্কার ও বাংলা ভাষায় শিক্ষা বিকাশে তাঁর চিন্তাধারার মৌলিক পরিচয় পাওয়া যায়। সেগুলো সারসংক্ষেপ করলে তাঁর শিক্ষাচিন্তা দাঁড়ায় নিম্নরূপ:

১. শিক্ষা জলের ন্যায় নিম্নগামী। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্প্রসারিত হলে তার অপ্রতিরোধ্য ধারা বৃহত্তর জনসমাজে ব্যাপ্ত হবে। তাই উচ্চ শিক্ষা প্রসারের মাধ্যমে সর্বজনীন শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে।

২. আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত সংজ্ঞা ও স্বরূপ নির্ণয় করেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেছেন, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পরস্পর নির্ভরশীল ও পরিপূরক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলে ঘোষণা করেছেন।

৩. তাঁর দৃষ্টিতে শিক্ষাক্ষেত্রে গণতন্ত্র অপরিহার্য। শিক্ষার ব্যাপারে শিক্ষাবিদদের স্বাধীন চিন্তার ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার অত্যাবশক

৪. বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় সম্পূর্ণ স্বাধীনতা বাঞ্ছনীয়। সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সম্পর্ক অহিনকুলের নয়; পরস্পর আস্থা ও বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ পরিচালনায় সরকারী হস্তক্ষেপ চলবে না।

৫. পাঠ্যবস্থায় ছাত্রদের পক্ষে রাজনীতি সম্পূর্ণ বাঞ্ছনীয়। অধ্যয়নই তাদের তপস্যা। তবে তারা রাজনৈতিক দর্শন, রাজনৈতিক ইতিহাস, রাষ্ট্রাদর্শ সম্পর্কীয় পুস্তকাদি অবশ্যই পাঠ করবে এবং নিজেদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলবে; কিন্তু প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ থেকে বিরত থাকবে।

৬. আদর্শ শিক্ষক হবেন সম্পূর্ণ রাজনীতি-প্রভাবমুক্ত। ছাত্রদের সামনে সর্বব্যাপারে নিজেকে আদর্শ ও অনুকরণীয় করে তোলাই তাঁর অন্যতম কাজ। তিনি ছাত্রদের শিক্ষাদীক্ষায়, চিন্তাভাবনায়, আচার-আচরণে, দেহে মনে স্বাধীন দেশের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলায় ব্রতী হবেন। তাঁর পক্ষে একই সঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রে ও রাজনীতিক্ষেত্রে বিচরণ অনভিপ্রেত।

৭. স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় এই তিন স্তরে পাঠ্যক্রম কেমন হবে আশুতোষ তা নির্দেশ করেছেন। তেমনি, ছাত্র-শিক্ষক-পাঠ্যক্রম এই তিনের সুষ্ঠু সম্মিলনে উপযুক্ত শিক্ষণপদ্ধতি ও পরিমণ্ডল গড়ে তোলার দিকে ছিল তাঁর সতর্ক দৃষ্টি।

৮. ছাত্রদের মন থেকে পরীক্ষাভীতি দূর করতে তিনি ছিলেন বদ্ধপরিকর। প্রশ্নপত্র রচনাপদ্ধতির আমূল সংস্কারসাধন করেন। ছেলে ঠকান বা প্রশ্নকর্তার বিদ্যা জাহিরমূলক প্রশ্নপত্র রচনা সম্পূর্ণ বাতিল করেন। তেমনি ভাবে, উত্তরপত্র মূল্যায়নের কড়াকড়িও হ্রাস করেন। তাঁর মতে, পরীক্ষার উদ্দেশ্য-ছাত্র কতটুকু শিখেছে, শিক্ষক কতটুকু শিখিয়েছেন এবং বৃহত্তর সমাজের কাজে লাগার মতো কর্মদক্ষতা অর্জন করেছে কিনা-তাই যাচাই করে দেখা। নিছক পরীক্ষাব্যবস্থার কড়াকড়িতেই শিক্ষার মান রক্ষা হয় না।

৯. স্কুল-কলেজ পর্যায়ে মাতৃভাষাই শিক্ষার মাধ্যম হওয়া উচিত। বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে ইংরেজি শিক্ষার বাহন হলেও কালক্রমে স্নাতোকোত্তর স্তরেও মাতৃভাষাই শিক্ষার বাহন হওয়া দেশ ও জাতির পক্ষে কল্যাণকর। সেই উদ্দেশ্যেই মাতৃভাষায় পঠনপাঠন পরীক্ষা গ্রহণের ও ডিগ্রিদানের ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়কে করতে হবে।

১০. উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা পরস্পরের সম্পৃক্ত। গবেষণার সুযোগশূন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশ্ববিদ্যালয় বলাই অনুচিত

১১. শিক্ষার উদ্দেশ্য ও ফলশ্রুতি-বেশ ও সমাজের মঙ্গলার্থে বলি-প্রদত্ত মানুষ গড়ে তোলাই হবে শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য ও ফলশ্রুতি।

আশুতোষের লক্ষ্য ছিল, অন্তত এশিয়া মহাদেশবাসী শিক্ষার্থীগণকে আর যেন লন্ডন, কেম্ব্রিজ, অক্সফোর্ড বার্লিন, প্যরিস বা বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে না হয়। আধুনিক ভারতীয় ভাষা বিভাগে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকটি ভাষায় পরীক্ষা দেবার ব্যবস্থা করছিলেন। সেগুলি হল- বাংলা, অসমিয়া, মৈথিলি, ওড়িয়া, উর্দু, হিন্দি মারাঠি, দ্রাবিড়ি (তেলেগু) মালয়ালম, কেনারিজ (কন্নড়) এবং সিংহলী। আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় অংশের শিক্ষাবিদদের গ্রহনের পক্ষপাতি ছিলেন। শিক্ষাক্ষেত্রে রাতারাতি ভারতীয়কারণ তিনি সর্মর্থন করতেন না, ক্রমান্বয়ে ভারতীয়করণ তাঁর কাম্য ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ পরিচালনায় সহকারি হস্তক্ষেপের প্রবল বিরোধী এবং বিশ্ববিদ্যালয় কাঠামোর অধিকতর গণতন্ত্রীকরণে তিনি আগ্রহী ছিলেন। তিনি বলতেন:

১. মানুষের কত স্বপ্ন থাকে, আমার ঐ একই স্বপ্ন ছিল...আমার মাতৃসমা মাতৃভাষাকে যদি কোনমতে সম্পদশালিনী করিতে পারি আমার জীবন ধন্য হইবে।

২. যে জাতির নিজের পরিচয়যোগ্য ভাষা নাই বা নিজের জাতীয় সাহিত্য নাই, সে জাতির বড়ই দুর্ভাগ্য।

৩. অন্যের যাহা ভাল, তাহা আমাকে লইতে হইবে, আমার যদি কিছু ভাল থাকে, তাহা অন্যকে অঞ্জলি পুরিয়া দিতে হইবে।

৪. এমন একটি সাধারণ উপায় নির্ধারণ করিতে হইবে, যাহার আশ্রয়ে বঙ্গ, বিহার, উৎকল, মাদ্রাজ, রাজপুতনা, গান্ধার, পাঞ্জাব সব এক সুত্রে গ্রথিত ও সাহিত্যেও এক সমতটে সমবেত হইতে পারি।

৫. শিক্ষার উদ্দেশ্য আত্মবিকাশ লাভ করা, হৃদয়ের মার্জ্জনা করা। দর্পণের ন্যায় বিশ্বের প্রতিবিম্ব গ্রহণে হৃদয়কে সমর্থ করা।"

রবীন্দ্রনাথ আশুতোষকে 'বিদ্যার সারথি' রূপে চিহ্নিত করেছেন। তিনি লিখেছেন:

বাঙালীর চিত্তক্ষেত্রে আশুতোষ
বিদ্যার সারথি,
তোমারে আপন নামে সম্মানিত
করেছে ভারতী।[৯৭]

১৯৩৯ সালের ২৫ মে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণ দিবসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই শ্রদ্ধা নিবেদন যথার্থ। তিনি প্রকৃত অর্থেই আশুতোষ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে বিদ্যার সারথি হয়েছিলেন।

চতুর্থ অধ্যায় : আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের শিক্ষাচিন্তা

তথ্যসূত্র :

১. মনোতোষ দাশগুপ্ত, তোমারি রাগিণী জীবনকুঞ্জে (প্রবন্ধ), Avï‡Zvl: we‘¨vi mvi_,সার্ধশত–জন্মবর্ষে শ্রদ্ধার্ঘ্য, মূখ্য সম্পাদক
ড. রীণা ভাদুরী , আশুতোষ কলেজ প্রকাশনা বিভাগ, কলকাতা ৭০০ ০২৬ পৃ.৪০
2. c‡ev³, c. 40
3. c‡ev³, c. 40
4. c‡ev³, c. 43
5. c‡ev³, c. 43
6. c‡ev³, c. 43
7. c‡ev³, c. 43
8. c‡ev³, c. 43
৯. c‡ev³, পৃ. ৪৩
১০. ব্রহ্মানন্দকে লেখা we‡eKvb‡›‘i wPwV থেকে উদ্ধৃত করেছেন মনোতোষ দাশগুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩
১১. আশুতোষ: we‘¨vi mvi_, (২৪ মার্চ ১৯০৭-এর সমাবর্তন ভাষণ) পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩
১২. মনোতোষ দাশগুপ্ত ,Avï‡Zvl: we‘¨vi mvi_, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯
১৩. বিশ্বনাথের আকস্মিক মৃত্যুর কারণ যা জানা যায় তা হলে, নদীতেস্নান করার সময় আকস্মিক দুর্ঘটনা। সম্ভবত ১৮৪৩ সালে আশুতোষের পিতামহী ব্রহ্মময়ী দেবী নীলাচলে তীর্থযাত্রা করেন এবং তীর্থ ক্ষেত্রেই তার মৃত্যু হয়। ফলে এদের চার পুত্র দুর্গাপ্রসাদ, গঙ্গাপ্রসাদ ও রাধিকাপ্রসাদ প্রকৃতই অভিভাবকহীন হয়ে পড়েন। [দ্র evsjvi evN m¨vi Avï‡Zvl, AciwRZ, বিশেষ সংখ্যা সম্পাদক ড. রীণা ভাদুড়ী ,ড. সমর ঘোষ, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় বর্ষ ২৭ সংখ্যা ১–২ জানুয়ারি ২০০৭, পৃ ২০৪]
১৪. evsjvi evN m¨vi Avï‡Zvl, AciwRZ, বিশেষ সংখ্যা পূর্বোক্ত পৃ.২০৪–২০৫
১৫. বাল্যে আশুতোষ সুস্বাস্থের অধিকারী ছিলেন না। পরে তিনি সুস্বাস্থের অধিকারী হন। ১৮৭৪ সালে ডাঃ চার্লস আশুতোষের জন্য পূর্ণ বিশ্রামের ব্যবস্থা করেন। তার পড়াশুনা বন্ধ করে দেওয়া হয়। তাকে হাওয়া বদলের নির্দেশ দেওয়া হয়। আশুতোষ মা ও বোন হেমলতার সঙ্গে মথুরা যান। আশুতোষের শরীর চর্চার অন্যতম মাধ্যম ছিল সাঁতার কাটা। আশুতোষের চারিত্রিক সম্মেহনী শক্তির উৎস ছিল অবয়বগত। শারীরিক গঠনে দৈহিক এবং মানসিক শক্তি আভাসিত হলেও, কোন কৌশলী পদক্ষেপের ফলে মানুষ তার প্রতি আকৃষ্ট হত না, বরং তার দৃষ্টিপাত কিংবা ইশারা সঙ্কেত জাগানো অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে অপরকে অনুগত এবং আজ্ঞাবহ রাখতেন। শিল্পী অতুল বসু আশুতোষের একটি প্রতিকৃতি এঁকে তার নীচে নাম দিয়েছিলেন ‘বেঙ্গল টাইগার’। [দ্র.AciwRZv wekl সংখ্যা, পৃ. ২০৯]
১৬. ভাস্কর মৃধা,বাংলা ভাষার প্রতিষ্ঠা ও স্যার আশুতোষ, (প্রবন্ধ), Avï‡Zvl: we‘¨vi mvi_,সার্ধশত–জন্মবর্ষে শ্রদ্ধার্ঘ্য, মূখ্য সম্পাদক ড. রীণা ভাদুরী , আশুতোষ কলেজ প্রকাশনা বিভাগ, কলকাতা ৭০০ ০২৬ পৃ.২৫
17. c‡ev³, c. 25
১৮. c‡ev³, পৃ. ২৫–২৬
১৯. নিখিলেশ গুহ, শিক্ষাব্রতী আশুতোষ, (প্রবন্ধ), Avï‡Zvl: we‘¨vi mvi wth, পূর্বোক্ত, পৃ.৯
২০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১
২১. সুকুমার সেন, w‘‡bi ci w‘b †h †Mj, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮২, কলকাতা পৃ. ৯৩
২২. wbwL‡jk ¸n, wkÿveZx আশুতোষ, c‡ev³, পৃ.১১
২৩. মনোতোষ দাশগুপ্ত, †Zvgwi iwMYx RxebK‡Ä (প্রবন্ধ), c‡ev³, পৃ.৪৬
২৪. AiæÜZx PvYK, mg‡qi AMeZx m¨vi Avï‡Zvl পৃ.১৯
২৫. মনোতোষ দাশগুপ্ত, তোমারি রাগিণী জীবনকুঞ্জে (প্রবন্ধ), c‡ev³ পৃ. ৪৮
২৬. পূর্বোক্ত পৃ. ৫০
২৭. ফুলরানী চক্রবর্তী, শিক্ষাব্রতী আশুতোষের গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার-প্রীতি (প্রবন্ধ) [*C.U. Convocation Address–* 1908] পূর্বোক্ত পৃ. ৬৯
২৮. পূবোক্ত পৃ. ৬৯
২৯. মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম, Aÿq Kgvi ‘Ë I Dbk kZ‡Ki ev0jv, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৯, ঢাকা, পৃ-৫১২
৩০. ড.দীনেশচন্দ্র সিংহ সম্পাদিত, cm½ KjKvZv wekwe‘¨vjq, কলকাতা, জানুয়ারী ২০০৭,পৃ-৬৭
31. আবুল কাসেম ফজলুল হক সম্পাদিত, বঙ্কিমচন্দ্র সার্ধশত জন্মবর্ষে, বাঙলাদেশ উপন্যাস পরিষদ সংকলন, জাগৃতি প্রকাশনি,ফেব্রুয়ারি ২০০১,ঢাকা, c.85
৩২. রামেন্দ্র সুন্দi wÎ‡e‘x PwiZ K_v , সম্পাদক শ্রী প্রহলাদকুমার প্রামাণিক, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা-১৪০৬ বাংলা, পৃষ্ঠা-২৬ ও ২৮.

৩৩. ড.দীনেশচন্দ্র সিংহ সম্পাদিত, cm½ KjKvZv wekwe`¨vjq, কলকাতা, জানুয়ারী ২০০৭,পৃ-৬৭
৩৪. বেগম আকতা কামাল সম্পাদিত Rxeb¯§wZ- iex›`bv_, প্রতীক,ফেব্রুয়ারি ২০১৫, ঢাকা,-পৃ-৮০
৩৫. ভবতোষ দত্ত. ewk¼gP›` †mB mg‡q, দীপ প্রকাশন,বইমেলা ২০০৯, কলকাতা,পৃ-১-২
৩৬. পূর্বোক্ত, ewk¼gP›` †mB mg‡q, পৃ-২-৩
৩৭. iex›` iPbvejx,GKv`k LÐ, প্রবন্ধ, শিক্ষার হেরফের, বিশ্বভারতী, ২৫ বৈশাখ ১৩৬৮ পৃ-৫৪৩
৩৮. 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের আগে বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজিতে চারটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। এগুলো হলো–On the Origin of Hindu festivals (Transactions of the Social Science Association, January 1869), A Population Literature of Bengal (Transactions of the Social Science Association, 28 February 1870), Bengali Literature (Calcutta Review, 1871 No. 104) এবং Buddhism and Sankhya Philosophy (*Calcutta Review, 1871* No. 106).
৩৯. *Bankim Rachanavali*-Edid by Joges Chandra Bagal Forth Print- September-2011, Sahitya Samsad- page-97-98)
৪০. ভবতোষ দত্ত. ewk¼gP›` †mB mg‡q, দীপ প্রকাশন,বইমেলা ২০০৯, কলকাতা,পৃ-৪
৪১. পূর্বোক্ত, পৃ.৬
৪২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০
৪৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০
৪৪. ev0jv‡`‡k D"P wkÿvi `‡kveQi, পৃ.৫১
৪৫. ewk¼g iPbvmgM, wØZxq LÐ (সাহিত্যসমগ্র), সালমা বুক ডিপো, ৩৮/২, বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০, জানুয়ারী ২০০৭, পৃ.২৫৩–২৫৪
৪৬. ev0jv‡`‡k D"P wkÿvi `‡kveQi, পৃ.৫২–৫৩
৪৭. চিত্তব্রত পালিত, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের শিক্ষাদর্শ (প্রবন্ধ), c‡ev³, পৃ.১৫
৪৮. পূর্বোক্ত, পৃ.১৫
৪৯. নিখিলেশ গুহ, শিক্ষাব্রতী আশুতোষ, (প্রবন্ধ), Avï‡Zvl: we`¨vi mvi‡_, পূর্বোক্ত, পৃ.১২
৫০. পূর্বোক্ত, পৃ.১৩
৫১. ড.দীনেশচন্দ্র সিংহ সম্পাদিত, cm½ KjKvZv wekwe`¨vjq, পৃ.৮১
৫২. He had the courage to dream because he had the power to fight and the confidence to win – his will itself was the path to the goal (দ্র. প্রসঙ্গ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পূর্বোক্ত, পৃ.৮১]
৫৩. দীনেশচন্দ্র সিংহ, মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কারে আশুতোষের অবদান (প্রবন্ধ), অপরাজিত, পূর্বোক্ত,পৃ. ১৮৯
৫৪. ড.দীনেশচন্দ্র সিংহ সম্পাদিত, প্রসঙ্গ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ.৮১
৫৫. বাংলার বাঘ স্যার আশুতোষ, AciwRZ, বিশেষ সংখ্যা পূর্বোক্ত,পৃ ১৯০
৫৬. দীনেশচন্দ্র সিংহ, মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কারে আশুতোষের অবদান (প্রবন্ধ), পূর্বোক্ত,পৃ.১৯৫
57. c‡ev³,c.190
58. c‡ev³,c.190Ñ91
59. c‡ev³,c.191Ñ92
60. c‡ev³,c.192
৬১. হবিগঞ্জ হাই স্কুল (শ্রীহট্ট) জামালপুর ডোনো হাই স্কুল (ময়মনসিংহ) বাঙ্গোরা হাই স্কুল (ত্রিপুরা) ফরিদপুর ঈশান ইনস্টিটিউশন, সিরাজগঞ্জ ব্রিজলাল ফ্রি হাই স্কুল (পাবনা) গৈলা হাই স্কুল (বরিশাল) বাবুরহাট হাই স্কুল (ত্রিপুরা) ডব্লিউ.বি. ইউনিয়ন চিকনদি হাই স্কুল (ফরিদপুর) ইনষ্টিটিউশন (বরিশাল) ভোলা এইচ, ই, স্কুল (বরিশাল) মহারাজগঞ্জ মার্চেন্টস এইচ ই. স্কুল (বরিশাল) বাইসারি এইচ. ই. স্কুল (বরিশাল) কার্তিকপুর এইচ.ই. স্কুল (ফরিদপুর) সিরাজগঞ্জ ভিক্টোরিয়া স্কুল (পাবনা) এইচ.ই. স্কুল (বরিশাল), বানারিপাড়া ইউনিয়ন ইনষ্টিটিউশন (বরিশাল) ব্রজমোহন ইনষ্টিটিউশন (বরিশাল) টাঙ্গাইল বিন্দুবাসীনি, বগুড়া হাই স্কুল (বগুড়া) কোটালিপাড়া ইউনিয়ন ইনষ্টিটিউশন (ফরিদপুর) সুনামগঞ্জ জুবিলী হাই স্কুল (শ্রীহট্র) পটুয়াখালী এইচ.ই. স্কুল (বরিশাল) সাটিরপাড়া কালীকুমার ইনষ্টিটিউশন (ঢাকা) ইদিলপুর হাই স্কুল (ফরিদপুর) ঝালকাঠি হাই স্কুল (বরিশাল) লক্ষীপুর এইচ.ই. স্কুল (নোয়াখালী) ন্যাশনাল হাই স্কুল (ত্রিপুরা) মুড়াপাড়া ভিক্টোরিয়া হাই স্কুল (ঢাকা) রহমতপুর হাই স্কুল (বরিশাল) হাসান আলি জুবিলী স্কুল (ত্রিপুরা) শিবসাগর হাই স্কুল (আসাম) এডওয়ার্ড ইনস্টিটিউশন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া (ত্রিপুরা) নবীনগর হাই স্কুল (ত্রিপুরা), বাগেরহাট এইচ.এ. স্কুল (?) প্রভৃতি। [দ্র. [দ্র. বাংলার বাঘ স্যার আশুতোষ, অপরাজিত, পূর্বোক্ত,পৃ ১৯৩]
62. c‡ev³,c.193Ñ94
63. c‡ev³,c.194
64. c‡ev³,c.194 Ñ95
65. c‡ev³,c.195
৬৬. c‡ev³,c.১৯৫
৬৭. দীনেশচন্দ্র সিংহ, স্নাতকোত্তর শিক্ষা–গবেষণার স্থপতি আশুতোষ (প্রবন্ধ), c‡ev³,c.১৯৯

৬৮. W. bxnviiÄbivq †eZvi fvlY (29.3.1964), উদ্ধৃতি, দীনেশচন্দ্র সিংহ, মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কারে আশুতোষের অবদান (প্রবন্ধ), পূর্বোক্ত,পৃ.১৯৬
৬৯. দীনেশচন্দ্র সিংহ, স্নাতকোত্তর শিক্ষা–গবেষণার স্থপতি আশুতোষ (প্রবন্ধ), পূ‡ev³,পৃ.১৯৭
70. c‡ev³,c.198
71. c‡ev³,c.199
72. c‡ev³,c.200
73. c‡ev³,c.200
74. c‡ev³,c.200Ñ201
75. c‡ev³,c.201
76. c‡ev³,c.202
৭৭. c‡ev³,c.২০৩
৭৮. মনোতোষ দাশগুপ্ত, তোমারি রাগিণী জীবনকুঞ্জে (প্রবন্ধ), Avï‡Zvl: we‡'¨vi mvix_, পূর্বোক্ত,পৃ.৪৭
৭৯. পূর্বোক্ত,পৃ.৪৭
৮০. ভাস্কর মৃধা,বাংলা ভাষার প্রতিষ্ঠা ও স্যার আশুতোষ (প্রবন্ধ), Avï‡Zvl: we‡'¨vi mvix_, পূর্বোক্ত, পৃ.২৬
৮১. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬
৮২. মনোতোষ দাশগুপ্ত, তোমারি রাগিণী জীবনকুঞ্জে (প্রবন্ধ), mgveZb fvlY 1911) পূর্বোক্ত,পৃ .৪৭
৮৩. ভাস্কর মৃধা,বাংলা ভাষার প্রতিষ্ঠা ও স্যার আশুতোষ (প্রবন্ধ), পূর্বোক্ত,পৃ.২৭
৮৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭
৮৫. স্বপনকুমার দাস, আশুতোষ ও বিজ্ঞান শিক্ষা (প্রবন্ধ), AciwRZ, পূর্বোক্ত,পৃ ২৪২
৮৬. পূর্বোক্ত,পৃ ২৪১
৮৭. পূর্বোক্ত,পৃ ২৪২
৮৮. পূর্বোক্ত,পৃ ২৪৩
৮৯. পূর্বোক্ত,পৃ ২৪৩
৯০. পূর্বোক্ত,পৃ ২৪২
৯১. প্রতাপচন্দ্র, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও জাতীয় সাহিত্য (প্রবন্ধ), AciwRZ, পূর্বোক্ত,পৃ ১৮৭–৮৮
৯২. আশুতোষ মুখোপাধ্যায় , ভারতীয় সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ঃ জাতীয় সাহিত্য পৃ ৬, [দ্র. নির্মল দাশ,বাঙালির মাতৃভাষা ও আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (প্রবন্ধ), AciwRZ, পূর্বোক্ত,পৃ ২৫৬]
৯৩. এম. এ. পাশ ছাত্রদের উপহাস করে তখনকার সাময়িকপত্রে নানা ব্যঙ্গরচনা ও ছবি প্রকাশ করা হত। এর প্রতিবাদ হিসাবে আশুতোষ পুত্র শ্যামাপ্রসাদকে বাংলায় এম. এ পড়িয়েছিলেন ।[দ্র. AciwRZ, পূর্বোক্ত,পৃ ২৫৬]
৯৪. ড.দীনেশচন্দ্র সিংহ সম্পাদিত, প্রসঙ্গ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ.৮৩
95. *Address at the first Convocation of Mysore University-19.10.1918.* উল্লিখিত অনুচ্ছেদের ভাবার্থ হচ্ছে–

(ভাবার্থঃ সারা দেশব্যাপী জালের মতো ছড়িয়ে থাকবে সুপরিচালিত স্কুল। সেখানে স্কুল শিক্ষারই উন্নত, সম্প্রসারিত ও পরিপূরক ধাপ যে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা, তার জন্য ছাত্রগণ শিক্ষা পাবে। এই ছাত্রগণ যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি-প্রার্থী হবে তখন তাদের বাজিয়ে নেবার জন্য এক বাছাই পরীক্ষায় বসতে হবে। তবে সে পরীক্ষার মান অনাবশ্যকভাবে কঠোর হবে না-ভীতিকর ও স্বেচ্ছাচারমূলক তো নয়ই। ছাত্রজীবনের এই পর্বে তাদের বিচার-বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণশক্তির প্রসারণ ঘটাতে হবে। প্রথমত, ছাত্রদের জাতীয় ভাষার উপর সম্পূর্ণ অধিকার থাকা চাই। ভাষার ব্যাকরণগত গঠনশৈলী সম্পর্কে নির্ভুল জ্ঞান থাকা উচিত। সাহিত্যের শ্রেষ্ট সৃষ্টিসমূহের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় থাকা বাঞ্জনীয়। নিজস্ব ভাষায় সুনিপুণভাবে প্রকাশ করার দক্ষতা থাকা আবষ্যক। ইংরেজি ভাষায়-ইংরেজি সাহিত্যে নয় কিন্তু-কাজ চালাবার মতো নিখুঁত জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক। দ্বিতীয়ত, প্রযুক্তি বিজ্ঞান বিষয়ে তো বটেই, সম্ভব হলে প্রযুক্তি যন্ত্রবিদ্যারও নির্বাচিত শাখায় চর্চার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বোধ বিচারশক্তির পুষ্টি ঘটান উচিত। সবশেষে, প্রাচীন ভাষা, বিশ্বের ভুগোল, ভারতবর্ষ ও ইংলন্ডের ইতিহাস, এবং সম্ভব হলে আধুনিক ইতিহাসে জ্ঞানলাভের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মানসিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার ঘটাতে হবে। কোন সাধারণ মেধাসম্পন্ন অথচ পরিশ্রমী ছাত্র তার মাতৃভাষার মাধ্যমে যদি এই ধরনের পাঠক্রমে শিক্ষা পায়, তা হলে ১৭ বছর বয়সেই এক উদার শিক্ষার মূল সূত্র তার আয়ত্ত হবে এবং পরবর্তী তিন বছরে পাঠক্রম সমাপনান্তে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি অর্জনের সম্পূর্ণ উপযুক্ত হয়ে উঠবে। অত্যন্ত কুশলী, কর্তব্যপরায়ণ স্বাধীনচেতা প্রথম শ্রেণীর শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে পেশাভিত্তিক এবং মানসিক উৎকর্ষবিধায়ক শিক্ষাদানের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা রাখতে হবে। কারণ, একমাত্র শিকারী বাজপাখির পক্ষেই বাচ্চা বাজপাখিকে শিকার শেখান সম্ভব। [দ্র.প্রসঙ্গ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পূর্বোক্ত,পৃ ৮৩–৮৪]

৯৬. ড.দীনেশচন্দ্র সিংহ সম্পাদিত, cm½ KjKvZv wekwe'¨vjq, পৃ.৮৫
৯৭. Avï‡Zvl: we‡'¨vi mvix_,সার্ধশত–জন্মবর্ষে শ্রদ্ধার্ঘ্য, পূর্বোক্ত,পৃ ১১৪

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

স্বামী বিবেকানন্দ ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর শিক্ষাচিন্তা

স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাচিন্তা:

১. পরিচয়
১.২ স্বামী বিবেকানন্দের মানস বৈশিষ্ট্য
১.৩ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও কর্ম
১.৪ শিক্ষাচিন্তায় আত্মনিয়োগ

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর শিক্ষাচিন্তা:

২. পরিচয়
২.২ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মানস বৈশিষ্ট্য
২.৩ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও কর্ম
২.৪ বাংলা ভাষায় অনুরাগ ও ইংরেজি শিক্ষার বিরোধীতা
২.৫ বাংলা ভাষায় শিক্ষা বিস্তারে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা
২.৬ পরিভাষা চর্চায় ভূমিকা

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

স্বামী বিবেকানন্দ ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর শিক্ষাচিন্তা

১
স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাচিন্তা

পরিচয়

উনিশ শতকের নবজাগরণের চিন্তা ধারায় স্বামী বিবেকানন্দ মানবতাবোধে দীক্ষিত ছিলেন। তিনি সমকালীন চিন্তা ধারায় প্রভাবিত ছিলেন। স্বদেশ ও স্বজাতির মঙ্গলার্থে আত্মনিবেদন ছিল তাঁর জীবনের লক্ষ্য। কর্মে সফলতা অর্জনের জন্য ইচ্ছাশক্তিকে বেশি গুরুত্ব দিতেন। তিনি বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে এই সত্যে উপনীত হন যে আত্মশক্তি অর্জন না হলে মানুষের মুক্তি নেই। আর এই মুক্তির মূলে ছিল তাঁর শিক্ষাচিন্তা। বিদ্যাশিক্ষাকে তিনি জাগতিক সমস্ত কর্মের মধ্যে অতি উত্তম কর্ম বলে মনে করতেন। চারপাশের হতাশার দারিদ্র এবং সামাজিক ধর্মীয় অসংগতি তাকে নানদিক থেকে ব্যথিত করত। এই বোধ থেকে তিনি মানব কল্যানের জন্য আত্মনিবেদন করেছিলেন। তিনি স্বদেশের ইতিহাস ঐতিহ্যকে তুলে ধরে স্বদেশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। বেদান্ত ধর্ম চিন্তার কারণে সেকালে নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে। তিনি সেগুলোকে বাধা মনে করেননি। সমাজে নারীর মর্যাদা এবং সাধারণ মানুষের উন্নতিকল্পে শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। অভাবের মধ্যে বাঙালির ধর্মচর্চাকে বিবেকানন্দ সহ্য করতেন না। তাঁর কাছে ক্ষুধার্ত মানুষের চেয়ে ধর্ম বড় ছিল না। তিনি ধর্মের চেয়ে মানুষের কল্যাণকে গুরুত্ব দিতেন বেশি। তিনি বিশ্বাস করতেন শিক্ষাদীক্ষায় মানুষ উন্নত চিন্তার অধিকারী হলে বিশেষ কোনো ধর্মে গুরুত্ব দিবে না। এমনকি পৃথিবীতে প্রচলিত শ্রেষ্ঠ ধর্মগুলোর অস্তিত্বও থাকবে না। শিক্ষাচিন্তায় তিনি নারীশিক্ষা, জনশিক্ষা, বিজ্ঞানশিক্ষা প্রভৃতির কথা বলেছিলেন।

১.২
স্বামী বিবেকানন্দের মানস বৈশিষ্ট্য

স্বামী বিবেকানন্দের বেদান্তবাদ বেদান্তকে তত্ত্বকথার সীমানা ছাড়িয়ে ব্যবহারিকের আঙিনায় এনে দিয়েছে। তাঁর মতে, আগামী পৃথিবীতে কোন একটি বিশেষ 'ধর্মমত' থাকবে না। হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, খ্রীষ্টধর্ম-এরকম নির্দিষ্ট একটা 'ধর্মমত' বলে পৃথিবীতে কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকবে না। কারণ, যত মানুষ শিক্ষিত হবে তত মানুষের বৌদ্ধিক দিগন্ত আরো বেশি বিস্তৃত হবে। তখন সেই শিক্ষিত মানুষ কোন একটি নির্দিষ্ট ধর্মীয় গণ্ডির মধ্যে আটকে থাকতে চাইবে না। সেই সময় সমগ্র পৃথিবীর মানুষের কাছে একটা বিশ্বজনীন আধ্যাত্মিক আদর্শকে উপস্থাপিত করতে হবে। যার উপর কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের ছাপ থাকবে না। কিন্তু ধর্মকে কি এক্ষেত্রে রাখা যাবে? আগমী দিনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিস্ময়কর প্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে এমন সময় আসন্ন যখন কোন নির্দিষ্ট ধর্মকে মানুষ আর নেবে না। আবার ধর্ম ছাড়া মানুষ বাঁচতেও পারবে না।

বিবেকানন্দ এই সামাজিক আধ্যাত্মিক সমস্যার সমাধান করে বললেন, তখন পৃথিবীতে ধর্ম থাকবেই, কিন্তু কোন নির্দিষ্ট সাম্প্রদায়িক ধর্ম থাকবে না। হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্ম, মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্ম, খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের ধর্ম-এইরকম সাম্প্রদায়িক ধর্ম মুছে গিয়ে সারা পৃথিবীর জন্য একটি বিশ্বজনীন ধর্ম (Universal

Religion) গড়ে উঠবে। আগামী দিনের এই বিশ্বজনীন ধর্ম হবে বেদান্ত। পাশ্চাত্যে প্রচারের সময় এবং পরবর্তীকালে ভারতে প্রচারের সময় বিবেকানন্দ এই বেদান্তেরই জয়গান গেয়েছেন। তিনি বলেছেন, আমি চাই এমন একটি মানবসমাজ যেখানে বেদ থাকবে না, বাইবেল থাকবে না, কোরান থাকবে না।

বিবেকানন্দ মানবসমাজকে এমন একটি স্থানে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন যেখানে বেদ নেই, বাইবেল নেই, কোরান নেই। কিন্তু বেদ, বাইবেল ও কোরানের মর্ম থাকবে তার মধ্যে নিহিত। আসলে সেখানে যে পতাকার তলে সমস্ত মানুষ সমবেত হবে সেই পতাকাটি হবে মানবতা। সব মানুষের কথা সেখানে বলা হবে এবং এই পতাকাকে একটি ধর্মের নাম যদি দিতে হয় তবে তার নাম হবে 'বেদান্ত ধর্ম'। স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের এই বিজ্ঞান-দর্শনকে অবলম্বন করেই সংঘের আদর্শ ঘোষণা করলেন:

> বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়'-
> আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ।[১]

এই আদর্শের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ আত্মমুক্তি ও জগতের হিত-এই দুটিকে পাশাপাশি বিবেচনা করেছেন । জ্ঞান ও বিজ্ঞানের এ এক অপূর্ব সমন্বয় ও সহাবস্থান ছিল তাঁর। 'এই ভাবে তিনি বনের বেদান্তকে ঘরে আনলেন, গুহার উপলব্ধিকে গৃহে আনলেন, গ্রন্থবদ্ধ জ্ঞানকে অর্গলমুক্ত করে জীবনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করলেন। সর্বপ্রাণীর সুখের জন্য, সব মানুষের কল্যাণের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের বিজ্ঞানবাদকে তিনি ছড়িয়ে দিলেন সর্বত্র।'[২]

স্বামী বিবেকানন্দের বেদ সম্বন্ধীয় ধারণর উপর বিশ্লেষণমূলক রচনা আমাদের চোখে পড়ে না। কেবলমাত্র স্বামী প্রেমানন্দের কাছে বেদ-বিদ্যালয় গঠনের ইচ্ছা প্রকাশ করা ছাড়া।

বিবেকানন্দের শেষ ইচ্ছা স্বামী প্রেমানন্দের কাছে আদেশরূপে ধরা দিয়েছিল পরবর্তীকালে মঠের ব্রহ্মচারীদের প্রশিক্ষণের দায়িত্বপালনের সময় ব্রহ্মচারীদের সংস্কৃত শিক্ষা বা বেদ অভ্যাসের দিকে তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। তৎকালে একপত্রে প্রেমানন্দ লিখেছেন:

> স্বামীজী শেষদিন শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমার কাছে কেবল বিদ্যাপ্রচারের কথা বলেছিলেন। মূর্খ হলেই ভক্ত হয় না। ভাব প্রকাশের ভাষা চাই।...ভাবভক্তি কি ছড়াছড়ি যাচ্ছে, ধন? শিক্ষা কি সাধন নয়?[৩]

স্বামী অখণ্ডানন্দ বরাহনগর মঠে বেদবিদ্যালয় গঠন করতে না পারলেও বেলুড় মাঠে নবীন ব্রহ্মচারীদের জন্য একটি বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব ছিল বলে জানা যায়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় লিখেছেন:

> মনে পড়ে শিকাগো 'ধর্ম্ম মহাসভায়' ভারতে খৃষ্টধর্ম প্রচারভিলাষী মিশনারীদিগকে লক্ষ্য করিয়া স্বামীজি বলিয়াছিলেন যে ভারতবাসী ভাতের-এক মুঠি অন্নের কাঙ্গাল-ধর্মের কাঙ্গাল নহে, তাহাদের ক্ষুধার্ত মুখে আজ অন্ন প্রদান করিতে হইবে। কারণ, ক্ষুধার্ত্ত লোকদিগকে ধর্ম্মের কথা বলা, তা তাহাদিগকে দর্শনশাস্ত্র বুঝাইবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র। .....আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দ দেখিয়েছেন যে সাধারণ কুলিমজুরও প্রতিদিন ৯/১০ টাকা রোজগার করে, আর ভারতের লক্ষ লক্ষ লোক অনশন অর্ধাশনে দিনপাত করে। তাই স্বামীজি বলিতেন যে যে জাত সামান্য অন্নবস্ত্রের সংস্থান কর্ত্তে পারে না, পরের মুখাপেক্ষী হয়ে জীবন যাপন করে সে জাতের আবার বড়াই। ধর্ম্ম কর্ম্ম এখন গঙ্গায় ভাসিয়ে আগে 'জীবন সংগ্রামে অগ্রসর হ'।[৪]

১.৩

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও কর্ম

স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৬৩ সালের ১২ জানুয়ারি কলকাতার শিমুলিয়া পল্লীতে জন্ম গ্রহণ করেন। । জন্মের সময় তাঁর নাম রাখা হয় নরেন্দ্রনাথ দত্ত। তার বাবা বিশ্বনাথ দত্ত এবং মা ভূবনেশ্বরী দেবী। স্বামী বিবেকানন্দের বাবা বিশ্বনাথ দত্ত ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী। পারিবারিক পরিবেশে প্রাথমি শিক্ষা গ্রহণ, পরে মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশন ও প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন করেন। ১৮৮৩ সালে জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশন থেকে বি. এ. পাস করেন। কিছুকাল আইন ক্লাসে অধ্যয়ন করেন। পিতার মৃত্যুর পর চরম অর্থ

সংকটে পড়ে তিনি প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোন ত্যাগ করেন। কিছুকাল মেট্রোপলিটান স্কুলে মধ্যে দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন। সাধারণ বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গীত ও ব্যায়ামের পারদর্শিতা অর্জন। রামোহন রায়ের বেদান্ত দর্শন পড়ে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট হন। কলেজে পড়ার সময় রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের সান্নিধ্য লাভ ও তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ১৮৮৬ সালে রামকৃষ্ণের মৃত্যুর পর তাঁর কিছু শিষ্যের সহায়তায় বরাহনগরে রামকৃষ্ণ মঠ স্থাপন করেন। এই সময় সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ এবং বিবেকানন্দ নামে অভিহিত হন । তিনি তিন বছরকাল পরিব্রাজকরূপে সমস্ত ভারত ভ্রমণ করেন। তিনি জ্ঞানার্জনের তৃষ্ণায় জয়পুরের সভাপণ্ডিতদের কাছে পাণিনি, ক্ষেত্রীয় সভাপণ্ডি নারায়ণ দাসের কাছে পতঞ্জলি এবং পাণ্ডু রায়ের কাছে বেদান্ত অধ্যয়ন। শিকাগোতে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় হিন্দু ধর্মের প্রতিনিধিরূপে যোগদানের উদ্দেশ্যে মাদ্রাজবাসী বন্ধুদের সহায়তায় ১৮৯৩ সালের ১৩ মে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন। সেখানে সারগর্ভ বক্তৃতা দিয়ে অসামান্য বাগ্মীরূপে পরিচিতি লাভ করেন। ১৮৯৯ সালে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কেন্দ্র বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। এ বছরই বেদান্ত শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠাকল্পে পুনরায় যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন। স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত ধর্ম-ইতিহাস সম্মেলনে যোগদান করেন। ১৯০০ সালে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, বেনারসে, ব্রহ্মচর্যাশ্রম, বারকৃষ্ণ হোম, রামকৃষ্ণ পাঠশালা ইত্যাদি স্থাপন করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে পরিব্রাজক (১৯০৩ সাল), ভাববার কথা (১৯০৫), বর্তমান ভারত (১৯০৫ সাল), প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, Karmayoga, Rajayoga, Jnanayoga। বাংলা সাহিত্যে সফল কথ্যরীতির অন্যতম প্রধান প্রচারক। তাঁর বক্তৃতা ও রচনা তেজ, বীর্য, কর্তব্যপরায়ণতা, উদারতা, দেশানুরাগ, সাম্য, স্বাধীনতা, সর্বজীবে দয়া, ত্যাগ ও বৈরাগ্যসাধনার বাণীতে ভাস্বর। তিনি ৪ জুলাই ১৯০১ সালে বেলুড় মঠ মৃত্যুবরণ করনে।

১.৪

শিক্ষাচিন্তায় আত্মনিয়োগ

স্বামী বিবেকান্দ শাশ্বত মানবতার উদ্বোধক। তিনি সর্বজনীন শিক্ষার কথা বলেছেন। মানবতার উদ্বোধন ও বিকাশের লক্ষ্যে প্রণীত বা পরিকল্পিত তাঁর শিক্ষা ব্যবস্থাকে কোন বিশেষ গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের মধ্যে কেন্দ্রীভূত রাখার তিনি ছিলেন ঘোর বিরোধী।[৫] জাতীয় জীবন গঠনে শিক্ষা ছাড়া যে বিকল্প পথ নেই তা তিনি অন্তর দিয়ে বুঝেছিলেন। এ সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য ছিল অত্যন্ত পরিষ্কার:

> জন সাধারণকে শিক্ষিত করা এবং তাহাদিগকে উন্নত করাই জাতীয় জীবন গঠনের পন্থা। আমাদের সমাজের সংস্কারকগণ খুঁজিয়া পাননা ক্ষতটি কোথায়।.... সমস্ত এুটির মূলই এইখানে যে, সত্যিকার জাতি–যাহারা কুটিরে বাস করে, তাহারা তাহাদের ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্ব ভুলিয়া গিয়াছে।....তাহাদের লুপ্ত ব্যক্তিত্ববোধ আবার ফিরাইয়া দিতে হইবে। তাহাদিগকে শিক্ষত করিতে হইবে।..... প্রত্যেককেই তাহার নিজের মুক্তির পথ করিয়া লইতে হইবে। রাসায়নিক দ্রব্যের একত্র সমাবেশ করাই আমাদের কর্তব্য– দানা বাঁধার কার্য ঐশ্বরিক বিধানে স্বতঃই হইয়া যাইবে। আসুন, আমরা তাহাদের মাথায় ভাব প্রবেশ করাইয়া দেই–বাকীটুকু তাহারা নিজেরাই করিবে। ইহার অর্থ, জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করিতে হইবে।'[৬]

তিনি প্রচলিত জাতিভেদ, অতীতমুখীচিন্তা, মৃত ও নিষ্প্রাণ- জড়পূজা পরিত্যাগ করে ভারতবাসীকে প্রাণসম্পন্ন মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানান। তাঁর সে আহবানে সাড়া দিতে দেশবাসী যাতে মানসিক ও আত্মিক শক্তি অর্জন করতে পারে তার জন্য প্রকৃত ও সর্বজনীন শিক্ষা বাস্তবায়নের উপর জোর দেন তিনি। এ সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য ছিলঃ

> These arc the very people whom I want to help. For, are not all souls of the same quality? Is not the goal of all the same? And so strength must come to the nation through education.[৭]

Dhaka University Institutional Repository

বিবেকানন্দের মতে শিক্ষা কেবল আলো সম নয়, এটি শক্তিও।[৮] তিনি সেই আলো খুঁজে পেয়েছিলেন মানুষের অন্তরে। হিন্দুধর্ম প্রচার করতে গিয়ে জাগতিক মঙ্গল ও শিক্ষা বিস্তারের উপর জোর দিয়েছিলেন বলে তিনি বিবেকানন্দের প্রতি সত্যেন্দ্রনাথ বসু শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তিনি বলেছেন:

> বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন যে জীবনকে উপোসী রেখে পারলৌকিক মঙ্গলেন পিছনে ছুটা মরীচিকার পিছনে দৌড়ানের মতই নির্থক। খালি পেটে যে ধর্ম হয় না, তা তার আগে খুব কমজনেই এমন করে বুঝিয়েছেন। সেইজন্য যে আন্দোলনের সূত্রপাত তিনি করে গেলেন, তার অন্যতম আদর্শ ছিল সেবার মধ্য দিয়ে মানুষের মঙ্গল বলতে তিনি তার সামগ্রিক কল্যাণ বুঝতেন। সাধারণ মানুষের জীবনের কোন অংশই তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। শিক্ষা বিস্তার এবং নতুন ধর্মাদর্শন প্রচার দুয়েতেই তাঁর সমান আগ্রহ ছিল।[৯]

শিক্ষা সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের বাণীর ভূমিকা অসামান্য। তাঁর গভীর চিন্তাপ্রসূত শিক্ষাদর্শ নব্যভারতের গঠনমূলক কাজে শিক্ষাক্ষেত্রে কীভাবে কার্যকর হতে পারে এবং বালক বালিকাগণের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক উন্নতি বিধানে কীভাবে সহায়তা করতে পারে তা তাঁর ভাবগম্ভীর উক্তির মাধ্যমে সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে।এখানে তাঁর এধরনের কয়েকটি বাণি উল্লেখ করা যেতে পারে।[১০] যথা:

১. Education is the manifestation of the perfection already in man.
২. ইউরোপের বহু নগর পর্যটন করিয়া তাহাদের দরিদ্রদেরও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও বিদ্যা দেখিয়া আমাদের গরিবদের কথা মনে পড়িয়া অশ্রুজল বিসর্জন করিতাম। কেন এ পার্থক্য হইল? শিক্ষা-জবাব পাইলাম। শিক্ষাবলে আত্মপ্রত্যয়, আত্মপ্রত্যয়বলে অন্তর্নিহিত ব্রহ্ম জাগিয়া উঠিতেছেন; আর ক্রমেই তিনি সঙ্কুচিত হচ্ছেন।
৩. শিক্ষা হচ্ছে মানুষের ভিতর যে পূর্ণতা প্রথম হতেই বর্তমান তারই প্রকাশ।
৪. আমাদের প্রত্যেকের ভিতর কি ক্ষুদ্র পিপীলিকা, কি স্বর্গের দেবতা- সকলেরই ভিতর অনন্ত জ্ঞানের প্রস্রবণ রয়েছে।
৫. জ্ঞান স্বতই বর্তমান রয়েছে, মানুষ কেবল সেটা আবিস্কার করে মাত্র।
৬. বাহ্যজগৎ হইতে আমরা কেবল উত্তেজনা পাই, এমন কি সেই উত্তেজনার অস্তিত্ব জানিতে হইলেও আমাদিগকে ভিতর হইতে প্রতিক্রিয়া করিতে হয়; আর যখন আমরা এই প্রতিক্রিয়া করি, তখন প্রকৃতপক্ষে আমরা আমাদের নিজ মনের কিছুটা সেই উত্তেজনার দিকে প্রেরণ করি; আর যখন আমরা উহাকে জানিতে পারি, তখন আমাদের নিজ মন ঐ উত্তেজনা দ্বারা যেভাবে আকরিত হয়, আমরা সেইভাবে আকারিত মনকেই জানিতে পারি।
৭. সমস্ত জ্ঞান ও সমস্ত শক্তি অন্তর্নিহিত রহিয়াছে, বাহির নহে। যাহাকে আমরা প্রকৃত বলি উহা একখানি প্রতিচ্ছবির আরশি উহাই মাত্র প্রকৃতির কাজ আর জ্ঞান হইল এই প্রকৃতিরূপ আরশিতে অন্তর্নিহিতের প্রতিচ্ছায়া। আমরা যাহাকে শক্তি, প্রকৃতির রহস্য এবং বল বলি, সমস্তই অন্তর্নিহিত, বহির্জগতে কতকগুলি ধারাবাহিক পরিবর্তনমাত্র। প্রকৃতিতে কোন জ্ঞান নাই; সমস্ত জ্ঞান মানুষের আত্মা হইতে আসে। মানুষ জ্ঞান প্রকাশ করে, তাহার অন্তরে আবিস্কার করে- এ সমস্ত পূর্ব হইতেই অনন্তকাল যাবৎ রহিয়াছে।
৮. 'আমরা শিক্ষা করিতেছি' এবং এই আবরণ অপসারণের কাজ যতই অগ্রসর হয়, জ্ঞানও ততই অগ্রসর হইতে থাকে। এই আবরণ যাঁহার ক্রমশ উঠিয়া যাইতেছে, তিনি অপেক্ষাকৃত জ্ঞানী; যাঁহার আবরণ খুব বেশি, সে অজ্ঞান; আর যে ব্যক্তি হইতে অজ্ঞান একেবারে গিয়াছে, তিনি সর্বজ্ঞ। পূর্বে অনেক সর্বজ্ঞ পুরুষ ছিলেন; আমার বিশ্বাস একালেও অনেক হইবেন, আর আগামী কল্পসমূহে অসংখ্য সর্বজ্ঞ পুরুষ জন্মাইবেন। আমি যেমন একখণ্ড চকমকিতে নিহিত থাকে, জ্ঞান তেমনি মনের মধ্যেই রহিয়াছে; উদ্দীপক কারণটি যেন ঘর্ষণ, জ্ঞানাগ্নিকে প্রকাশ করিয়া দেয়।
৯. আমাদের ভিতর শক্তি পূর্ব হইতেই নিহিত ছিল অব্যক্তভাবে, কিন্তু ছিল নিশ্চয়ই। অতএব সিদ্ধান্ত এই: মানুষের আত্মাতেই অনন্ত শক্তি রহিয়াছে, মানুষ উহার সম্বন্ধে না জানিলেও উহা রহিয়াছে, কেবল জানিবার অপেক্ষামাত্র।
১০. প্রত্যেক বিষয়ের ব্যাখ্যা তোমার নিজের ভিতরে। কেহই প্রকৃতপক্ষে কখনও অপরের দ্বারা শিক্ষিত হয় নাই। প্রত্যেককে নিজে নিজে শিক্ষা লাভ করিতে হইবে বাহিরের আচার্য কেবল উদ্দীপক কারণমাত্র। সেই উদ্দীপনা দ্বারা আমাদের ভিতরের আচার্যই আমাদিগকে সকল বিষয় বুঝাইয়া দিবার জন্য উদ্বোধিত হন। তখন সব কিছুই আমাদের অনুভব ও চিন্তা দ্বারা প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট হইয়া আসে। তখন আমরা নিজেদের আত্মার ভিতরে ঐ সকল তত্ত্ব অনুভব করিব এবং এই অনুভূতিই প্রবল ইচ্ছাশক্তিরূপে পরিণত হইবে। প্রথমে ভাব, তারপর ইচ্ছা।
১১. মানবজাতির চরম লক্ষ্য-জ্ঞানলাভ। জগতের মহাপুরুষগণের চরিত্র আলোচনা করিলে দেখা যায়, অধিকাংশ স্থলে সুখ অপেক্ষা দুঃখ তাঁহাদিগকে অধিক শিক্ষা দিয়াছে ধনৈশ্বর্য অপেক্ষা দারিদ্র্য অধিক শিক্ষা দিয়াছে, প্রশংসা অপেক্ষা নিন্দারূপ আঘাতই তাঁহাদের অন্তরের অগ্নি প্রজ্বলিত করিতে অধিক পরিমাণে সাহায্য করিয়াছে। যদি

Dhaka University Institutional Repository

আমরা ধীরভাবে নিজেদের অন্তঃকরণ অধ্যয়ন করি, তবে দেখিব, আমাদের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, আর্শীবাদ-অভিসম্পাত, নিন্দা-সুখ্যাতি সবই আমাদের মনের উপর বহির্জগতের বিভিন্ন আঘাতের দ্বারা আমাদের ভিতর হইতেই উৎপন্ন। উহাদের ফলেই আমাদের বর্তমান চরিত্র গঠিত।

১২. মানুষকে যত প্রকার শক্তি লইয়া নাড়াচাড়া করিতে হয় তন্মধ্যে যে কর্মের দ্বারা তাহার চরিত্র গঠিত হয়, তাহাই সর্বাপেক্ষা প্রবল শক্তি।

১৩. সাধারণের ভেতর আর মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার না হলে কিছু হবার জো নেই।

১৪. ভারতবর্ষে আমরা গরিবদের, সামান্য লোকদের, পতিতদের কি ভাবিয়া থাকি। তাহাদের কোন উপায় নাই, পলাইবার কোন রাস্তা নাই, উঠিবার কোন উপায় নাই। ভারতের দরিদ্র, ভারতের পতিত, ভারতের পাপীগণের সাহায্যকারী কোন বন্ধু নাই। সে যতই চেষ্টা করুক, তাহার উঠিবার উপায় নাই। তাহারা দিন দিন ডুবিয়া যাইতেছে। রাক্ষসবৎ নৃশংস সমাজ তাহাদের উপর ক্রমাগত যে আঘাত করিতেছে, তাহার বেদনা তাহারা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছে, কিন্তু তাহারা জানে না কোথা হইতে ঐ আঘাত আসিতেছে। তাহারাও যে মানুষ, ইহা তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে। ইহার ফল দাসত্ব ও পশুত্ব।

১৫. আমাদের দেশে একজন মহৎ লোক মারা গেলে বহু শতাব্দী ধরিয়া আর একজনের আবির্ভাবের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে হয়, আর এদেশে (পাশ্চাত্যদেশে) মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সে স্থান পূর্ণ হইয়া যায়। কারণ পাশ্চাত্যে কৃতী পুরুষগণের উদ্ভবক্ষেত্র অতি বিস্তৃত, আর আমাদের দেশে অতি সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্র হইতে তাঁহাদের উদ্ভব হইয়া থাকে। এ দেশের শিক্ষিত নরনারীর সংখ্যা অত্যন্ত বেশি। তাই ত্রিশকোটি অধিবাসীর দেশ ভারতবর্ষ অপেক্ষা তিন চার কিংবা ছয় কোটি নরনারী অধ্যুষিত এ সকল দেশে কৃতী পুরুষগণের উদ্ভবক্ষেত্র বিস্তৃততর।

বিবেকানন্দের শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল চরিত্রগঠণ, ইচ্ছা শক্তির জাগরণ এবং সংস্কার সাধন। ভালোমন্দের পার্থক্য নির্ণয়, সত অভ্যাস গড়ে তোলা প্রভৃতি। অশেষ জ্ঞান ও অনন্ত শক্তির আকর ব্রহ্ম প্রত্যেক নরনারীর অভ্যন্তরে সুপ্তের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন; সেই ব্রহ্মকে জাগরিত করাই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য।

২

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর শিক্ষাচিন্তা

পরিচয়

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯) বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার অন্যমত পথিকৃৎ। অসামান্য প্রতিভার অধিকারী বাঙালি রেনেসাঁর ভাব-সংঘাত ও সমন্বয়ের অন্যতম সার্থক পুরুষ। তিনি কলকাতা রিপন কলেজের পদার্থবিজ্ঞানের কৃতি অধ্যাপক হিসেবে সুপরিচিত। তিনি বিজ্ঞান ও দর্শনের জটিল তত্ত্ব প্রাঞ্জল ও সাবলীল গদ্যে বিশ্লেষণ করে বাংলা প্রবন্ধ–সাহিত্যের সমৃদ্ধিসাধন করেছেন। রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্যচর্চায় বহুজনকে অনুপ্রাণিত করেছেন। পারিবারিক ঐতিহ্য অনুযায়ী রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞান চর্চার সঙ্গে সাহিত্য প্রতিও বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। তিনি বাংলা ভাষাচর্চার উন্নয়ন, বিকাশ ও বিস্তৃতি ঘটানোর লক্ষ্যে বাংলা পরিভাষা প্রণয়নে উদ্যোগী হন। এ ক্ষেত্রে তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি পদ্ধতিগতভাবে এ ধরণের পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। এ দিক থেকে বাংলা পরিভাষার আদি স্থপতির মর্যাদা তাঁর। রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, ধর্ম, জীবন ও জগৎ, ভাষাতত্ত্ব, সৌন্দর্যতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে বহু প্রবন্ধ লিখেছেন। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা, চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রভৃতি গ্রন্থ[২] রচনা করেছেন। এ দেশের বিস্তৃত ঐতিহাসিক উপকরণ সংগ্রহ করে ইতিহাস রচনা করে দেশের গৌরবময় চিত্র দেশে–বিদেশের সবার সামনে তুলে ধরায় ছিল তাঁর আগ্রহ দেখা যায়। তিনি সমকালের নানা বিষয় অনুসঙ্গ এবং অন্যান্য চিন্তকদের নিয়ে আলোচনা করেছেন। বিভিন্ন সাহিত্য সভায় দেওয়া তাঁর ভাষণ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের

Dhaka University Institutional Repository

অমুল্য সম্পদ। তিনি যুক্তিনিষ্ঠ মন নিয়ে ইংরেজি ভাষায় শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় বাঙালির অগ্রগতি না হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন । বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানশিক্ষার বিস্তারের মাধ্যমে বাঙালির উন্নতি সার্বিক উন্নতি প্রত্যাশা করতেন।

২.২

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মানস বৈশিষ্ট্য

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ছিলেন অসামান্য প্রতিভার অধিকারী, বাঙালি রেনেসাঁর অন্যতম সার্থক পুরুষ। বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য তিনি বাঙালির কাছে অত্যন্ত এখনো শ্রদ্ধেয় হয়ে আছেন। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা বিকাশে যাঁরা অগ্রণীর ভূমিকায় ছিলেন, তিনি তাঁদের অন্যতম। তাঁর রচনায় বিজ্ঞানের মূলে পৌঁছানোর যত প্রচেষ্ঠা পাওয়া যায়, বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্যের অপর কোন লেখকের রচনায় তা পাওয়া যায় না। এ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রসঙ্গে অতুল গুপ্তের কথাটি স্মরণ করা যায়। তিনি লিখেছেন:

> আজ যে-সব বাঙালি বিজ্ঞানী বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান ও নববিজ্ঞানের চমৎকার পরিচয় দিচ্ছেন রামেন্দ্রসুন্দর তাঁদের গুরু। তাঁর সর্বজ্ঞানরসিক অনুসন্ধিৎসু মন বিজ্ঞানেই নিজেকে আবদ্ধ রাখতে পারেনি। বেদবিদ্যা ও বিজ্ঞানভিত্তিক দর্শন থেকে আরম্ভ ক'রে মহাভারত ও মহাজন-চরিত-কথার মধ্য দিয়ে বাংলার মেয়েলি ছড়া পর্যন্ত সে মনের স্বচ্ছন্দ গতি। ইংরেজ সমালোচক যে মনকে বলেছেন 'বাদশাহী হীরা'। জ্ঞানের আলো পড়লে শতমুখ থেকে কিরণ ঠিকরে আসে। রামেন্দ্রসুন্দরের শেষের দিকের প্রবন্ধগুলি তাঁর এই বহুমুখী জ্ঞান ও চিন্তার পরিচয়। তাঁর বিশাল জ্ঞান ছিল তাঁর মনের লীলাক্ষেত্র, তাকে বহন করতো হত না। তাঁর লেখা প্রবন্ধ তাঁর মনের প্রতিচ্ছবি। জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা তিনি বলেছেন অতি সহজে; তার পরিধির কথা ভাবলে তবে মনে বিস্ময় আসে। তাঁর গভীর চিন্তা পাঠকের মনে চিন্তা আনে কিন্তু তার প্রকাশ গম্ভীর নয়। ভাষা অবলীলায় ভাবকে প্রকাশ করেছে, কিন্তু তার গতি লঘু নয়। পদক্ষেপে মহার্ঘ শালীনতা। গভীর জ্ঞান ও চিন্তা প্রকাশের উপযুক্ত ভাষা। কিন্তু তার মধ্যে দেখা দিয়েছে অনাবিল হাসি। জ্ঞানীর বিমুক্ত মনের পরিচয়।[১]

জ্ঞানসাধনায় নিবেদিতপ্রাণ রামেন্দ্রসুন্দর সম্পর্কে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন:

> যৌবনের প্রারম্ভেই তুমি যেরূপ বিদ্যাবত্তা ও গুণবত্তা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তুমি যে পথেই যাইতে, তাহাতেই প্রভূত ধন-সম্পদ ও যশঃ উপার্জন করিতে পারিতে, কিন্তু তুমি সে সকল পদই ত্যাগ করিয়া দারিদ্রমন্ডিত অধ্যাপনা ও মাতৃভাষার সেবাই জীবনের ব্রত করিয়াছ এবং আত্মত্যাগ ও আদর্শ চরিত্রের পরমোজ্জ্বল ও মহিমাময় দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছ। তুমি বিজ্ঞানকে স্বর্গ হইতে মর্ত্যে নামাইয়া আনিয়াছ এবং যাঁহারা বিজ্ঞানজ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়া দেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, তাঁহাদের একজন অগ্রণী হইয়াছ। তুমি একাধারে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক এবং সাহিত্যসেবী। অতএব বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্যের ত্রিধারা তোমাতে সংযুক্ত হইয়া তোমার হৃদয়ক্ষেত্রকে পুণ্যপ্রয়াগে পরিণত করিয়াছে...।[২]

রামেন্দ্রসুন্দরের প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বলেছেন–'তাঁহার প্রতিভায় বৈজ্ঞানিক অপেক্ষা দার্শনিক প্রকৃতি সমধিক পরিস্ফুট। ...রামেন্দ্রসুন্দরের দার্শনিক প্রতিভা বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় নিয়ন্ত্রিত হইয়া অপূর্ব সাফল্যলাভ করিয়াছিল।'[৩] এ সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন:

> দর্শনই হউক বা বিজ্ঞানই হউক, ইতিহাসই হউক বা প্রত্নতত্ত্বই হউক– রামেন্দ্রবাবু যাহাই লিখিতেন, তাহাই যে শুধু প্রাঞ্জল হইত, এমন নয়, সত্য সত্যই তাহার মধুরতায় প্রাণকে জল করিয়া দিত, পড়িতে কবিতার মত বোধ হইত, কল্পনায় মাখামাখি থাকিত, রসে ও ভাবে ভোর করিয়া দিত। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি বলেন, "দর্শনের গঙ্গা, বিজ্ঞানের সরস্বতী ও সাহিত্যের যমুনা- মানব-চিন্তার এই ত্রিধারা রামেন্দ্র সঙ্গমে যুক্ত বেণীতে পরিনত হইয়াছিল। তাঁহার সারস্বত সাধনার ত্রিবেণী সঙ্গম বহুদিন বাঙালির তীর্থ হয়ে থাকবে।[৪]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রামেন্দ্রসুন্দরের প্রতিভার দানে মুগ্ধ ছিলেন। তিনি তাঁর কর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দরের পঞ্চাশ পূর্তি উপলক্ষ্যে তিনি বলেছেন:

Dhaka University Institutional Repository

> হে মিত্র, পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ণ করিয়া তুমি তোমার জীবনের ও বঙ্গসাহিত্যের মধ্যগগনে আরোহন করিয়াছ। আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।
>
> যখন নবীন ছিলে তখনই তোমার ললাটে জ্ঞানের শুভ্র মুকুট পরাইয়া বিধাতা তোমাকে বিদ্বৎসামাজে প্রবীণের অধিকার দান করিয়াছিলেন। আজ তুমি যশে ও বয়সে পৌঢ়, কিন্তু তোমার হৃদয়ের মধ্যে নবীনতার অমৃতরস চিরসঞ্চিত। অন্তরে তুমি অজর, কীর্তিতে তুমি অমর, আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।
>
> সর্বজনপ্রিয় তুমি মাধুর্যধারায় তোমার বন্ধুগণের চিত্তলোক অভিষিক্ত করিয়াছ। তোমার হৃদয় সুন্দর, তোমার বাক্য সুন্দর, তোমার হাস্য সুন্দর, হে রামেন্দ্রসুন্দর আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি। পূর্ব দিগন্তে তোমার প্রতিভার রশ্মিচ্ছটা স্বদেশের নবপ্রভাতে উদ্বোধন সঞ্চার করিতেছে। জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্মের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যে চিরদিন তুমি দেশমাতার পূজা করিয়াছ। হে মাতৃভূমির প্রিয়পুত্র, আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।
>
> সাহিত্য-পরিষদে সারথি তুমি এই রথটিকে নিরন্তর বিজয়পথে চালনা করিয়াছ। এই দুঃসাধ্য কার্য্যে তুমি অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে জয় করিয়াছ, ক্ষমার দ্বারা বিরোধকে বশ করিয়াছ, বীর্য্যের দ্বারা অবসাদকে দূর করিয়াছ এবং প্রীতির দ্বারা কল্যাণকে আমন্ত্রণ করিয়াছ। আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।
>
> প্রিয়াণাং ত্বা প্রিয়পতিং হবামহে
> নিধীনাং ত্বা নিধিপতিং হবামহে
>
> প্রিয়জনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রিয় তুমি, তোমাকে আহবান করি, নিধিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিধি তুমি, তোমাকে আহবান করি। তোমাকে দীর্ঘজীবনে আহবান করি, দেশের কল্যাণে আহবান করি, বন্ধুজনের হৃদয়াসনে আহবান করি।[৫]

এঁদের কথা থেকে দর্শন, বিজ্ঞান ও সাহিত্য ক্ষেত্রে রামেন্দ্রসুন্দরের চিন্তার গভীরতা উপলব্ধি করা যায়। তাঁর চিন্তাভাবনা ছিল দার্শনিকের মতো, তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছিল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিপ্রসূত। রামেন্দ্রসুন্দর আজীবন বিদ্যাচর্চা ও জ্ঞানসাধানায় ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের জ্ঞানভান্ডার মন্থন করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, নিজের শেকড় থেকে বিচ্যুত হলে সেই জাতির উন্নতি, অগ্রগতি ও বিকাশের পথ চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যাবে। ফলে এক দিকে তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন, অন্যদিকে তিনি হার্বার্ট স্পেনসার, চার্লস ডারউইন, হেনবির বার্গস প্রমুখের চিন্তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। তবে তাঁর মন ছিল খাঁটি বাঙালির মন। বাঙালিত্বেরবোধ থেকে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গড়ে তুলেছিলেন, জাতীয় চিত্রশালা গঠনের চেষ্টা করেছেন। তিনি শ্রেণিকক্ষে বাংলা ভাষায় পাঠদান করেছেন। রামেন্দ্রসুন্দরের বাঙালিত্বে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় মন্তব্য করেন:

> বাঙ্গালার প্রচীন সাহিত্যে, বাঙ্গালার পুরাতত্ত্ব, বাঙ্গালার ইতিহাস, বাঙ্গালার পুরাবস্তু বাঙ্গালার অবদান - এক কথায় বাঙ্গালীর প্রাণ তাঁহার ধ্যানের বস্তু ছিল। জাতীয়তার এমন একনিষ্ঠ, আত্মমগ্ন, প্রচ্ছন্ন উপাসক আমি জীবনে অতি অল্প দিখিয়াছি।'যেমন গঙ্গা পূজে গঙ্গাজলে' রামেন্দ্রসুন্দরর তেমনই বাঙ্গালার উপকরণে বাঙ্গালার পূজা করিতেন, বাঙ্গালার ভাবে বাঙ্গালার সাধনা করিতেন। অধ্যাপক রামেন্দ্রসুন্দর বাঙ্গালা ভাষায় ক্লাসে অধ্যাপনা করিতেন। প্রিন্সিপাল রামেন্দ্রসুন্দর বাঙ্গালীর পরিচ্ছদ ধুতী চাদর পরিয়া রিপন কলেজে অধ্যক্ষতা করতেন। তিনি দুইবার বিশ্ববিদ্যালয়ে উপদেশক-রূপে প্রবন্ধ পাঠ করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়া প্রত্যাখান করিয়াছিলেন। কেন জানেন? রামেন্দ্র বাঙ্গালা ভাষায় প্রবন্ধ পড়িবার অনুমতি চাহিয়াছিলেন। তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের রীতি নহে, এই জন্য বাঙ্গালা দেশের বাঙ্গালীর বিশ্ববিদ্যালয়ের, বাঙ্গালী শ্রোতার মজলিসে, রামেন্দ্রসুন্দর বাঙ্গালা ভাষায় প্রবন্ধ পড়িবার অনুমতি পান নাই। তিনি তৃতীয় বার অনুরুদ্ধ হইয়া লেখেন,- 'ইংরেজী রচনায় আমি অভ্যস্থ নহি। বাঙ্গালা ভাষায় লিখিবার অনুমতি দিলে আমি "বেদ" সম্বন্ধে প্রবন্ধ পড়িতে পারি।' তখনকার ভাইসচ্যান্সেলার সার ডাক্তার দেবপ্রসাদ রামেন্দ্রসুন্দরকে সে অধিকার দান করিয়া বাঙ্গালীর কৃতজ্ঞতার অধিকারী হইয়াছেন। ইতিপূর্বে বাঙ্গালা কেতাব বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য হইয়াছিল বটে, কিন্তু আমরা বলিব, বাঙ্গালার বিশ্ববিদ্যালয়ে এই শুভ মুহূর্তেও পূর্বের বাঙ্গালা ভাষার কোন স্থান ছিল না। রামেন্দ্রসুন্দরই তাহার সূচনা করিয়া বাঙ্গালা দেশে চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালা দেশের বিশ্ববিদ্যালয় অদূর-ভবিষ্যতে যাহা হইতে বাধ্য, রামেন্দ্রসুন্দর প্রতিভার, মনস্বিতার, স্বাদেশিকতার ও মাতৃভাষা-ভক্তির নিক্রয়ে বাঙ্গালীকে তাহার অধিকারী করিয়া গিয়াছেন।[৬]

Dhaka University Institutional Repository

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও কর্ম

১২৭১ বঙ্গাব্দের ৫ ভাদ্র, ১৮৬৪ সালের ২০ আগস্ট রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমার অন্তর্গত জেমো গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত জিঝোটি ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম গোবিন্দসুন্দর ত্রিবেদী ও মাতার নাম চন্দ্রকামিনী দেবী। পিতার নিকট লেখাপড়ার হাতে খড়ি। ১৮৭০ সালে তাঁকে গ্রাম্য পাঠশালায় ভর্তি করা হয়। শিক্ষাজীবনে তিনি অত্যন্ত মেধার পরিচয় দিয়েছেন। প্রতিটি পরীক্ষায় তিনি বৃত্তি লাভ করেছেন। ১৮৭৫ সালে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় তিনি সর্বোচ্চ স্থান লাভ করে ছাত্রবৃত্তি লাভ করেন। তিনি কান্দি ইংরেজি স্কুল থেকে প্রথম স্থান অধিকার করে এন্ট্রান্স (১৮৮২) পাস করেন। তিনি কান্দি ইংরেজি স্কুল থেকে প্রথম স্থান অধিকার তিনি কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে এফ. এ (১৮৮৪), পদার্থবিদ্যা ও রসায়নে অনার্সসহ প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে বি. এ. (১৮৮৬) এবং পদার্থবিদ্যায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে এম. এ. (১৮৮৭) ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ১৮৮৮-তে প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি পান। তিনি ১৮৯২-তে কলকাতা রিপন কলেজে বিজ্ঞান শাস্ত্রের অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। ১৯০৩-এ তিনি উক্ত কলেজের অধ্যক্ষের পদ অলঙ্কৃত। আমৃত্যু তিনি ঐ কলেজে এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' (১৭ বৈশাখ, ১৩০১) স্থাপনের অন্যতম উদ্যোক্তা। ১৩১১-১৩১৮ পর্যন্ত তিনি এ প্রতিষ্ঠানে সম্পাদক পদে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৩২৬-এর ১৮ জ্যৈষ্ঠ এর সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ'-এর মুখপাত্র 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা' সম্পাদনা (১৩০৬-১৩১০, ১৩২৪-১৩২৫) করেন। বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক প্রবন্ধ রচনা করে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, ধর্ম, জীবন ও জগৎ, ভাষাতত্ত্ব, সৌন্দর্যতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে বিভিন্ন পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ লিখেছেন। বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ নিয়ে তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'প্রকৃতি'(১৩০৩ বঙ্গাব্দ) প্রকাশিত হয় । তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের' মধ্যে জিজ্ঞাসা (১৩১০), বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা (১৩১৩), মায়াপুরী, (১৩১৭), অভিভাষণ (১৩২০), কর্মকথা (১৩২০), চরিতকথা (১৩২০), বিচিত্র প্রসঙ্গ (১৩২১), শব্দকথা (১৩২৪), বিচিত্র জগৎ (১৯২০), যজ্ঞকথা (১৩২৭), রচনাসংগ্রহ (১৩২৯), নানা কথা (১৩৩১), জগৎকথা (১৯২৬) ও রামেন্দ্র রচনাবলী (১-৬ খণ্ডে সম্পূর্ণ, ১৯৪৯-১৯৫৭)। তিনি ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছেন। গ্রন্থ অনুবাদ করেছেন এবং বহু বইয়ের ভূমিকা লিখেছেন। তিনি যে সমস্ত বইয়ের ভূমিকা লিখেছেন তার মধ্যে সাধচরিত (১৯১১) অতুলচন্দ্র সুর, মন্দির (১৩৫৬) কিরণচন্দ্র দরবেশ, ব্রতকথা (১৩১৯)-কিরণ চন্দ্র দাসী, ব্রতকথা (১৩৫৪) ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপধ্যায়, শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন (১৯১৭) চণ্ডীদাস, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী (১৩১৪), খুকুমণি ছড়া ও গল্প (১৩০৬) যোগীন্দ্রনাথ সরকার, কালের স্রোত (১৩১৮) যোগেশচন্দ্র সিংহ, আর্যকীর্তি (১৯১৯), রজনীকান্তগুপ্ত এবং প্রতিভা (১৯১৮) ও সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস (১৯১৬) নামীয় রজনীকান্তগুপ্তের অপর দুখানি গ্রন্থ অন্যতম।

কর্মজীবনে তিনি রিপন কলেজের উন্নয়ন ও শ্রী বৃদ্ধিতে অমুল্য অবদান রাখেন। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা প্রকাশ, পরিষদের নিজস্ব ভবন নির্মাণ সাহিত্য সম্মিলন আয়োজন, বিভিন্ন স্থানে পরিষদের শাখা গঠন ও সাহিত্য সম্মিলন আয়োজনে ভূমিকা নেন। বহু সভা-সমাবেশ তিনি প্রবন্ধ পাঠ করেন; সভাপতি বা প্রধান অতিথিরূপে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন এবং প্রশংসিত হন। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার তিনি অন্যমত পথিকৃৎ। বহু গ্রন্থকার তাঁকে দিয়ে বইয়ের ভুমিকা লিখে নিয়েছেন। তাঁর ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ১৩২১ সালে তাঁকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সেখানে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং আরো বহু বিদগ্ধজন তাঁকে অভিনন্দন জানান। ১৩২৬ বঙ্গাব্দের ২১ জ্যৈষ্ঠ্য, ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ৬ জুন ৫৫ বছর বয়সে আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের ত্রিবেদী কলকাতায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর স্মৃতি পাঠাগার ও তৈল চিত্র স্থাপন করা হয়, নিজগ্রামে পান্থশালা নির্মাণ করা হয় এবং বহু গ্রন্থ রচনা করা হয়। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, 'রামেন্দ্র স্মৃতি গ্রন্থমালা, তৈরি করছে এবং ইতোমধ্যে চারটি গ্রন্থ রচিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা ভাষায় অনুরাগ ও ইংরেজি শিক্ষার বিরোধীতা

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বাঙালিকে মাতৃভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে চেয়েছেন বাংলা ভাষায় প্রতি গভীর অনুরাগ এবং জাতীয় কল্যাণ চিন্তায়। বাঙালির শিক্ষা বিধানে ইংরেজির হঠাৎ আগমনকে তিনি পুরাণে বর্ণিত মুনি-ঋষিগণের সন্তানদের মতো জন্ম মাত্রই সর্বজ্ঞ হওয়ার সঙ্গে তুলনা করে উপহাস করেছেন।[৭] ইংরেজি ভাষায় শিক্ষার মাধ্যমে বাঙালির যে কোনো উপকার হয় না, তা তিনি যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করেছেন। তিনি 'ইংরাজি শিক্ষার পরিণাম' প্রবন্ধ লিখে তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন:

> ষাট বৎসর পূর্বে এ দেশে সাব্যস্ত হইয়াছিল, ইংরাজি বিদ্যা না শিখিলে আমাদের মনুষ্যত্ব জন্মিবে না। সাব্যস্ত হইবা মাত্র বিলাতী সরস্বতী দশ মাসের অপেক্ষা না রাখিয়া একেবারে কতকগুলে শ্মশ্রুগুম্ফাধারী সুপক্ক সন্তান প্রসব করিলেন, ভারতমাতা অচিরেই হিমাচলের উচ্চতম শিখরে উন্নীতা হইবেন; কেহ আশঙ্কা করিলেন, এইবার ইহারা বুড়িকে ভারতসাগরে ডুবাইয়া মারিল। তারপর ষাট বৎসর অতীত হইয়াছে কিন্তু ইহার মধ্যে ভারতের বিশেষ উন্নতির বা অধোগতির লক্ষণ-লক্ষিত হয় নাই। কিন্তু ইহারই মধ্যে আর এক তান উঠিয়াছে, ইংরাজি বিদ্যা এ দেশের ক্ষেত্রে ফলিল না, বাঙলার মাটিতে কি বিলাতি ওক গাছের বৃদ্ধি হয়? এ দেশের মাটিতে বরং বেশি প্রাচীন সংস্কার বিদ্যার চাষ আবাদ করিলে কিছু ফল পাওয়া যাইতে পারে। চেষ্টা করিলে মন্দ হয় না।[৮]

ইংরেজি বিদেশি ভাষা বলে তা আয়ত্তে আনতে সময় লাগে। এই যুক্তি যাঁরা দিতেন, তাঁদের ভুল ধরিয়ে দিতে রামেরসুন্দর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। তিনি লিখেছেন:

> বিজ্ঞের দল স্মিতমুখে বলিতেছেন–আমরা পূর্বেই জানিতাম, বিলাতি মাল মাত্রই ভুয়া; কেবল বাহিরের চাকচিক্য দেখিয়া তোমরা আহ্লাদে আটখানা হইয়া একটা প্রকাণ্ড গণ্ডগোল আরম্ভ করিয়াছিলে; এখন ঠেকিয়া শেখ ও পথে এস। সুতরাং নব্য প্রাচীন, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, স্বদেশী, বিদেশী, সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই একটা অতৃপ্তি ও আকাঙ্ক্ষার চিহ্ন দেখা যাইতেছে; একটা নতুন পন্থার আবিষ্কার ও অনুসরণ না করিলে ভারতবাসীর মানসিক উন্নতির আর উপায় নাই; সর্বত্র এইরূপ একটা ভাব অন্তরে অন্তরে খেলিয়া বেড়াইতেছে। নানা জনে নানা কথা বলিতেছে। ত্রিশ বৎসরের বেশি হইল, ইংরাজি বিদ্যার বহুল প্রচারের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; বড় বড় অধ্যাপক বড় বড় জটিল শাস্ত্রে শিক্ষা দিয়া বৎসর ধরিয়া ভারতবাসীর মরিচা–ধরা মস্তিষ্ক আলোড়িত করিয়া দিতেছেন; তথাপি এ পর্যন্ত ভারতবর্ষে একটা নিউটন জন্মিল না, একটা ফ্যারাডে জন্মিল না। কি পরিতাপ! ভারতবাসীর মস্তিষ্কটারই বোধ হয় দোষ আছে। ডারউইনির মতানুসারে বানর ও মনুষ্যের মধ্যবর্তী পর্যায়ভুক্ত জীবের কিছুদিন হইতে অনুসন্ধান হইতেছে। বোধ হয়, ভারতবর্ষের লোক সেই জীব।[৯]

বিদেশি ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা যে কতখানি গলদ সে সম্পর্কে তিনি জানতেন। কারণ যে ভাষার সঙ্গে বাঙালির প্রাণের যোগ নেই, সে ভাষায় বিজ্ঞান তো দূরের কথা কোনো শিক্ষাই সম্ভব নয় । আমরা যতই তা নিয়ে আনন্দিত হই না কেন, তা যদি স্বদেশি ভাষায় না হয়, তবে তার কোনো সার্থকতা নেই। তার ফল আমাদের জীবনে ফলবে না। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন:

> আমরা বিজ্ঞান শিখিতেছি সত্য; কিন্তু বৈজ্ঞানিকের ধাতু আমাদের শোণিতে এখনও আসে নাই। বিজ্ঞানের নামে আমরা আটখানা হই; কিন্তু আমরা যাহা শিখি, তাহার মোটের উপর উপবিজ্ঞান বা অপবিজ্ঞান। মানুষের চুল তাড়িতের পরিচালক নহে শুনিয়া মাত্র আমরা লম্বা লম্বা টিকি রাখিতে আরম্ভ করি এবং চন্দ্রের অবস্থান ভেদে জোয়ার ভাটা হয়, পাঠ করিয়া মাত্র কোষ্ঠি গণিতে বসি। এমন শোচনীয় অবস্থা কি হয়! বস্তুত বিজ্ঞানের পদ্ধতি যে কি, তাহা আমরা জানিনা ও জানা আবশ্যক মনে করি না। মস্তিষ্কে কতগুলি মশলা পুরিতে পারি, কিন্তু তাহা সাজাইয়া গোছাইয়া যথাবিন্যস্ত করিবার ক্ষমতা রাখি না। সমগ্রটা একেবারে নিরীক্ষণ করিতে না পারিয়া কেবল এক প্রদেশই দেখিতে থাকি ও তাহা হইতে লম্বা চওরা সিদ্ধান্তের আবিষ্কার করি। খাইতে পারি, কিন্তু হজম করিবার শক্তি নাই। প্রাকৃতিক নিয়মের অন্বেষণ করিতে গেলে আগে প্রাকৃতিক ঘটনাগুলো তন্ন তন্ন করিয়া চোখের সমক্ষে দাঁড় করাইতে হয় ও পরে সহস্র উপায়ে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া, ছেদ করিয়া, জোড়া লাগাইয়া, ভাঙিয়া গড়িয়া, বিপুল পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে পরস্পরের সম্বন্ধ নিরূপণ করিতে হয়, তাহা আমরা বুঝিতে পারিনা। আমরা এক লম্ফে সাগর পার হইতে চাই, সেতু বন্ধনের অপেক্ষা করিতে পারি না। ডিম হইতে বাহিরিবা মাত্র উড়িতে চাই, পক্ষোদ্ভবের দেরি সহেনা। উদ্যমও নাই, অধ্যাবসায়ও নাই; ইন্দ্রিয়গুলোকে সংযত

> করিয়া বহির্জগতে প্রেরণ করিবার দরকার বোধ করি না, কেবল একবার চকিতের মতো দৃষ্টিপাত করিয়া, পরে ধ্যানযোগে বিশাল বিশ্বের কার্যপ্রণালীর সামঞ্জস্য করিতে চেষ্টা করি।[১০]

রামেন্দ্রসুন্দর মানবসমাজের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস, শিক্ষা, লোকাচার, রীতি-নীতি ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি সমাজবিজ্ঞানের ইতিহাস আলোচনায় উদার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর জগৎ-জীবন ভাবনা বিজ্ঞানকেন্দ্রিক হলেও তিনি সমাজ বিচ্ছিন্ন ছিলেন না। বাংলা ভাষার বিকাশ সাধনে তিনি বাংলায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা তৈরি করেছেন। বাংলা ভাষায় শিক্ষাচিন্তার ক্রমবিকাশ ধারায় পরিভাষা তৈরির কাজটি তাঁকে আরো বেশি স্মরণীয় করে রেখেছে।

২.৫

বাংলা ভাষায় শিক্ষা বিস্তারে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা

সতের শতকে ইংল্যাণ্ডে রয়্যাল সোসাইটিকে কেন্দ্র করে যখন নতুন পরীক্ষাভিত্তিক বিজ্ঞানের গোড়াপত্তন করা হচ্ছিল, তখন সোসাইটির দুটো সমস্যা দেখা দেয়। এক.বিজ্ঞানের ভাষা কী রকম হবে? দুই. প্রতিশব্দ,পরিভাষা কীভাবে প্রণয়ন করবেন? রয়্যাল সোসাইটির নিতান্ত শৈশবে ১৬৬৭ সালে বিশপ টমাস স্প্রাট তার একটা ইতিহাস প্রণয়ন করেন। এতে সোসাইটির আলাপ আলোচনা, প্রতিবেদন উপস্থাপনের ভাষা বিষয়ে স্প্রাট যা বলেছিলেন তাকে আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষাবিষয়ক ইশতেহার বলা হয়ে থাকে। রয়্যাল সোসাইটি স্পষ্টভাবে মেনে নিয়েছিলেন যে, তাঁরা বিজ্ঞানের ভাষা ও শব্দ ব্যাবহারকে যথাসম্ভব স্বাভাবিক ও সহজ করে পরিবেশন করবেন। এই লক্ষ্যে তাঁরা বিদ্বান ও পণ্ডিতব্যক্তির ভাষার চেয়ে কামার,কুমোর তথা শ্রমজীবী মানুষের ভাষাকে গুরুত্ব দিতে চেয়েছিলেন। ব্রাত্যজনের এই ভাষাকে বিজ্ঞানের ভাষায় রূপদানের পরিকল্পনা ছিল এক অসম্ভব দুঃসাহসী পরিকল্পনা। এ কাজের পৌরহিত্যের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল সেদেশের একজন ভাষাশিল্পী কবির ড্রাইডেনের উপর। [১১] ১৬৬৭ সালে বিশপ টমাস স্প্র্যাট ইংল্যাণ্ডের iq¨vj †mvmvBwUi হয়ে বিজ্ঞানের ভাষা বিষয়ে একটা ইতিহাস প্রণয়ন করেন। এতে সোসাইটির আলাপ আলোচনা, প্রতিবেদন উপস্থাপনের ভাষা বিষয়ে স্প্যাট যা বলেছিলেন তাকে আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষাবিষয়ক ইস্তাহার বলা যায়। তিনি লিখেছেন:

> Select all amplifications digressions and swellings of style, to return back to the primitive purity and shortness, when men deliver'd so many things, almost in an equal number of words. They have exacted from all their members, a close, natural way of speaking, positive expressions, clear senses, a native easiness, bringing all things as nearer the mathematical plainness, as they can; and preferring the language of artisans, country men and merchants before that of wits.[১২]

তখন রয়্যাল সোসাইটি স্পষ্টভাবে মেনে নিয়েছিলেন যে, তাঁরা বিজ্ঞানের ভাষা ও শব্দ ব্যবহারকে যথাসম্ভব স্বাভাবিক ও সহজ করে পরিবেশন করবেন। এই লক্ষ্যে তাঁরা বিদ্বান ও পণ্ডিতব্যাক্তির ভাষার চেয়ে কামার, কুমোর তথা শ্রমজীবী মানুষের ভাষাকে গুরুত্ব দিতে চেয়েছিলেন। ব্রাত্যজনের এই ভাষাকে বিজ্ঞানের ভাষায় রূপদানের পরিকল্পনা ছিল এক অসম্ভব দুঃসাহসী পরিকল্পনা। এ কাজের পৌরহিত্যের দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছিল। একজন কবির উপর বা একজন ভাষাশিল্পীর উপর। সেই কবি হলেন ড্রাইডেন। কবি সাহিত্যিক বিজ্ঞানের ভাষা নির্মাণের কাজে নিয়োগের ব্যাপারে দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায় যুক্তি দেকিযে বলেছেন:

> ভাষার নাড়িনক্ষত্র না জানলে, শব্দের জগৎ সম্বন্ধে গভীর অনুভব না থাকলে কথাকে পদে পদে আড় করে দিয়ে ছন্দের মন্ত্র লাগিয়ে অনির্বাচনীয়ের জাদু লাগানো যায় না। আর সেই জানার সঙ্গে অনুভবশক্তির সঙ্গে, একটা স্তরে গিয়ে বিজ্ঞানের ভাষা নির্মাণের কাজেরও সংযোগ রচিত হয়ে যায়। তার কারণ, এখানে সাধারণ মানুষের মুখের ভাষাকে, দৈনন্দিন জীবনে বহু ব্যবহৃত ভাষাকে নতুন করে তৈরি করে নেওয়ার একটা ব্যাপার থাকে।

অনির্বচনীয়কে প্রকাশ করবার জন্যে নয়, এমন তত্ত্ব বা ধারণাকে প্রকাশ করবার জন্যে যা দীর্ঘ অনুশীলন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর বিমূর্ত চিন্তার ফসল।[১৩]

উনিশ শতকের প্রথম দুই দশক শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত বিজ্ঞান সংক্রান্ত পত্রিকা ও পুস্তকে পরিভাষা প্রণয়নের চেষ্টা করা হয়।[১৪] এখানে তার কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়:

Load stone	চুম্বক পাথর
Compass	কোম্পাস
Engine	কল
Astronomer	জ্যোতির্ব্বিৎ
Solid	অনন্তরত্ব
Moveable	চাল্যমানত্ব

১৮১৯ সালে কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি পরিভাষা নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করে। এর এক বছর পর ১৯২০ সালে ফেলিক্স কেরির সম্পাদনায় বিদ্যাহারাবলী প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। একে প্রথম বাংলা বিশ্বকোষ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এর কয়টি প্রতিশব্দ নিম্নরূপ:[১৫]

Hepatico Enycsticiductus	যকৃৎকোষস্থ প্রণালী
Homogenous	সমপ্রকার, একবিধ
Larva	কীট সাবক
Myology	মাংসপেশী বিদ্যা
Organ of sense	বাগিন্দ্রিয়
Vein	রক্তবাহক নাড়ী
Viscera	অন্ত্র
Zoologia	পশুবিদ্যা, জীববিদ্যা

১৯৪৫ সালে ভার্নাকুলার ট্রান্সলেশন সোসাইটি প্রথমে ইংরেজ শব্দ উর্দুতে অনুবাদের জন্য একটি সাধারণ নিয়ম প্রনয়ণ করেন। এই নিয়ম বাংলার ক্ষেত্রেও অনুসরণের প্রস্তাব করা হয়।[১৬] এই নিয়মে বলা হয়েছে:

১. যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক শব্দের পরিভাষা নেই এবং ঐ শব্দসমূহ যদি সাধারণভাব প্রকাশ করে তাহলে সে ক্ষেত্রে দেশীয় ভাষা ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন - সোডিয়াম, অক্সিজেন, ক্লোরিন, বিশপ, জজ, কালেকটর ইত্যাদি।

২. যে শব্দের প্রতিশব্দ আছে তা ব্যবহার করাই উত্তম। যথা - Iron লোহা, Summons - তলবনামা।

৩. কোন মিশ্র শব্দ যদি দুটি ইংরেজি শব্দ দ্বারা গঠিত হয় এবং তার মধ্যে কোন একটিরও যদি উর্দু প্রতিশব্দ না থাকে, সে ক্ষেত্রে দেশীয় ভাষা ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন - Hydrocholoric = Hydrogen + clorine হাইড্রোক্লোরিক, হাইড্রোসালফিউরিক।

৪. কোন মিশ্র শব্দের যদি উর্দু প্রতিশব্দ না থাকে এবং তার বদলে যদি উর্দু তুল্য অন্য কোনো শব্দ দিয়ে ব্যবহার করা যায়, তাহলে তা পরস্পরের সঙ্গে যুক্তভাবে বা শুধু উর্দু তুল্য শব্দ দিয়ে ব্যবহার করা যেতে পারে। যথাঃ Chronology –ইলিম জমানে

৫. যে সমস্ত বিদেশী শব্দের ক্ষেত্রে উক্ত নিয়ম প্রযোজ্য নয়, সে সব ক্ষেত্রে শব্দকে উর্দু অক্ষরে প্রকাশ করাই শ্রেয়।

৬. কোনো মিশ্র শব্দের একটি উর্দু প্রতিশব্দ থাকলে এবং অপরটির উর্দু প্রতিশব্দ না থাকলে, তা যুক্তভাবে ব্যবহার করা সমীচীন।

৭. কোনো কোনো শব্দের Order, Class, Species ইত্যাদির উর্দু প্রতিশব্দ থাকলেও তা উর্দুতে ব্যবহার না করাই শ্রেয়। কারণ ঐ সমস্ত উর্দু শব্দ নানাভাবে ব্যবহৃত হয়ে পাঠকের নিকট সংশয় সৃষ্টি করতে পারে। বিশেষত প্রাণিবিদ্যার ক্ষেত্রে তা জটিলতা সৃষ্টি করে।

৮. উদ্ভিদের বংশগত নামকরণের ক্ষেত্রে তাদের সাধারণ ধর্ম বা বংশগত বৈশিষ্ট্য অনসরণ করা হয়। উর্দুর ক্ষেত্রে ঐ একই নিয়ম প্রযোজ্য হলেও তা অনুসরণ না করাই শ্রেয়। কারণ ইউরোপীয় শব্দে হুবহু উর্দু ব্যবহার করলে পাঠকদের কাছে দুর্বোধ্য হতে পারে।

উল্লিখিত নিয়মাবলি অনেকটা গঠনমূলক ছিল। তবে এই নিয়ম কতটা অনুসৃত হয়েছিল তা জানা যায় না। সেই উদ্যোগের পর, ১৮৫৪ সালে ইংলন্ডের কোর্ট অব ডাইরেক্টরস থেকে ভারতের শিক্ষা সম্পর্কে ডেসপাচ প্রেরন করা হয়। সে সম্পর্কে মন্তব্য করে কাশীর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ জেমস আর ব্যালেনটাইন দেশিয় ব্যক্তিদের উপর শিক্ষার দায়িত্ব দিতে এবং তাদেরকে শিক্ষা সংক্রান্ত উপযুক্ত বই দিয়ে সাহায্য করতে অনুরোধ করেন এবং তিনি সংস্কৃতের সাহায্যে বৈজ্ঞানিক শব্দের অনুবাদের পরামর্শ দেন। সেই সঙ্গে এদেশিয় ভাষায় যে সমস্ত প্রতিশব্দ পাওয়া যায় তা ব্যবহার করার অনুরোধ জানান।[১৭] তাঁর নির্দেশে প্রণীত পরিভাষার নমুনা নিম্নরূপ:

Causes and Conditions of Motion and Rest	- গতি-স্থিতিকর্ম-বিদ্যা
Statics and Dynamics	- ঘন পদার্থ গতি স্থিতি বিদ্যা
Statics and Dynamics of Solids	- দ্রাব পদার্থ গতি স্থিতি বিদ্যা
Statics and Dynamics of Fluids	- বায়ব পদার্থ গতি স্থিতি বিদ্যা
The lever	- উত্তোলক দণ্ড

অধ্যক্ষ ব্যালেনটাইন Minerology Chemistry- র প্রতিশব্দ যথাক্রমে 'খনিজ পদার্থবিদ্যা' ও রসায়ন' রাখার প্রস্তাব করেন।[১৮] তিনি বিজ্ঞানসম্মত আরো কিছু মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছিলেন। এ সময় ব্যাপক বিষয়ে উন্নতমানের বৈজ্ঞানিক পরিভাষা নির্মিত হয়। তবে সেগুলির সমস্ত ত্রুটিমুক্ত ছিল না । ১৮৫২ সালে বাংলায় চিকিৎসাবিদ্যা শেখানো শুরু হয়। ছাত্র সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং বইয়ের অভাব দেখা দেয়।[১৯] ১৮৬৭ সালে মেডিক্যাল কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডাঃ এওয়ার্ট কিছু ইংরেজি বই বাংলায় অনুবাদের প্রস্তাব দেন।

উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে বাংলা সাহিত্যের কিছু লেখককে তাঁদের মৌলিক সাহিত্যকর্মের পাশাপাশি বিজ্ঞান আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে দেখা যায়। বিজ্ঞান আলোচনা ক্ষেত্রে তাঁরা বড় প্রতিবন্ধক হিসেবে শনাক্ত করেন পরিভাষাকে। তাঁরা নানানভাবে এ সমস্যা সমাধানে আত্মনিয়োগ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর বোধদয়ে কিছু বৈজ্ঞানিক শব্দের প্রতিশব্দ, যেমন ঃ অণুবীক্ষণ, মেরু, বায়ু ইত্যাদি ব্যবহার করেন। অক্ষয়কুমার দত্ত বহু পরিভাষা ব্যবহার করার পারদর্শিতা দেখান; যেমন: বেগ, সমগতি, সরলগতি, বিবৃদ্ধগতি, আপেক্ষিক গতি, হ্রাসমান গতি, অনলেক্ষ গতি প্রভৃতি। সে সময়ে নিম্নশ্রেণিতে মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা নেওয়া হলে বাংলায় বিজ্ঞান বই প্রকাশের প্রয়োজন পড়ে। নিম্নশ্রেণির জন্য রচিত বিজ্ঞান বইয়ের পরিভাষা নিয়ে ভাবনা জরুরি হয়। যাদবচন্দ্র বসু প্রথমে বৈজ্ঞানিক শব্দের প্রচলিত বাংলা প্রতিশব্দ পাওয়া গেলে তা গ্রহণ করতে বলেন। নয়তো নূতন শব্দ সংকলন করতে বলেন এবং সহজে বোধগম্য হওয়ার জন্য সঙ্গে ইংরেজি নাম ব্যবহারের পরামর্শ দেন।[২০] তাঁর পরিভাষার নমুনা :

পটাসিক ক্লোরেট	হরিতায়িত ক্ষারক
হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড	লবণ দ্রাবক
ফসফরাস	প্রস্ফুরক
আইওডিন	অরুণক

এর কাছাকাছি সময়ে যদুনাথ মুখোপাধ্যায় উদ্ভিদ বিচার গ্রন্থে [২১] বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহার করেন বৈজ্ঞানিক শব্দের বিপরীতে-

Algae	সমুদ্র তৃণ

Cellular tissue	কৌশিক তন্তু
Woody tissue	কাষ্ঠ তন্তু
Epidermic	উপত্বক

ভূদেব মুখোপাধ্যায়, কানাইলাল দে প্রমুখ বিজ্ঞান লেখক যদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রশংসা করেন। যাদব চন্দ্র, অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর প্রমুখ চিন্তাবিদদের পরিভাষা নির্মাণের প্রয়াস প্রশংসনীয়। ১৮৭৮ সনে রাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরী রসায়নের আরেকটি পরিভাষা তৈরি করেন। একে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়।[২২]

ক) যে সমস্ত নাম দেশীয় ভাষায় বহুদিন থেকে প্রচলিত তা গ্রহণ,

খ) অন্যান্য ক্ষেত্রে ইংরেজি নাম গ্রহণ,

গ) যৌগিক পদার্থের ক্ষেত্রে উভয়েরই প্রথম দু'টি অংশ গ্রহণ।

১৮৮৯ সালে বিজ্ঞান দর্পণ পত্রিকার সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ তাঁর পত্রিকায় বৈজ্ঞানিক শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহার করেছিলেন।[২৩] এভাবে তৈরি পরিভাষা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীকে সমস্যায় ফেলে। ফলে সবার জন্য উপযোগী পরিভাষার প্রয়োজন দেখা দেয়। তখন সকলের জন্য গ্রাহ্য পরিভাষা নির্মাণ করে রজনীকান্ত গুপ্ত ১৩০১ সালে ১৩ শ্রাবণ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কাছে একখানি পত্র দেন। ঐতিহাসিক সে পত্রটির বক্তব্য ছিল নিম্নরূপ :[২৪]

> 'পরিভাষার এরূপ অস্থিরতায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েরই বিস্তর অসুবিধা ঘটিতেছে। ভিন্ন ভিন্ন পরিভাষা থাকাতের শিক্ষার্থী কোনো এক নির্ধারিত পথ আয়ত্ত করিতে পারিতেছে না। শিক্ষকও কোন বিষয়ে কোন পথটি নির্ধারিত থাকিবে বুঝাইতে পারিতেছেন না। অধিকন্তু হইাতে ভাষারও স্থিরতা থাকিতেছে না। বাঙ্গালী ভাষাক্রমে প্রণালীবদ্ধ হইয়া উঠিতেছে। এখন পরিভাষাও প্রণালীবদ্ধ করা উচিত হইতেছে। ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের পরিভাষা এক করিবার জন্য একটি সমিতি স্থাপন করা কর্তব্য। প্রয়োজন হইলে পরিষদের সভ্য ভিন্ন অপরাপর খ্যাতনামা অভিজ্ঞ ব্যক্তি এই সমিতির অন্তর্ভূক্ত হইবেন। সমিতি বিজ্ঞান প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের আলোচনা করিয়া এক একটি পরিভাষা নির্দিষ্ট করিতে চেষ্টা করিবেন।'

পরিষদ উল্লিখিত পত্র আলোচনা করে আট জনকে নিয়ে একটি সমিতি গঠন করে। সমিতির সভাপতি রামকমল ভট্টাচার্য্য। অন্যান্য সদস্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, শারদারঞ্জন রায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনবিহারী গুপ্ত, রজনীকান্ত গুপ্ত এবং দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

সমিতির কাছে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, অপূর্বচন্দ্র দত্ত, মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র রায়, মনীন্দ্র সিংহদেব, কালিদাস মল্লিক প্রমুখ পরিভাষা বিষয়ে তাঁদের নিজ নিজ বক্তব্য উপস্থাপন করেন। এঁদের মধ্যে ত্রিবেদী মহাশয়ের বক্তব্য সর্বাগ্রে আলোচনার দাবি রাখে। তিনিই পরিভাষা গঠনের মূল সূত্র ব্যাখ্যা করেন।[২৫] তিনি দেশীয় ভাষা থেকে শব্দ অনুবাদ না করে বাংলা ভাষা গ্রহণের পক্ষে মত দেন, সেক্ষেত্রে চলতি ভাষার পাশে বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দকে এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে, যাতে খাঁটি বাংলার দাবি বজায় থাকে। রাসায়নিক পরিভাষা গঠনের জন্য তিনি কয়েকটি নিয়ম স্থির করে দেন। যেমন:

১. প্রচলিত পদার্থের মধ্যে চালু শব্দ বজায় রাখা - স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ।

২. সম্প্রতি প্রচলিত শব্দ চালু রাখা - অম্লযান, যবক্ষরযান।

৩. মানুষের নিত্যব্যবহার্য জিনিস ও শব্দ বিষয়ে সংস্কৃত বা খাঁটি বাংলা শব্দ অন্বেষণ আইওডিন, পটাশিয়াম, ক্যালশিয়াম।

৪. এ ছাড়া ইংরেজি শব্দ বাংলায় অক্ষরান্তরিত করা এবং উচ্চারণের সুবিধার জন্য কাটছাঁট করে মোলায়েম করা- Ultraviolet light বেগনি পারের আলো; Intra red light লাল উজানি আলো, All India Radio আকাশবাণী (সবই রবীন্দ্রনাথের দেওয়া)।

৫. যৌগিক পদার্থেও পরমাণু মাত্রার পার্থক্য নির্ণয়ে তিনি কিছু নিয়ম অনুসরণ করতে বলেন -

- Ousও ic এর পার্থক্য 'ক' প্রত্যয়ের ব্যবহার Ferrous লৌহ Ferric লৌহিক Manganous মঙ্গল Manganic মঙ্গলক Cuprous তাম্র Cupric তাম্রক Nitorus মরুত Nitric মরুতক।
- Per ও Hypo ইংরেজী উপসর্গের স্থলে বাংলায় 'পরি ও উপ' ব্যবহার করতে বলেন। যেমন-

Chloric - হরিণক Per chloric- পরি-হরিণক
Chlorous -হরিণ Hypochlorous - উপ-হরিণ
Potassium Oxide - দগ্ধ পত্রক Calcic Oxide - দগ্ধ ঘটিক।

তাঁর মত অনুযায়ী Oxide -কে ক্রমানুসারে সাজালে যে পরিভাষা পাওয়া যায় তা এরকম।

N_2O (Nitrous Oxide) - উপদগ্ধ মরুত
N_2O_2 (Nitriuus Oxide) - আদগ্ধ মরুত
N_2O_3 (Nitrous Anhydride) - দগ্ধ মরুতক
N_2O_4 (Nitric peroxide) - আদগ্ধ মরুতক
N_2O_5 (Nitric Anhydride) - দগ্ধ মরুতক।

তিনি Oxide-এর পরিবর্তে 'দগ্ধ' শব্দটির ব্যবহার করতে বলেন। তবে Oxide- যেমন শব্দের পরে ব্যবহার করা হয়, 'দগ্ধ' তেমনি আগে ব্যবহার করতে হবে।

বিশ শতকের শুরুতে উল্লেখিত পরিভাষা প্রণয়ণের বিভিন্ন রীতি নিয়ে বিচ্ছিন্ন ভাবে কাজ করতে দেখা যায়। তবে সবার গ্রহণযোগ্য পরিভাষা প্রণয়নের ক্ষেত্রে কার্যকর কোন প্রয়াস লক্ষ করা যায় না। ফলে বিজ্ঞানালোচনা শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। তখন চিকিৎসাবিদ্যায় পরিভাষা প্রণয়নের কাজেও কোন অগ্রগতি দেখা যায় না। এক্ষেত্রে ইংরেজী শব্দ হুবহু রেখে দেওয়া হয়। সাহিত্যিকদের মধ্যে রামগতি ন্যায়রত্ন, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রমুখ এক্ষেত্রে যথেষ্ট আন্তরিক হলেও সফলতা দেখা যায় না। তখন সাহিত্য পরিষদও এগিয়ে যেতে পারেনি। এসব কারণে সুষ্ঠু পরিভাষা নির্মাণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় পরিভাষা সৃষ্টির ক্ষেত্রে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মনোযোগী হন।

২.৬

পরিভাষা চর্চায় ভূমিকা

উনিশ শতকের শুরুতে এদেশে বাংলা ভাষায়, বিজ্ঞানচর্চার সূত্রপাত করেন ইংরেজরা। তাঁরা বাংলা ভাষায়, বিজ্ঞান গ্রন্থও প্রকাশ করেন। রবার্ট মে রচিত অঙ্ক পুস্তক (১৮১৭) বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম গণিত গ্রন্থ। তারপর পিয়ার্স-ভূগোল বৃত্তান্ত(১৮১৯) ম্যাক গণিতাঙ্ক (১৮১৯) মার্শম্যান-জ্যোতিষ ও গোলধ্যায় (১৮১৯) ফেলিক্স কেরি-বিদ্যাহারবলী (১৮২০), লোসন পশ্বাবলী (১৮২০), উইলিয়াম ইয়েটস পদার্থবিদ্যা সার (১৮২৪) ও জ্যোতিবিদ্যা (১৮৩৩) এবং জন ম্যাক-কিমিয়াবিদ্যাসার (১৮৩৪) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে বাঙালিদের মধ্যে এবিষয়ে প্রথম ছিলেন হলধর সেন-অঙ্ক পুস্তক (১২৪ ব.-/১৮৩৯)। পরে অক্ষয়কুমার দত্ত-বাহ্য বস্তুর সঙ্গে মানব প্রকৃতিক সম্বন্ধ বিচার ও পদার্থবিদ্যা (১৮৫৬), কৃষ্ণিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়- বিদ্যাকল্পদ্রুম, ভূগোল বৃত্তান্তও ক্ষেত্রতত্ত্ব, ভূদেব মুখোপাধ্যায়-ক্ষেত্রতত্ত্ব (১৮৬২) ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (১ম ও ২য় ভাগ), রাজেন্দ্রলাল মিত্র-প্রাকৃত ভূগোল (১৮৫৪) নবীন চন্দ্র দত্ত-খগোল বিবরণ (১২৭তব./১৮৬৬) ও ব্যবহারিক জ্যামিতি (১৮৭৩) এবং আরো অনেকে

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান গ্রন্থ রচনা করতে এগিয়ে আসেন। বিজ্ঞানী ছাড়াও কবি সাহিত্যিকেরাও এ ব্যাপারে উৎসাহী হয়েছিলেন। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচনা করেছিলেন বিজ্ঞান রহস্য (১৮৭৫) এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্ব পরিচয় (১৯৩৭)। কিন্তু সেকালে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার প্রধান সমস্যা ছিল বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সংক্রান্ত। পৃথক ভাবে এব্যাপারে অনেকেই চেষ্ঠা করেছেন। তবে রীতি-নীতি ও পদ্ধতিগত ভাবে, বিশেষ ভাবে এব্যাপারে বিশেষ করে সাংগঠনিক ভাবে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রণয়ণে প্রথম ভুমিকা নিয়েছিলেন আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। ড. হুমায়ুন আজাদ 'পরিভাষা অধ্যায়ের ভূমিকায় [২৬] উল্লেখ করেছেন:

> রামেন্দ্রসুন্দরের ত্রিবেদী বাঙলা পরিভাষার আদি স্থপতি-তিনিই প্রথম বাঙলা ভাষায় পরিভাষা রচনার রীতি সম্পর্কে আলোচনা করেন ও রচনা করেন বেশ কিছু পারিভাষিক শব্দ। তাঁর বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ও 'রায়ায়নিক পরিভাষা সম্পর্কে মৌলিক প্রবন্ধ যাতে তিনি পরিভাষা প্রণয়নের নীতি ব্যাখা করেন। পরবর্তী পরিভাষা সংকলকেরা সচেতন-অসচেতনভাবে অনুসরণ করেছেন তাঁকেই। 'বৈজ্ঞানিক পরিভাষ'য় তিনি বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য ব্যাখা করে বাঙলা পরিভাষা প্রণয়নের তিনটি পথ নির্দেশ করেন; অবিকল ইংরেজী শব্দগ্রহণ, সংস্কৃত থেকে ঋণ ও খাঁটি বাংলা শব্দ ব্যবহার। 'রাসায়নিক পরিভাষা সংকলনে কোন রীতি অবলম্বন করতে হবে, তা নির্দেশ করেন।

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রণয়নের মূলসূত্র সম্পর্কে বলতে গিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তাঁর 'বৈজ্ঞানিক পরিভাষা' নিবন্ধে[২৭] বলেছেন:

> বিজ্ঞানের পরিভাষা গঠনের সময় এই কয়টি কথা মনে রাখিতে হবে। যে শব্দটি প্রয়োগ করিবে তাহার একটি সুনির্দিষ্ট, বাঁধাবাঁধি, সীমাবদ্ধ, স্পষ্ট তাৎপর্য্য থাকে। প্রত্যেকে শব্দ একটি নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহার করিবে। সেই শব্দটি আর দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহার হবে না। এই হল বৈজ্ঞানিক পরিভাষা মূল সূত্র। এই মূল সূত্রে দৃষ্টি রাখিয়া ভাষা প্রণয়ন করিলে বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় যাহা মুখ্য উদ্দেশ্য, তাহা সুচারুরূপে সম্পাদিত হইবে।

তিনি বিজ্ঞানের উন্নয়ন নিয়ে ভেবেছেন, বিজ্ঞান বিষয়ক নিবন্ধ ও গ্রন্থ বাংলা ভাষায় রচনা করেছেন। বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি নিজের উপলব্ধির কথা জানিয়েছেন। তিনি লিখেছেন:

> বিজ্ঞানের ভাষায় সহিত বিজ্ঞানের উন্নতির অতি নিকট সম্বন্ধ। যাঁহারা বিজ্ঞানের অনুশীলন করেন, তাঁহারাই এ সম্বন্ধে জানেন। বিজ্ঞানের ভাষা প্রচলিত ভাষা হইতে কয়েকটি কারণে স্বতন্ত্র। উভয়ত্র ভাষার উদ্দেশ্য এক হইলে ও একত্র সৌষ্ঠবের দিকে, অন্যত্র সামর্থ্যের দিকে অধিক সৃষ্টি রাখিতে হয়। বিজ্ঞানের ভাষা সমর্থনভাষা না হইলে, বিজ্ঞান পুষ্টিলাভ করে না; অঙ্গে বল পায় না; বিজ্ঞানের পরিণতি ও বিকাশ ঘটে না।

পারিভাষিক শব্দের তিনটি সুস্পষ্ট লক্ষণ উল্লেখ করে তিনি 'রাসায়নিক পরিভাষা' নিবন্ধে[২৮] লিখেছেন:

> ১। প্রত্যেক শব্দ একটিমাত্র শব্দে ব্যবহৃত হইবে; তাহার দ্বিতীয় অর্থ থাকিবে না।
> ২। এক অর্থে একটি মাত্র শব্দ প্রযুক্ত হইবে; দুই শব্দ একার্থীবাচী হইবে না।
> ৩। প্রত্যেক শব্দ তাহার নির্দিষ্ট অর্থে সর্বদা ব্যবহৃত হইবে।

রাসায়নিক পদার্থের ইংরেজী নামের ইতিহাস থেকে তিনি তাদেরকে তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেন এবং বাংলায় নামকরণের কয়েকটি সূত্রে অনুসরণের প্রস্তাব[২৯] করেন:

শ্রেণিসমূহ নিম্নরূপ:

১. কতগুলি যৌগিক পদার্থ রসায়ন বিজ্ঞান বহু পূর্ব্বেই জনসমাজে বিশিষ্টরূপে পরিচিত ছিল। তাহাদের খাঁটি ইংরেজি নাম বিজ্ঞানের ভাষ্যতেও গৃহীত হইয়াছে। উদারণ - gold, silver, sulpher, iron ইত্যাদি। কিন্তু যে সকল যৌগিক পদার্থে তাবৎ মূল পদার্থ বর্তমান আছে; তাহাদের নামকরণকালে তাহাদের ইংরেজি নামের পরিবর্তে ল্যাটিন নাম ব্যবহারে সুবিধা হয়। যেমন auric acid, argentia nitrate, ferrous sulphate ইত্যাদি।

২. রসায়ন বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠান পর যে সকল মূল পদার্থ নূতন আবিষ্কৃত হইয়াছে, কতিপয় স্থলে তাহাদের কোন না কোন একটি গুণ অবলম্বন করিয়া নামকরণ করা হইয়াছে। উদারণ- Oxygen, Chlorine, lodine, phosphorus. Potassium, Calcium।

৩. তদ্ভিন্ন অপরত্র কোন একটা কল্পিত ব্যাপার অনুসারে খেয়ালের উপর নামে সঙ্কলিত হইয়াছে। উদারণ- Tellurium, Cobalt, Galium, Germanium ইত্যাদি।

নামকরণের সূত্র সমুহঃ

১. পরিচিত পদার্থের মধ্যে যাহাদের নাম ভাষায় বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে, সেই নাম বজায় রাখা যাইবে। যেমন-স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, গন্ধক, পারদ ইত্যাদি।

২. যে কয়টি নতুন নাম বাঙ্গালা ভাষায় কিছু পূর্ব হইতে গৃহীত হইয়াছে, তাহা যথাসাধ্য বজায় রাখিবার চেষ্ঠা করা যাইবে। অম্লজান, যবক্ষারজান প্রভৃতি বাংলায় ইতিপূর্বে গৃহীত ও প্রচলিত হইয়াছে। বিশেষ আপত্তি না থাকিলে উদাদিগকে রক্ষা করা যাইবে।

৩. তদ্ভিন্ন সর্বত্র কেবল ইংরেজি শব্দ অক্ষরন্তরিত করা যাইবে তবে উচ্চরণের সুবিধার জন্য কাটিয়া ছাটিয়া শব্দগুলিকে মোলায়েম করিয়া নাওয়া যাইবে। শব্দ গুলি শ্রুতিমধুর হওয়া দরকার; বাঙ্গলা ভাষার ধাতুর সহিত না মিশিলে কোন শব্দ গ্রাহ্য হইবে না।

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রণয়নে তিনি বিশুদ্ধবাদী ছিলেন না। তবে খাঁটি শব্দে পরিভাষা প্রণয়নের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁর মধ্যে কোন গোঁড়ামি ছিল না। যে কোন ভাষা থেকে শব্দ গ্রহণে তিনি উদার দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ[৩০] করেছেন: বোধকরি কোন ভাষাতে এমন শব্দ প্রচলিত নাই, সংস্কৃত ভাষায় অতলস্পর্শ সমুদ্র মন্থন করিলে যাহার প্রতিশব্দ না মিলিতে পারে। তথাপি বিদেশি সামগ্রী গ্রহণ করিব না- এইরূপ পণ ধরিয়া বসার কোন প্রয়োজন দেখি না। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা: চিকিৎসা বিজ্ঞান, ভৌগোলিক পরিভাষা, শরীর বিজ্ঞান পরিভাষা বিষয়ে তিনি নিবন্ধ রচনা করেছেন, 'বাংলার প্রথম রসায়ন গ্রন্থ, এবং উপস্থিত বিষয়ে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা লেখকের বক্তব্য নিয়ে আলোচনা করেছেন; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় সেগুলো যথাক্রমে ১৩০৬,১৩০৬,১৩১৭,১৩০৫ ও ১৩০১ সালে প্রকাশিত হয়েছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পরিভাষা-সমিতির সঙ্গে তিনি সম্পৃক্ত ছিলেন এবং সচেতন অভিজ্ঞতার আলোকে যা উপলব্ধি করেছিলেন 'শব্দ কথা'র মুখবন্ধে তা বিবৃত[৩১] করেছিলেন:

> কাগজ কলম হাতে কোন একটা বিজ্ঞান বিদ্যার পরিভাষা গড়িয়া তোলার বৃথা পরিশ্রম। সুচারু পারিভাষিক শব্দের সৃষ্টি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের রচনাকর্তার ও অনুবাদকের হাতে। তবে প্রাচীন সাহিত্যের যে সকল শব্দের প্রয়োগ আছে, অথবা আধুনিক সাহিত্য পূর্ববর্তী লেখকেরা যে সকল শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাদের তালিকা দিলে একালে লেখকের কতকটা সাহায্য হইতে পারে।

সর্বোপরি তিনি সকল প্রকার সংকীর্ণতা ও দোদুল্যমানতা পরিহার করে সাহসের সঙ্গে পরিভাষা প্রণয়নের উদ্যোগ থাকা আবশ্যক মনে মন্তব্য[৩২] করেছেন:

কোন পরিভাষা যে নির্দোষ ও সম্পূর্ণ হইবে, এইরূপ আশা করা যায় না। সাহসে ভর করিয়া যথাসাধ্য সঙ্গতি রাখিয়া ও অসঙ্গতি নিবারণ করিয়া পরিভাষা সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক। যদি সেই পরিভাষার মূলগত এবং সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য দোষ লক্ষিত না হয়, তবে সাধারণ উহা গ্রহণ করিতে পারিবে। তাহার আশ্রয়ে গ্রন্থ রচনা ও জ্ঞান প্রচারকার্য্য আরব্ধ হইতে পারিবে। তাহাকেই ভিত্তি করিয়া তাহার গাঁথন চলিতে পারিবে। আবশ্যকমত কালক্রমে তাহাকে সংস্কৃত করিয়া লইসেই চলিবে।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর পরে অনেক খ্যাতনামা কবি, সাহিত্যিক ও গবেষকরা বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রণয়ণে অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), জ্ঞানেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী (১৮৭২-১৯০৯), রাজশেখর বসু (১৮৮০-১৯৬০), সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৯০-১৯৭৭), গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য (১৮৯৫-১৯৮১), মুহম্মদ এনামুল হক (১৯০২-১৯৮২) প্রমুখের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

এছাড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রণয়ণে ভূমিকা পালন করেছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, ঢাকার কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা প্রভৃতি সংস্থা এবং প্রকৃতি, ভারতবর্ষ, মাসিক মোহাম্মদী, বাংলা একাডেমি পত্রিকা প্রভৃতি ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু সেকালে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রণয়নে রামেন্দ্রসুন্দরের যে ভূমিকা নিয়েছিলেন এবং যে ভাবে করেছিলেন তা আজও অনুসরণীর ও আদর্শস্থানীয় হয়ে রয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ আজীবন বিজ্ঞানসেবী ছিলেন। বাংলা বানানের সমস্যা নিয়ে ভাবতে গিয়ে তিনি শব্দতত্ত্ব ও পরিভাষা বিষয়ে আকৃষ্ট হন। তিনি নিজেকে নানাভাবে পরিভাষার কাজে নিযুক্ত রাখার প্রায়াস পেয়েছেন। জীবনের শেষলগ্নে পরিপূর্ণভাবে এ কাজে আত্মনিবেদিত হবার সুযোগ তাঁর এসেছিল। কিন্তু তখন তিনি ভগ্নস্বাস্থ্য, তদুপরি তাঁর ব্যস্ততাও অফুরন্ত। ১৯৩২ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপ্রধ্যায়ের আহবানে খণ্ডকালীন অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেছিলেন। বাংলা বানান, বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রণয়ন ও সংকলন করার পরামর্শদানের জন্যই এই আকুল আহবান। শান্তিনিকেতনে তাঁর কাছ থেকে তাঁকে সাহায্য করার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একজন গবেষনা সহায়কের পদ সৃষ্টি করেন। এই পদে রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছানুযায়ী বিজনবিহারী ভট্টাচার্যকে নিযুক্ত করা হয়। করিব প্রত্যক্ষ তত্ত্বধানে পরিভাষা সঙ্কলন আর বানান সংস্কারের কাজ চলতে থাকে। ১৯৩৪ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসেবে রবীন্দ্রনাথের কার্যকাল শেষ হয়। ইতোমধ্যে পরিভাষা সঙ্কলনের কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য রাজশেখর বসুকে সভাপতি ও চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যকে সম্পাদক করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একটি কেন্দ্রীয় পরিভাষা কমিটি গঠন করে। বিশ্ববিদ্যালয়েই এর দপ্তর ছিল। কমিটির সদস্য ছিলেন বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, চিন্তাহরণ চক্রবর্তী ও দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়, সমিতির সহকারী সম্পাদক প্রমথনাথ বিশী।

পঞ্চম অধ্যায় : স্বামী বিবেকানন্দ ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর শিক্ষাচিন্তা

তথ্যসূত্র :

স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাচিন্তা

১. পূর্বা সেনগুপ্ত,বেদ ও বিবেকান্দ, এম.সি. সরকার এণ্ড সন্স প্রাইবেট লিমিটেড, জানুয়ারি ১৯৯৯,কলকাতা,পৃ. জ
২. পূর্বোক্ত, পৃ.
৩. প্রেমানন্দ প্রেমকথা। ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য। পৃঃ ৮১-৮২
৪. প্রফুল্লচন্দ্র রায়, প্রবন্ধ সংগ্রহ সম্পাদক পিনাকপাণি দত্ত, দে'জ পাবলিশিং , জানুয়ারি ২০১২ কলকাতা, পৃ ৫৫৭
৫. আনিসুজ্জামান: বিবেকান্দের শিক্ষা-চিন্তা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, সংখ্যা ৪২, ফেব্রুয়ারি,১৯৯২, পৃ.-৪৩।
৬. স্বামী we‡eKvb›', 'শিক্ষা ও ধর্ম প্রসঙ্গ', উদ্দীপন, ঢাকা শ্রী রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন, ১৯৮৪, পৃ.-২৭।
৭. The Philosophy of Vivekananda p.97 as quoted from Sister Nivedita: Master as I saw Him.pp.196-197.
৮. প্রসূন বসু ও শচীনন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য (সম্পাদক), বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র,(অখণ্ড বাংলা সংস্করণ), কলিকাতাঃ নবপত্র প্রকাশন, ১৮৮৮, পৃ.১৪৮-১৪৯।
৯. সত্যেন্দ্রনাথ বসু রচনা সংকলন, পৃ. ২৫৭-২৫৮
১০. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৭১) হইতে গৃহীত [দ্র. স্বামী বিবেকানন্দ শিক্ষা প্রসঙ্গ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর শিক্ষাচিন্তা

১. আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ছিলেন সেকালের বেসরকারি কলেজের বিজ্ঞানের অধ্যাপক। ছাত্রদের পদার্থবিজ্ঞানের ক খ পড়াতেন। সেই প্রাথমিক বিজ্ঞান পড়াতে পরীক্ষা দেখাবার জন্য যে সামান্য যন্ত্রপাতির প্রয়োজন তারও বালাই ছিল না। সে-সবের জায়াগায় ছিল কালো বোর্ড আর সাদা চক। বিজ্ঞানে এই প্রাইমারি বিদ্যালয়ের গুরুমহাশয় রামেন্দ্রসুন্দর ছিলেন সর্ববিজ্ঞানবিদ্যার মহামহোপাধ্যায় পন্ডিত। কিন্তু মহাপন্ডিত বললে তাঁর পরিচয় হয় না। বহু বিজ্ঞানের শিকড় থেকে ফুলফল পর্যন্ত সবকিছুর পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞানমাত্র নয়, সে-সব বিজ্ঞানের গতি ও প্রকৃতিতে তাঁর অন্তদৃষ্টি ছিল অসাধারন। উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বিজ্ঞানের পরিণতি, এবং সে শতাব্দীর শেষ দিকে তার নবপর্যায়ের সূচনারা তথ্য ও তত্ত্বে তাঁর মন ভরে ছিল। সে জ্ঞান ও চিন্তার অল্প কিছু পরিচয় তিনি দিয়েছেন তাঁর প্রথম দিকের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে। [দ্র.প্রবন্ধ সংগ্রহ প্রমথ চৌধুরী, সম্পাদনা- অতুল গুপ্ত, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ৭ আগস্ট ১৯৫২,ভূমিকা, পৃ- ১১]
২. †kô ceÜ-iv‡g›'m›'i wÎ‡e'x, সম্পাদনা ড.প্রদীপ রায়, বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র মাঘ ১৪১৯, জানুয়ারি ২০১৩, ভূমিকা,পৃ.১
৩. পূর্বোক্ত ,পৃ.১
৪. পূর্বোক্ত ,পৃ.১–২
৫. পূর্বোক্ত ,পৃ.২–৩
৬. রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বিজ্ঞানকে জগৎ-জীবনের সারসত্য বা মূলভিত্তি হিসেবে গ্রহন করলেও এ কথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, এই জগৎ-জীবনের অন্তরালে একটি অ-খন্ড সর্বজনীন সারমেয় পদার্থ রয়েছে। তাই তিনি 'ধর্ম'-কে 'কর্ম' হিসাবেই গ্রহণ করেন এবং কর্মের ওপরই গুরুত্ব প্রদান করেন। আর এভাবেই তিনি বিজ্ঞান থেকে দর্শনে উত্তরন লাভ করেন। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, তাঁর মানস বিবর্তনে ডারউইন ও হাক্সলির বিবর্তনবাদ, বিশেষকরে, প্রাকৃতিক নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । [দ্র. †kô ceÜ-iv‡g›'m›'i wÎ‡e'x, সম্পাদনা ড.প্রদীপ রায়, পূবোক্ত,পৃ.৩]
৭. পুরাণ পাঠ করিলে অবগত হওয়া যায় যে, সেকালে তেজিয়ান - সন্ততি সকল সময়ে জন্মগ্রহণের জন্য প্রচলিত নিয়মানুসারে দশ মাস কাল গর্ভাবস্থানরূপ যাতনা ভোগের অপেক্ষা রাখিতেন না। দেশ কাল পাত্রের প্রতি বিশেষ লক্ষ না রাখিয়াই যত্র তত্র অকস্মাৎ এক এক ঋষিবংশধরের আবির্ভাব হইত এবং তিনিও প্রায় ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র সাঙ্গোপাঙ্গ বেদশাস্ত্রের উচ্চারণ আরম্ভ করিয়া একটা ভাবী বিপ্লবের সূচনা করিয়া ফেলিতেন।[দ্র রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী , ইংরাজি শিক্ষার পরিণাম (প্রবন্ধ), রামেন্দ্র-রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড), কলকাতা, শ্রাবণ ১৩০২, বাঙলাদেশে উচ্চশিক্ষার দুশো বছর, সূচীপত্র,২০০৬, ঢাকা,পৃ.১৭৮]
৮. রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, ইংরাজি শিক্ষার পরিণাম (প্রবন্ধ), রামেন্দ্র-রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড), কলকাতা, শ্রাবণ ১৩০২, বাঙলাদেশে উচ্চশিক্ষার দুশো বছর, সূচীপত্র, ২০০৬ ঢাকা ,পৃ ১৭৮
৯. পূর্বোক্ত ,পৃ.১৭৮
১০. পূর্বোক্ত ,পৃ.১৮১
১১. তপন চক্রবর্তী, kZ‡I evOwj i weÁvb PP©v, বাংলা একাডেমি, চৈত্র ১৪০৭ /মার্চ২০০১, ঢাকা,পৃ.৮৮-৮৯

১২. তপন চক্রবর্তী, kZe‡l ev0wj i weÁvb PP©া, বাংলা একাডেমি, চৈত্র ১৪০৭ /মার্চ২০০১, ঢাকা, পৃ.৮৮
১৩. পূর্বোক্ত ,পৃ.৮৯
১৪. পূর্বোক্ত ,পৃ. ৯১
১৫. পূর্বোক্ত ,পৃ. ৯৩
১৬. পূর্বোক্ত ,পৃ. ৯৬
১৭. পূর্বোক্ত ,পৃ. ৯৭
১৮. পূর্বোক্ত ,পৃ. ৯৮
১৯. পূর্বোক্ত ,পৃ. ৯৯
২০. পূর্বোক্ত ,পৃ. ১০০
২১. পূর্বোক্ত ,পৃ. ১০১
২২. পূর্বোক্ত ,পৃ. ১০১
২৩. রামেন্দ্র-রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড), কলকাতা, শ্রাবণ ১৩০২, বাঙলাদেশে উচ্চশিক্ষার দুশো বছর, সংস্থান-Static, চুম্বককার্ষণ-Magnetism, অসম সংস্থান-Dynamics, তড়িত বিজ্ঞান Electricity : পৃ.১৯০
২৪. পূর্বোক্ত ,পৃ. ১৯০
২৫. পূর্বোক্ত ,পৃ. ১৯১
২৬. বাংলা ভাষা (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রধান সম্পাদক হুমায়ুন আজাদ ।[দ্র. এম এ. আজিজ মিয়া, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, ডিসেম্বর ২০০৬, পৃ. ৫৪]
২৭. সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা ১:২ (১৩০১), পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫
২৮. পূর্বোক্ত পৃ. ৫৫
২৯. সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা ২:২ (১৩০২), পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬
৩০. সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা ১:২ (১৩০১), পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬
৩১. রামেন্দ্রসুন্দর ও বাংলা সাহিত্য -ডঃ প্রদ্যোত সেনগুপ্ত, পৃ. ১৩৮
৩২. সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা ২:২ (১৩০২), পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাচিন্তা

১. পরিচয়
২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মানস বৈশিষ্ট্য
৩. প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও কর্ম
৪. শিক্ষাচিন্তায় আত্মনিয়োগ
৫. শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
৬. শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষা
৭. মাতৃভাষায় শিক্ষা বিকাশের অন্তরায়
৮. শিক্ষা পরিকল্পনা ও বিধি-পদ্ধতি
৯. বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন
৯.২ শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা
৯.৩ বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা
১০. বিদ্যালয় পরিচালনা প্রসঙ্গে বিশেষ চিঠি
১০.২ ছাত্রদের দায়িত্ব ও কর্তব্য
১০.৩ শিক্ষায় বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ জাগরণ প্রত্যাশা
১০.৪ শিক্ষা প্রশাসন পরিকল্পনা
১০.৫ শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য
১০.৬ ছাত্র–শিক্ষক সম্পর্ক
১১. নারীশিক্ষা
১২. জনশিক্ষা ও পল্লি উন্নয়ন
১৩. স্বদেশপ্রেম ও সমাজ উন্নয়ন
১৪. শিক্ষায় ঐক্যসাধন ও বিজ্ঞানশিক্ষা
১৫. শিশু শিক্ষায় প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রভাব
১৬. শিক্ষাচিন্তা গঠনে পারিবারিক প্রভাব ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাচিন্তা

পরিচয়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) ইতিহাসের মহত্তম সাহিত্যরথীদের অন্যতম একজন। তিনি বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী কবি ও ভাবুক। যত দিকে মানুষের কৌতূহল সঞ্চারিত হতে পারে সে–সব যাবতীয় বিষয় নিয়ে তিনি গভীরভাবে চিন্তা করেছেন। তাঁর কল্পনাশক্তি ও অনুভবের সমুদয় উষ্ণতা দিয়ে তিনি মানুষকে ভালবাসতেন। তিনি মনে করতেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মানুষের আত্মশক্তি অপেক্ষা উন্নততর আর কিছু নেই। তাঁর জীবন-দর্শন-চিন্তার সারবত্তা হচ্ছে মানবকল্যাণ। মানুষের মুক্তি ও উন্নতির পিছনেই ছিল তাঁর সমস্ত সৃজনশক্তির ঠিকা। শিল্প-সাহিত্য, সমাজ-রাষ্ট্র, দর্শন-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর চিন্তার যে সুর বেজেছে তা মানব মুক্তির সুর । আর সে সুরের মূলে রয়েছে তাঁর শিক্ষাচিন্তা। তিনি বুঝেছিলেন শিক্ষার আলো না হলে ভারতবর্ষের মানুষকে তার কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব নয়। অন্যদিকে লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ মানুষ আনন্দহীন জীবন বইয়ে বেড়াতে বাধ্য হয়। এ কারণে শিক্ষাকে তিনি দেখেছেন, মানুষের অস্তিত্ব সংকট মোকাবেলার অব্যর্থ হাতিয়ার হিসেবে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে এ সত্য অনুভব করেছিলেন যে, মানুষ প্রকৃত জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত হলে পরস্পরের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করবে এবং সত্য ও সুন্দরের পথে অগ্রসর হবে। তাঁর শিক্ষাতত্ত্বের মূলমন্ত্র হচ্ছে সত্য দর্শন। বিশ্বকবি খ্যাতির আড়ালে তিনি যে অসামান্য শিক্ষাচিন্তক, তা তাঁর মানবীয় সত্য দর্শনে নিবিষ্টচিত্ত না হলে আবিষ্কার করা যায় না। শিক্ষা বিষয়ক প্রথম রচনা 'শিক্ষার হেরফের (১৮৯২) থেকে মৃত্যুর অল্পকাল পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘ অর্ধশতাব্দী সময়ে তিনি বাঙালির শিক্ষা নিয়ে অক্লান্তভাবে প্রবন্ধ রচনা করেছেন, ভাষণ দিয়েছেন, পত্র–প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন এবং নানা আলাপ–আলোচনায় শিক্ষা বিষয়ে তাঁর সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করেছেন। বাংলা ভাষায় শিক্ষাচিন্তার ক্রমবিকাশ ধারায় তাঁর চিন্তাভাবনা সবচেয়ে উজ্জ্বল। এই অধ্যায়ে আমরা তাঁর শিক্ষাচিন্তাকে কয়েকটি উপশিরোনামে ভাগ করে পর্যালোচনা করার প্রয়াস পাব।

২

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মানস বৈশিষ্ট্য

রবীন্দ্রনাথের জীবনে পাশ্চাত্য দর্শন ও সভ্যতার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং ভারতীয় বেদ-উপনিষদের সার্থক সমন্বয় ঘটেছিল। দার্শনিক চিন্তাধারার দিক থেকে তিনি ছিলেন ভাববাদী, সত্য–শিব–সুন্দরের পূজারী হিসেবে পরম এক আধ্যাত্মিক শক্তিতে গভীর বিশ্বাস ছিল তাঁর। রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন ও জগৎভাবনার মূলে ছিল উপনিষদ। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের প্রগাঢ় সম্পর্কের বিষয়টি তিনি উপলব্ধি করেছেন তাঁর বহুমুখী চিন্তায়। পৃথিবীর সব মানুষের প্রতি ছিল তাঁর সাম্যদৃষ্টি। তিনি আজীবন সত্য ও সুন্দরের সাধনা করেছেন। ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে এক পত্রে তিনি যে কথা লিখেছেন, তাতে তাঁর মানস বৈশিষ্ট্যের এ দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি লিখেছিলেন:

> মিথ্যাচারণ করিলে অন্য লোকের নিকট বিশ্বাস হারাইতে হয় এবং তাহাতে নিজের এবং পরের অনেক সময় অনেক অসুবিধা ও অনিষ্ট ঘটে একথা সত্য- কিন্তু এইটেই আসল নয়। পাপের বাহ্য ফল দুঃখ ও অনিষ্ঠ কিন্তু তাহার চেয়ে গুরুতর পরিণাম নিজের মনটাকে নষ্ট করা। আমরা অন্যকে বঞ্চনা করিতে গিয়া নিজেকে যেমন বঞ্চনা করি এমন আর কাহাকেও নহে। আমাদের চরিত্র সত্য হইতে যতই ভ্রষ্ট হইতে থাকে, ততই বলহীন হইয়া পড়ে। আমাদের শাস্ত্রে বলে, বলহীন কখনও ঈশ্বরকে লাভ করিতে পারে না। অসত্য ও

Dhaka University Institutional Repository

> অন্যান্য পাপ মনের চারিদিকে কেবলি আবরণ তৈরি করিয়া দেয়- আমরা সেই জালে জড়াইয়া মলিন ও নির্জ্জীব হইয়া মনুষ্যত্ব হারাইয়া অত্যন্ত দীনভাবে জীবন কাটাইতে থাকি। যদি প্রতিজ্ঞা করি যে, কখনও সত্যকে ছাড়িব না, মিথ্যাকে আশ্রয় করিব না এবং সেই প্রতিজ্ঞা অনুসারে যথাসাধ্য চলিতে পারি- যতই দুঃখ পাই, যতই ক্ষতি ঘটে লোকে যতই নিন্দা করে বা পীড়া দেয় প্রাণপণে যদি সত্যকে রক্ষা করিয়া চলি, তবে সমস্ত জীবন মন সত্যের জৌতিতে তেজস্বী হইয়া উঠে- সত্যের বলে বলিষ্ঠ হইয়া পরম গৌরব লাভ করে। তোমার অন্তরে যে অন্তর্যামী আছেন তিনিই সমস্ত ভালমন্দ বিচার করেন-তাঁহার বিচারই শিরোধার্য্য করিতে হইবে- লোকের বিচারকে ভয় করিয়া চলিবে না। উপনিষদে এই উপদেশ আছে সত্যান্নপ্রমাদিতব্যঃ কুশলান্ন প্রমাধিতব্যঃ ধর্ম্মান্ন প্রমাদিতব্যঃ- সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইবে না, মঙ্গল হইতে ভ্রষ্ট হইবে না, ধর্ম হইতে ভ্রষ্ট হইবে না। আর্শীর্ব্বাদ করি এই অনুশাসনটি স্বীকার করিয়া তোমার জীবন দিনে দিনে পবিত্র উন্নত উজ্জ্বল ও বলশালী হইয়া উঠুক।[১]

রবীন্দ্রনাথ ধর্ম-বিশ্বাসে তাঁর পূর্ববর্তী অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ থেকে ব্যতিক্রম ছিলেন। কারণ এঁদের প্রথমজন প্রার্থনার বিশেষ কোনো মূল্য আছে বলে স্বীকার করতেন না, দ্বিতীয়জন প্রার্থনা প্রসঙ্গে কথা বলার অবসরই পেতেন না। এ বিষয়ে অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তবে মানবতাবোধের দিক থেকে এঁদের সঙ্গে তাঁর কোনো প্রভেদ নেই। তিনি ছিলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানবতাবাদী চিন্তানায়কদের অন্যতম একজন। রবীন্দ্রনাথ মানুষের মধ্যেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করেছেন। মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানোকে পাপ মনে করতেন তিনি। তাঁর মানবচেতনার মূলে ছিল মানবাত্মার উদ্বোধন। তিনি ব্রাত্যজনের চিত্তলোকের অতুল ঐশ্বর্যের মধ্যে এই মানবসত্যকে সন্ধান করেছেন। তিনি লিখেছেন:

> আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন
> সকল মন্দিরের বাহিরে
> আমার পূজা আজ সমাপ্ত হল
> দেবলোক থেকে
> মানবলোকে
> আকাশে জ্যোতির্ময় পুরুষে
> আর মনের মানুষের আমার অন্তরতম আনন্দে।

'পত্রপুট' কতিায় এই স্বকীয় মানব চেতনার পরিচয়, তাঁর জীবনাদর্শেরই পরিচায়ক। 'রবীন্দ্রনাথের মানবচেতনা এ পরম সত্যোপলব্ধি মধ্যেই নিহীত আছে।'[২] রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘ সাহিত্য-সাধনায় তাঁর ভাষা, ভঙ্গি এবং বক্তব্যে বারবার যে পরিবর্তন এনেছেন তা তাঁর মানস বৈশিষ্ট্য নির্দেশক। কারণ তাঁর ঐ সব পরিবর্তন অনেক ক্ষেত্রে এমন ব্যাপক হয়েছে যে, এক পর্যায়ের সঙ্গে অন্য পর্যায়ের তুলনা করলে মিলে না, ভিন্ন বলে মনে হয়। তবে এ পরিবর্তন যতটা মাত্রাগত,ততটা প্রকৃতিগত নয়। রবীন্দ্র-সমালোচকগণ যে একথা বলেননি, তা নয়। বিশেষ করে প্রমথনাথ বিশী এ বিষয়ে তাঁর লেখায় একাধিকবার উল্লেখ করেছেন।[৩] তবে রবীন্দ্রমানসে নিসর্গচেতনায়, ধর্মচিন্তায়, সমাজ-ভাবনায়, মানবতাবোধে, সাহিত্যাদর্শে, শিক্ষাচিন্তায় যে কত গভীর পরিবর্তন এনেছিল, সেই বিষয়ে সমালোচকগণ ব্যাপক কোনো আলোচনায় যাননি।

রবীন্দ্রমানস ও প্রতিভার বিবর্তন প্রসঙ্গে সমালোচকগণ নানা দিক নির্দেশ করেছেন। তাঁর পিতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং সর্বোপরি সমগ্র পরিবার. উপনিষদ, ব্রাহ্মসমাজ, তাঁর অধীত গ্রন্থাবলী প্রভৃতি নানা বিষয় সমালোকদের আলোচনার অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। তবে 'পরিবারের গণ্ডি পেরিয়ে রবীন্দ্রনাথ কীভাবে বিশ্বসংসারের বিশাল প্রকৃতির কোলে উপনীত হন, সমালোচক[৪] সেদিকে আদৌ মনোযোগ দেননি। অথচ রবীন্দ্রজীবনের এই প্রেক্ষাপটের দিকে লক্ষ না রাখলে রবীন্দ্রমানসের পরিবর্তনের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করা যায় না। কারণ যে রবীন্দ্রনাথ একদা প্রকৃতিকে দেখেছিলেন কেবল 'আড়াল-আবডাল' আর 'ফাঁক-ফুঁকর' দিয়ে,[৫] তিনিই অল্পকালের মধ্যে কীভাবে বিশ্বের প্রতিটি ধূলিকণা এবং ঘাসের সঙ্গে একাত্মবোধ করেন অথবা 'সমুদ্রের প্রতি'-র মতো কবিতা রচনা করেন, তান বিস্তারিত ব্যাখ্যায় যেতে কেউ অনুরাগী হননি।

১৮৯০ সালের পূর্ববর্তী রবীন্দ্রমানস বিশ্লেষণ করলে তাঁর আনুষ্ঠানিকতা-সম্পৃক্ত ধর্মবিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়। এ সময়ে আদি ব্রাহ্মসমাজ-অনুমোদিত আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি তাঁর যথেষ্ট আনুগত্য লক্ষ্য করা যায়। আদি ব্রাহ্মসমাজ-আচরিত হিন্দুত্বকেই তিনি জ্ঞান করতেন বিশুদ্ধ হিন্দুত্ব বলে এবং অন্যান্য ধর্মের তুলনায় সেই হিন্দুত্বকে তিনি শ্রেষ্ঠতর বলে মনে করতেন। অথচ পরিণত বয়সে তাঁর ধর্মচিন্তায় ঔদার্য প্রকাশ

Dhaka University Institutional Repository

পেয়েছে। তখন তিনি কেবল অন্যান্য বিখ্যাত ধর্মসমূহের বিশেষ বিশেষ আদর্শের দ্বারাই প্রভাবিত হননি, বাংলার লৌকিক ধর্মের দ্বারাও প্রভাবিত ও আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর ধর্মচিন্তায় এ ঔদার্য স্বীকরণ ও সমন্বয় সাধনার সূচনা হয় তাঁর পূর্ববঙ্গে অবস্থানকালে। এ দেশের জাতীয়তাবোধ যে গোড়া থেকেই ধর্মপ্রভাবিত, বীন্দ্রনাথের জীবনের প্রথম পর্বে তা সত্য হয়েছিল। তার পূর্বে রবীন্দ্রমানসে যে জাতীয়তাবোধ দৃঢ়মূল ছিল, তা হিন্দু-ভারতীয় জাতীয়তা। সেখানে অহিন্দুর স্থান ছিল সংকীর্ণ, হেয় বললেও বেশি বলা হবে না। এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি বৈপ্লবিকভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল এবং তিনি ধীরে ধীরে সর্বভারতীয়–সার্বধর্মিক জাতীয়তায় বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন। তিনি কর্মক্ষেত্রে বহুজনের সংস্পর্শে এসেছিলেন। বিশেষ করে নোবেল জয়ের (১৯১৩) পর, তাঁর অসম্ভব কবি খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লে পরিচিত, ভক্ত, অনুরাগী , বন্ধুর সংখ্যা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। তবুও সেসময় মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার অভাব অনুভব করে তিনি ব্যথিত হয়েছেন। তিনি লিখেছে:

> জন্মকাল থেকে আমাকে নির্জন নিঃসঙ্গতার ভেলার মধ্যে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। তীরে দেখতে পাচ্ছি লোকালয়ের আলো, জনতার কোলাহল, ক্ষণে ক্ষণে ঘাটেও নামতে হয়েছে, কিন্তু কোথাও জমিয়ে বসতে পারিনি। রশি যতবার ডাঙার খোঁটায় বেঁধেছি টান মেরে ছিঁড়ে দিয়েছে।[৬]

রবীন্দ্রনাথের এই বেদনাবোধের পরিচয় তাঁর রচনাবলীর বহু স্থানে পাওয়া যায়। তাঁর এই নিঃঙ্গতাবোধের কারণ কী ? অন্তর মেশাতে চেয়েও'[৭] কোন বাধায় তিনি বারবার ঠেকে গেছেন? অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, অন্যের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দিতে না-পারার এ বৈশিষ্ট্য, একটা ব্যবধানের অনুভূতি, তাঁর বাল্যশিক্ষা এবং পরিবারের মধ্যেই উপ্ত ছিল। তাঁর নিজের ভাষায় তিনি ছিলেন– কুনো, একলা, একঘরে; সমাজের নিয়ন্ত্রণের অতীত, স্কুল-শাসনের বাইরে।[৮] তাঁর দিন কেটেছে শহরের মধ্যে। কেবল তা-ই নয়, শহরবাসীর মধ্যেও ঘুরে বেড়াবার যে স্বাধীনতা থাকে, বাল্যকাল তাঁর সেটুকুও ছিল না। একটা প্রকাণ্ড অট্টালিকার কোণের এক ঘরে তিনি বন্দি থাকতেন।[৯] জীবনস্মৃতি, ছেলেবেলা ইত্যাদি গ্রন্থে তিনি এই বন্দীত্বের বিস্তৃত বিবরণ দান করেছেন।[১০] অথচ এই বন্দীত্বের বিপরীতে তাঁর অন্তরে ছিল বৃহৎ জগতের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দেওয়ার সুতীব্র আকুতি। সে কথাও তিনি জীবনস্মৃতি, ছেলেবেলা, আত্মপরিচয় প্রভৃতি গ্রন্থে এবং শেষ বয়সের বহু কবিতায় উল্লেখ করেছেন।[১১] বাইরের পৃথিবীর জন্যে, বিপুল সুদুরের জন্যে, তাঁর মনে ব্যাকুলতা ছিল। তিনি লিখেছেন:

> My banished soul sitting in the civilized isolation of the town-life cried within me for the enlargement of the horizon of its comprehension. I was like the torn-away line of a verse, always in a state of suspense, while the other line, with which it rhymed and which could give it fullness, was smudged by the mist away in some undecipherable distance.[১২]

রবীন্দ্রনাথ যদি বাইরের মানুষ, প্রকৃতি এবং বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে দিতে পারতেন, তা হলে পরিবারের মধ্যে তিনি যে একাকীত্বে ক্লিষ্ট ছিলেন, তা থেকে হয়তো মুক্ত হতে পারতেন। এমনকি অন্য ছেলেদের মতো বিদ্যালয়ে নিয়মিত লেখাপড়া করতে পারলেও হয়তো তাঁর মনে বিচ্ছিন্নতাবোধের এমন ক্ষত তৈরি হতো না। সেখানেও তিনি সহজ হতে পারনেনি। যেখানকার শিক্ষার যে পরিবেশ সাধারণ ছেলেমেয়েদের জন্য নির্ধারিত ছিল, তা তাঁর মতো অসাধারণের উপযোগী ছিল না। এ জন্যেই তাঁর কাছে বিদ্যালয় বন্দীশালা হিসেবে গণ্য হয়েছে।[১৩] তাঁর পরবর্তী কালের বহু রচনায় তিনি বিদ্যালয়ের এই নিষ্করুণ পরিবেশের নিন্দা করেছেন।[১৪] বাল্যকাল থেকেই তিনি স্কুল-পলাতক, এ বিষয়টিও তাঁর চরিত্র গঠনে বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল বলে মনে হয়। এ কারণেই তিনি হয়তো যথেষ্ট সামাজিক হয়ে উঠতে পারেননি। এ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন:

> আরো একটা কারণ আমাকে খাপছাড়া করেছিল। আমি ইস্কুল পালানো ছেলে, পরীক্ষা দিইনি, পাস করিনি; মাষ্টার আমার ভাবী কালের সম্বন্ধে হতাশ্বাস। ইস্কুলঘরের বাইরে যে আকাশটা বাধাহীন সেইখানে আমার মন হাঘরেদের মতো বেরিয়ে পড়েছিল।[১৫]

রবীন্দ্রনাথের এই খাপছাড়া, স্কুল পালানো, কুনো বালকের মন ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল একান্তভাবে পারিবারিক পরিবেশে।' মহর্ষি বলে খ্যাত পিতা, সংস্কৃতিবান ভ্রাতৃবৃন্দ, পরিবারের বিদগ্ধ বন্ধুগণ এবং আশ্রিতবর্গ–নানাজন নানাভাবে প্রভাবিত করেছেন এই বালককে– যাঁর গ্রহণ করার ক্ষমতা ছিলো অপরিমিত,

Dhaka University Institutional Repository

উপলব্ধি ও অনুভূতি ছিলো সুগভীর এবং স্পর্শকাতরতা ছিলো সুতীক্ষ্ণ।[১৬]জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারের প্রথম দেশ-জোড়া বিখ্যাত ব্যক্তি দ্বারকানাথ ঠাকুরের মধ্যেও সেকালের ভদ্রলোক চরিত্রের অসঙ্গতিগুলি স্পষ্টভাবে লক্ষণীয়। সমাজসেবা, সামাজিকতা, ব্যবসা-বানিজ্য, শিল্পকর্ম ইত্যাদি বিষয়ে কলকতার নাগরিক সমাজে সুপরিচিত হলেও ব্যক্তিগতভাবে সাধারণ মানুষদের সঙ্গে তাঁর খুব একটা যোগাযোগ ছিল না। আবার ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-আচরণ ও মূল্যবোধের ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন বহু অসঙ্গতির সমষ্টি। তিনি অংশত ছিলেন ঐতিহ্যবাহী ও জাতীয়তাবাদী,[১৭] অংশত সমন্বয়বাদী,[১৮] এবং অংশত পাশ্চত্যবাদী।[১৯]

প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের সময়েই ঠাকুর পরিবার অর্থ-বিত্তের দিকে দিয়ে শিখরে অবস্থান করে। তবে সে সময় ঠাকুর পরিবার শিল্প–সাহিত্যের দিকে ততটা মনোযোগী হয়নি। দেবেন্দ্রনাথের সময়েই পরিবারটি বিদ্যা ও সংস্কৃতিচর্চায় অসামান্য অগ্রগতি লাভ করে। বিত্ত-বিদ্যা-বৈদগ্ধ্য সাধারণ সমাজ থেকে ঠাকুর পরিবারকে বিচ্ছিন্ন করেছিল বলে কেউ কেউ যে অভিযোগ করেন, তা একেবারে অমূলক নয়। তবে ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধের দিক থেকে দেবেন্দ্রনাথ তাঁর পিতার দ্বিধাকে অনেকটা কাটিয়ে উঠেছিলেন। তাঁর অনুসৃত নীতির মধ্যেও অসঙ্গতির তেমন অভাব ছিল না, পূর্বনীতি বর্জন করে তিনি ব্রহ্মসমাজের হাল ধরেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন– ঠাকুর-পরিবার 'সমাজের নোঙর তুলে দূরে বাঁধা-ঘাটের বাইরে এসে ভিড়ে ছিলো। আচার-অনুশাসনের ক্রিয়াকর্ম সেখানে সমস্তই বিরল।'[২০] তার ফলস্বরূপ, মহাদেশ থেকে দূর-বিচ্ছিন্ন দ্বীপের গাছপালা জীবজন্তুর মতো এক ধরনের স্বাতন্ত্র্য এই পরিবারে বেড়ে ওঠে।[২১] রবীন্দ্রনাথ তাঁর পারিবারিক ধর্ম, প্রাচীন ভারতবর্ষীয় আদর্শ, এবং হিন্দুত্বের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন বললেও বেশি বলা হয় না। 'পিতা দেবেন্দ্রনাথের ধর্মীয় আদর্শের প্রতিফলন রবীন্দ্রনাথে যতোটা গভীরভাবে পড়েছিলো, পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের ওপর ততোটা পড়েনি।'[২২] বিশেষ করে, পরিণত বয়সে নিজস্ব ধর্মবোধ জাগ্রত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এর প্রভাব তাঁর মধ্যে সুস্পষ্টভাবে লক্ষ করা যায়।

রবীন্দ্রনাথ বেড়ে উঠেছেন ব্রিটিশ সাম্রারাজ্যের রাজধানী কলকাতা শহরে। হিন্দু, মুসলমান ও ব্রিটিশ সংস্কৃতির সঙ্গমস্থল ছিল তাঁর পরিবার। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সূচনা থেকেই তাঁর পরিবারটি কলকাতার সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত ছিল। তাঁর সমকালের কথা বলতে গিয়ে তিনি লিখেছেন:

> বাহির হইতে দেখিলে আমাদের অনেক বিদেশীপ্রথার চলন ছিল কিন্তু আমাদের পরিবারের হৃদয়ের মধ্যে একটা স্বদেশাভিমান স্থির দীপ্তিতে জাগিতেছিল। স্বশের প্রতি পিতৃদেবের যে একটি আন্তরিক শ্রদ্ধা তাঁহার জীবনের সকল প্রকার বিপ্লবের মধ্যেও অক্ষুন্ন ছিল, তাহাই আমাদের পরিবাস্থ সকলের মধ্যে একটি প্রবল স্বদেশপ্রেম সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছিল।[২৩]

পরিবারের এই স্বদেশাভিমান ও তার স্বরূপ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেছেন যে, স্বদেশের জন্যে তাঁর পিতার একটি আন্তরিক শ্রদ্ধা শত বিপ্লবের মধ্যেও অক্ষুন্ন ছিলো।[২৪] আসলে দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন এ পরিবারের প্রাণকেন্দ্রস্বরূপ।[২৫] তাই তাঁর স্বদেশপ্রীতি পরিবারের অন্যান্য সদস্যের মধ্যে সঞ্চারিত হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। রবীন্দ্রনাথের বাল্য ও কৈশোরকালে বাংলাদেশে স্বদেশ প্রেমের ধারা প্রবলভাবে বহমান ছিল না। বরং 'শিক্ষিত ব্যক্তিরা দেশের ভাষা এবং ভাব উভয়কে তাঁদের জীবনের বাইরের দরজায় ঠেকিয়ে রেখেছিলেন।[২৬] এমনকি, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের দুই প্রধান পথিকৃৎ-মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-সাহিত্যের আসরে আবির্ভূত হন ইংরেজি ভাষায় সাহিত্য রচনার মাধ্যমে। অথচ ঠাকুর পরিবারে মাতৃভাষার চর্চা হতো সযত্নে ও সগর্বে। 'দেবেন্দ্রনাথের আন্তরিক ইচ্ছায় দেশীয় সংস্কৃতি ও দেশীয় ভাব সেখানে অসুসৃত হতো বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে।'[২৭] শুধু তাই নয়, ১৮৬০ ও ১৮৭০ দশকে ইংরেজদের সঙ্গে তুলনা করে শিক্ষিত ব্যক্তিরা স্বজাতি ও স্বদেশ সম্পর্কে যে 'আত্মসচেতন হয়ে ওঠেন'[২৮] এবং তার অনিবার্য ফলস্বরূপ যে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ও বিকাশ ঘটে, ঠাকুর বাড়ি তাতেও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

ঔপনিবেশিক সংস্কৃতি বাঙালি জীবনের প্রতিটি স্তরে নাড়া দেয়। ফলে সাহিত্য, কলা, রাজনীতি , সমাজ সংস্কার, ধর্ম সংস্কার প্রভৃতি ক্ষেত্রে নতুন প্রয়াস দেখা দেয়। ইংরাজি ভাষায় শিক্ষা প্রচলনের প্রভাবে শুরু হয় এ সংস্কার। ভাষা মাধ্যম ইংরেজি হওয়ার ফলে ভারতের অধিকাংশ মানুষই এ পরিবর্তনের বাইরে থেকে যায়, বিশেষ করে গ্রামীণ ভারত। রবীন্দ্রনাথ সেই বিভেদকে 'পিতা পুত্রের বিচ্ছেদ' বলে বর্ণনা করেছেন। দেশের ঐতিহ্যকে তিনি নানাভাবে গদ্যে ও পদ্যে প্রকাশ করেছেন এবং ধীরে ধীরে দেশের ভবিষৎ সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব ধারনা প্রতিষ্ঠা করেছেন। এটা করতে গিয়ে তিনি একদিকে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রবাদকে বর্জন

করেছেন এবং অন্যদিকে প্রাচীন ভারতের সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ পরিত্যাগ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কালের সমস্ত প্রলোভন কাটিয়ে দেশ সেবায় শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের জীবনের উন্নতিকে কর্তব্য বলে গ্রহণ করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের সর্বাপ্রেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, বিশ্বাত্মচেতনা।[২৯] তাঁর কল্পনায় ও আদর্শে সাম্প্রদায়িকতা বর্জন ও মানুষের সহজাত ঐক্য প্রাধান্য লাভ করে। তাঁর বিশ্বপ্রীতির মূলে আত্মপ্রত্যয়, মাতৃভাষার মাধ্যমে বলিষ্ঠ শিক্ষা, ও ভারতীয় ঐতিহ্যের সম্যক জ্ঞান। এই দুটিই তিনি পারিবারিক ধারায় পেয়েছিলেন। ঠাকুর পরিবারের একমাত্র রবীন্দ্রনাথেরই এই আস্থার প্রয়োজন হয়, কারণ আজীবন তিনি নিজের দেশের এবং বিশ্বের মধ্যে এক সূক্ষ সামঞ্জস্য আনর চেষ্টা করে গিয়েছিলেন। ১৯১৩ সালে, নোবেল পুরস্কার পাবার পর, তিনি নিজের সম্বন্ধে লিখেছিলেন-' আমি একটি চলন্ত পাখীর মত। পৃথিবীর দুইপাত আমার বাসা। এবারে ওপার থেকে আমার ডাক এসেছে।'[৩০] নিজের পরিস্থিতি উল্লেখ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই দুপারের পাখির রুপক ব্যবহার করেছেন। তাঁর বিশেষ বন্ধু, দার্শনিক ব্রজেন্দ্রনাথ শীল তাঁকে এক পত্রে লিখেছিলেন-ভারতে থাকিয়া আপনাকে East ও West দুই hemisphere এরই দায় আপনাকে ঠেকাইতে হইয়াছে। ইহাতে শরীর ভাঙ্গিলেও শরীরের অপরাধ নাই- কিন্তু আনন্দের বিষয় মন আপনার অটুট রহিয়াছে।[৩১]

৩

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও কর্ম

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬১ সালের ৭ ই মে (২৫ বৈশাখ, ১২৬৮) কলকাতার জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাতা সারদা দেবী এবং পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর।

দেবেন্দ্রনাথের পনেরটি সন্তানের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ চতুর্দশ।[৩২] রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম দিককার শিক্ষা অর্জনের দুটি দিক সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে বলেছেন যে, প্রথমত বাড়িত বাইরে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে শিক্ষা লাভ করেছেন; দ্বিতীয়ত, পারিবারিক পরিমণ্ডলে অনানুষ্ঠানিক পরিবেশে শিক্ষা লাভ করেছেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ির এক কোণার বারান্দায় একটা পাঠশালা ছিল। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার হাতেখড়ি হয় 'বর্ণ পরিচয়' দিয়ে। জীবন স্মৃতিতে তিনি লিখেছেন:

> আমরা তিনটি বালক[৩৩] একসঙ্গে মানুষ হইতেছিলাম। আমার সঙ্গীদুটি আমার চেয়ে দুই বছরের বড়ো। তাঁহারা যখন গুরুমহাশয়ের[৩৪] কাছে পড়া আরম্ভ করিলেন আমারও শিক্ষা সেই সময়ে শুরু হইল[৩৫], কিন্তু সে কথা আমার মনেও নাই। কেবল মনে পড়ে 'জল পড়ে পাতা নড়ে।[৩৬]' তখন 'কর খল' প্রভৃতি বানানের তুফান কাটাইয়া সবেমাত্র কূল পাইয়াছি। সেদিন পড়িতেছি 'জল পড়ে পাতা নড়ে।' আমার জীবণে এইটেই আদি করিব প্রথম কবিতা। সেদিনের আনন্দ আজও যখন মনে পড়ে তখন বুঝিতে পারি, কবিতার মধ্যে মিল জিনিটার এত প্রয়োজন কেন। মিল আছে বলিয়াই কথাটা শেষ হইয়াও শেষ হয় না-তাহার বক্তব্য যখন ফুরায় তখনো তাহার ঝংকারটা ফুরায় না, মিলটাকে লইয়া কানের সঙ্গে মনের সঙ্গে খেলা করিতে থাকে। এমনি করিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া সেদিন আমার সমস্ত চৈতন্যের মধ্যে জল পড়িতে ও পাতা নড়িতে লাগিল।[৩৭]

রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে ওরিয়েন্টাল সেমিনারি, নর্মাল স্কুল, 'সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করলেও স্কুলের পাঠ শেষ করতে পারেননি। ১৭ বছর বয়সে ব্যারিস্টারি পড়তে ইংল্যান্ড গেলেও কোর্স সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। বাড়িতে গৃহশিক্ষকের কাছেই তিনি উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করে। বালক বয়সে তাঁর কোনো স্কুলেই বেশি দিন লেখা পড়া করেননি। ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে পড়ার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তিনি লিখেছেন:

> ওরিয়েণ্টাল সেমিনারিতে যখন পড়িতেছিলাম তখন কেবলমাত্র ছাত্র হইয়া থাকিবার যে-হীনতা তাহা মিটাইবার একটা উপায় বাহির করিয়াছিলাম। আমাদের বারান্দার একটি বিশেষ কোণে আমিও একটি ক্লাস খুলিয়াছিলাম। রেলিংগুলো ছিল আমার ছাত্র। একটি কাঠি হাতে করিয়া চৌকি লইয়া তাহাদের সামনে বসিয়া মাস্টারি করিতাম। রেলিংগুলার মধ্যে কে ভালো ছেলে আর কে মন্দ ছেলে, তাহা একেবারে স্থির করা ছিল। এমনকি ভালমানুষ রেলিং ও দুষ্ট রেলিং, বুদ্ধিমান রেলিং ও বোকা রেলিংয়ের মুখশ্রীর প্রভেদ আমি

Dhaka University Institutional Repository

> যেন সুস্পষ্ট দেখিতে পাইতাম। দুষ্ট রেলিংগুলার উপর ক্রমাগত আমার লাঠি পড়িয়া পড়িয়া তাহাদের এমনি দুর্দশা ঘটিয়াছিল যে, প্রাণ থাকিলে তাহারা প্রাণ বিসর্জন করিয়া শান্তি লাভ করিতে পারিত। লাঠির চোটে যতই তাহাদের বিকৃতি ঘটিত ততই তাহাদের উপর রাগ কেবলই বাড়িয়া উঠিত; কী করিলে তাহাদের যে যথেষ্ট শাস্তি হইতে পারে, তাহা যেন ভাবিয়া কুলাইতে পারিতাম না। আমার সেই নিরব ক্লাসটির কী ভয়ংকর মাস্টারি যে করিয়াছি, তাহার সাক্ষ্য দিবার জন্য আজ কেহই বর্তমানে নাই। আমার সেই সেকালের দারুনির্মিত ছাত্রগণের স্থলে সম্প্রতি লৌহনির্মিত রেলিং ভর্তি হইয়াছে-আমাদের উত্তরবর্তিগণ ইহাদের শিক্ষকতার ভার আজও কেহ গ্রহণ করে নাই, করিলেও তখনকার শাসন প্রণালীতে এখন কোন ফল হইত না-ইহা বেশ দেখিয়াছি, শিক্ষকের প্রদত্ত বিদ্যাটুকু শিখিতে শিশুরা অনেক বিলম্ব করে, কিন্তু শিক্ষকের ভাবখানা শিখিয়া লইতে তাহাদিগকে কোনো দুঃখ পাইতে হয় না। শিক্ষাদান ব্যাপারের মধ্যে যে সমস্ত অবিচার, অধৈর্য, ক্রোধ, পক্ষপাতপরতা ছিল, অন্যান্য শিক্ষাণীয় বিষয়ের চেয়ে সেটা অতি সহজেই আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিলাম। সুখের বিষয় এই যে, কাঠের রেলিঙের মত নিত্যান্ত নির্ভার ও অচল পদার্থ ছাড়া আর কিছুর উপরে সেই সমস্ত বর্বরতা প্রয়োগ করিবার উপায় সেই দুর্বল বয়সে আমার হাতে ছিল না। কিন্তু যদিচ রেলিং শ্রেণীর সঙ্গে ছাত্রের শেণীতে পার্থক্য যথেষ্ট ছিল, তবু আমার সঙ্গে আর সংকীর্ণচিত্ত শিক্ষকের মনস্তত্ত্বের লেশমাত্র প্রভেদ ছিল না।[৩৮]

ওরিয়েন্টাল সেমিনারি স্কুলের পর তাঁকে নর্মাল স্কুওে ভর্তি করা হল। সেখানেও তাঁর পড়তে ভাল লাগলো না। কারণ বহুবিদ, তার মধ্যে –শিক্ষকদের আচরন, অন্যছেলেদের সঙ্গে মিশতে না পারা, শিক্ষার পরিবেশ প্রভৃতি গুরতর সমস্যা ছিল তাঁর কাছে। 'নর্মাল স্কুল'[৩৯] –এ পড়ার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তিনি লিখেছেন:

> ক্রমশ নর্মাল স্কুলের স্মৃতিটা যেখানে ঝাপসা অবস্থায় পার হইয়া স্ফুটতর হইয়া উঠিয়াছে সেখানে কোনো অংশেই তাহা লেশমাত্র মধুর নহে। ছেলেদের সঙ্গে যদি মিশিতে পারিতাম তবে বিদ্যাশিক্ষার দুঃখ তেমন অসহ্য বোধ হইত না। কিন্তু সে কোনো মতেই ঘটে নাই। অধিকাংশ ছেলেরই সংস্রব এমন অশুচি ও অপমানজনক ছিল যে, ছুটির সময় আমি চাকরকে লইয়া দুতলায় রাস্তার দিকের এক জানালার কাছে একলা বসিয়া কাটাইয়া দিতাম। মনে মনে হিংসা করিতাম, এক বৎসর, দুই বৎসর, তিন বৎসর-আরো কত বৎসর এমন করিয়া কাটাইতে হইবে। শিক্ষদের মধ্যে একজনের কথা আমার মনে আছে, তিনি এমন কুৎসিত ভাষা ব্যবহার করিতেন যে তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধাবশত তাঁহার কোনো প্রশ্নেরই উত্তর করিতাম না।.....যখন পড়া চলিত তখন সেই অবকাশে পৃথিবীর অনেক দুরহ সমস্যার মীমাংশাচেষ্টা করিতাম। একটা সমস্যা কথা মনে আছে। অস্ত্রহীন হইয়াও শত্রুকে কী করিলে যুদ্ধে হারানো যাইতে পারে, সেটা আমার গভীর চিন্তার বিষয় ছিল। ঐ ক্লাসের পড়াশুনার গুঞ্জনধ্বনির মধ্যে বসিয়া ঐকথাটা মনে মনে আলোচনা করিতাম তাহা আজো আমার মনে আছে। ভাবিতাম কুকুর, বাঘ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুদের ভালো করিয়া শায়েস্তা করিয়া প্রথমে তাহাদের দুই-চারি সার যুদ্ধক্ষেত্রে যদি সাজাইয়া দেওয়া যায়, তবে লড়াইয়ের আসরের মুখবন্ধটা বেশ সহজেই জমিয়া উঠে, তাহার পরে নিজেদের বাহুবল খাটাইলে জয়লাভটা নিতান্ত অসাধ্য হয় না।.....এমনি করিয়া সেই ক্লাসে এক বছর যখন কটিয়া গেল তখন মধুসূদন বাচস্পতির নিকট আমাদের বাংলার বাৎসরিক পরীক্ষা হইল। সকল ছেলের চেয়ে আমি বেশি নম্বর পাইলাম। আমাদের ক্লাসের শিক্ষক কর্তৃপুরুষদের কাছে জানাইলেন যে, পরীক্ষক আমার প্রতি পক্ষপাত প্রকাশ করিয়াছেন। দ্বিতীয়বার আমার পরীক্ষা হইল। এবার স্বয়ং সুপারিন্টেন্ডেন্ট পরীক্ষকের পাশে চৌকি লইয়া বসিলেন। এবারেও ভাগ্যক্রমে আমি উচ্চস্থান পাইলাম।[৪০]

-এরপর তাঁকে 'সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে 'ভর্তি করা হয়। পূর্বের দুটি স্কুলের তুলনায় 'সেন্ট জেভিয়ার্সে শিক্ষার পরিবেশ রবীন্দ্রনাথের জন্য অনুকূল ছিল। অল্পদিনের মধ্যেই এ স্কুলে শিক্ষকদের সঙ্গে তাঁর সহজ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। এ সময় তিনি ম্যাকবেথের কিছু অংশ বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। এরপর তিনি ১৮৭৮ সালে ইংল্যান্ডে সরকারি ব্রাইটন স্কুলে ভর্তি হন। তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস তিনেক হেনরি মোরলের ইংরেজি সাহিত্যের ক্লাশ করেন। সেখানে মোরলের বক্তৃতা তাঁকে বেশ আনন্দ দিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে এ ছাড়া আর বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। তবে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার তুলনায় অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার দ্বারা তিনি অনেক বেশি সমৃদ্ধ হয়েছিলেন। সেই শিক্ষাই তাঁর জীবনগঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। পরবর্তীতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষাচিন্তায় শিক্ষার যে পরিবেশের কথা বলেছেন, তা তাঁর জন্মস্থান জোড়াসাঁকোতেই ছিল। এখানেই তাঁর পিতার কাছে আসতেন সেকালের সব বিখ্যাত পণ্ডিত, গুণী ব্যক্তিরা আসতেন । তাঁরা বাঙালির ভাষা- সংস্কৃতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। সবমিলিয়ে জোড়াসাঁকোতে যেন সবসময় বিরাজ করতো একটা 'জীবন্ত প্রাণবন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে'র পরিবেশ। রবীন্দ্রনাথ সেই পরিবেশর সম্পর্কে লিখেছেন:

Dhaka University Institutional Repository

> আমাদের বাড়ির বন্ধু শ্রীকণ্ঠবাবু দিনরাত গানের মধ্যে তলিয়ে থাকতেন। বারান্দায় বসে বসে চামেলির তেল মেখে স্নান করতেন, হাতে থাকত গুড়গুড়ি, অম্বুরি তামাকের গন্ধ উঠত আকাশে, গুন গুন গান চলত, ছেলেদের টেনে রাখতেন চার দিকে। তিনি তো গান শেখাতেন না, গান তিনি দিতেন; কখন তুলে নিতুম জানতে পারতুম না। ফুর্তি যখন রাখতে পারতেন না দাঁড়িয়ে উঠতেন, নেচে নেচে বাজাতে থাকতেন সেতার, হাসিতে বড়ো বড়ো চোখ জ্বল জ্বল করত, গান ধরতেন-ময় ছোড়োঁ রজকী বাসরী। সঙ্গে সঙ্গে আমিও না গাইলে ছাড়তেন না।...তার পরে যখন আমার কিছু বয়েস হয়েছে তখন বাড়িতে খুব বড়ো ওস্তাদ এসে বসলেন যদু ভট্ট। শেখাই হল না। কিছু কিছু সংগ্রহ করেছিলুম লুকিয়ে-চুরিয়ে-ভালো কাফি সুরে 'রুম ঝুম বরখে আজু বাদরওয়া', রয়ে গেল আজ পর্যন্ত আমার বর্ষার গানের সঙ্গে দল বেঁধে।[৪১]

ঠাকুরবাড়ির অন্ত:পুরের শিক্ষাব্যবস্থাপনার ভার ছিল রবীন্দ্রনাথের সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথের উপর। তিনি কলকাতা মেডিকেল কলেজে পড়াশোনা করেন এবং কুস্তিতে তাঁর উৎসাহ ছিল। সেকালের তুলনায় রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক শিক্ষার পরিবেশও ছিল ব্যতিক্রমধর্মী। কঠোর নিয়মানুবর্তিতার মধ্য দিয়ে ঠাকুর পরিবারের ছেলেদের গৃহে পড়াশোনা করতে হতো। পড়তে হতো অনেকগুলো বিষয়। একমাত্র ইংরেজি শিক্ষক অঘোর বাবুর পাঠদান ছাড়া সমস্ত বিষয় পড়ানো হতো বাংলায়। তখন রবীন্দ্রনাথকে কঠিন রুটিন মেনে চলে গৃহে পড়াশোনা করতে হতো। তিনি নিজেই তাঁর বর্ণনা দিয়েছেন:

> অন্ধকার থাকতেই বিছানা থেকে উঠি, কুস্তির সাজ করি, শীতের দিনে শিরশির করে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠতে থাকে। শহরে এক ডাকসাইটে পালোয়ান ছিল, কানা পালোয়ান, সে আমাদের কুস্তি লড়াতে।...কুস্তির আখড়া থেকে ফিরে এসে দেখি মেডিক্যাল কলেজের এক ছাত্র বসে আছেন মানুষের হাড় চেনবার বিদ্যে শেখবার জন্যে।... দেউড়িতে বাজত সাতটা। নীলকমল মাস্টারের ঘড়ি-ধরা সময় ছিল নিরেট। এক মিনিটের তফাত হবার জো ছিল না। খটখটে রোগা শরীর, কিন্তু স্বাস্থ্য তাঁর ছাত্রেরই মতো, এক দিনোর জন্যেও মাথাধরার সুযোগ ঘটল না। বই নিয়ে যেতুম টেবিলের সামনে। কালো বোর্ডের উপর খড়ি দিয়ে অঙ্কের দাগ পড়তে থাকত-সবই বাংলায়, পাটীগণিত, বীজগণিত, রেখাগণিত। সাহিত্যে 'সীতার বসবাস' থেকে একদম চড়িতে দেওয়া হয়েছিল ' মেঘনাদবধ' কাব্যে। সঙ্গে ছিল প্রকৃতিবিজ্ঞান। মাঝে মাঝে আসতেন সীতানাথ দত্ত বিজ্ঞানের ভাসা ভাসা খবর পাওয়া যেত জানা জিনিস পরখ করে। মাঝে একবার এলন হেরম্ব তত্ত্বরত্ন। লাগলুম না কিছু বুঝে মুগ্ধবোধ মুখস্থ করে ফেলতে। এমনি করে সারা সকাল জুড়ে নানারকম পড়ার...চাপ।...ঘণ্টা বাজে দশটার।...বুড়ো ঘোড়া পালকিগাড়িতে করে টেনে নিয়ে চলল আমার দশটা-চারটার আন্দামানে। সাড়ে চারটার পর ফিরে আসি স্কুল থেকে। জিমন্যাস্টিকের মাস্টার এসেছেন। কাঠের ডাণ্ডার উপর ঘণ্টাখানেক ধরে শরীরটাকে উলেটপালট করি। তিনি যেতে না যেতে এসে পড়েন ছরি-আঁকার মাস্টার। ক্রমে দিনের মরচে পড়া আলো মিলিয়ে আসে।...পড়বার ঘরে জ্বলে ওঠে তেলের বাতি। অঘোর মাস্টার এসে উপস্থিত। শুরু হয়েছে ইংরেজি পড়া।[৪২]

পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬০ এর প্রতিষ্ঠিত উত্তর কলকাতার জোড়াসাঁকোর বাসভবনে রবীন্দ্রনাথ বড় হন। এই পরিবারের এমন একটি নিজস্ব জগৎ ছিল যাতে প্রাচীন ও আধুনিক মূল্যবোধের সমন্বয় ঘটেছিল। এ বিষয় রবীন্দ্রনাথ পরিণত বয়সে তাঁর স্ত্রীকে লিখেছেন–'আমাদের পরিবারের শিক্ষা রুচি অভ্যাস ভাষা ও ভাব অন্য সমস্ত বাঙ্গালী পরিবার থেকে স্বতন্ত্র.....।'[৪৩] তখনকার ভারতীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের অগ্রণী হিসাবে 'প্রিন্স' দ্বারকানাথ প্রভৃতি ধনশালী ছিলেন। জীবনবিলাসী বিশ্বনাগরিক দ্বারকানাথ ফারসি, আরবি ও ইংরাজি ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন এবং শোনা যায় ইংলন্ড, ফ্রান্স ও ইটালিতে রাজন্যবর্গ থেকে উগ্রপন্থী পর্যন্ত নানা শ্রেণির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়েছিল। স্বদেশেও তিনি বিশিষ্ট সমাজ ও ধর্মসংস্কারক রামমোহন রায়ের সঙ্গে প্রত্যেকটি শিক্ষা ও সমাজকল্যাণ আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভুমিকা পালন করেন। তাঁর পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন বিপরীত, উপনিষদের মহত্তম আদর্শে অনুপ্রাণিত। পিতার ঋণশোধের জন্য উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া প্রায় সব সম্পত্তি এক দয়ায় পাওনাদারের হাতে সমর্পণ করেছিলেন দেবেন্দ্রনাথ। তাঁর এই মহান আদর্শের জন্য দেশবাসী তাঁকে মহর্ষি আখ্যা দেয়, ঠিক যেমন দ্বারকানাথকে তাঁর মস্ত উদারতার জন্য দেশের মানুষ ভালবেসে 'প্রিন্স' আখ্যা দেয়। ধর্মবিশ্বাসে ঠাকুর পরিবার রামমোহন রায়ের একশ্বরবাদী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ নিজে ব্রাহ্ম সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। গোঁড়া হিন্দুধর্ম সংস্কারের উদ্দেশ্য রামমোহন প্রথম এই বৈপ্লবিক ব্রাহ্ম আন্দোলনের সূচনা করেন। ১৮৩৩-এ তাঁর মৃত্যুর প্রাক্কালে নতুন পথের নির্দেশ রেখে যান। রবীন্দ্রনাথ বহুবার বলেছেন যে রামমোহনের শিক্ষাই তাঁর জীবনের প্রথম অনুপ্রেরণা। তিনি লিখেছেন:

Dhaka University Institutional Repository

> তাঁর মৃত্যুর পরে আজ একশত বৎসর অতীত হল। সেদিনকার অনেক কিছুই আজ পুরাতন হয়ে গেছে, কিন্তু রামমোহন রায় পুরাতত্ত্বের অস্পষ্টতায় আবৃত হয়ে যাননি। তিনি চিরকালের মতোই আধুনিক... তিনি বিরাজ করেছেন ভারতের সেই আগামীকালে, যে কালের ভারতের মাহা ইতাস আপন সত্যে সার্থক হয়েছে, হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান মিলিত হয়েছে অখন্ড মহাজাতীয়তায়।[৪৪]

তিনি বলতেন–' স্বদেশের গৌরববুদ্ধি আমার মনে আছে; কিন্তু আমি একান্ত আগ্রহে ইচ্ছা করি যে, সেই বুদ্ধি যেন কখনো আমাকে একথা না ভোলায় যে, একদিন আমার দেশে সাধকেরা যে মন্ত্র প্রচার করেছিলেন সে হচ্ছে ভেদবুদ্ধি করবার মন্ত্র।'[৪৫] রবীন্দ্রনাথের বাড়িতে স্বদেশপ্রেমের জন্য তাঁর অগ্রজেরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করতেন। তাঁদের প্রভাবে তাঁর মধ্যে স্বদেশানুরাগ জন্মে, শৈশব থেকেই তিনি স্বাধীন চিন্তায় নিয়ে বেড়ে উঠেন। পরিবারের বড়দের উদার মনোভাবের প্রভাবে তাঁর মনে তৈরি হতে থাকে বিশ্বমানবতার বোধ। যা তাঁর কর্ম জীবনে প্রভাব ফেলেছে। তিনি পিতা আদেশে ১৮৮৪ সাল থেকে বিষয়কর্মে নিযুক্ত হন। ১৮৯০ সালে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জমিদারি দেখাশুনা শুরু করেন। সেই সূত্রে তিনি কুষ্টিয়ার শিলাইদহ ও সিরাজগঞ্জের শাহজাতপুরে দীর্ঘ সময় অবস্থান করেন। সাহিত্য চর্চা, বাংলা ভাষায় শিক্ষাবিস্তার, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা, সমাজ সেবা, দেশভ্রমণ প্রভৃতি কাজের মধ্য দিয়ে তিনি মানব কল্যাণে সত্য-সুন্দরের সাধনায় তাঁর আশি বছরের দীর্ঘ জীবনন নিবেদন করেছেন।

৪

শিক্ষাচিন্তায় আত্মনিয়োগ

রবীন্দ্রনাথের জন্মের পূর্বের পাঁচ বছর সময়কে বাংলার সমাজ ব্যস্থার জন্য এক মাহেন্দ্রক্ষণ বলা যায় । এই সময় পর্বের মধ্যে–কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্রাহ্মধর্ম প্রচার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ ও স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক আন্দোলন, নীলকরদের হাঙ্গামা,বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে সাঁওতাল বিদ্রোহ, বাংলা সাহিত্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের তিরোভাব, মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও দীনবন্ধু মিত্রের আর্বিভাব, সোমপ্রকাশ পত্রিকার অভ্যুদয়, দেশিয় নাট্যশালা স্থাপন ও নাট্যসাহিত্যে যুগোপযোগী প্রতিভার আত্মপ্রকাশ প্রভৃতি ঘটনা ঘটেছে। এই প্রত্যেকটি ঘটনা–আন্দোলন বাংলাদেশকে মধ্যযুগীয় মনোভাব থেকে বাইরে আসতে সহায়তা করেছিল।[৪৬] বাস্তবিক অর্থে বাংলার আধুনিকতার সূত্রপাত হয় এই পর্ব থেকেই। বাংলার সমাজ ব্যবস্থায় এই নবজন্মের ঊষালগ্নে রবীন্দ্রনাথের জন্ম। তাঁর বয়স যখন মাত্র ষোল বছর তখন তিনি এক প্রবন্ধে এদেশের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে তীক্ষ্ণ মন্তব্য করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন:

> বঙ্গদেশে এখন এমনি সৃষ্টিছাড়া শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত হইয়াছে যে তাহাতে শিক্ষিতেরা বিজ্ঞান দর্শনের কতকগুলি বুলি এবং ইতিহাসের সাল-ঘটনা ও রাজাদিগের নামাবলী মুখস্থ করিতে পারিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের রুচির ও উন্নতি করিতে পারেন নাই বা স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতেও শিখেন নাই।[৪৭]

এই মন্তব্যের মধ্য দিয়েই শিক্ষা বিষয়ে তাঁর চিন্তার সূচনা। এর পর 'ন্যাশনাল ফণ্ড'(১৮৮৩) লিখলেন। তাতে তিনি সরকারের স্বায়ত্ব শাসনের সমালোচনা করে তা আগে থেকে বোঝার জন্য শিক্ষার উপর জোর দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন:

> আজ যে ভাবগুলি কেবল গুটি দুই তিন মাত্র লোক জানে, সেই ভাব সাধারণে যাহাতে প্রচার হয় তাহারই চেষ্টা করা, এমন করা, যাহাতে দেশের গাঁয়ে গাঁয়ে, পাড়ায় পাড়ায় নিদেন গুটী কতক করিয়া শিক্ষিত লোক পাওয়া যায়, এবং তাঁহাদের দ্বারা অশিক্ষিতদের মধ্যেও কতকটা শিক্ষার প্রভাব ব্যাপ্ত হয়। কেবল ইংরেজি লিখিলে কিম্বা ইংরেজিতে বক্তৃতা দিলে ইটি হয় না। ইংরেজিতে যাহা শিখিয়াছ তাহা বাঙ্গালায় প্রকাশ কর, বাঙ্গালাসাহিত্য উন্নতি লাভ করুক ও অবশেষে বঙ্গবিদ্যালয়ে দেশ ছাইয়া সেই সমুদয় শিক্ষা বাঙ্গালায় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ুক। ইংরেজিতে শিক্ষা কখনই দেশের সর্বত্র ছড়াইতে পারিবে না। তোমরা দুটি চারটি লোক ভয়ে ভয়ে ও কি কথা কহিতেছ, সমস্ত জাতিকে একবার দাবী করিতে শিখাও কিন্তু সে কেবল বিদ্যালয় স্থাপনের দ্বারা হইবে, Political agitation-এর দ্বারা হইবে না।...[৪৮]

১৮৯০সালে দ্বিতীয়বার বিলেত ভ্রমণ উপলক্ষে তিনি রচনা করলেন 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি' এটি প্রথম ১৮৯১ সালে সাধনা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এখানে তিনি স্ত্রী শিক্ষার গুরত্ব এবং ইংরেজি শিক্ষার প্রতি অতি উৎসাহীদের আশাহত হওয়ার ভবিষ্যতবাণী করেছেন। তিনি বলেছেন:

> এখন, অন্তরে বাহিরে এই ইংরেজি শিক্ষা প্রবেশ করে' সমাজের অনেক ভাবান্তর উপস্থিত করবেই সন্দেহ নেই। কিন্তু যাঁরা আশঙ্কা করেন আমরা এই শিক্ষার প্রভাবে য়ুরোপীয় সভ্যতার মধ্যে প্রাচ্যলীলা সম্বরন করে, পরম পাশ্চাত্ত্যলোক লাভ করব-আমার আশা এবং আমার বিশ্বাস তাঁদের সে আশঙ্কা ব্যর্থ হবে।...কারণ, যেমন শিক্ষাই পাই না কেন, আমাদের একেবারে রূপান্তর হওয়া অসম্ভব। ইংরাজি শিক্ষা আমাদের কেবল কতকগুলি ভাব এনে দিতে পারে কিন্তু ইংলন্ড পাব কোথা থেকে। বীজ পাওয়া যায় কিন্তু মাটি পাওয়াই কঠিন।[৪৯]

এ সময়ে রচিত তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ হচ্ছে-'শিক্ষার হেরফের' (১৮৯২)।[৫০] প্রস্তুতি পর্বের রচনা হলেও এতে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা বিষয়ে যেসব কথা বলেছেন তা পরবর্তীতে লেখা শিক্ষাবিষয়ক বহু প্রবন্ধের সারকথাস্বরূপ। এখানে তিনি ইংরেজি শিক্ষা বা ঔপনিবেশিক শিক্ষা নিয়ে দুটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। তা হলো-এক. জীবনের সঙ্গে শিক্ষার সংগতি-রক্ষা; এবং দুই, শিক্ষায় মাতৃভাষার অপরিহার্যতা। ইংরেজ-প্রবর্তিত শিক্ষাকে এই প্রবন্ধে তিনি বলেছেন- 'মানসিকশক্তি-হ্রাস-কারী নিরানন্দ শিক্ষা'।[৫১] নিম্নে এ প্রবন্ধের মূল বক্তব্য সংক্ষেপে সূত্রাকারে উল্লেখ করা যায়।[৫২] তিনি লিখেছেন:

১. ইংরেজি আমাদের কাজের ভাষা, ভাবের ভাষা নয়। প্রচলিত শিক্ষায় ইংরেজি ভাষার চর্চায় ভাবের চর্চা হয় না, ভাবের সঙ্গে ভাষার মিল হয় না।
২. এই ব্যবস্থায় আমাদের জীবনের মাহেন্দ্রক্ষণ ইংরেজি ভাষা শিক্ষার চেষ্টায় কেটে যায়।
৩. এই শিক্ষার সঙ্গে জীবনের যোগ হয় না। এ শিক্ষা চিরকাল পোষাকী অর্থাৎ বাইরের ব্যাপার হয়ে থাকে।
৪. এ শিক্ষা কেরানি-তৈরির শিক্ষা, মানুষ তৈরির শিক্ষা নয়।
৫. এ শিক্ষা-বিধিতে আনন্দের স্থান নেই। এতে গ্রহণশক্তি, ধারণশক্তি ও চিন্তাশক্তির স্বাভাবিক বললাভ ঘটে না।
৬. এ শিক্ষায় কল্পনাবৃত্তির স্ফুর্তি হয় না, শুধু স্মরণশক্তিরই চর্চা হয়।

সেকালের কালের পণ্ডিত মনীষীদের অনেকেই রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লিখে এ প্রবন্ধের প্রশংসা করেন । সেই সঙ্গে 'প্রতি ছত্রে আপনার সঙ্গে আমার মতের ঐক্য আছে' বলে তাঁর মতের পক্ষে সমর্থন দান করেন।[৫৩] তাঁদের সমর্থন পত্রের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ' তিনখানি পত্র' নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। এতে তিনি বাংলা ভাষায় শিক্ষা বিস্তারে সাধারণ মানুষের কল্যাণ ও জাতীয় উন্নতির গুরুত্ব তুলে ধরেন। বিষয়টি বোঝানোর জন্য তিনি এদেশে বিভিন্ন সময় নানা ভাষা ভাষি জাতি ও শাসকদেও শাসন শোষনের ঐতিহাসিকতা নির্দেশ করে তাঁদের অস্তিত্ব বিলীন হওয়ার বিসয়টি ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর ভাষায়:

> দেশের অধিকাংশ লোকের শিক্ষার উপর যদি দেশের উন্নতি নির্ভর করে, এবং সেই শিক্ষার গভীরতা ও স্থায়িত্বের উপর যদি উন্নতির স্থায়িত্ব নির্ভর করে, তবে মাতৃভাষা ছাড়া যে আর কোনও গতি নাই, এ-কথা কেহ না বুঝিলে হাল ছাড়িয়া দিতে হয়।...রাজা কত আসিতেছে কত যাইতেছে; পাঠান গেল, মোগল গেল, ইংরেজ আসিল আবার কালক্রমে ইংরেজও যাইবে, কিন্তু ভাষা সেই বাংলাই চলিয়া আসিতেছে এবং বাংলাই চলিবে; যাহা কিছু বাংলায় থাকিবে তাহাই যথার্থ থাকিবে এবং চিরকাল থাকিবে। ইংরেজ যদি কাল চলিয়া যায় তবে পরশ্ব ওই বড়ো বড়ো বিদ্যালয়গুলি বড়ো বড়ো সৌধবুদ্ধুদের মতো প্রতীয়মান হইবে।...ভালোরূপ নজর করিয়া দেখিলে আজও ওগুলোকে বুদ্ধুদ বলিয়া বোঝা যায়। উহারা আমাদের বৃহৎ লোকপ্রবাহের মধ্যে অত্যন্ত লঘুভাবে অতিশয় অল্প স্থান অধিকার করিয়া আছে। প্রবাহের গভীর তলদেশে উহাদের কোনও মূল নাই। তীরে বসিয়া ফেনের আধিক্য দেখিলে ভ্রম হয় তবে বুঝি আগাগোড়া এইরূপপ ধবলাকার, একটু অন্তরে অবগাহন করিলেই দেখা যায় সেখানে সেই স্নিগ্ধ শীতল চিরকালের নীলাম্বুধারা।...শিক্ষা যদি সেই তলদেশে প্রবেশ না করে, জীবন্ত মাতৃভাষার মধ্যে বিগলিত হইয় চিরস্থায়িত্ব লাভ না করে, তবে সমাজের উপরিভাগে যতই অবিশ্রাম নৃত্য করুক এই ফেনাইয়া উঠুক তাহা ক্ষণিক শোভার কারণ হইতে পারে, চিরন্তন জীবনের উৎস হইতে পারে না।[৫৪]

এভাবে একের পর এক প্রবন্ধ লিখে রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষায় শিক্ষা বিস্তারের পক্ষে নিজের যুক্তি ও মতামত তুলে ধরেছেন। স্বদেশের জন্য কল্যাণকর নতুন শিক্ষানীতি, শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষা পদ্ধতি নিয়ে তিনি সারাজীবন

Dhaka University Institutional Repository

ভেবেছেন এবং তা বাস্তবায়নের জন্য আত্মনিয়োগ করেছেন। মাতৃভাষায় শিক্ষা বিস্তারের বিষয়টি তাঁর রচনার একটা বড় অংশ জুড়ে সমোজ্জ্বল হয়ে আছে। বাংলা ভাষায় বাঙালির শিক্ষা নিয়ে তিনিই সবচেয়ে বেশি প্রবন্ধ লিখেছেন, ভাষণ দিয়েছেন, পত্র লিখেছেন, আলোচনা করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর অসামান্য শক্তি ছিল, পূর্বসুরীদের শিক্ষাচিন্তার সারবত্তা অনুধাবন করে মাতৃভাষায় বাঙালির মধ্যে প্রকৃত শিক্ষা ছড়িয়ে দিবার। তাঁর সৃষ্টিকর্মের নানা স্থানে শিক্ষা প্রসঙ্গে বহুমূল্য মতামত ব্যাপ্ত হয়ে আছে। এ কারণে তাঁর শিক্ষামূলক রচনার সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করা কঠিন।[৫৫]

৫

শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য চর্চার পাশাপাশি বাঙালির শিক্ষা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করেছেন। তাঁর সেই ভাবনায় কবিত্বের আবেগ ছিল না, ছিল যুক্তি-দর্শন ও বাস্তব অভিজ্ঞতার মেল বন্ধন। ফলে তা মোটেও লক্ষ্যহীন ছিল না। প্রদীপ জ্বালানোর আগে সলতা পাকানোর প্রস্তুতির কথা তিনি যে শুধু বলেছেন তা নয়, নিজে তার প্রমাণও দিয়েছেন। বাঙালির শিক্ষা চিন্তায় আত্মনিয়োগের পুর্বে এর একটা লক্ষ্য স্থির করেই তিনি অভিষ্ট গন্তব্যের অভিমুখে অগ্রসর হয়েছেন। শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর লেখা থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে আত্মশক্তির উদ্‌বোধন। তাঁর ধারনা মতে, শিক্ষা শুধু বৈষয়িক সিদ্ধির জন্য নয়, শিক্ষা অন্তরের ঐশ্বর্য। শিক্ষার লক্ষ্য ইন্দ্রিয়মনের তৎপরতা; জীবনীশক্তি, মননশক্তি ও কর্মশক্তির বিকাশ। শিক্ষার লক্ষ্য মানুষকে কর্মিষ্ঠ ও বলিষ্ঠ করে তোলা। শিক্ষার লক্ষ্য নিছক উপকরণবান হওয়া নয়, সর্বপ্রকার সামর্থবান হওয়া। তিনি শিক্ষার এমন লক্ষ্য স্থির করেছিলেন তখনকার ঔপনেবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থা এবং প্রচলিত শিক্ষাব্যাবস্থার কারণে। এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে,'আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় দেশের জনসাধারণের সঙ্গে শিক্ষিতের যোগ নেই, শিক্ষিতের একতলা ও দোতলার মধ্যে সিঁড়ি নেই। এ হল ব্যাপক ভূমিকা–ভ্রষ্ট শিক্ষা ব্যবস্থা।'[৫৬] প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক বিকাশ হয় না । ফলে সেই অবস্থা থেকে বের হয়ে আসার প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা সম্বলিত শিক্ষাব্যবস্থার কথা ভাবেন তিনি। তাঁর শিক্ষার লক্ষ্য ছিল–স্বাধীন চিন্তাশক্তি ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ সাধন করে মানুষের দৈহিক মানসিক ও নৈতিকতার উন্নয়ন ঘটিয়ে সামাজিক গুণাবলি অর্জনে সহায়তা করা।

শিক্ষার্থীর মনে কৌতুহল ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি জাগ্রত করা শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করতেন। শিক্ষার্থীর দৈহিক বিকাশ যাতে স্বাভাবিকভাবে হয়, সে-দিকে শিক্ষার লক্ষ্য থাকা উচিত বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল পরমসত্তাকে উপলব্ধির মাধ্যমে মনুষ্যত্ব অর্জন করা। শৈশব থেকেই শিক্ষার্থীকে ভ্রাতৃত্ববোধ ও সামাজিকতা শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি তাঁর শিক্ষাচিন্তায় বেশি জোর দিয়েছেন। ব্যক্তিত্ব ও আত্মচেতনা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক চেতনার বিকাশ তাঁর শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য ছিল। তিনি জ্ঞান অর্জনের জন্য এবং বিকাশের জন্য শিক্ষার্থীকে উন্মুক্ত করার কথা বলেছেন। তাঁর শিক্ষার লক্ষ্য ছিল মানুষকে মনুষ্যত্ব সম্পন্ন করে তাকে সবদিক থেকে পরিপূর্ণ মানুষ করে তোলা। তিনি লিখেছেন:

> .....আমি জানি অনেকের মত এই যে, লেখাপড়া শিখাইবার জন্য ঘর হইতে ছাত্রদিগকে দূরে পাঠানো তাহাদের পক্ষে হিতকর নহে। এ সম্বন্ধে প্রথম বক্তব্য কথা এই যে, লেখাপড়া শেখানো বলিতে আমরা আজকাল যাহা বুঝি তাহার জন্য বাড়ির গলির কাছে যে-কোনো একটা সুবিধামত ইস্কুল এবং তাহার সঙ্গে বড়ো জোর একটা প্রাইভেট টিউটার রাখিলেই যথেষ্ট। কিন্তু এইরূপে 'লেখাপড়া করে যেই গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই' শিক্ষার দীনতা ও কার্পণ্য মানবসন্তানের পক্ষে যে অযোগ্য তাহা আমি একপ্রকার ব্যক্ত করিয়াছি। দ্বিতীয় কথা এই শিক্ষার জন্য বালকদিগকে ঘর হইতে দূরে পাঠানো উচিত নহে, এ কথা মানিতে পারি যদি ঘর তেমনি ঘর হয়। কামার কুমার তাঁতি প্রভৃতি শিল্পিগণ ছেলেদিগকে নিজের কাছে রাখিয়াই মানুষ করে-তাহার কারণ, তাহারা যেটুকু শিক্ষা দিতে চায় তাহা ঘরে রাখিয়াই ভালোরূপে চলিতে পারে। শিক্ষার আদর্শ আর-একটু উন্নত হইলে ইস্কুলে পাঠাইতে হয়-তখন এ কথা কেহ বলে না যে বাপ-মায়ের কাছে শেখানোই সর্বাপেক্ষা শ্রেয়; কেননা, নানা কারণে তাহা সম্ভবপর হয় না। শিক্ষার আদর্শকে আরও যদি উচ্চে তুলিতে

Dhaka University Institutional Repository

> পারি, যদি কেবল পরীক্ষাফললোলুপ পুঁথির শিক্ষার দিকেই না তাকাইয়া থাকি, যদি সর্বাঙ্গীন মনুষ্যত্বেও ভিত্তিস্থাপনকেই শিক্ষার লক্ষ্য বলিয়া স্থির করি তবে তাহার ব্যবস্থা ঘরে এবং ইস্কুলে করা সম্ভবই হয় না।[৫৭]

পৃথিবীতে জ্ঞান–বিজ্ঞান চর্চা করে ইউরোপ কীভাবে সমস্ত পৃথিবীতে গুরুর আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথ তা ব্যাখ্যা করে আমাদেরকে জ্ঞানে–বিজ্ঞানে এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করেছেন। কোনো ব্যক্তি বা জাতি কীভাবে মর্যাদার আসন লাভ কওে তিনি আমাদের তা বুঝিয়ে দিয়েছেন। তা কোনো গায়ের জোরে নয়, একান্তই বুদ্ধিবলে, পৃথিবীর নানা বিষয়ে খোঁজ–খবর রেখে। আর এ ক্ষেত্রে কাজ করেছে তাঁদের জানার, বড় হওয়ার এবং গৌরব অর্জন করার আকাঙ্খা । কারণ অকাঙ্খা প্রবল এবং বৃহৎ না হলে অর্জন বড় হয় না। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

> মানুষের যে বাসনা ক্ষুদ্র স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে, সেটাকে বড় করে তুলে মানুষ বড় হয় না, ছোটই হয়ে যায়; সে যেন খাঁচার ভিতরে পাখীর ওড়া, তাতে পাখার সর্থকতা হয় না। কিন্তু জ্ঞানের জন্যে আকাঙ্খা, প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে আবিষ্কার করে' তাকে মানুষের অধিকারে আনবার জন্যে আকাঙ্খা যাতে মানুষ মরুকে জয় করে ফসল পায়, রোগকে জয় করে স্বাস্থ্য পায়, দূরত্বকে জয় করে নিজের গতিপথ অবারিত করে-তাতেই মানুষের মনুষ্যত্ব প্রকাশ পায়, তাতেই প্রমাণ হয় যে মানুষের জাগ্রত আত্মা পরাভবকে বিশ্বাস করে না; কোনো অভাব দুঃখ দুর্গতিকেই সে অদৃষ্টের হাতের চরম মার মনে করে মাথা পেতে নিতে অপমান বোধ করে; সে জানে যে তার দুঃখমোচন তার নিজেরই হাতে, তার অধিকার প্রভুত্বের অধিকার। য়ুরোপ এমনি করে আপন আকাঙ্ক্ষার পাখা বড় করে মেলতে পেরেছে বলেই, আজ পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে শিক্ষা দেবার অধিকার সে পেয়েছে। সেই শিক্ষাকে আমরা যদি পুঁথির বুলি শিক্ষা, কতকগুলি বিষয় শিক্ষা বলে ক্ষুদ্র করে দেখি তাহলে নিজেকে বঞ্চিত করলুম। মনুষ্যত্বের শিক্ষাটাই চরমশিক্ষা, আর সমস্তই তার অধীনে। এই মনুষ্যত্ব হচ্ছে আকাঙ্ক্ষার ঔদার্য; আকাঙ্ক্ষার দুঃসাধ্য অধ্যবসায়, মহৎ সঙ্কল্পের দুর্জয়তা।[৫৮]

৬

শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষা

রবীন্দ্রনাথ জানতেন যে. মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভ না হলে শিক্ষায় পরিপূর্ণতা আসে না। এ কারণেই তিনি বাঙালির শিক্ষা পরিকল্পনায় মাতৃভাষাকে আশ্রয় করেছিলেন। তাঁর দীর্ঘ জীবনে তিনি স্বজাতির উন্নতি ও মুক্তির জন্য স্বদেশি ভাষাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন –'শিক্ষায় মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধ' আমরা সেই মাতৃদুগ্ধ থেকে বঞ্চিত, অথচ শিক্ষায় সকল খাদ্য ঐ ভাষার রসায়নে আমাদের আপন খাদ্য হয়।[৫৯] শিক্ষা মাধ্যম হিসেবে তিনি মাতৃভাষা বাংলাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এ ক্ষেত্রে তিনি নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা মাতৃভাষার মাধ্যমে গড়ে উঠেছিল। তাই তিনি বাংলা ভাষার প্রাণ স্পন্দনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে তা গভীরভাবে আয়ত্ব করতে পেরেছিলেন। 'জীবন স্মৃতিতে তিনি স্বীকার করেছেন যে, এজন্যই এই ভাষা তাঁর কাছে প্রাণময় ও আনন্দময় হয়েছিল। তিনি লিখেছেন:

> বাহির হইতে দেখিলে আমাদের পরিবারে অনেক বিদেশী প্রথার চলন ছিল, কিন্তু আমাদের পরিবারের হৃদয়ের মধ্যে একটা স্বদেশভিমান স্থির দীপ্তিতে জাগিতেছিল। স্বদেশের প্রতি পিতৃদেবের যে একটি আন্তরিক শ্রদ্ধা তাঁহার জীবনের সকল প্রকার বিপ্লবের মধ্যে অক্ষুন্ন ছিল, তাহাই আমাদের পরিবারস্থ সকলের মধ্যে একটি প্রবল স্বদেশপ্রেম সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছিল। বস্তুত, সে সময়টা স্বদেশপ্রেমের সময় নয়। তখন শিক্ষিত লোকে দেশের ভাষা এবং দেশের ভাব উভয়কেই দুরে ঠেকাইয়া রাখিয়াছিলেন। আমাদের বাড়িতে দাদারা চিরকাল মাতৃভাষার চর্চা করিয়া আসিয়াছেন। আমার পিতাকে তাঁহার কোনো নতুন আত্মীয় ইংরাজিতে পত্র লিখিয়াছিলেন, সে পত্র লেখকের নিকটে তখনই ফিরিয়া আসিয়াছিল।.....ছেলেবেলায় বাংলা পড়িতেছিলাম বলিয়াই সমস্ত মনটার চালনা সম্ভব হইয়াছিল। শিক্ষা জিনিষটা যথাসম্ভব আহার-ব্যাপারের মতো হওয়া উচিত। খাদ্যদ্রব্যে প্রথম কামড়টা দিবামাত্রেই তাহার স্বাদের সুখ আরম্ভ হয়, পেট ভরিবার পূর্ব হইতেই পেটটি খুশি হইয়া জাগিয়া উঠে- তাহাতে তাহার জারক রসগুলির আলস্য দুর হইয়া যায়। বাঙালির পক্ষে ইংরেজি শিক্ষায় এটি হইবার জো নাই। তাহার প্রথম কামড়েই দুই পাটি দাঁত আগাগোড়া নড়িয়া উঠে- মুখ বিবরের মধ্যে একটা ছোটখাটো ভুমিকম্পের অবতারণা হয়। তারপরে, সেটা যে লোষ্ট্রজাতীয় পদার্থ নহে, সেটা যে রসে পাক করা মোদকবস্তু, তাহা বুঝিতে বুঝিতেই বয়স অর্ধেক পার হইয়া যায়। বানানে ব্যাকরণে বিষম লাগিয়া নাক চোখ দিয়া যখন অজস্র জলধারা বহিয়া যাইতেছে, অন্তরটা তখন একেবারেই

> উপবাসী হইয়া আছে। অবশেষে বহু কষ্টে অনেক দেরীতে খাবারের সঙ্গে যখন পরিচয় ঘটে তখন ক্ষুধাটাই যায় মরিয়া। প্রথম হইতেই মনটাকে চালনা করিবার সুযোগ না পাইলে মনের চলৎশিক্তেই মন্দা পড়িয়া যায়। যখন চারিদিকে খুব করিয়া ইংরেজি পড়াইবার ধুম পড়িয়া গিয়াছে, তখন যিনি নসাহস করিয়া আমাদিগকে দীর্ঘকাল বাংলা শিখাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, সেই আমার স্বর্গত সেজদাদার উদ্দেশ্যে সকৃতজ্ঞ প্রণাম নিবেদন করিতেছি।[৬০]

রবীরন্দ্রনাথ বাংলা ভাষায় পথ ভূগোল, ইতিহাস, গণিত, প্রাকৃত বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন। জীবন স্মৃতিতে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, বার বছর বয়স পর্যন্ত তাঁর ইংরেজি বর্জিত শিক্ষা চলছিল। যার ফলে ছেলেবেলা থেকেই তিনি বাংলা ভাষায় প্রবেশাধিকার লাভ করেছিলেন। এ কারণেই তিনি ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার গলদ সহজে ধরতে পেরেছিলেন। তিনি তাঁদের কৃত্রিম ও যান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থার কঠোর সমালোচনা করেছেন। রবীরন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তায় ভাষা মাধ্যম বিবেচনার অন্যতম প্রধান বিষয় হল শিক্ষায় মাতৃভাষার স্থান, শিক্ষাবিস্তারে মাতৃভাষার অপরিহার্যতা। কারণ মাতৃভাষার সঙ্গে আমাদের প্রাণের যে যোগ, তা অন্য কোনো ভাষায় হবার নয়। তিনি লিখেছেন–'আমাদের দেশের নালন্দা তক্ষশিলা প্রমূখ প্রাচীন কালের বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে দেশের চিত্তের যোগ ছিল। আমাদের বর্তমান কালের বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই যোগ নেই। তাই তার বিদ্যা দেশের সর্বসাধারেণ মধ্যে ব্যাপ্ত হয় না। এর প্রধান বাধা ভাষা-ইংরেজি ভাষা।[৬১] বিদেশি শিক্ষারবিধিকে তিনি রেলকামরার প্রদীপের সঙ্গে তুলনা করেছেন। দূর থেকে সেই প্রদীপের আলো চোখে পড়ে, কিন্তু নগর আলোকিত হয় না। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

> এই বিদেশী শিক্ষাবিধি রেলকামরার দীপের মতো। কামরাটা উজ্জ্বল, কিন্তু যে যোজন যোজন পথ গাড়ি চলছে ছুটে সেটা অন্ধকারে লুপ্ত। কারাখানার গাড়িটাই যেন সত্য, আরা প্রাণবেদনায় পূর্ণ সমস্ত দেশটাই যেন অবাস্তব।
>
> শহরবাসী একদল মানুষ এই সুযোগে শিক্ষা পেলে, মান পলে, অর্থ পেলে; তারাই হল এনলাইটেন্‌ড্‌, আলোকিত। সেই আলোর পিছনে বাকি দেশটাতে লাগল পূর্ণ গ্রহণ। ...দেশের বুকে এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে এত বড় বিচ্ছেদেও ছুরি আর-কোনোদিন চালানো হয় নি, সে কথা মনে রাখতে হবে।[৬২]

রবীন্দ্রনাথ মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করে পূর্ববর্তী এবং সমকালীন ঘটনা প্রবাহের বিচার করে মানবতাবোধ ও সর্বভারতীয় সমন্বয় সাধন করতে চেয়েছেন। তিনি ভারতীয় শিক্ষার্থীদের ভারতীয় পরিচয়কে প্রধান করে তুলতে অনুপ্রাণিত করেছেন। তিনি ইউরোপীয় আদর্শের বিশ্ববিদ্যালয়কে গুরুত্ব দেননি। তার কারণ শিক্ষার শেকড় দেশের মর্মমূলেই নিহিত থাকে। আর শিক্ষা সে পথেই বিকাশ লাভ করে। সেকালে ভারতবর্ষ 'ব্রিটিশ শিক্ষাপদ্ধতিকে স্থির বা ধ্রুব' বলে ধরে নিয়েছিল। শিক্ষা যে 'চলমান পরিবর্তমান সত্য',সে কথা তাঁরা ভুলে গিয়েছিল। কিংবা তা তাঁদের উপলব্ধিতে আসেনি। রবীন্দ্রনাথ তাঁদেও সেই ভুল ধরিয়ে দিয়ে সেই অবস্থা দূর হওয়া প্রয়োজন বলে মত দিয়েছিলেন। তিনি যুক্তি দেখিয়ে বলেছিলন যে, সংস্কৃতিই ব্যক্তিজীবনকে নানা মাত্রায় সমৃদ্ধ করতে পারে। এই প্রেক্ষাপটেই নালন্দা ও তক্ষশীলা বিশ্বাবিদ্যালয়কে তিনি ভারতীয় শিক্ষার আদর্শ বলে উল্লেখ করেছেন এবং ভারতীয় নিজস্ব ভাষাগুলির উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ মাতৃভাষার মাধ্যমেই ব্যক্তি সবকিছু ভালভাবে চিন্তা করতে এবং সৃজনশীল হয়ে উঠতে পারে।। তিনি ভেবেছেন অন্য জাতি বা গোষ্ঠীর সঙ্গেও তাদের সংযোগ সাধিত হবে। কিন্তু ভারতীয়দের মধ্যে স্বাজাত্যবোধ জাগানোর জন্যই নিজের চিরচেনা মাতৃভাষায় শিক্ষার ভার তাঁদের নিজেদের হাতে তুলে নিতে হবে। তিনি লিখেছেন:

> বিদেশী শিক্ষাধিকারের হাত হইতে স্বজাতিকে মুক্তি দিতে হইলে শিক্ষার ভার আমাদের নিজের হাতে লইতে হইবে এবং যাহাতে শিশুকাল হইতে ছেলেরা স্বদেশীয় ভাবে স্বদেশী প্রণালীতে, স্বদেশের সহিত হৃদয়মনের যোগ রক্ষা করিয়া স্বদেশের বায়ু ও আলোক প্রবেশের দ্বার উন্মুক্ত রাখিয়া শিক্ষা পাইতে পারে, তাহার জন্য আমাদিগতে একান্ত প্রযত্নে চেষ্টা করিতে হইবে।[৬৩]

Dhaka University Institutional Repository

মাতৃভাষায় শিক্ষা বিকাশের অন্তরায়

রবীন্দ্রনাথের সুপরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল ইংরেজ-প্রবর্তিত ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা। যা প্রায় একশ' বছর ধরে এদেশের স্কুল-কলেজে শিক্ষা চালু আছে, সেই ব্যবস্থা। এই প্রচলিত ইংরেজি শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধেই রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য। এর বিরুদ্ধে তাঁর অনেক আপত্তি ছিল। তাঁর বিশেষ অভিযোগগুলি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রধান আপত্তি ছিল তিনটি।[৬৪] তিনি বলেছিলেন:

১. ঔপনিবেশিক শিক্ষার পেছনে কোনো সুচিন্তিত কেন, কোনোরকম শিক্ষাতত্ত্বই নেই। অর্থাৎ শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে কোনো চিন্তা নেই, তদানুযায়ী কোনো পরিকল্পনা নেই। বরং বলা যায়, কুপরিকল্পনা আছে-সে হল শিক্ষা দিয়ে মানুষকে কেরানিতে পরিণত করা, ঔপনিবেশিক প্রভুশক্তির ক্রীতদাসে পরিণত করা। ফলে, সৃজনশীলতা, মুক্তি ও আনন্দ, শিক্ষার যা অপরিহার্য ভিত্তি, এ শিক্ষায় তা সম্পূর্ণ অবহেলিত। এক কথায়, এ শিক্ষা শিক্ষাই নয়, এ হল এক ধরনের বিষক্রিয়া।

২. এ শিক্ষার দাঁড়াবার কোনো ভুমি নেই। ঐতিহ্যের সঙ্গে, জাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে- দেশের চিত্তের সঙ্গে এ শিক্ষার কোনো যোগ নেই। অর্থাৎ এ শিক্ষা ভারতবাসীর পক্ষে সত্য নয়।

৩. আপাতদৃষ্টিতে আধুনিক হলেও, আধুনিকাতর বাইরের খোলসটাই এ লক্ষ্য, আধুনিকতার মর্মসত্যের সঙ্গে এর কোনো যোগ নেই। তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে, কালের প্রবাহের সঙ্গে, ইতিহাসের সত্যের সঙ্গে এই ঔপনিবেশিক কেরানি-তৈরির শিক্ষাব্যবস্থার অন্তরের কোনো যোগ থাকা সম্ভব নয়।

এই তিনটি তত্ত্বগত আপত্তি ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার আরো তিনটি বাস্তব ও ঐতিহাসিক সমস্যার কথা বলেছিলেন।[৬৫] তাঁদের সেই শিক্ষাবিধির মারাত্মক বিপদ প্রসঙ্গে তিনি বার বার বাঙালিকে সতর্ক করেছিলেন। তিনি বলেছেন:

১. শিক্ষার বিষয়বস্তু যা-ই হোক না কেন, শিক্ষা মাতৃভাষায় না হওয়ার ফলে, একটি সম্পূর্ণ বিজাতীয় ভাষার মাধ্যমে হওয়ার ফলে, সাধারণভাবে এ শিক্ষা আমাদের অন্তরে প্রবেশ করে না। এ শিক্ষা সম্পূর্ণ শূন্যগর্ভ-অনেকটা খোলসের মতো, জীবিকার ক্ষেত্রে তা আমাদের অঙ্গে থাকে বটে, কিন্তু অন্তরঙ্গ জীবনে তার কোনো ক্রিয়া থাকে না। বিজ্ঞানশিক্ষাতেও তাই, বিজ্ঞান আমাদের জীবনে প্রবেশ করে না। ফলে যাঁরা সুশিক্ষিত বলে গণ্য, তাঁদেরও জীবনদৃষ্টি সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক থেকে যায়। সোজা কথায়, এ শিক্ষা আমাদের বাইরের চাক্‌চিক্য দিলেও প্রকৃতপক্ষে অশিক্ষিতই রেখে দেয়।

২. এ শিক্ষা দেশের মানুষকে তথাকথিত শিক্ষিত ও অশিক্ষিত এই দুই ভাগে, বস্তুত দুই স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত করে। এতে তথাকথিত শিক্ষিত শ্রেণী দেশ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। নিজেদের শ্রেণীর বাইরে তাদের দৃষ্টি যায় না। এতে দেশের মধ্যে শাসক ও শাসিত এই দুই জাতির জন্ম হয়।

৩. এ শিক্ষা অত্যন্ত সংকীর্ণ গন্ডীতে সীমাবদ্ধ। এর মধ্যে জনশিক্ষার কোনো ব্যবস্থা নেই, শিক্ষার বিকিরণের কোনো পথ নেই। এর মাধ্যমে ইংরেজি বলে, অল্প-সংখ্যক শহুরে সংগতিপন্ন লোকই এই শিক্ষা পেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষায় শিক্ষাবিস্তারের যে চিন্তা করেছিলেন তা এখনো পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করেনি। এর প্রধান কারণ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার পাশ্চাত্যধর্মী প্রবনতা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবৎকালে শিক্ষা সম্পর্কে বহু সমস্যার সম্মুখিন হয়েছিলেন। সেগুলোর মধ্যে-শিক্ষককেন্দ্রিক শিক্ষা, শিক্ষায় প্রকৃতির অনুপস্থিতি, ভাল পাঠ্যপুস্তকের অপ্রতুলতা, উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব, যথার্থ শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলার প্রতি অনীহা, ডিগ্রিনির্ভর শিক্ষা প্রভৃতি। এ সমস্যাগুলো এখনো দূর করা যায়নি। কী কারণে এসব সমস্যা এখনো অমীমাংসিত রয়ে গেছে তার জবাব আমরা রবীন্দ্রনাথের চিন্তা থেকেই পাই। তিনি ১৯১৯ সালের ১০ ডিসেম্বর প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে এক পত্রে লিখেছেন:

> মানবপ্রাণের সংস্রববর্জ্জিত শিক্ষা আমাদের চিত্তে প্রাণঞ্চারের কাজ করছেনা, কেবল কতকগুলো খবর জমা করছে সেইজন্যে শিক্ষা সঙ্গে আমাদের জ্ঞানের দীক্ষা হচ্ছে না। সেই জন্যে কেবলি মানুষের সঙ্গে মিলিয়ে সজীব শিক্ষাবিধির ব্যবস্থা অতি সত্বর করা চাই। .....যে শিক্ষা আজ আমাদের নেশন গড়ে তোলবার জন্যে একদিকে তাগিদ করছে সেই শিক্ষাই আর একদিকে অত্যন্ত পুঁথিগত হওয়ায় মানুষের থেকে আমাদের মনকে সরিয়ে রেখে দিয়েছে। এখানেও শুধু মানুষ নয়, প্রকৃতিও আমাদের কাছে অস্পৃশ্য মনে হল। আমি সেই

Dhaka University Institutional Repository

> জন্যে ছেলেগুলোকে নিয়ে ভারতে লোকালয়ে এবং দেশে বিদেশে খুব করে আলোড়ন করে বেড়াতে চাই- তাদের মন যাতে বাল্যকাল থেকে স্তরে স্তরে লোকপরিচয়ে বিশ্বপরিচয়ে অভ্যস্ত হয়ে যায়।[৬৬]

রবীন্দ্রনাথ এই সময় লক্ষ করেছেন যে ভারতীয় সমাজে গুরুকেন্দ্রিকশিক্ষা প্রচলিত ছিল। সেকালে শিক্ষণীয় বিষয় কম থাকলেও সমাজ ও প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত করে একধরনের সমন্বিত শিক্ষা প্রদান করা হতো। তাতে সামাজিক প্রয়োজনের দিকটি বেশি গুরুত্ব পেত। প্রাচীন ভারতীয় সেই শিক্ষায় রবীন্দ্রনাথ প্রত্যাবর্তন করেননি। তবে সেই শিক্ষার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি সমকালের শিক্ষার চাহিদাকে প্রাধান্য দিয়েছেলেন। এর পেছনে তিনটি প্রধান বিষয় কাজ করেছে–এক.শিক্ষার্থীদের চিত্তবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ সাধন, দুই.বাইরের বিশৃঙ্খলা থেকে শিক্ষার্থীদের মনকে সরিয়ে রাখা, তিন. শিক্ষার্থীদের কাছে শিক্ষাক্রম যাতে অবাস্তব, অনাবশ্যক মনে না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা। রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষায় শিক্ষার প্রতিবন্ধকতার নানা কারণ চিহ্নিত করেছেন। প্রয়োজন অপেক্ষা অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে আমাদের বেশি মনোযোগের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন:

> পায়ের তেলোটি এমন করিয়া তৈরি হইয়াছিল যে, খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া পৃথিবীতে চলিবার পক্ষে এমন ব্যবস্থা আর হইতে পারে না। যে দিন হইতে জুতা পরিতে শুরু করিলাম সেই দিন হইতে তেলোকে মাটির সংস্রব হইতে বাঁচাইয়া তাহার প্রয়োজনকেই মাটি করিয়া দেওয়া গেল।... এইরূপে বিশ্বজগৎ এবং আমাদের স্বাধীন শক্তির মাঝখানে আমরা সুবিধার প্রলোভনে অনেকগুলা বেড়া তুলিয়া দিয়াছি। এইরূপে সংস্কার ও অভ্যাসক্রমে সেই কৃত্রিম আশ্রয়গুলাকেই আমরা সুবিধা এবং নিজের স্বাভাবিক শক্তিগুলিকেই অসুবিধা বলিয়া জানিয়াছি। কাপড় পরিয়া পরিয়া এমনি করিয়া তুলিয়াছি যে, কাপড়টাকে নিজের চামড়ার চেয়ে বড়ো করা হইয়াছে। এখন আমরা বিধাতার সৃষ্ট আমাদের এই আশ্চর্য সুন্দর অনাবৃত শরীরকে অবজ্ঞা করি।....মাটি জল বাতাস আলোর সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগ না থাকিলে শরীরের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। শীতে গ্রীষ্মে কোনো কালে আমাদের মুখটা ঢাকা থাকে না, তাই আমাদের আমাদের মুখের চামড়া দেহের চাড়ারার চেয়ে বেশি শিক্ষিত; অর্থাৎ, বাহিরের সঙ্গে কী করিয়া আপনার সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে হয় তাহা সে ঠিক জানে। সে আপনাতেই আপনি সম্পূর্ণ; তাহাকে কৃত্রিম আশ্রয় প্রায় লইতে হয় না।.....অবশ্য ভদ্রসমাজে কাপড়চোপড় জুতামোজার একটা প্রয়োজন আছে বলিয়াই হইাদের সৃষ্টি হইয়াছে; কিন্তু এই-সকল কৃত্রিম সহায়কে প্রভু করিয়া তুলিয়া তাহার কাছে নিজেকে কুণ্ঠিত করিয়া রাখা সংগত নয়।[৬৭]

৮

শিক্ষা পরিকল্পনা ও বিধি-পদ্ধতি

ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে প্রতিযোগীতা করে টিকে থাকার ক্ষমতা দেশজ শিক্ষাব্যবস্থার ছিল না। ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই দেশজ সাবেকী টোল-চতুষ্পাঠী শিক্ষাব্যবস্থার ভাঙন শুরু হয়। রবীন্দ্রনাথের যৌবনে সাবেকী ব্যবস্থা প্রায় ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়ায়। ওয়ার্ড, উইলসন, এ্যাডাম প্রমুখের রিপোর্ট থেকে জানা যায়, উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে ৬৫ বছরের মধ্যে নবদ্বীপে টোলের সংখ্যা কমে ৩১ থেকে ১৩- তে এবং ছাত্রের সংখ্যা কমে সাড়ে সাত শ' থেকে একশ'তে নেমে এসেছিল। কাজেই বিশ শতকের গোড়ায় রবীন্দ্রনাথ যখন বিদ্যালয় স্থাপনের কথা ভাবছেন, ততদিনে টোল-চতুষ্পাঠীর সংখ্যা ও শিক্ষা ইংরেজি শিক্ষার সঙ্গে গণনীয় পর্যায়েও ছির না। রবীন্দনাথ তাঁর শিক্ষাচিন্তার মতো করে যখন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হলেন তখন তাঁর সামনে শিক্ষার উল্লিখিত দুটি বিকল্প আদর্শই বিদ্যমান ছিল। একটি দেশজ পুরানো মডেল, অন্যটি ইংরেজ-প্রবর্তিত শিক্ষাবিধির মডেল। রবীন্দ্রনাথ এ দুটির কোনটিকেই তাঁর বিদ্যালয়ের জন্য আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেননি। তিনি প্রচলিত সাবেকী শিক্ষাবিধির টোল-চতুষ্পাঠী এবং মক্তব-মাদ্রাসার মডেল পরিহার করলেন পরানো বলে আর ইংরেজিকে পরিহার করলেন বিজাতীয় অচেনা ভাষা ,তাতে আমাদের ভাবের যোগ নেই বলে। তিনি বাংলা ভাষায় শিক্ষাদানের জন্য এক তৃতীয় মডেলে তাঁর বিদ্যালয়কে গড়ে তুলতে চাইলেন। যথার্থ শিক্ষাবিধির মৌল শর্তগুলো পূরণ করে তিনি এমন শিক্ষাবিধি প্রবর্তন করলেন। শিক্ষার চরম লক্ষ্যের সঙ্গে জড়িত–কী শিখব, কেন শিখব, কী হতে চাই যে শিখব; কী হওয়াতে চাই যে শেখাব? –এসব বিষয় তিনি গভীরভাবে অনুধাবন করে বললেন–'আমরা কী হইব এবং আমরা কী শিখব, এই দুটা কথা একেবারে গায়ে গায়ে সংলগ্ন।'[৬৮]

Dhaka University Institutional Repository

মানবজীবনের সার্থকতা কোথায়, কোন্ শিক্ষা মানুষকে তার সার্থকতায় পৌঁছে দেয়, শিক্ষাতত্ত্বের এই বিষয়গুলো মৌল বিষয়। যথার্থ শিক্ষাবিধি হতে হলে এই তত্ত্বগত প্রশ্নগুলোর সদুত্তর থাকতে হয়। না হলে তাকে যথার্থ শিক্ষাবিধি বলা যায় না। বাকী শর্তদুটি এই মৌল তত্ত্বের সঙ্গে জড়িত। প্রথমটির যোগ জাতীয় অতীতের সঙ্গে, দ্বিতীয়টির যোগ সর্বজনীন ভবিষ্যতের সঙ্গে। প্রত্যেক দেশের যথার্থ শিক্ষাব্যবস্থাকে একই সঙ্গে দুটি অনমনীয় দাবির মুখোমুখি হতে হয়। তাকে নিজের দেশের জাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত হতে হয়, জাতীয় জীবনপ্রবাহের সঙ্গে মিলে থাকতে হয় । তা না হলে তাতে জীবনীশক্তি যেমন থাকে না, তেমনি সত্যতাও থাকে না। অন্যদিকে, সেই সঙ্গে তাঁকে কালের যুগসত্যের সঙ্গে যুক্ত থেকে মাবনসভ্যতার অগ্রগতির অভিযানের শরিক হতে হয়। তা না হলে সে নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে কালের গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তাকে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর কর্মপ্রয়াসকে বুঝতে হলে এ তিনটি শর্তের সতর্ক থাকতে হয়। তাঁর প্রথম শর্ত মনুষ্যত্বের শর্ত। সেই সঙ্গে স্ব-কাল ও ভাবীকালের দাবি পুরণ এবং জাতীয় ঐতিহ্যের দাবি ।

রবীন্দ্রনাথ নানা কারণে সাবেকী টোল-জাতীয় শিক্ষাবিধি এবং ইংরেজ প্রবর্তিত স্কুল-কলেজের প্রচলিত শিক্ষাবিধি, এ দুইয়েরই ঘোর বিরোধী ছিলেন। তত্ত্বগতত এবং ব্যবহারিক উভয় দিক থেকেই তাঁর এ বিরোধ ছিল আপোসহীন। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, আমাদের জাতীয় জীবনে সংকটের সব থেকে গোড়ার কারণ হল অশিক্ষা এবং তজ্জনিত অবুদ্ধি। আর এটাও তিনি বিশ্বাস করতেন যে,শিক্ষাই পারে আমাদের দেশের সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে। শিক্ষা নিয়ে তিনি যে আদৌ কোনোদিন কর্মক্ষেত্রে নামতে পারবেন, নিজস্ব শিক্ষাতত্ত্ব নিজস্ব শিক্ষাবিধি নিয়ে, নিজের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানকে অবলম্বন করে বৃহৎ একটি পরিকল্পনাকে সামনে রেখে তিনি যে অগ্রসর হতে পারবেন, এই সম্ভাবনা সেদিন মোটেই স্পষ্ট ছিল না। তবু তিনি নিজের আত্মশক্তির উপর ভর করে নতুন শিক্ষাচিন্তা নিয়ে সেকালের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। গান্ধীকে তিনিই প্রথম 'মহাত্মা' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। গান্ধী প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় এবং রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয়ের মধ্যেও অনেক মিল দেখতে পাওয়া যায়। দু'জনেই ভারতের প্রয়োজনের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর বলে ইংরেজি শিক্ষার আদর্শকে অগ্রাহ্য করেছেন, গুরুত্ব দিয়েছেন দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার উপর।

এই দেশীয় শিক্ষার মূল কথা হলো, তাঁদের মতে-মাতৃভাষায় প্রকাশ করার ক্ষমতা অর্জন করা, সামাজিক উন্নয়ন, চরিত্রগঠন, অধ্যাত্মবোধ, বাস্তব অভিজ্ঞতা ও পরিচিত পরিবেশে শিক্ষার্থীদের প্রাণমনের বিকাশ সাধন। তবে দু'জনের শিক্ষাচিন্তার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য লক্ষ করা যায়। বিশেষ করে গান্ধী শান্তিনিকেতনের 'বর্ণভেদ' নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে প্রথম দিকে পার্থক্যের মধ্যে ঐক্যের সূত্র খুঁজেছেন। গান্ধীর বিদ্যালয় যদিও শান্তিনিকেতনে চার মাসের বেশি অধিষ্ঠিত থাকেনি, তবু শিক্ষার্থীদের জন্য গান্ধীপ্রবর্তিত কিছু কঠোর নিয়ম রবীন্দ্রনাথকে বেশ পীড়া দিয়েছে। কঠোর এই ব্যবস্থা যে শিক্ষার্থীদের কল্পনাশক্তিকে খর্ব করে দিতে পারে, পরিণামে যা তাদের জন্য সুফল বয়ে আনবে না, সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ নিঃসংশয় ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন পরিবর্তন আসা উচিত ভেতর থেকে, উপর থেকে চাপিয়ে দিয়ে সাফল্য অর্জন করা যাবে না। সবকিছুই হওয়া উচিত সমন্বিতভাবে, বিচ্ছিন্নভাবে নয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষাদার্শনিক। আধুনিক ও যুগোপযোগী শিক্ষাতত্ত্বের উদ্ভাবক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ভারতের শিল্প ও কৃষ্টির সঙ্গে পাশ্চাত্যের শিল্প ও বিজ্ঞানের সমন্বয় ঘটিয়ে রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করেছিলেন তাঁর অমর শিক্ষাতত্ত্ব। তাঁর শিক্ষাভাবনার মৌলিক বৈশিষ্ট হচ্ছে, তিনি যেমন দেশিয় শিক্ষারীতিকে সমকালের উপযোগী করে নিয়েছেন, তেমনি নিজের ভাবনার সঙ্গে মিলে গেলে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদদের ভাবনাকেও শিক্ষাক্ষেত্রে কাজে লাগিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন

সাহিত্যকর্ম ছাড়া রবীন্দ্রনাথ অন্য যে কাজের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন, তা হল শিক্ষা । এখানেই তাঁর সঙ্গে পৃথিবীর অন্য বড় কবি বা সাহিত্যস্রষ্টার মৌলিক পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে উঠে। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য নির্মাণকে ব্যক্তি প্রতিভা বিকাশের একমাত্র শিল্পক্ষেত্র বলে গণ্য করেননি। তিনি মানুষের সার্বিক মুক্তি কল্যাণে আত্মনিয়োগকে বড় করে দেখেছেন। প্রকৃত অর্থেই তিনি 'শিক্ষাদাতা'র ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি নিজের চেষ্টায় 'শান্তিনিকেতন' (১৯০১), বিশ্বভারতী (১৯২০) প্রভৃতি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন। এগুলোতে তিনি তাঁর নতুন শিক্ষানীতির পরীক্ষা–নিরীক্ষা চালিয়েছেন এবং তাঁর শিক্ষাচিন্তার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। আমরা প্রচলিত অর্থে যে শিক্ষাদানের কথা বলি, তাঁর এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল তার ব্যতিক্রম। রবীন্দ্রনাথ সেই ধরনের শিক্ষাদানের ব্যাপারে একেবারেই উৎসাহী ছিলেন না। তাঁর শিক্ষাচিন্তা ও কর্মের লক্ষ্যও তা ছিল না। বরং বিপরীতটাই তাঁর জীবনের সাত্যিকর্ম ছাড়া সারাজীবন এই একটি কাজই অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে করে গেছেন রবীন্দ্রনাথকে তাই যদি শুধু সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ বলি, তাহলে কোনো ভুল হবে না। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে তিনি লিখেছেন:

> এই সংকল্পের বীজ আমার মগ্ন চৈতন্যের মধ্যে নিহিত ছিল, তা ক্রমে অগোচরে অঙ্কুরিত হয়ে জেগে উঠেছে। এর কারণ আমার নিজের জীবনের মধ্যেই রয়েছে। বাল্যকাল থেকে আমি যে জীবন অতিবাহিত করে এসেছি তার ভিতর থেকে প্রতিষ্ঠানের আদর্শটি জাগ্রত হয়ে উঠেছে।[৬৯]

রবীন্দ্রনাথ আশ্রমিক পরিবেশে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেওয়াকে তাঁর পরিকল্পিত শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনের অনুকুল মনে করেছেন। তাঁর মতে আশ্রমই হচ্ছে এমন প্রতিষ্ঠান, যেখানে প্রাকৃতিক পরিবেশ বৃত্তাবদ্ধ হয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী অন্তরঙ্গ পরিবেশে পরস্পর ভাববিনিময়ের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রমকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে পারে। আশ্রমের আরও একটি বৈশিষ্ট্যের প্রতি গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেছেন আশ্রম ভোগবাদী বস্তুজীবনের আকর্ষণ থেকে মুক্ত। এ কারণে আশ্রম পরিবেশে শিক্ষার্থীরা ধ্যান ও সাধনার মধ্যে দিয়ে প্রকৃত শিক্ষা অর্জন করতে পারে। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যা অনুসারে ব্রহ্মচর্য শিক্ষার্থীদের সমাজ থেকে কিছুটা আলাদা করে স্বতন্ত্র রূপে গড়ে তোলে। প্রাথমিক বা জীবনের প্রথম পর্যায়ের শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব অপরিসীম। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

> Brahmacharya should not be narrowly interpreted as austerity. A boy brought up in society is distracted by the impact of many people and many affairs and his manural development is impeded...Moral instruction has now displaced brahmacharya in our schools...But it is a mechanical Affair...it cannot possibly be made attractive to a boy;it either hurts him or goes over his head and makes feel like a criminal in the dock.[৭০]

৯.২

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

ঔপনিবেশিক শাসক প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা এবং দেশিয় বিদ্যানুরাগীদের গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থাকে বর্জন করে রবীন্দ্রনাথ যে নতুন শিক্ষা পদ্ধতির কথা ভেবেছিলেন, তা বাস্তবে রূপদান করতে তিনি ১৯০১ সালে 'শান্তিনিকেতন' বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি লিখেছেন:

> আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, এখানকার এই প্রভাতের আলো, শ্যামল প্রান্তর, গাছপালা যেন শিশুদের চিত্ত স্পর্শ করতে পারে। কারণ, প্রকৃতির সাহচর্যে তরুণ চিত্তে আনন্দসঞ্চারের দরকার আছে। এই উদ্দেশ্যে আমি আকাশ আলোর অঙ্কশায়ী উদার প্রান্তরে এই শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেছিলুম।[৭১]

আমরা এর আগেই জেনেছি যে, রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতীয় আশ্রমিক শিক্ষার ভাবধারায় অনুপ্রাণিত ছিলেন। সেই প্রেরণাতেই তিনি শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। এ বিদ্যালয়ে তিনি আশ্রমিক শিক্ষার বহু

বৈশিষ্ট্যও রক্ষা করেছিলেন। নগর থেকে দূরে পল্লির উদার প্রান্তওে তিনি শান্তিনিকেতন গড়ে তুলেছিলেন।। শহর ছেড়ে কেন সেখানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলেন, তার কারণ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন:

> ভারতবর্ষের এই একটা আশ্চর্য ব্যাপার দেখা গেছে, এখানকার সভ্যতার মূল প্রস্রবন শহরে নয়, বনে। ভারতবর্ষের প্রথমতম আশ্চর্য বিকাশ যেখানে দেখতে পাই সেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষ অত্যন্ত ঘেঁষাঘেঁষি করে একবারে পিণ্ড পাকিয়ে ওঠে নি। সেখানে গাছপালা নদী সরোবর মানুষের সঙ্গে মিলে থাকবার অবকাশ পেয়েছিল। সেখানে মানুষও ছিল ফাঁকাও ছিল। ঠেলাঠেলি ছিল না। অথচ ফাঁকায় ভারতবর্ষেও চিত্তকে জড়প্রায় করে দেয়নি, রবঞ্চ তার চেতনাকে আরো উজ্জ্বল করে দিয়েছিল। এরকম ঘটনা জগতে আর কোথাও ঘটেছে বলে দেখা যায় না।[৭২]

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার মূলে ছিল– ব্যক্তিক বিকাশ সাধন এবং সামাজিক উন্নয়নের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা। 'কেবল এ প্রক্রিয়াই মানুষের সার্বিক মুক্তি অর্জন সম্ভব বলে তিনি মনে করেন।[৭৩] আর এই প্রত্যাশা থেকেই তিনি কোলাহল মুক্ত শান্ত পরিবেশে তিনি শান্তিনিকেত বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে শিক্ষাপদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ নিচে সূত্রকারে উপস্থাপিত হলো:

১. অবাধ স্বাধীনতা : শ্রেণীকক্ষে আবদ্ধ পরিবেশে শিক্ষাদানের পরিবর্তে এখানে মুক্ত প্রকৃতির মাঝে শিক্ষা দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীরা ইচ্ছামতো ঘুরে বেড়াতে এবং খেলাধুলা করতে পারে। অকারণ বিধি-নিষেধের কঠোরতা এখানে নেই।

২. সাম্য: জাতিধর্মের কোন পার্থক্য এখানে করা হয় না। ছেলেমেয়েরা এক সঙ্গে পড়ালেখা কওে, এক সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া ও খেলাধুলা করে।

৩. সরল জীবনযাপন : উচ্চ চিন্তা এবং সরল জীবনযাপন শান্তিনিকেতনের শিক্ষাপদ্ধতির অন্যতম বৈশিষ্ট। শিক্ষার্থীরা নিজেদের কাজ নিজেরাই করে। ঘর-বাড়ি পরিষ্কার করা, বাগান পরিচর্যা, পোষাক-পরিচ্ছদ পরিষ্কার করা, বাসন ধোয়া-এসব কাজ শিক্ষার্থীরা সানন্দে নিজেরাই সমাধা করে। এর ফলে তারা শ্রমের প্রতি মর্যাদা ও আত্মনির্ভরতা অর্জনের শিক্ষা লাভ করে।

৪. গৃহ-পরিবেশ : শিক্ষার্থীরা শান্তিনিকেতনে গৃহ-পরিবেশে বাস করে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক একান্ত মধুর হওয়ার ফলে এ বিদ্যালয়ে কখনো শৃঙ্খলার অভাব দেখা দেয় না। শৃঙ্খলাভঙ্গের কারণে শাস্তির কঠোরতাও এখানে নেই।

৫. ভারতীয় কৃষ্টি ও আধ্যাত্মিকতা: শান্তিনিকেতনে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল ছাত্র-ছাত্রীদের ভারতীয় কৃষ্টি ও আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে শিক্ষাদান। প্রচীন ভারতের তপোবনের নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও আশ্রমিক শিক্ষাদর্শের প্রতিফলন শান্তিনিকেতনের শিক্ষাব্যবস্থায় সুস্পষ্ট।

৬. সহপাঠ : শান্তিনিকেতনের শিক্ষাব্যবস্থায় সহপাঠ্যক্রমিক কাজের প্রাধান্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ঋতু উৎসব, খেলাধুলা, অভিনয়, নৃত্য, সঙ্গীত, সম্মিলন, ভ্রমন, চিত্রাঙ্কন ইত্যাদির ব্যবস্থা আছে শান্তিনিকেতনের শিক্ষাক্রমে। রবীন্দ্রনাথ নিজে এইসব কাজে সক্রিয়ভাবে যোগ দিতেন, গান রচনা করতেন এবং অভিনয়ে অংশগ্রহন করতেন।

৭. মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা : শান্তিনিকেতনের আর এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট হচ্ছে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, যথার্থ শিক্ষা কেবল মাতৃভাষার মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব। ঔপনিবেশিক যুগে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের পরিকল্পনা নিঃসন্দেহে এক সাহসী ও যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

৮. সময়-তালিকা ও কার্যসূচি : শান্তিনিকেতনে কাজের সময়সূচি ছিল যথেষ্ট নমনীয়। প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষার্থীদের সময়-তালিকার পরিবর্তন করা এ বিদ্যালয়ের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট। সাধারনভাবে ব্রাহ্মমুহূর্ত থেকে বিদ্যালয়ের কাজ শুরু হয় এবং সকাল দশটা পর্যন্ত পড়ালেখা চলে। মধ্যাহ্নভোজের পর বিশ্রাম। অপরাহ্নে শিক্ষার্থীরা সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্রাঙ্কন, শারীরিক শিক্ষা, খেলাধুলা ইত্যাদি করে থাকে।

৯. শিল্প শিক্ষা: মহাত্মা গান্ধীর মতো রবীন্দ্রনাথও শান্তিনিকেতনের শিক্ষাক্রমে শিল্প কাজের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। এ বিদ্যালয়ে নানরূপ কুটির শিল্প, তাঁত শিল্প, দারুশিল্প, মৃৎশিল্প, চামড়া শিল্প, কৃষি শিল্প ও উদ্যান পরিচর্যার কাজ শিক্ষা দেওয়া হয়।

১০. পল্লি-উন্নয়ন: সমাজসেবা ও পল্লি-উন্নয়নমূলক কাজ শান্তিনিকেতনের শিক্ষাব্যবস্থার আর এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট। পল্লি-উন্নয়নমূলক কাজের মাধ্যমে সমাজের নানা ধরনের মানুষের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় ঘটে, নানা বিষয় তারা প্রত্যক্ষভাবে জানতে পারে।

১১. ভাষা শিক্ষা: রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন- 'শিক্ষায় মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধ'। তাই বলে কেবল মাতৃভাষাই শিক্ষা দেওয়া হতো না শান্তিনিকেতনে। মাতৃভাষা ছাড়াও অন্যান্য ভাষা শিক্ষাকে তিনি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছেন। হিন্দি, উর্দু, সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, আরবি, ফারসি প্রভৃতি ভাষা শিক্ষার কথা তিনি বলেছেন। বৃহত্তম প্রাচ্য সংস্কৃতির সঙ্গে যোগস্থাপনের জন্য তিব্বতি এবং চীনা ভাষা শিক্ষার কথা তিনি বলেছেন; সর্বোপরি ইংরেজি ভাষা আয়ত্তের কথাও তিনি বলেছেন। প্রসঙ্গত তিনি লিখেছেন- 'আমি বাঙালী বলে আমাদের সাহিত্যরসের চর্চা কেবল বাংলা সাহিত্যেও মধ্যেই পরিসমাপ্ত হবে? আমি কি বিশ্বসংসারে জন্মাই নি? আমারই জন্য জগতের যত দার্শনিক, যত করি, যত বৈজ্ঞানিক তপস্যা করেছেন, এর যথার্থোপলব্ধির মধ্যে কি কম গৌরব আছে?'[৭৪]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গীতিকবিদের অন্যতম একজন । শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর এখানকান শ্যামল পরিবেশ তাঁর কবি প্রতিভার উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল। তাই দেখা যায় এ সময় তাঁর তাঁর সৃজনশীল কবি প্রতিভার পূর্ণ প্রকাশ ঘটে। রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় ছিল ঔপনিবেশিক শাসক-প্রবর্তিত প্রচলিত ইংরেজি শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক জোড়ালো প্রতিবাদ। এ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় মধ্য দিয়ে একদিকে তাঁর উপনিবেশবাদ-বিরোধী চেতনার প্রকাশ ঘটেছে, অন্যদিকে তাঁর নতুন শিক্ষাদর্শন প্রতিফলিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সমালোচক লিখেছেন:

> It should therefore be clearly perceived that Santiniketan Ashram was born primarily as a protest against the converntional system of education. On the other hand, Robindranath also had some doubts in his mind about the efficiency of our traditional indigenous institutions, such as Tol, Chatuspathi, Pathsala etc. in the field of our modern education in our country.[৭৫]

৯.৩

বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা

রবীন্দ্রনাথ সংকীর্ণ জীবনবোধ–এমনকি সমকালীন জাতীয়তার বোধ থেকে ক্রমশ বিশ্বাত্মবোধে উত্তীর্ণ হচ্ছিলেন, 'ন্যাশনাল বিদ্যাশিক্ষা বলতে য়ুরোপ যা বোঝে আমরা যদি তাই বুঝি, তবে তা নিতান্তই বোঝার ভুল হবে।...প্রাচীন ভারতের তপোবনে যে মহাসাধনার বনস্পতি একদিন মাথা তুলে উঠেছিল এবং সর্বত্র তার শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে সমাজের নানা দিককে অধিকার করে নিয়েছিল, সেই ছিল আমাদের ন্যাশনাল সাধনা'[৭৬] তাঁর সেই বিশ্ববোধের চেতনার বাস্তব প্রতিফলন হচ্ছে 'বিশ্বভারতী' (১৯২১)। এ প্রতিষ্ঠানকে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনার প্রয়োগ ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। কারণ এখানে শিক্ষাবিষয়ে তাঁর অতীত অভিজ্ঞতার প্রতিফন ঘটেছে। তিনি বিশ্বভারতীকে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমন্বয়সাধন কেন্দ্রে পরিণত করতে চেয়েছেন । বিশ্বভারতীর শিক্ষার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন ভিন্ন দেশ ও জাতির সাহিত্য–সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে, বন্ধন সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন । তাঁর 'বিশ্বভারতী' প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যও ছিল তাই। রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে যে বিশ্বাত্মবোধের পরিচয় দিয়েছেন তা নিচের মতামতগুলো থেকেই অনুমান করা যায়। এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্যগুলো সাজালে নিম্নরূপ হয়। কথাগুলো হচ্ছে:

১. To study the mind of Man in its realisation of different aspects of truth from diverse points of view
২. To bring into more intimate relation with one another though patient study and research the different cultures of the East on the basis of their underlying unity.
৩. To approach the West form the standpoint of such a unity of the life and thought of Asia;
৪. To seek to realize in a common fellowship of study the meeting of East and West and thus ultimately to strengthen the fundamental conditions of world peace through the free communication of ideas between the two hemispheres.
৫. And with such ideas in view to provide to Santiniketan a centre of culture where research into the study of the religion, literature, history, science and art of

> Hindu, Buddhist, Jain, Zoroastrian, Islamic, Sikh, Christian and other civilizations may be perused along with the culture of the West, with that simplicity of externals which is necessary for true spiritual realization, in family, good fellowship and co-operation between the thinkers and scholars of both Eastern and Western countries, free from all antagonisms of race, nationality, creed or caste and in the name of the One Supreme Being who is Shantam, Shivam, Advaitam.[৭৭]

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীতে জগতের সমস্ত জ্ঞানের সমন্বয় ঘটাতে চেয়েছিলেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে শিক্ষার্থীরা এখানে এসে শিক্ষা গ্রহণ করবে-বিশ্বাত্মবোধ একাত্ম হয়ে সম্মিলনী সভ্যতার মহাসমুদ্রে তাঁরা অবগাহন করবে ধন্য হবে। এই প্রত্যাশায় তিনি বলেছেন:

> We can work together in a common pursuit of truth, share together our common heritage, and realise that artists in all parts of the world have created form of beauty, scientists discovered secrets of the universe, philosophers solved the problems of existence, saints made the truth of the spiritual world organic in their own lives, not merely for some particular race to which they belonged, but for mankind'.[৭৮]

সমকালীন ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে বিকল্প শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তক ও শিক্ষাচর্চাবিদ হিসেবে তাঁর নাম ও কীর্তি তাই অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনা সে-অর্থে যেমন মৌলিক, তেমনি অন্যদের ভাবনার সংশ্লেষ ও আত্তীকরণও বটে।[৭৯]

হিমাংশুভূষণ লিখেছেন:

> Tagore was no more entirely 'original' than great educators like Plato, Bacon, Locke, Rousseau and Deway, because he reflected, as much as they, some past or contemporary thought… Tagore's educational ideas had deep and powerful roots and did not originate, as it were, in mid-air. In fact, we have made the point in an earlier context that it reflected within a single compass, so much of the best educational thoughts of the world.[৮০]

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীতে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার চর্চা হয়। বিশ্বভারতীতে শিশুদের নার্সারি স্কুল থেকে আরম্ভ করে আন্তর্জাতিক স্তরের নানাবিধ বিষয় পঠন-পাঠন হয়ে থাকে।[৮১] বিশ্বভারতীর–'শিশুভবন (নার্সারি স্কুল), পাঠভবন (মাধ্যমিক স্কুল), শিক্ষাভবন (উচ্চ-মাধ্যমিক), বিদ্যাভবন (স্নাতক ও স্নাতকোত্তর), বিনয়ভবন (শিক্ষক প্রশিক্ষণ), কলাভবন (শিল্প ও চারুকলা), সঙ্গীতভবন (সঙ্গীত ও নৃত্য), শ্রীনিকেতন (পল্লি-উন্নয়ন), শিক্ষাসত্র (গ্রাম-বিদ্যালয়),শিল্পসদন (শিল্পসদন), চীনাভবন (চীনা, তিব্বতি প্রভৃতি ভাষা-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি তাঁর প্রত্যাশিত জ্ঞানচর্চার কাজটি করতে চেয়েছিলেন। বিশ্বভারতীর এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে রূপায়িত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের যুগান্তকারী শিক্ষাদর্শন।

১০

বিদ্যালয় পরিচালনা প্রসঙ্গে বিশেষ চিঠি

রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা করে তাঁর শিক্ষাদর্শের প্রতিফলন ঘটাতে চেয়েছিলেন। তিনি নিজেই এই প্রথিষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার এক বছর পর তাঁর স্ত্রী মৃণালিনী দেবী বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন স্ত্রীকে নিয়ে তিনি কলকাতায় যেতে বাধ্য হন। তাঁর সহকারি কুঞ্জলাল ঘোষকে বিদ্যালয়ের দায়িত্বে রেখে তিনি কলকাতা চলে আসেন। কিন্তু এ প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাঁর সজাগ দৃষ্টি সর্বদা অটুট ছিল। রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় থাকার সময় কুঞ্জলাল ঘোষকে কুড়ি পৃষ্ঠার যে চিঠি লিখেছিলেন, সেটাই তার প্রকৃত প্রমাণ। কুঞ্জলাল ঘোষকে তিনি এর আগেই ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষক ও প্রশাসক পদে নিয়োগ দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রজীবনী লেখক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন,এই চিঠিটি ব্রহ্মচর্যাশ্রম পরিচালনার প্রথম লিখিত নির্দেশনা হিসেবে গণ্য হয়েছে। ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার প্রথম দশকে উল্লিখিত নির্দেশনাই ছিল

Dhaka University Institutional Repository

বিদ্যালয় পরিচালনার মূল ভিত্তি। বিদ্যালয় পরিচালনা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি কী ছিল, ওই চিঠি থেকে তার পরিচয় পাওয়া যায়। চিঠিটি প্রধানত চারটি অংশে বিভক্ত। এই অংশগুলিকে আলাদাভাবে এবং সমন্বিত করে দেখলে বাঙালির শিক্ষা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ সেই সময়ে কী চিন্তা করেছিলেন, তা সহজে অনুমান করা যায়। এই চিঠিতে উল্লিখিত মতামতগুলো বলেন্দ্রনাথ প্রস্তাবিত বিদ্যালয় পরিচালনার নিয়মবিধির সঙ্গে সমন্বিত করে দেখলে রবীন্দ্রশিক্ষাচিন্তার একটা রূপরেখা পাওয়া যায়। এ চিঠির প্রথম ও দ্বিতীয় অংশে বিদ্যালয়ের অধ্যাত্মবাদী ও জাতীয়তাবাদী লক্ষ্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা পাওয়া যায়। এ অংশের প্রধানত প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাপদ্ধতি ব্রহ্মচর্যায় কেন্দ্রীভূত থাকার বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে। বিদ্যালয় পরিচালনার কার্যপ্রণালীর এ চিঠির তৃতীয় ও চতুর্থ অংশে তিনি 'গুরুশিষ্যের আধ্যাত্মিক-পারমার্থিক সম্পর্কের বিষয়টি তুলে ধরেছেন। শিক্ষা সামগ্রিকভাবে গুরু-শিষ্যের দান-গ্রহণের উপর নির্ভরশীল। এখানে শিক্ষা চিন্তায় অনুসারে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপনের মুখ্য উদ্দেশ্যর প্রতিফলন ঘটেছে। এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

> ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে স্বদেশের প্রতি বিশেষরূপে ভক্তিশ্রদ্ধাবান করিতে চাই। পিতামাতায় যেরূপ দেবতার বিশেষ আবির্ভাব আছে–তেমনি আমাদের পক্ষে আমাদের স্বদেশে, আমাদের পিতৃপিতামহদিগের জন্ম ও শিক্ষা-স্থানে দেবতার বিশেষ সত্তা আছে। পিতামাতা যেমন দেবতা তেমনি স্বদেশও দেবতা। স্বদেশকে লঘুচিত্তে অবজ্ঞা, উপহাস, ঘৃণা এমন-কি, অন্যান্য দেশের তুলনায় ছাত্ররা যাহাতে খর্ব করিতে না শেখে সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে চাই।[৮২]

১০.২

ছাত্রদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের জন্য কতগুলো মৌলিক কাজ নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন । সেগুলোর মধ্যে - ঈশ্বর ব্রতপালন, মঙ্গলব্রত গ্রহণ, পরমার্থে মনুষ্যত্বলাভের চেষ্টা, স্বদেশের প্রতি বিশেষরূপে শ্রদ্ধাবান, স্বদেশাচাররের অনুগত হওয়া, বিশ্বজনীনতায় উত্তীর্ণ হওয়ার চেষ্টা, ধনাভিমান পরিত্যাগ, আত্মগৌরব বিলুপ্তি , বেশভূষায় বিলাসিতা পরিত্যাগ, দারিদ্র্যকে লজ্জাজনক বা ঘৃণাজনক মনে না করা, পরিচ্ছন্নতা ও শুচিতা সম্পর্কে সজাগ থাকা, পরস্পরের প্রতি শিষ্টাচার আত্মসংযম, ধৈর্য, গুরুভক্তি প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয়ে হিন্দুসমাজের আচার-আচরণ প্রতিপালনের স্বাধীনতার দিতে চেয়েছেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেছে– 'যাহারা (শিক্ষার্থী বা শিক্ষক) হিন্দুসমাজের সমস্ত আচার যথাযথ পালন করিতে চান তাঁহাদিগকে কোনো প্রকারে বাধা দেওয়া বা বিদ্রুপ করা এ বিদ্যালয়ের নিয়ম বিরুদ্ধ'।[৮৩] চিঠির আকারে লেখা বিস্তারিত পাঠ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। নিচে তাঁর লেখা চিঠির প্রথম অংশ [৮৪] উল্লেখ করা হলো:

> বিনয় সম্ভাষণমেতং
>
> ১. আপনার প্রতি আমি যে ভার অর্পণ করিয়াছি আপনি তা ব্রতস্বরূপে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, ইহাতে আমি বড়ো আনন্দলাভ করিয়াছি। একান্ত মনে কামনা করি, ঈশ্বর আপনাকে এই ব্রতপালনের বল ও নিষ্ঠা দান করুন।
>
> ২. আমি আপনাকে পূর্বেই বলিয়াছি, বালকদিগের অধ্যয়নের কাল একটি ব্রতযাপনের কাল। মনুষ্যত্বলাভ স্বার্থ নহে, পরমার্থ–ইহা আমাদের পিতামহেরা জানিতেন। এই মনুষ্যত্বলাভের ভিত্তি যে শিক্ষা তাহাকে তাঁহারা ব্রহ্মচর্যব্রত বলিতেন। এ কেবল পড়া মুখস্থ করা এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া নহে-সংযমের দ্বারা, ভক্তিশ্রদ্ধার দ্বারা, শুচিতা দ্বারা, একাগ্র নিষ্ঠা দ্বারা সংসারশ্রমের জন্য এবং সংসারশ্রমের অতীত ব্রহ্মের সহিত অনন্ত যোগ সাধনের জন্য প্রস্তুত হইবার সাধনাই ব্রহ্মচর্যব্রত।
>
> ৩. ইহা ধর্মব্রত। পৃথিবীতে অনেক জিনিসই কেনাবেচার সামগ্রী বটে, কিন্তু ধর্ম পণ্যদ্রব্য নহে। ইহা এক পক্ষে মঙ্গল ইচ্ছার সহিত দান ও অপর পক্ষে বিনীত ভক্তির সহিত গ্রহণ করিতে হয়। এইজন্য প্রাচীন ভারতে শিক্ষা পণ্যদ্রব্য ছিল না। এখন যাঁহারা শিক্ষা দেন তাঁহারা শিক্ষক, তখন যাঁহারা শিক্ষা দিতেন তাঁহারা গুরু ছিলেন। তাঁহারা শিক্ষার সঙ্গে এমন একটি জিনিস দিতেন যাহা গুরুশিষ্যের আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ ব্যতীত দানপ্রতিগ্রহ হইতেই পারে না।
>
> ৪. ছাত্রদিগের সহিত এইরূপ পারমার্থিক সম্বন্ধ স্থাপনই শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু এ কথা মনে রাখা আবশ্যক যে, উদ্দেশ্য যত উচ্চ হইবে তাহার উপায়ও তত দুরূহ ও দুর্লভ হইবে। এ-সব

কার্য ফরমাসমত চলে না। শিক্ষক পাওয়া যায়, গুরু সহজে পাওয়া যায় না। এইজন্য যথাসম্ভব লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ধৈর্য্যের সহিত সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে হয়। সমস্ত অবস্থা বিচেনায় যতটা মঙ্গলসাধন সম্ভবপর তাহাই শিরোধার্য করিয়া লইতে হইবে এবং নিজের অযোগ্যতা স্মরণ করিয়া নিজেকে প্রত্যহ সাধনার পথে অগ্রসর করিতে হইবে।

৫. মঙ্গলব্রত গ্রহণ করিলে বাধাবিরোধ-অশান্তির জন্য মনকে প্রস্তুত করিতে হয়-অনেক অন্যায় আঘাতও ধৈর্য্যের সহিত সহ্য করিতে হইবে। সহিষ্ণুতা ক্ষমা ও কল্যাণভাবের দ্বারা সমস্ত বিরোধ-বিপ্লবকে জয় করিতে হইবে।

৬. ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে স্বদেশের প্রতি বিশেষরূপে ভক্তিশ্রদ্ধাবান করিতে চাই। পিতামাতার যেরূপ দেবতার প্রতি বিশেষ আবির্ভাব আছে–তেমনি আমাদের পক্ষে আমাদের স্বদেশে, আমাদের পিতৃপিতামহদিগের জন্ম ও শিক্ষা-স্থানে দেবতার বিশেষ সত্তা আছে। পিতামাতা যেমন দেবতা তেমনি স্বদেশও দেবতা। স্বদেশকে লঘুচিত্তে অবজ্ঞা, উপহাস, ঘৃণা এমন-কি, অন্যান্য দেশের তুলনায় ছাত্ররা যাহাতে খর্ব করিতে না শেখে সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে চাই। আমাদের স্বদেশীয় প্রকৃতির বিরুদ্ধে চলিয়া আমরা কখনো সার্থকতা লাভ করিতে পারিব না। আমাদের দেশের যে বিশেষ মহত্ত্ব ছিল সেই মহত্ত্বের মধ্যে নিজের প্রকৃতিকে পূর্ণতা দান করিতে পারিলেই আমরা যথার্থভাবে বিশ্বজনীনতার মধ্যে উত্তীর্ণ হইতে পারিব-নিজেকে ধ্বংস করিয়া অন্যের সহিত মিলাইয়া দিয়া কিছুই হইতে পারিব না। অতএব, বরঞ্চ অতিরিক্তমাত্রায় স্বদেশাচাররের অনুগত হওয়া ভালো তথাপি মুগ্ধভাবে বিদেশীর অনুকরণ করিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করা কিছু নহে।

৭. ব্রহ্ম-ব্রতে ছাত্রদিগকে কাঠিন্য অভ্যাস করিতে হইবে। বিলাস ও ধনাভিমান পরিত্যাগ করিতে হইবে। ছাত্রদের মন হইতে ধনের গৌরব একেবারে বিলুপ্ত করিতে চাই। যেখানে তাহার কোনো লক্ষণ দেখা যাইবে সেখানে তাহা একেবারে নষ্ট করা কর্তব্য হইবে। আমার মনে হইয়াছে শৌখিন দ্রব্যের প্রতি কিঞ্চিৎ আসক্তি আছে– সেটা দমন করিতে হইবে। বেশভূষা সম্বন্ধে বিলাসিতা পরিত্যাগ করিতে হইবে। কেহ দারিদ্র্যকে যেন লজ্জাজনক ঘৃণাজনক না মনে করে। অশনে বসনেও শৌখিনতা দূর করা চাই।

৮. দ্বিতীয়ত নিষ্ঠা। উঠা বসা পড়া খেলা স্নান আহার ও সর্বপ্রকার পরিচ্ছন্নতা ও শুচিতা সম্বন্ধে সমস্ত নিয়ম একান্ত দৃঢ়তার সহিত পালনীয়। ঘরে বাহিরে শয্যায় বসনে ও শরীরে কোনোপ্রকার মলিনতা প্রশ্রয় দেওয়া না হয়। যেখানে কোনো ছাত্রের কাপড় কম আছে সেখানে সে যেন কাপড়-কাচা সাবান দিয়া স্বহস্তে প্রত্যহ নিজের কাপড় কাচে ও ব্যবহার্য গাড়ু মাজিয়া পরিষ্কার রাখে এবং ঘরের যে অংশে তাহার বিছানা কাপড়চোপড় ও বই প্রভৃতি থাকে সে-অংশ যেন প্রত্যহ যথাসময়ে যথানিয়মে পরিষ্কার তকতকে করিয়া রাখে। ছেলেরা প্রত্যহ পর্যায়ক্রমে তাহাদের অধ্যাপকদের ঘরও পরিষ্কার করিয়া গুছাইয়া রাখিলে ভালো হয়। অধ্যাপকদের সেবা করা ছাত্রদের অবশ্যকর্তব্যের মধ্যে নির্ধারিত করা চাই।

৯. তৃতীয়ত ভক্তি। অধ্যাপকদের প্রতি ছাত্রদের নির্বিচারে ভক্তি থাকা চাই। তাঁহারা অন্যায় করিলেও তাহা বিনা বিদ্রোহে নম্রভাবে সহ্য করিতে হইবে। কোনোমতে তাঁহাদের সমালোচনা বা নিন্দায় যোগ দিতে পারিবে না। অধ্যাপকেরা যদি কখনো পরস্পরের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন তবে সে সময়ে কোনো ছাত্র সেখানে উপস্থিত না থাকে তৎপ্রতি যত্নবান হইতে হইবে। কোনো অধ্যাপক ছাত্রদের সমক্ষে অন্য অধ্যাপকদের প্রতি অবজ্ঞাজনক ব্যবহার, অসহিষ্ণুতা বা রোষ প্রকাশ না করেন সে দিকে সকলের মনযোগ থাকা কর্তব্য। ছাত্রগণ অধ্যাপকদিগকে প্রত্যহ প্রণাম করিবে। অধ্যাপকগণ পরস্পরকে নমস্কার করিবেন। পরস্পরের প্রতি শিষ্টাচার ছাত্রদের নিকট যেন আদর্শস্বরূপ বিদ্যমান থাকে।

১০. বিলাসত্যাগ, আত্মসংযম, নিয়মনিষ্ঠা, গুরুজনে ভক্তি সম্বন্ধে আমাদের দেশের প্রাচীন আদর্শের প্রতি ছাত্রদের মনোযোগ অনুকূল অবসরে আকর্ষণ করিতে হইবে। যাহারা (শিক্ষার্থী বা শিক্ষক) হিন্দুসমাজের সমস্ত আচার যথাযথ পালন করিতে চান তাঁহাদিগকে কোনোপ্রকারে বাধা দেওয়া বা বিদ্রুপ করা এ বিদ্যালয়ের নিয়মবিরুদ্ধ। রন্ধনশালায় বা আহারস্থলে হিন্দু-আচার বিরুদ্ধ কোনো অনিয়মের দ্বারা কাহাকেও ক্লেশ দেওয়া হইবে না।

ছাত্রসভায় দেওয়া এক বক্তৃতায় তিনি বলেন :

> অধ্যয়নই যে ছাত্রজীবনের প্রধান কর্তব্য এবং অধ্যয়নে যতই অবহিত হইতে পারা যায়, ততই যে সফলতা লাভের বেশি সম্ভাবনা, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু এ কথাও ঠিক যে, সকল দেশেই বিশেষ বিশেষ সংকটের সময় এ নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়া থাকে। তখন বয়স্কেরা ব্যবসা ছাড়িয়া, যুবকেরা

আমোদপ্রমোদ ছাড়িয়া, ছাত্রেরা অধ্যয়ন ছাড়িয়া আন্দোলনে যোগদান করিয়া থাকেন।...ছাত্রেরা যে এ আন্দোলনে যোগ দিয়াছেন, তাহা নিতান্তই স্বাভাবিক বিশেষত আমাদের দেশে।[৮৫]

জীবনের লক্ষ্য অর্জনের পরামর্শ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে এক পত্রে লিখেছিলেন:

জীবনের লক্ষ্য কি হওয়া উচিত এবং কি করলে হৃদয়ের শুষ্কতা দূর হয়, এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছ। মোটামুটি এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ, কিন্তু উত্তর পেলেই যে সেটা কাজে লাগানো সহজ, এমন কথা বলতে পারিনে। আমরা যে কোন কাজ এবং যে কোন অবস্থার মধ্যেই থাকি না কেন নিজেকে যেন সত্য করে উপলব্ধি করতে পারি এই লক্ষ্যই মনে স্থির রাখতে হবে। ...তোমরা বিজ্ঞান প্রভৃতি আলোচনা করে বর্হিবিষয় সম্বন্ধে জ্ঞানের সমস্ত বাধা যেমন কাটিয়ে উঠে শক্তিলাভ করচ, তেমনি জীবনকে সৎ পথে চালনা করে প্রবৃত্তির কলুষ কাটিয়ে উঠে নিজের চরম সত্যকে ক্রমশই বাধামুক্তভাবে উপলব্ধি করে ভুমার সঙ্গে যোগযুক্ত হয়ে সর্বদা অভয়ে আনন্দে এবং অপরিমেয় কল্যানের মধ্যে বিরাজ করবে এই হচ্ছে লক্ষ্য; এই লক্ষ্য সাধন করতে হলে অত্যন্ত সাবধানে জীবনকে নির্মল রেখে প্রত্যহ মনকে তাঁর মধ্যে নিবিষ্ট করতে হবে যিনি অন্তর বাহিরকে পূর্ণ করে রয়েছেন, যিনি বিশ্ব চরাচরকে সত্য করে বিরাজ করছেন, যিনি পরিপূর্ণ সত্য, পরিপূর্ণ জ্ঞান, যিনি অমৃতময় আনন্দময় অনন্তস্বরূপ ব্রহ্ম। কিন্তু এ-সব কথা যদি কেবল মুখের কথামাত্র হয়, তবে তেমন দুর্গতি মানুষের পক্ষে আর কিছু হতে পারে না। জীবনের ভিতর দিয়ে তাঁকে নিজের আত্মার মধ্যে পেতে হবে কথার ভিতর দিয়ে নয়। অতএব তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে, নিজের জীবনকে প্রশস্ত করে স্বার্থপরতা এবং অহংকার থেকে নিজেকে মুক্ত করে বিশ্বের সবার দ্বারা নিজের শক্তিকে সার্থক করে প্রতিদিন অনন্ত পথের পাথেয় সঞ্চয় করে চলা। বড় বড় কথা শোনবার এবং বড় বড় কথা আবৃত্তি করবার লোভ যদি পেয়ে বসে, তা হলে পথ হারাবে। জানতে চাও বলতে চেও না, পেতে চাও লোকে কাছে ফলাতে চেও না। মিতাচারী মিতভাষী হয়ে নম্র হয়ে শ্রদ্ধাবান হয়ে অন্তর্যামীর প্রতি নির্ভর স্থির রেখে গোপনে আপনার সাধনার পথে অগ্রসর হতে থাকো। অনেক বাধা বিঘ্ন শোক দুঃখের ভিতর দিয়ে চলতে হবে- অনেক উঠবে এবং পড়বে, সন্দেহ মনকে আবৃত করবে এবং অবসাদে জীবনকে ভারগ্রস্থ করে তুলবে সেই সমস্ত কাটিয়ে যখন অবিচল আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করবে, তখন ধন্য হবে। মনে কোরো না জিনিষ বক্তৃতা শুনে পাওয়া যায়, কিম্বা এ সমস্ত তোমাদের কাগজে প্রবন্ধ লেখবার বিষয়- অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে ধৈর্য্যের সঙ্গে অপ্রগলভ বিনয়ের সঙ্গে সমস্ত জীবন দিয়ে তবে এই অটল প্রতিষ্ঠা মানুষ লাভ করে- এসব জিনিষ লঘুভাবে কথায় বার্তায় ব্যবহার করবার নয়। মানুষের যা শ্রেষ্ঠ সম্পদ, তাকে আনন্দের মধ্যে কতক পরিমাণে উপলব্ধি করবার পূর্বেই যদি সে সম্বন্ধে চাপল্য ও প্রগলভতা প্রকাশ করতে আরম্ভ করতে আরম্ভ করি, তা হলে তাতে আমাদের শক্তিকে নষ্ট করে দেয়- রন্ধনের আয়োজন নেই অথচ চুলা ধরাতে বসলে তাতে ফল হয় এই যে, যখন রন্ধনের সময় উপস্থিত হবে, তখন দেখবে আগুন নেই, কেবল রাশীকৃত ছাই জমে আছে।[৮৬]

১০.৩

শিক্ষায় বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ জাগরণ প্রত্যাশা

ব্রহ্মচর্যাশ্রম পরিচালনার দ্বিতীয় অংশে শিক্ষাক্রমে অধ্যাত্মসাধনাকে যুক্ত করেছেন রবীন্দ্রনাথ। বিশেষভাবে তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন 'গায়ত্রীমন্ত্রে'র উপর। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন এর মাধ্যমেই ব্যক্তিমানস আপন অন্তর্লোক ও বহির্বাস্তবতার সঙ্গে যুক্ত হবে। একাদশ পরিচ্ছদে গায়ত্রীমন্ত্রকে এমনভাবে বর্ণনা করেছেন যে গোষ্ঠী ও জাতীয়তাবাদকে ছাড়িয়ে গিয়ে তা যেন শিক্ষার্থীদের বিশ্বাসত্মবোধ উত্তীর্ণ করে দেয়: '...সমস্ত বিশ্বজগৎকে মনের মধ্যে আহরণ করিয়া আনিতে হইবে-তখনকার মতো মনে করিতে হইবে আমি সমস্ত বিশ্বজগতের মধ্যে দাঁড়াইয়াছি–আমি এখন কেবলমাত্র কোনো বিশেষ দেশবাসী নহি।' এখানে তিনি যে সমকালীন জাতীয়তাবাদকে অতিক্রম করে গিয়ে বিশ্বাত্মবোধে সমীকৃত হচ্ছিলেন তা সহজেই বোঝা যায়। তিনি লিখেছেন: [৮৭]

১১. ছাত্রদিগকে গায়ত্রীমন্ত্র মুখস্থ করাইয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে। আমি যে ভাবে গায়ত্রী ব্যাখ্যা করি তাহা সংক্ষেপে নিম্নে লিখিলাম:

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্ব ঃ-

Dhaka University Institutional Repository

এই অংশ গায়ত্রীর ব্যাতি নামে খ্যাত। চারি দিক হইতে আহরণ করিয়া আনার নাম ব্যহৃতি। প্রথম ধ্যানকালে ভূলোক ভুবর্লোক ও স্বর্লোক অর্থাৎ সমস্ত বিশ্বজগৎকে মনের মধ্যে আহরণ করিয়া আনিতে হইবে-তখনকার মতো মনে করিতে ইহবে আমি সমস্ত বিশ্বজগতের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছি- আমি এখন কেবলমাত্র কোনা বিশেষ দেশবাসী নহি। বিশ্বজগতের মধ্যে দাঁড়াইয়া বিশ্বজগতের যিনি সবিতা, যিনি সৃষ্টিকর্তা, তাঁহারই বরণীয় জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান করিতে হইবে। মনে করিতে হইবে এই ধারণাতীত বিপুল বিশ্বজগৎ এই মুহূর্তে এবং প্রতি মুহূর্তেই তাঁহা হইতে বিকীর্ণ হইতেছে। তাঁহার এই-যে অসীম শক্তি যাহার দ্বারা ভূর্ভুবঃস্বর্লোক অবিশ্রাম প্রকাশিত হইতেছে, আমার সহিত তাঁহার অব্যবহিত সম্পর্ক কী সূত্রে। কোন সূত্র অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে ধ্যান করিব।

১২. ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ- যিনি আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তিসকল প্রেরণ করিতেছেন, সেই ধীসূত্রেই তাঁহাকে ধ্যান করিব। সূর্যের প্রকাশ আমরা প্রত্যক্ষভাবে কিসের দ্বারা জানি। সূর্য আমাদিগকে যে কিরণ প্রেরণ করিতেছে সেই কিরণের দ্বারা। সেইরূপ বিশ্বজগতের সবিতা আমাদের মধ্যে অহরহ যে ধীশক্তি প্রেরণ করিতেছেন, যে শক্তি থাকার দরুন আমি নিজেকে ও বাহিরের সমস্ত বিশ্বব্যাপারকে উপলব্ধি করিতেছি– সে ধীশক্তি তাঁহারই শক্তি এবং সেই ধীশক্তি দ্বারাই তাঁহারই শক্তি প্রত্যক্ষভাবে অন্তরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অন্তরতম রূপে অনুভব করিতে পারি। বাহিরে যেমন ভূর্ভুবঃস্বর্লোকের সবিতা রূপে তঁহাকে জগৎচরাচরের মধ্যে উপলব্ধি করি, অন্তরের মধ্যে সেইরূপ আমার ধীশক্তির অবিশ্রাম প্রেরয়িতা বলিয়া তাঁহাকে অব্যবহিতভাবে উপলব্ধি করিতে পারি।

১৩. বাহিরে জগৎ এবং আমার অন্তরে ধী, এই দুইই একই শক্তির বিকাশ- ইহা জানিলে জগতের সহিত আমার চেতনার এবং আমার চেতনার সহিত সেই সচ্চিদানন্দের ঘনিষ্ঠ যোগ অনুভব করিয়া সংকীর্ণতা হইতে স্বার্থ হইতে ভয় হইতে বিষাদ হইতে মুক্তি লাভ করি। গায়ত্রীমন্ত্রে বাহিরের সহিত অন্তরের ও অন্তরের সহিত অন্তরতমের যোগসাধন করে- এইজন্যই আর্যসমাজে এই মন্ত্রের এত গৌরব :

যো দেবোহগ্নৌ যোহপ্সু যো বিশ্বং ভুবনামাবিবেশ।
যো ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ।।

১৪. ব্রহ্মধারণার পক্ষে এই মন্ত্রই আমি বালকদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা সরল বলিয়া মনে করি। ঈশ্বর জলেস্থলে অগ্নিতে ওষধি-বনস্পতিতে সর্বত্র আছেন, এই কথা মনে করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করা শান্তিনিকেতনের দিগন্তপ্রসারিত মাঠের মধ্যে অত্যন্ত সহজ। সেখানকার নির্মল আলোক আকাশ এবং প্রান্তর বিশ্বেশ্বরের দ্বারা পরিপূর্ণ, এ কথা মনে করিয়া ভক্তি করা ছেলেদের পক্ষেও কঠিন নহে। এইজন্য গায়ত্রীর সঙ্গে সঙ্গে এই মন্ত্রটিও ছেলেরা শিক্ষা করে। গায়ত্রী সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিবার পূর্বেও এই মন্ত্রটি তাহারা ব্যবহার করিতে পারে।

১৫. ছাত্রগণ পাঠ আরম্ভ করিবার পূর্বে সকলে সমস্বরে 'ওঁ পিতা নোহসি' উচ্চারণপূর্বক প্রণাম করে। ঈশ্বর যে আমাদের পিতা এবং তিনিই যে আমাদিগকে পিতার ন্যায় জ্ঞান শিক্ষা দিতেছেন, ছাত্রদিগকে তাহা প্রত্যহ স্মরণ করানো চাই। অধ্যাপকেরা উপলক্ষমাত্র, কিন্তু যথার্থ যে জ্ঞানশিক্ষা তাহা আমাদের বিশ্বপিতার নিকট হইতে পাই। তাহা পাইতে হইলে চিত্তকে সর্বপ্রকার পাপমলিনতা হইতে মুক্ত করিতে হয়। সে জ্ঞান পাইতে হইলে ভক্তিসহকারে ঈশ্বরের কাছে প্রত্যহ প্রার্থনা করিতে হয়– সেইজন্য এই মন্ত্রে আছে।

বিশ্বনি দেব সবির্তদুরিতানি পরাসব–
যদভদ্রং তন্ন আসুব।
'হে দেব, পে পিত, আমাদের সমস্ত পাপ দূর করো, যাহা ভদ্র তাহাই আমাদিগকে প্রেরণ করো। ব্রহ্মচারীদের পক্ষে জীবনের প্রতিদিনকে সর্বপ্রকার শারীরিক মানসিক পাপ হইতে নির্মল করিবার জন্য মনুষ্যত্বলাভের জন্য প্রস্তুত হইবার ইহাই প্রকৃষ্ট মন্ত্র– যদভদ্রং তন্ন আসুব।

১৬. বক্তৃতা দিতে অনেক সময়েই চিত্তবিক্ষেপ ঘটায়। অধ্যাত্মসাধনায় ভাবান্দোলনের মূল্য যে অধিক তাহা আমি মনে করি না। ভাবাবেসের অভ্যাস মাদকসেবনের ন্যায় চিত্তদৌর্বল্যজনক। গভীর তত্ত্বগর্ভ সংক্ষিপ্ত প্রাচীন মন্ত্রের ন্যায় ধ্যানের সহায় কিছুই নাই। সাধনার পথে যথ অগ্রসর হওয়া যায় এই-সকল মন্ত্রের অন্তরের মধ্যে ততই গভীরতর রূপে প্রবেশ করা যায়-ইহারা কোথাও যেন বাধা দেয় না। এইজন্য আমি ছাত্রদিগকে উপনিষদের মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া থাকি। মন্ত্র যাহাতে মুখস্থ করার না হইয়া যায় সেজন্য তাহাদিগকে মাঝে মাঝে ব্যাখ্যা করিয়া স্মরণ করাইয়া দিয়া থাকি। কিছুকাল আমার অনুপস্থিতিবশত

> নতুন ছাত্রদিগকে মন্ত্র বুঝাইয়া দিবার অবকাশ পাই নাই। আপনার সঙ্গে যে ছাত্রদিগকে লইয়া যাইবেন তাহাদিগকে যদি আহ্নিকের জন্য উপনিষদের কোনো মন্ত্র বুঝাইয়া বলিয়া দেন তো ভালোই হয়।

প্রকৃতির উদার উন্মুক্ত আহ্বানই রবীন্দ্রনাথকে বৃহত্তর বৈশ্বিক পটভূমির সঙ্গে যুক্ত করে দিচ্ছিল। 'তপোবন' প্রবন্ধেই বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে ভারতের ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক যোগ যে কত গভীর ছিল, তার বর্ণনা দিয়েছেন তিনি। প্রাচীনকালে ব্যক্তি তার সংকীর্ণ বিচরণক্ষেত্র ছাড়িয়ে তখন নিখিলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়েছে। বিশ্বজাগতিকতাকে উপলব্ধি করেছেন।

১০.৪

শিক্ষা প্রশাসন পরিকল্পনা

কুঞ্জলাল ঘোষকে লেখা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ ৬৫ টি অনুচ্ছেদ লিখেছিলেন। এর মধ্যে ১৭ নং থেকে ৪৯ নং পর্যন্ত ৩৩টি অনুচ্ছেদে তিনি বিদ্যালয় পরিচালনার প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ রয়েছে। সেগুলো বিদ্যালয় পরিচালনার আদর্শ প্রশাসনিক নিয়ম-নীতি হিসেবে আজকের দিনেও সমান গুরুত্ব বহন করে। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয় পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার যে দিকগুলো এ অংশে বর্ণনা করেছেন তার মধ্যে – বিদ্যালয়ের প্রতিদিনকার বিভিন্ন কর্মকাণ্ড, শিখন পদ্ধতি, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা, আচার-আচারণ প্রভৃতি বিষয় বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এখানে একজন দক্ষ শিক্ষাপ্রশাসক ও ব্যবস্থাপকের মতো নির্দেশনা দিয়েছেন। শিক্ষাব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এসবের গুরুত্বপূর্ণ অপরিসীম। তাঁর নির্দেশনা নিম্নে উল্লেখ করা যেতে পারে।[৮৮]

১৭. এক্ষণে, আপনার কার্যপ্রণালীর কথা বিবৃত করিয়া বলা যায়। মনোরঞ্জনবাবু, জগদানন্দবাবু ও সুবোধবাবুকে লইয়া একটি সমিতি স্থাপিত হইবে। মনোরঞ্জনবাবু তাহার সভাপতি হইবেন। আপনি উক্ত সমিতির নির্দেশমতে বিদ্যালয়ের কার্যসম্পাদন করিতে থাকিবেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রদের শয্যা হইতে গাত্রোত্থান স্নান আহ্নিক পড়া খেলা শয়ন সম্বন্ধে কাল নির্ধারণ তাঁহারা করিয়া দিবেন-যাহাতে সেই নিয়ম পালিত হয় আপনি তাহাই করিবেন।

১৮. বিদ্যালয়ের ভৃত্যনিয়োগ, তাহাদের বেতননির্ধারণ বা তাহাদিগকে অবসর দান, তাঁহাদের পরামর্শমত আপনি করিবেন।

১৯. মাস শেষে আগামী মাসের একটি আনুমানিক বাজেট সমিতির নিকট হইতে পাস করাইয়া লইবেন। বাজেটের অতিরিক্ত খরচ করিতে হইলে তাঁহাদের লিখিত সম্মতি লইবেন।

২০. খাতায় প্রত্যহ তাঁহাদের সহি লইবেন। সপ্তাহ অন্তর সপ্তাহের হিসাব ও মাসান্তে মাসকাবার তাঁহাদের স্বাক্ষরসহ আমাকে দিতে হইবে।

২১. সমিতির প্রস্তাবিত কোনো নিয়মের পরিবর্তন খাতায় লিখিয়া লইয়া আমাকে জানাইবেন। সায়াহ্নে ছেলেদের খেলা শেষ হইয়া গেলে সমিতির নিকট আপনার সমস্ত মন্তব্য জানাইবেন ও খাতায় সহি লইবেন।

২২. ভাণ্ডারের ভার আপনার উপর। জিনিসপত্র ও গ্রন্থ প্রভৃতি সমস্ত আপনার জিম্মায় থাকিবে। জিনিসপ্রত্রের তালিকায় আপনি সমিতির স্বাক্ষর লইবেন। কোনো জিনিস নষ্ট হইলে, হারাইলে বা বাড়িলে তাঁহাদের স্বাক্ষরসহ তাহা জমাখরচ করিয়া লইবেন।

২৩. আহারের সময় উপস্থিত থাকিয়া ছাত্রদের ভোজন পর্যক্ষেণ করিবেন।

২৪. ছাত্রদের স্বাস্থ্যের প্রতি সর্বদা দৃষ্টি রাখিবেন।

২৫. তাহাদের জিনিসপত্রের পরিপাট্য, তাহাদের ঘর শরীর ও ভেশভূষার নির্মলতা ও পরিচ্ছন্নতার প্রতি মনোযোগী হইবেন।

২৬. ছাত্রদের চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহজনক কিছু লক্ষ্য করিলেই সমিতিকে জানাইয়া তাহা আরম্ভেই সংশোধন করিয়া লইবেন।

২৭. বিদ্যালয়ের ভিতরে, বাহিরে, রান্নঘরে ও তাহার চতুর্দিকে, পায়খানার কাছে কোনোরূপ অপরিষ্কার না থাকে আপনি তাহার তত্ত্বাবধান করিবেন।

২৮. গোশালায় গরু মহিষ ও তাহাদের খাদ্যের ও ভৃত্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

Dhaka University Institutional Repository

২৯. বিদ্যালয়ের সংলগ্ন ফুল ও তরকারির বাগান আপনার হাতে। সেজন্য বীজ ক্রয়, সার সংগ্রহ ও মধ্যে মধ্যে ঠিকা লোক নিয়োগ সমিতিকে জানাইয়া করিতে পারিবেন।

৩০. শান্তিনিকেতনের আশ্রমের সহিত বিদ্যালয়ের সংশ্রব প্রার্থনীয় নহে। জিনিসপত্র ক্রয়, বাজার করা ও বাগান তৈরির সহায়তায় মাঝে মাঝে আশ্রমের মালীদের প্রয়োজন হইতে পারে-কিন্তু অন্যান্য ভৃত্যদের সহিত যোগাযোগ না করাই শ্রেয়।

৩১. ঠিকা লোক প্রভৃতি প্রয়োজন হইলে সর্দারকে বা মালীদিগকে, রবীন্দ্র সিংহকে বা তাহার সহকারীকে জানাইয়া সংগ্রহ করিবেন।

৩২. শান্তিনিকেতনে ঔষধ লইতে রোগী আসিলে তাহাদিগকে হোমিওপ্যাথি ঔষধ দিবেন। যে যে ঔষধের যখন প্রয়োজন হইবে আমাকে তালিকা করিয়া দিলে আমি আনাইয়া দিব।

৩৩. শান্তিনিকেতন-আশ্রম-সম্পর্কীয় কেহ বিদ্যালয়ের প্রতি কোনোপ্রকার হস্তক্ষেপ করিলে-বা সেখানকার ভৃত্যদের কোনো দুর্ব্যব্যহারে বিরক্ত হইলে আমাকে জানাইবেন।

৩৪. জাপানী ছাত্র হোরির আহারাদি ও সর্বপ্রকার স্বচ্ছন্দতার জন্য আপনি বিশেষরূপে মনোযোগী হইবেন।

৩৫. মনোরঞ্জনবাবু ও শিক্ষকদের বিনা অনুমতিতে শান্তিনিকেতনের অতিথি-অভ্যাগত স্কুল পরিদর্শন বা অধ্যাপনের সময় উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না। আপনি যথাসম্ভব বিনয়ের সহিত তাহাদিগকে এই নিয়ম জ্ঞাপন করিবেন।

৩৬. অভিভাবকদের অনুমতি ব্যতীত কোনো ছাত্রকে বিদ্যালয়ের বাহিরে কোথাও যাইতে দিবেন না।

৩৭. বাহিরের লোককে ছাত্রদের সহিত মিশিতে দিবেন না।

৩৮. অধ্যাপকগণ ভৃত্যদের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইলে আপনাকে জানাইবেন-আপনি সমিতিতে জানাইয়া তাহার প্রতিকার করিবেন।

৩৯. আহারাদির ব্যবস্থায় অসন্তুষ্ট হইলে অধ্যাপকগণ ছাত্রদের সমক্ষে বা ভৃত্যদের নিকটে তাহার কোনো আলোচনা না করিয়া আপনাকে জানাইবেন, আপনি সমিতির নিকট তাঁহাদের নালিশ উত্থাপন করিবেন।

৪০. বিশেষ নির্দিষ্ট দিনে ছাত্রগণ যাহাতে অভিভাকগণের নিকট পোস্টকার্ড লেখে তাহার ব্যবস্থা করিবেন। বন্ধ-চিঠি লেখা নিম্নশ্রেণীর ছাত্রদের পক্ষে নিষিদ্ধ জানিবেন।

৪১. পোস্টকার্ড কাগজ কলম বহি প্রভৃতি কেনার হিসাব রাখিয়া অভিভাবকদের নিকট হইতে পত্র লিখিয়া মূল্য আদায় করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

৪২. সমিতি, বিদ্যালয় সম্বন্ধে অভিভাবকদের নিকট জ্ঞাপনীয় বিষয় যাহা স্থির করিবেন আপনি তাহা তাঁহাদিগকে পত্রের দ্বারা জানাইবেন।

৪৩. কোনো বিশেষ ছাত্র সম্বন্ধে আহারাদির বিশেষ বিধি আবশ্যক হইলে সমিতিকে জানাইয়া আপনি তাহা প্রবর্তন করিবেন।

৪৪. কোনো ছাত্রর অভিভাবক কোনো বিশেষ খাদ্যসামগ্রী পাঠাইলে অন্য ছাত্রদিগকে না দিয়া তাহা একজনকে খাইতে দেওয়া হইতে পারিবে না।

৪৫. গোশালায় গরু-মহিষ যে দুধ দিবে তাহা ছাত্রদের কুলাইয়া অবশিষ্ট থাকিলে অধ্যাপকগণ পাইবেন, এ নিয়ম আপনার অবগতির জন্য লিখিলাম।

৪৬. শান্তিনিকেতন-আশ্রমের অতিথি প্রভৃতি কেহ কোনো বই পড়িতে লইলে তাহা যথাসময়ে তাঁহার নিকট হইতে উদ্ধার করিয়া লইতে হইবে।

৪৭. কাহাকেও কলিকাতায় বই লইয়া যাইতে দেওয়া হইবে না। বিশেষ প্রয়োজন হইলে আমার বিশেষ অনুমতি লইতে হইবে।

৪৮. মাসের মধ্যে একদিন থালা ঘটিবাটি প্রভৃতি জিনিসপত্র গণনা করিয়া লইবেন।

৪৯. ছাত্রদের অভিভাবক উপস্থিত হইলে মনোরঞ্জনবাবুর অনুমতি লইয়া নির্দিষ্ট সময়ে ছাত্রদের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া লইবেন।

১০.৫

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

রবীন্দ্রনাথ সমকালীন ভারতীয় মানসবৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তাঁর নিজের শিক্ষাভাবনাকে যুক্ত করে দিয়েছিলেন । উদ্ভাবন করেছিলেন নতুন এক শিক্ষাপ্রণালির। তাঁর ভাবনার কেন্দ্রে ছিল 'অধ্যাত্মসাধনা' ও 'জাতীয়তা'র বোধ। ভারতের অতীত ঐতিহ্য ও গৌরবকে তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি চেয়েছেন জাতীয়তাবোধ উদ্দীপ্ত সুশৃঙ্খল দেশপ্রেমিক নাগরিক সৃষ্টি করতে। এই কাজ করতে গিয়ে তাঁকে দুস্তর পথ পেরুতে হয়েছে। এ ক্ষেত্রে তাঁর বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণই ছিলেন নানা মতাদর্শে বিভক্ত। রবীন্দ্রনাথের আশ্রম বিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত ক্ষিতিশ রায়ের সাক্ষ্যটি এ ক্ষেত্রে স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি লিখেছেন:

> শিক্ষকদের চারটি ধারা ছিল : 'সনাতনপন্থী'-এঁরা ছিলেন গোঁড়া হিন্দুবাদী; 'দেশপ্রেমিক'-এঁরা পশ্চিমী সভ্যতাকে অস্বীকার করেছেন; 'শিক্ষাবিদ'-এঁরা নতুন পদ্ধতিতে পুরনো বিষয়েরই প্রবর্তনা চেয়েছেন এবং 'শৃঙ্খলাবাদী'-এঁরা মনে করতেন যে শিক্ষার্থীদের শুধু নিয়মশৃঙ্খলার জালে বেঁধে শিক্ষা দেওয়া উচিত নয়।[৮৯]

ব্রহ্মচর্যাশ্রম পরিচালনা সংক্রান্ত এই চিঠিটির শেষাংশে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে আশ্রমের শিক্ষকদের সম্পর্ক এবং তাঁর শিক্ষাচিন্তাকে অন্যদের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেওয়ার সমস্যা সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। ইশোহিনোরি হোরি নামের এক জাপানি শিক্ষার্থীর মাধ্যমে বৈশ্বিক ভাবনার দ্বারাও তিনি স্পৃষ্ট ছিলেন । হোরি ছিলেন শান্তিনিকেতনের প্রথম বিদেশি শিক্ষার্থী [৯০] প্রকৃতির সাহচর্যে যে শিক্ষার্থীদের জীবন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে তার কথাও এই চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ বেশ গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের লেখা চিঠির ৫০ নং অনুচ্ছেদ থেকে ৬৫ নং অনুচ্ছেদ পর্যন্ত বিষয়গুলো দেখে নেওয়া যায়। যেমন:

৫০. উপস্থিতমত এই নিয়মগুলি লিখিয়া দিলাম। ক্রমশ আবশ্যকমত ইহার অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হইবে। কিন্তু প্রধানত নিয়মের সাহায্যেই বিদ্যালয়-চালনার প্রতি আমার বিশেষ আস্থা নাই। কারণ, শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়টি পড়া গিলাইবার কলমাত্র নহে। স্বতউৎসারিত মঙ্গল ইচ্ছার সহায়তা ব্যতীত ইহার উদ্দেশ্য সফল হইবে না।

৫১. এই বিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণকে আমি আমার অধীনস্থ বলিয়া মনে করি না। তাঁহারা স্বাধীন শুভবুদ্ধির দ্বারা কর্তব্য সম্পাদন করিয়া লইবেন ইহাই আমি আশা করি এবং ইহার জন্যই আমি সর্বদা প্রতীক্ষা করিয়া থাকি। কোনো অনুশাসনের কৃত্রিম শক্তির দ্বারা আমি তাঁহাদিগকে পুর্ণকর্মে বাহ্যিকভাবে প্রবৃত্ত করিতে ইচ্ছা করি না। তাঁহাদিগকে আমার বন্ধু বলিয়া এবং সহযোগী বলিয়াই জানি। বিদ্যালয়ের কর্ম যেমন আমার, তেমনি তাঁহাদেরও কর্ম-এ যদি না হয় তবে এ বিদ্যালয়ের বৃথা প্রতিষ্ঠা।

৫২. আমি যে ভাবোৎসাহের প্রেরণায় সাহিত্যিক ও আর্থিক ক্ষতি এবং শারীরিক মানসিক নানা কষ্ট স্বীকার করিয়া এই বিদ্যালয়ের কর্মে আত্মোৎসর্গ করিয়াছি সেই ভাবাবেগ আমি সকলের কাছে আশা করি না। অনতিকালপূর্বে এমন সময় ছিল যখন আমি নিজের কাছ হইতেও ইহা আশা করিতে পারিতাম না। কিন্তু আমি অনেক চিন্তা করিয়া সুস্পষ্ট বুঝিয়াছি যে, বাল্যকালে ব্রহ্মচর্যব্রত, অর্থাৎ আত্মসংযম, শারীরিক ও মানসিক নির্মলতা, একাগ্রতা, গুরুভক্তি এবং বিদ্যাকে মনুষ্যত্বলাভের উপায় বলিয়া জানিয়া শান্ত সমাহিত ভাবে শ্রদ্ধার সহিত গুরুর নিকট হইতে সাধনা-সহকারে তাহা দুর্লভ ধনের ন্যায় গ্রহণ করা-ইহাই ভারতবর্ষের একমাত্র রক্ষার উপায়।

৫৩. কিন্তু এই মত ও আগ্রহ আমি যদি অন্যের মনে সঞ্চার করিয়া না দিতে পারি তবে সে আমার অক্ষমতা ও দুর্ভাগ্য-অন্যকে সেজন্য আমি দোষ দিতে পারি না। নিজের ভাব জোর করিয়া কাহারও উপর চাপানো যায় না- এবং এ সকল ব্যাপারে কপটতা ও ভান সর্বাপেক্ষা হেয়।

৫৪. আমার মনের মধ্যে একটি ভাবের সম্পূর্ণতা জাগিতেছে বলিয়া অনুষ্ঠিত সমস্ত ত্রুটি দৈন্য অপূর্ণতা অতিক্রম করিয়াও আমি সমগ্রভাবে আমার আদর্শকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই-বর্তমানের মধ্যে ভবিষ্যৎকে, বীজের মধ্যে বৃক্ষকে উপলব্ধি করিতে পারি- সেইজন্য সমস্ত খণ্ডতা দীনতা সত্ত্বেও, ভাবের তুলনায় কর্মের যথেষ্ট অসংগতি থাকিলেও আমার উৎসাহ ও আশা ম্রিয়মান হইয়া পড়ে না।

৫৫. যিনি আমার কাজকে খণ্ড খণ্ড ভাবে প্রতিদিনের মধ্যে বর্তমানের মধ্যে দেখিবেন, নানা বাধা-বিরোধ ও অভাবের মধ্যে দেখিবেন, তাঁহার উৎসাহ আশা সর্বদা সজাগ না থাকিতে পারে। সেইজন্য আমি কাহারও কাছে বেশি কিছু দাবি করি না, সর্বদা আমার উদ্দেশ্য লইয়া অন্যকে বলপূর্বক উৎসাহিত করিবার চেষ্টা করি না- কালের উপরে, সত্যের উপরে বিধাতার উপরে সম্পূর্ণ ধৈর্য্যের সহিত নির্ভর করিয়া থাকি। ধীরে ধীরে স্বাভাবিক নিয়মে অন্তরের ভিতর হইতে অলক্ষ্য শক্তিতে যাহার বিকাশ হয় তাহাই যথার্থ এবং তাহার উপরেই নির্ভর করা যায়। ক্রমাগত বাহিরের উত্তেজনায়, কতক লজ্জায়, কতক ভাবাবেগে, কতক

অনুকরণে যাহার উৎপত্তি হয় তাহার উপরে সম্পূর্ণ করা যায় না এবং অনেক সময়ে তাহা হইতে কুফল উৎপন্ন হয়।

৫৬. আমি আশা করিয়া আছি যে, অধ্যাপকগণ আমার অনুশাসনে নহে, অন্তরস্থ কল্যাণবীজের সহজ বিকাশে ক্রমশই আগ্রহের সহিত আনন্দের সহিত ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সঙ্গে নিজের জীবনকে একীভূত করিতে পারিবেন।

৫৭. তাঁহারা প্রত্যহ যেমন ছাত্রদের সেবা ও প্রণাম গ্রহণ করিবেন তেমনি আত্মত্যাগ ও আত্মসংযমের দ্বারা ছাত্রদের নিকটে আপনাদিগকে প্রকৃত ভক্তির পাত্র করিয়া তুলিবেন। পক্ষপাত অবিচার অধৈর্য, অল্প কারণে অকস্মাৎ রোষ, অভিমান, অপ্রসন্নতা, ছাত্র বা ভৃত্যদের সম্বন্ধে চপলতা, লঘুচিত্ততা, ছোটোখাটো অভ্যাসদোষ, এ-সমস্ত প্রতিদিনের প্রাণপণ যত্নে পরিহার করিতে থাকিবেন।

৫৮. নিজেরা ত্যাগ ও সংযম অভ্যাস না করিলে ছাত্রদের নিকট তাঁহাদের সমস্ত উপদেশ নিষ্ফল হইবে এবং ব্রহ্মচর্যাশ্রমের উজ্জ্বলতা ম্লান হইয়া যাইতে থাকিবে। ছাত্ররা বাহিরে ভক্তি ও মনে মনে উপেক্ষা করিতে যেন না শেখে।

৫৯. আমার ইচ্ছা, গুরুদের সেবা ও অতিথিদের প্রতি আতিথ্য প্রভৃতি কার্যে রথীর দ্বারা বিদ্যালয়ে আদর্শ স্থাপণ করা হয়। এ-সমস্ত কাজে যথার্থ গৌরব আছে, অবমান নাই-এই কথা যেন ছাত্রদের মনে মুদ্রিত হয়। সকলেই যেন আগ্রহের সহিত অগ্রসর হইয়া এই-সমস্ত সেবাকার্যে প্রবৃত্ত হয়। অভ্যাগতদের অভিবাদন, তাঁহাদের সহিত শিষ্টালাপ ও তাঁহাদের প্রতি সযত্ন ব্যবহার যেন সকল ছাত্রকে বিশেষরূপে অভ্যাস করানো হয়।

৬০. বিদ্যালয়ের নিকটে কোনো আগন্তুক উপস্থিত হইলে তাহাকে যেন বিনয়ের সহিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে শেখে-ছাত্রগণ ভৃত্যদের প্রতি যেন অবজ্ঞা প্রকাশ না করে এবং তাহারা পীড়াগ্রস্ত হইলে যেন তাহাদের সংবাদ লয়। ছাত্রদের মধ্যে কাহারও পীড়া হইলে তাহাকে যথাসময়ে ঔষধ ও পথ্য সেবন করানো ও তাহার অন্যান্য শুশ্রূষার ভার যেন ছাত্রদের প্রতি অর্পিত হয়। ভৃত্যদের দ্বারা যত অল্প কাজ করানো যাইতে পারে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। আপনি যদি সংগত ও সুবিধাজনক মনে করেন তবে গোশালায় গাভীগুলির তত্ত্বাবধানের ভার ছাত্রদের প্রতি কিয়ৎপরিমাণে অর্পণ করিতে পারেন।

৬১. দুইটি হরিণ আছে, ছাত্রগণ যদি তাহাদিগকে স্বহস্তে আহারাদি দিয়া পোষ মানাইতে পারে তবে ভালো হয়। আমার ইচ্ছা কয়েকটি পাখি মাছ ও ছোটো জন্তু আশ্রমে রাখিয়া ছাত্রদের প্রতি তাহাদের পালনের ভার দেওয়া হয়। পাখি খাঁচায় না রাখিয়া প্রত্যহ আহারাদি দিয়া ধৈর্যের সহিত মুক্ত পাখিদিগকে বশ করানোই ভালো। শান্তিনিকেতনে কতকগুলি পায়রা আশ্রয় লইয়াছে, চেষ্টা করিলে ছাত্ররা তাহাদিগকে ও কাঠবেড়ালিদিগকে বশ করাইতে পারে। লাইব্রেরী গোছানো, ঘর পরিপাটি রাখা, বাগানের যত্ন করা, এ-সমস্ত কাজের ভার যথাসম্ভব ছাত্রদের প্রতিই অর্পণ করা উচিত জানিবেন।

৬২. জাপানী ছাত্র হোরির সেবাভার রথী প্রভৃতি কোনো বিশেষ ছাত্রের উপর দিবেন। এনট্রোন্স পরীক্ষার ব্যস্ততায় আপাতত তাহার যদি একান্ত সময়াভাব ঘটে তবে আর কোনো ছাত্রের উপর অথবা পালা করিয়া বয়স্ক ছাত্রদের উপর দিবেন। তাহারা যেন যথাসময়ে স্বহস্তে হোরিকে পরিবেশন করে। প্রাতঃকালে তাহারা বিছানা ঠিক করিয়া দেয়-যথাসময়ে তাহার তত্ত্ব লইতে থাকে-নাবার ঘবে ভৃত্যেরা তাহার আবশ্যকমত জল দিয়াছে কি না পর্যবেক্ষণ করে। প্রথম দুই-একদিন রথীর দ্বারা এই কাজ করাইলে অন্য ছাত্রেরা কোনো প্রকার সংকোচ অনুভব করিবে না।

৬৩. ছাত্ররা যখন খাইতে বসিবে তখন পালা করিয়া একজন ছাত্র পরিবেশন করিলে ভালো হয়। ব্রাহ্মণ পরিবেশক না হইলে আপত্তিজনক হইতে পারে। অতএব সে সম্বন্ধে বিহিত ব্যবস্থাই কর্তব্য হইবে। রবিবারে মাঝে মাঝে চড়িভাতি করিয়া ছেলেরা স্বহস্তে রন্ধনাদি করিলে ভালো হয়।

৬৪. সম্প্রতি নানা উদবেগের মধ্যে আছি, এজন্য সকল কথা ভালোরূপ চিন্তা করিয়া লিখিতে পারিলাম না। আপনি সেখানাকার কাজে যোগদান করিলে একে একে অনেক কথা আপনার মনে উদয় হইবে, তখন অধ্যাপকগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া আপনার মন্তব্য আমাকে জানাইবেন।

৬৫. আপনার প্রতি আমার কোনো আদেশ-নির্দেশ নাই; আপনি সমবেদনার দ্বারা, শ্রদ্ধা ও প্রীতির দ্বারা আমার হৃদয়ের ভাব অনুভব করিবেন এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত কল্যাণকামনার দ্বারা কর্তব্যের শাসনে স্বাধীনভাবে ধরা দিবেন এবং যদষৎ কর্ম প্রকুর্বীত তদব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ।

রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয় পরিচালনার উল্লিখিত যে দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেন, তা গঠনে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথ প্রস্তাবিত খসড়া নিয়মাবলীকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। উল্লিখিত নিয়মাবলী থেকেই বোঝা যায় শিক্ষাবিদ হিসেবে রবীন্দ্রনাথ কতটা সুগভীর চিন্তার পরিচয় দিয়েছিলেন।[৯১] রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাদানের সময় তিনি শিক্ষার মূল বিষয়টি অনুধাবনে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তিনি বলেন:

Dhaka University Institutional Repository

> ...শিক্ষা বলতে কি বোঝায়? প্রাণকে সম্পূর্ণ জাগানো। প্রাণ বলতেই বোঝায় সত্য আগ্রহের লক্ষ্য ধরে নিরন্তর এগোনো। আমাদের দেশে মানুষ আগ্রহহীন-মানুষের প্রতি তাদের আগ্রহ নেই, জ্ঞানের প্রতিও।...শিশুকাল থেকে ছেলেদের মনে আমরা শিক্ষণীয় বিষয় ভারী করে চালাই, তাতেই শিক্ষার আগ্রহ মারা পড়ে অর্থাৎ চিত্তকে আমরা বইয়ের শেলফের মতো দেখি, প্রাণবান জিনিসের মতো দেখিনে। আমাদের দেশে সবচেয়ে দরকার শিশুকাল থেকেই আমাদের ছেলেমেয়েদের মনে আগ্রহ জন্মিয়ে দেওয়া-চারিদিকে যা কিছু আছে সবতাতেই তাদের আগ্রহ জাগানো চাই-বিচিত্র বিষয়ে-কেননা মনের খোরাক দেহের খোরাকের মতোই বিচিত্র। আমাদের শিক্ষকদের নিজেরই মনে চারিদিকের প্রতি ছাত্রদের প্রতি আগ্রহ নেই বলেই তারা কেবল মরামন হয়। সে মন অকর্মকভাবে বস্তু ধারণ করতেই পারে, কিন্তু রূপ সৃষ্টি করতে পারে না। তারা বীজের বস্তার মত, বীজকে ফলানো তাদের কর্ম নয়-কারণ বীজের প্রতি তাদের প্রাণগত আগ্রহ নেই। যে শিক্ষক যে বিষয়টি সর্বদাই নিজে পড়ে না, অন্যকে পড়ায়, তার শিক্ষকতার অধিকার নেই।[৯২]

তিনি শিক্ষকের দ্বায়িত্ব প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রতি সম্মান দেওয়ার কথা বলেছেন। অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লেখা এক পত্রে তিনি লিখেছেন:

> .মানুষকে শ্রদ্ধা করাইা হচ্ছে মানুষের সকলের চেয়ে বড় সেবা।...আমি আমার বিদ্যালয়ের ছেলেদের চিত্তকে এই শ্রদ্ধার দ্বারা জাগ্রত করতে চাই। কেননা মানুষের প্রত্যেকের মধ্যেই এই শ্রদ্ধার সামগ্রী আছে-সেই দেবতার পূজা করলেই সে দেবতা দর্শন দেন। ছেলেদের যদি আমরা শ্রদ্ধা করি তবে তাদের যেটি শ্রদ্ধেয় সেইটেই বড় হয়ে ওঠে। তারা পারবে না, তারা ফাঁকি দেবে এ কথাটা গভীরভাবে সত্য নয়-...ভিতরে শক্তি আছে তাকে তাগিদ করলে তবে সে দেখা দেয়-আমরা অনেক সময়ে কেবল তার উল্টোই করি-বিশেষত ছেলেদের উপর আমাদের জোর খাটে বলেই আমরা অল্প কারণে এবং নির্বিচারে তাদের অপমান করি- এই অপমানের দ্বারা তাদের মন্দকে আমরা যত আঘাত করি তার চেয়ে তাদের ভালোক আমরা ঢের বেশি আঘাত করে থাকি। ছেলেদের আমরা দান করব তারা আমাদের কাছে গ্রহণ করবে এই আমাদের সম্বন্ধ-এই সম্বন্ধ অনুসারে ছেলেরা আমাদের নীচে দাঁড়ায় বলেই তাদের সম্বন্ধে আমাদের অত্যন্ত সতর্ক হওয়া দরকার।[৯৩]

১০.৬

ছাত্র–শিক্ষক সম্পর্ক

শিক্ষা সামগ্রিকভাবে গুরু-শিষ্যের সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল। তাই তিনি 'গুরু-শিষ্যের আধ্যাত্মিক-পারমার্থিক সমন্ধ স্থাপনকেই শান্তিনিকেতন ব্রাহ্মবিদ্যালয়ের মূখ্য উদ্দেশ্য'করেছিলেন। এখানে জাতীয়বাদী লক্ষ্য অর্জনেও তিনি সমান গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন:

> ব্রাহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে স্বদেশের প্রতি বিশেষরূপে ভক্তিশ্রদ্ধাবান করিতে চাই। পিতামাতায় যেরূপ দেবতার বিশেষ আবির্ভাব আছে–তেমনি আমাদের পক্ষে আমাদের স্বদেশে, আমাদের পিতৃপিতামহদিগের জন্ম ও শিক্ষা-স্থানে দেবতার বিশেষ সত্তা আছে। পিতামাতা যেমন দেবতা তেমনি স্বদেশেও দেবতা। স্বদেশকে লঘুচিত্তে অবজ্ঞা, উপহাস ঘৃণা ,এমন-কি অন্যান্য দেশের তুলনায় ছাত্ররা যাহাতে খর্ব করিতে না শেখে সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে চাই।[৯৪]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষাচিন্তায় শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর মতে, শিক্ষকও শিক্ষাব্যবস্থার অপরিহার্য এক অংশ। শিক্ষকের সেবামূলক মনোভাব একান্ত জরুরি বলে তিনি মত প্রকাশ করেছেন। শিক্ষকের মাঝে তিনি প্রত্যাশা করেছেন চিরন্তন জ্ঞানপিপাসা। তাঁর কাছে জ্ঞানই শক্তি। যিনি পরম জ্ঞানী তিনিই অনন্ত শক্তির অধিকারী। শিক্ষকের চিরন্তন জ্ঞানপিপাসা না থাকলে তিনি কিছুতেই শিক্ষার্থীর জ্ঞানচাহিদা মেটাতে পারবেন না। প্রসঙ্গত তিনি লিখেছেন:

> A most important truth which we are apt (appropriate) to forger is that a teracher can never truly teach unless he is still learning himself. A lamp can never light another lamp unless it continues to burn its own flame. [৯৫]

ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে সম্পর্কের কথা বলতে গিয়ে তিনি লিখেছেন:

Dhaka University Institutional Repository

> শান্তিনিকেতনে আমি ছাত্রদের মধ্যে বিশ বছর বাস করছি; সেখানে আমি তাদের সঙ্গের সঙ্গী। আমাদের মধ্যে যে কেবল গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ তা নয়। সম্মানের যে-দুরত্ব তার উপর দাঁড়িয়ে আমি কাজ করিনি, বয়স্য ভাবে তাদের সঙ্গে যুক্ত হ'তে চেষ্টা করেছি। কেননা আমার বিশ্বাস, অন্তরে তাদের সমবয়সী না হ'তে পারলে তাদের কিছু দিতে পারা যায় না।...আমার প্রাচীন বয়স আধুনিককালের সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ ঘটাতে পারেনি। তোমরা যদি আমার কবিতা পাঠ কর তা হ'লে দেখতে পাবে, আমি তারুণ্যের কবি, আমার বাণী এই নবযুগেরই বাণী; জীর্ণকে, অর্ধমৃতকে আঁকড়ে ধ'রে, অতীতের দিকে উজানে পাড়ি দিতে আমি কখনো বলিনে। তোমরা যারা যুবক তাদের মধ্যে যৌবনের সাহস হোক, যৌবনের যা ধর্ম-নতুনের পরীক্ষা দ্বারা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা, দুঃসাহসের ভিতর দিয়ে নিজের বীর্য পরীক্ষা করা, তাই তোমাদের হোক। নির্জীব সংস্কারের জালে নিজের জীবনকে ক্ষুদ্র স্বার্থের সঙ্গে রাখা, এ যেন তোমাদের না ঘটে, নব জীবনের চাঞ্চল্য তোমাদের মধ্যে আসুক। প্রাণের ক্ষেত্র থেকে প্রত্যক্ষভাবে তোমরা জ্ঞান আহরণ করো, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করো।[৯৬]

১১

নারীশিক্ষা

বিশ শতকের সূচনায় স্বদেশি আন্দোলন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যে মোহভঙ্গ হয়। এই প্রেক্ষাপটেই শান্তিনিকেতনের শিক্ষাবিধিতে পরিবর্তন একান্ত জরুরী হয়ে ওঠে। তিনি তখন বৃহৎ মানবিক বোধে তাড়িত হয়ে শান্তিনিকেতনের আশ্রমটিকে নতুন করে গড়ে তুলার ব্রত গ্রহণ করেন। এ সময়ে শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর নানা উদ্ভাবনারও পরিচয় পাওয়া যায়। সেগুলোর মধ্যে নারীশিক্ষা, পল্লির সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া, প্রকৃতির নানা বিষয় অনুসঙ্গের প্রতি বিশেষ মনোযোগ এবং শিক্ষাক্রমে শিল্পকলার অন্তর্ভুক্তি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এ সময় তিনি নারীশিক্ষা সম্পর্কে বিশেষভাবে দায়িত্ব সচেতন হয়ে উঠেন।

রবীন্দ্রনাথ নারীশিক্ষা অকুণ্ঠ সমর্থক ছিলেন। নারীশিক্ষায় পুরুষের লাভ, সমাজের উপকার, এসব কারণে তিনি নারীশিক্ষায় নিজেকে নিয়োজিত করেননি। তাঁর লক্ষ্য ছিল আরো বিস্তৃত আরো ব্যাপক। এই দুটি আনুষঙ্গিক বিষয় তাঁর চিন্তায় ছিল গৌণ, মুখ্য ছিল– নারীকে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব অর্জন করতে হবে এবং তার ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটাইতে হবে। এ ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে যে মৌলিক পার্থক্য থাকে তাকে তিনি অস্বীকার করেননি। শিক্ষার ক্ষেত্রে সেই ভেদকে মেনে নিয়েই তিনি নারীশিক্ষা বিষয়ে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ মতামত ব্যক্ত করেছেন। অনেকের আশঙ্কা ছিল যে 'শিক্ষা' নারীপ্রকৃতির স্বাতন্ত্র্যকে নষ্ট করে দেবে। রবীন্দ্রনাথ কখনো তা মনে করতেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন শিক্ষা যদি যথার্থ হয়, তাহলে লোকের এ আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক। তিনি বলেছেন– '...আমার ধারণা এই যে, মেয়েরা যদি-বা কাণ্ট্‌হেগেলও পড়ে তবু শিশুদের স্নেহ করিবে এবং পুরুষদের নিতান্ত দুর-ছাই করিবে না।'[৯৭] শিক্ষার সার্বভৌম দিক এবং জাতীয় শিক্ষার দিক যেমন সত্য বলে তিনি সিদ্ধান্ত করেছিলেন, নারীশিক্ষা শিক্ষার ক্ষেত্রেও তাঁর অভিমত অনুরূপ ছিল, সাধারণ এবং বিশেষ এই দুই দিকের সত্যকে স্বীকার করা। তিনি লিখেছেন:

> ...শিক্ষাপ্রণালীতে মেয়ে-পুরুষে কোথাও কোনো ভেদ থাকিবে না, একথা বলিলে বিধাতাকে অমান্য করা হয়। বিদ্যার দুটো বিভাগ আছে। একটা বিশুদ্ধ জ্ঞানের, একটা ব্যবহারের। যেখানে বিশুদ্ধ জ্ঞান সেখানে মেয়ে-পুরুষে পার্থক্য নাই, কিন্তু যেখানে ব্যবহার সেখানে পার্থক্য আছেই। মেয়েদের মানুষ হইতে শিখাইবার জন্য বিশুদ্ধ জ্ঞানের শিক্ষা চাই, কিন্তু তার উপরে মেয়েদের মেয়ে হইতে শিখাইবার জন্য যে ব্যবহারিক শিক্ষা তার একটা বিশেষত্ব আছে...।[৯৮]

রবীন্দ্রনাথ পুরুষের সুবিধার দিকে তাকিয়ে এ কথা বলেননি, বলেছেন নারীর নিজস্ব ভুমিকার গরজে, তাদের নিজস্ব স্বভাবের গরজে। অনেক সময় পরিবার ও সমাজ এমন কুযুক্তি এনে উপস্থিত করে যা নারীমুক্তির পরিপন্থি এবং নারী-ব্যক্তিত্বের বিকাশের প্রধান বাধা হয়ে উঠে। এই কুযুক্তিকে রবীন্দ্রনাথ কখনোই প্রশ্রয় দেননি। এ প্রসঙ্গে তিনি পরিবার ও সমাজের হীন নীতি নির্ধারকদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন:

> '..স্ত্রী হওয়া, মা হওয়া, মেয়েদের স্বভাব, দাসী হওয়া নয়।'[৯৯]...বিশুদ্ধ জ্ঞানের শিক্ষা নিয়ে কোনো প্রশ্নই নেই, ব্যবহারিক শিক্ষাও এমন হওয়া চাই যে, ...পুরুষ পুরুষই থাকিবে, মেয়েরা মেয়ে থাকিয়া যাইবে

> বলিয়াই তার 'সংকটে সহায়, দুরুহ চিন্তায় অংশী এবং সুখে দুঃখে সহচরী হইয়া সংসারে তাহার প্রকৃত সহযাত্রী হইবেন।[১০০]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষাপ্রণালীতে নারী -পুরুষে কোথাও কোনো ভেদ থাকবে না, সেকথা যেমন বলেননি তেমনি সেই ভেদরেখা দ্বারা নারীকে আরাদা করার কথাও বলেননি। তিনি পরিবার ও সমাজ সংগঠনের সুখ ও শান্তির জন্য এ দুটির সমন্বয় সাধন করতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন:

> ... স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত না হ'লে বর্তমান শিক্ষিত সমাজে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সভমঞ্জস্য নষ্ট হয়। আমাদের দেশে বিদেশী শিক্ষা প্রচলিত হওয়াতে ইংরাজি যে জানে এবং ইংরাজি যে জানে না তাদের মধ্যে একটা জাতিভেদের মত দাঁড়াচ্ছে, অতএব অধিকাংশ স্থলেই আমাদের বরকন্যার মধ্যে যথার্থ অসবর্ণ বিবাহ হচ্ছে। একজনের চিন্তা, চিন্তার ভাষা, বিশ্বাস এবং কাজ আর এক জনের সঙ্গে বিস্তর বিভিন্ন।এই জন্যে আমাদের আধুনিক দাম্পত্যে অনেক প্রহসন এবং সম্ভবত অনেক ষ্ট্যাজিডিও ঘটে' থাকে। স্বামী যেখানে ঝাঁঝালো সোডাওয়াটার চায়, স্ত্রী সেখানে সুশীতল ডাবের জল এনে উপস্থিত করে।....এই জন্যে সমাজে স্ত্রীশিক্ষা ক্রমশই প্রচলিত হচ্ছে; কারো বক্তৃতায় নয়, কর্তব্য জ্ঞানে নয়, আবশ্যকের বশে।[১০১]

১২

জনশিক্ষা ও পল্লি উন্নয়ন

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর লোকশিক্ষা প্রবন্ধে জানিয়েছিলেন যে, ইংরেজ-প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষিত আর অশিক্ষিত দুটি পৃথক জাতিতে পরিণত হয়েছে। ইংরেজি শিক্ষার গুণে লোকশিক্ষার পথ রুদ্ধ হওয়াতে, অশিক্ষিত জনসাধারণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। লোকশিক্ষা বা জনশিক্ষার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথও তাই মনে করেছেন। এ কারণেই তিনি ইংরেজি শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। এই বিদেশি শিক্ষার বিরুদ্ধে তাঁর প্রধান অভিযোগ ছিল দুটি।

এক. জনশিক্ষার সমস্ত পথকে বিলুপ্ত করে দেওয়া ।

দুই. শিক্ষিত শহরবাসী এবং অশিক্ষিত গ্রামবাসী, দেশকে এইভাবে দুই পৃথক জাতিতে পরিণত করে দেওয়া।

ব্রিটিশ শাসনের আগে এ দেশে যে গ্রাম্য পাঠশালা সেগুলো ব্রিটিশ শাসন ও ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে প্রাথমিক ক্রমেই তা বিলুপ্ত হয়েছে। এর ফলে জনশিক্ষা বিস্তারের সহজ পথ বন্ধ হয়ে গেছে। যে কারণে সমাজে সাধারণ মানুষ আরো ব্যাপকভাবে অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারে নিমজ্জিত হয়েছে। শিক্ষা না থাকায় উন্নতির কোনো রাস্তাও তারা তৈরি করতে পারে না । রবীন্দ্রনাথ এই সমস্যাকে গভীরভাবে অনুধাবন করে দেখেছেন যে দেশের সবচেয়ে বড় জাতিভেদ এবং শ্রেণি বৈষম্যের কারণ হচ্ছে ইংরেজি শিক্ষার আগ্রাসনে জনশিক্ষার পথের বিলুপ্তি। এ প্রসঙ্গে 'শিক্ষার বিকিরণ' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন:

> কেউ কেউ তথ্য গণনা করে দেখিয়েছেন, পূর্বকালে এ দেশে গ্রাম্য পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষার যে উদ্যোগ ছিল ব্রিটিশ শাসনে ক্রমেই তা কমেছে।[১০২] কিন্তু তার চেয়ে সর্বনেশে ক্ষতি হয়েছে, জনশিক্ষাবিধির সহজ পথ রুদ্ধ হয়ে জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানের অনাবৃষ্টি চিরকালীন হয়ে দাঁড়ালো, অন্য দিকে আধুনিক কালের নতুন বিদ্যার যে আবির্ভাব হল তার প্রবাহ বইল না সর্বজনীন দেশের অভিমুখে।...ইংরেজি শিখে যাঁরা বিশিষ্টতা পেয়েছেন তাঁদের মনের মিল হয় না সর্বসাধারণের সঙ্গে। দেশে সকলের চেয়ে বড়ো জাতিভেদ এইখানেই, শ্রেণীতে শ্রেণীতে অস্পৃশ্যতা।[১০৩]

রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাকে কখনো উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখতে চাননি। তিনি শিক্ষায় সবার সমান অধিকার থাকার কথা বলেছেন। তাঁর শিক্ষানীতিতে শিক্ষা কেবল শহরবাসীর জন্য নয়, যে শিক্ষা দেশের সমস্ত মানুষের জন্য, সেই শিক্ষাই শিক্ষা। রুশদেশে সেই শিক্ষার আলোক সর্বত্র বিকিরিত হয়েছে বলে রবীন্দ্রনাথ সেই দেশকে তীর্থস্থান বলে গণ্য করেছেন। মস্কোর উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপকদের সঙ্গে আলাপের কালে (১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৩০) নিজের শিক্ষা এক্সপেরিমেন্টের কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের স্কুলের উপর জোড় দেননি, জোর দিয়েছেন শ্রীনিকেতনের শিক্ষাসত্রের উপর।

আশা করেছেন যে এই গ্রামীণ বিদ্যালয়টিই এক সময় ভবিষ্যতের আলোকবর্তিকা হয়ে উঠবে। রবীন্দ্রনাথ রাশিয়া থেকে ১৯৩০ সালের ২০ সেপ্টেম্বও তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথকে এক পত্রে এ কথা জানিয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন:

> ..... এতকাল সমাজের অধিকাংশ লোক শিক্ষার পূর্ণ সুযোগ থেকে বঞ্চিত ভারতবর্ষ তো প্রায় সম্পূর্ণই বঞ্চিত। এখানে সেই শিক্ষা যে কি আশ্চর্য উদ্যমে সমাজের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হচ্ছে তা দেখলে বিস্মিত হতে হয়। শিক্ষার পরিমাণ শুধু সংখ্যায় নয়, তার সম্পূর্ণতায় তার প্রবলতায়। কোনো মানুষই যাতে নিঃসহায় ও নিস্কর্মা হয়ে না থাকে এ জন্যে কি প্রচুর আয়োজন ও কি বিপুল উদ্যেম। শুধু শ্বেত রাশিয়ার জন্যে নয়- মধ্য এশিয়ার অর্ধ-সভ্য জাতের মধ্যেও এরা বন্যার মতো বেগে শিক্ষা বিস্তার করে চলেছে সায়েন্সের শেষ ফসল পর্যন্ত যাতে তারা প্রায় এইজন্যে প্রয়াসের অন্ত নেই। এখানে থিয়েটারে ভাল ভাল অপেরা ও বড়ো বড়ো নাটকের অভিনয়ে বিষম ভিড় কিন্তু যারা দেখছে তারা কৃষিও কর্মীদের দলের। কোথাও এদের অপমান নেই। ইতিমধ্যে এদের যে দুই একটা প্রতিষ্ঠান দেখলুম সর্ব্বত্রই লক্ষ্য করছি এদের চিত্তের জাগরণ এবং আত্মমর্যাদার আনন্দ। আমাদের দেশের জনসাধারণের ত কথাই নেই ইংলন্ডের মজুর শ্রেণীর সঙ্গে তুলনা করলে আকাশ পাতাল তফাৎ দেখা যায়। আমরা শ্রীনিকেতনে যা করতে চেয়েছি এরা সমস্ত দেশ জুড়ে প্রকৃষ্টভাবে তাই করছে। আমাদের কর্মীরা কিছুদিন যদি এখানে এসে শিক্ষা করে যেতে পারত তাহলে ভারি উপকার হত।[১০৪]

রবীন্দ্রনাথ রাশিয়া ভ্রমণে গিয়ে আমাদের দেশে প্রাচীনকালে প্রচলিত উচ্চবর্ণ এবং উচ্চবিত্ত মানুষদের জন্য উচ্চশিক্ষা আর দেশের জনসাধারণের জন্য লোকশিক্ষা ও কথা স্মরণ করেছেন সে দেশের জনশিক্ষার ব্যবস্থা দেখে। সে দেশে সাধারণ মানুষের জন্য শিক্ষার সুযোগ সুবিধা প্রত্যক্ষ করে যেমন পুরকিত হয়েছেন তেমনি আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের জন্য শিক্ষার সুযোগ না থাকার কথা ভেবে দুঃখ পেয়েছেন। এ বিষয়ে তাঁর অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন:

> চিরকালই মানুষের সভ্যতায় একদল অখ্যাত লোক থাকে, তাদেরই সংখ্যা বেশি, তারাই বাহন; তাদের মানুষ হবার সময় নেই; দেশের সম্পদের উচ্ছিষ্টে তারা পালিত। সবচেয়ে কম খেয়ে কম পরে কম শিখে সবচেয়ে বেশি তাদের অসম্মান। কথায় কথায় তারা রোগের মরে, উপোষে মরে, উপরওয়লাদের লাথি ঝাঁটা খেয়ে মরে জীবন যাত্রার জন্য যত কিছু সুযোগ সুবিধে, সব কিছু থেকেই তারা বঞ্চিত। তারা সভ্যতার পিলসুজ মাথায় প্রদীপ নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে- উপরের সবাই আলো পায়, তাদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে। আমি অনেকদিন এদের কথা ভেবেছি, মনে হয়েছে এর কোনো উপায় নেই। একদল তলায় না থাকলে আর একদল উপরে থাকতেই পারে না, অথচ উপরে থাকার দরকার আছে। উপরে না থাকলে নিতান্ত কাছের সীমার বাইরে কিছু দেখা যায় না; কেবলমাত্র জীবিকা নির্বাহ করার জন্যে ত মানুষের মনুষ্যত্ব নয়। একান্ত জীবিকাকে অতিক্রম করে তবেই তার সভ্যতা। ... যে সব মানুষ, শুধু অবস্থার গতিকে নয়, শরীর মনের গতিকে নীচের তলার কাজ করতে বাধ্য এবং সেই কাজেরই যোগ্য, যথাসম্ভব তাদের শিক্ষা স্বাস্থ্য সুখ সুবিধার জন্যে চেষ্টা করা উচিত।[১০৫]

রবীন্দ্রনাথের জনশিক্ষা বিস্তারের মূল উদ্দেশ্য ছিল পল্লি উন্নয় তথা গ্রামের সাধারণ মানুষের জীবন-মানের উন্নতি সাধন। গ্রাম উন্নয়নের জন্য তিনি বিভিন্ন সময়ে যে-সব নীতি গ্রহণ করেছিলেন, তার মধ্যে অন্যতম প্রধান হচ্ছে বয়স্কশিক্ষা। রবীন্দ্রনাথ গ্রামে বয়স্কশিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করে শিক্ষা বঞ্চিত গ্রামের বয়স্ক লোকদের শিক্ষার ব্যবস্থার পরিকল্পনা করেছিলেন। বয়স্কশিক্ষার মাধ্যমে তিনি গ্রাম-উন্নয়নের প্রাথমিক ভিত্তি সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। গ্রামের বয়স্কদের শিক্ষাদানের জন্যসম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যেসব প্রদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন সূত্রাকারে তা নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা যায়। যেমন:

১. উপযুক্ত শিক্ষক নির্বাচন করে পল্লিসমাজের অধীনে বিদ্যালয় ও আবশ্যক মত নৈশবিদ্যালয় স্থাপন এবং বালক-বালিকা সাধারণের সুশিক্ষার ব্যবস্থা
২. বিজ্ঞান, ইতিহাস বা মহাপুরুষদিগের জীবনী ব্যাখ্যা করে সাধারণকে শিক্ষাপ্রদান ও সর্বধর্মের সারনীতি সংগ্রহ করে সাধারণের সুশিক্ষার ব্যবস্থা।
৩. আদর্শ কৃষিক্ষেত্র ও খামার স্থাপন ও তথায় যুবক ও অন্য পল্লিবাসীদিগকে কৃষিকার্য বা গো-মহিষাদি পালন দ্বারা জীবিকা উপার্জনোপযোগী শিক্ষাপ্রদান ও কৃষিকার্যের উন্নতি সাধনের চেষ্টা।
৪. বয়স্ক গৃহস্থ স্ত্রীলোকেরা যাতে আপন সংসারের আয়বৃদ্ধি করতে পারেন এবং অসহায় হলে সংসারের ভার গ্রহণ করতে পারেন, তদনুরূপ শিল্পাদি শিক্ষা দেওয়া ও তদুপযোগী উপকরণ সংগ্রহ করা।
৫. নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য গ্রামের সবাইকে নিম্নতম প্রয়োজনানুযায়ী লেখাপড়া ও অঙ্ক শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রামের সাধারণ মানুষের প্রতি বিভিন্ন দিকের চরম অবহেলা রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় ধরা পড়েছিল । এ কারনেই তিনি তাদেরকে শিক্ষার আরোয় আলোকিত করে তাদের উন্নতির একটা পথ তৈরি করে দিতে চেয়েছিলেন। তাঁর সেই ইচ্ছার কথা বলতে গিয়ে তিনি লিখেছেন:

> ...আমার আর একটি প্রস্তাব আমাদের শিক্ষা-বিভাগের সম্মুখে আমি উপস্থাপিত করতে চাই। দেশের যে-সকল পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা নানাকারণে বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত, তাদের জন্যে ছোটবড়ো প্রাদেশিক শহরগুলিতে যদি পরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা যায় তবে অনেকেই অবসরমতো ঘরে ব'সে নিজেকে শিক্ষিত করতে উৎসাহিত হবে। নিম্নতন থেকে উচ্চতন পর্ব পর্যন্ত তাদের পাঠ্যবিষয় নির্দিষ্ট করে তাদের পাঠ্যপুস্তক বেঁধে দিলে সুবিহিত ভাবে তাদের শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত হোতে পারবে। এই পরীক্ষার যোগে যে-সকল উপাধির অধিকার পাওয়া যাবে, সমাজের দিক থেকে তার সম্মান ও জীবিকার দিক থেকে তার প্রয়োজনীয়তার মূল্য আছে। আশা করা যায়, দেশব্যাপী পরীক্ষার্থীর দেয় অর্থ থেকে অনায়াসে এর ব্যয় নির্বাহ হবে। এই উপলক্ষ্যে পাঠ্যপুস্তক রচনার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়ে জনসাধারণের মধ্যে বিদ্যাবিস্তারের উপাদান বেড়ে যাবে এবং এতে ক'রে বিস্তর লেখকের জীবিকার উপায় নিদ্ধারিত হবে। একদা বিশ্বভারতী থেকে এই কর্তব্য গ্রহণ করবার সংকল্প মনে উদয় হয়েছিল কিন্তু দরিদ্রের মনোরথ মনের বাইরে অচল। তাছাড়া রাজসরকারের উপাধিই জীবনযাত্রায় কর্ণধার।[১০৬]

বিশ্বমানবতায় বিশ্বাসী রবীন্দ্রনাথ সব মানুষের প্রতি গভীর মমতা অনুভব করতেন। এ কারণেই তিনি মানবজাতির আত্মিক মিলনকে স্বাদেশিক ভাবতত্ত্বের উর্ধ্বে স্থান দিয়েছিলেন। তাঁর বিভিন্ন লেখা ও পত্রাবলী থেকে এ বিষয়ে জানা যায় । ১৮৯০ সালে জমিদারি দেখাশুনার কাজে পূর্ববঙ্গে আসার পর তিনি প্রথম বাংলার চাষিদের সংস্পর্শে আসেন। তখন জমিদারি কাজের সুত্রে দেশের অধিকাংশ মানুষের শোচনীয় দারিদ্রের জীবন তিনি খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন। সভ্রান্ত পরিবারের সন্তান হিসেবে তাঁর পক্ষে এই সত্যের সম্মুখীন হওয়া এক ধরনের নতিস্বীকারের অভিজ্ঞতা। তাদের অসহায় অবস্থা রবীন্দ্রনাথের মানবিকতাকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। তিনি এসব মানুষের অবস্থা সম্পর্কে সমাজের উচ্চশ্রেণিকে সজাগ করতে চেয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন:

> আমাদের এই দরিদ্র চাষী প্রজাগুলোকে দেখলে আমার ভারি মায়া করে, এরা যেন বিধাতার শিশুসন্তানের মতো নিরুপায়। তিনি এদের মুখে নিজের হাতে কিছু তুলে না দিলে এদের আর গতি নেই। পৃথিবীর স্তন যখন শুকিয়ে যায় তখন এরা কেবল কাঁদতে জানে-কোনোমতে একটুখানি ক্ষুধা ভাঙ্গলেই আবার তখনই সমস্ত ভুলে যায়। সোসিয়ালিষ্টরা যে সমস্ত পৃথিবীময় ধনবিভাগ করে দেয় সেটা সম্ভব কি অসম্ভব ঠিক জানি নে- যদি একেবারেই অসম্ভব হয় তাহলে বিধির বিধান বড়ো নিষ্ঠুর মানুষ তার মধ্যে এতটুকু একটু ছিদ্র একটু সম্ভাবনা রেখে দেওয়া উচিত যাতে সেই দুঃখমোচনের জন্য মানুষের উন্নত অংশ অবিশ্রাম চেষ্টা করতে পারে, একটা অংশ পোষণ করতে পারে।[১০৭]

১৩

স্বদেশপ্রেম ও সমাজ উন্নয়ন

রবীন্দ্রনাথ পূর্ববঙ্গে জমিদারি দেখতে এসে এখানকার শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের প্রতি গভীর ভালোবাসা অনুভব করেন। তিনি এ অঞ্চলের মানুষের শিক্ষার কথা যেমন ভাবতে শুরু করেন তেমনি এখানকার মানুষের ভাগ্যেও পরিবর্তনের কথাও ভাবলেন। তিনি পল্লি সমাজব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে বিশেষভাবে সচেতন হয়ে উঠেন। এখানকার মানুষের জীবনযাপন ও নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার অভিঘাত পুরোনো সমাজ কাঠামোর অবক্ষয় প্রত্যক্ষ করে তিনি বিচলিত হয়েছিলেন। তিনি লক্ষ করেছিলেন, নতুন ব্যবস্থায় ভারতবর্ষীয় এককালীন স্বয়ংসম্পূর্ণ সমাজ State-এর কাছে মর্মান্তিকভাবে আত্মবিলোপ করতে বাধ্য হয়েছে। ফলে গ্রামের আলো নিভে গিয়ে, কৃত্রিম আলো জ্বলে উঠেছে শহরে। তাঁর মনে হয়েছে, সে আলোয় সূর্য-চন্দ্র-নক্ষত্রের সঙ্গীত নেই।[১০৮] তার ফলে, একদিন দেশের যে বিরাট চিত্ত পল্লিতে প্রসারিত হয়ে আশ্রয় পেয়েছে, প্রাণ পেয়েছে, সামাজিক প্রক্রিয়ায় তার যোগ ছিলো অবিচ্ছিন্ন। সে আজ শুকিয়ে গেছে, মরে গেছে।[১০৯] বিত্ত, বিদ্যা, সম্মান, এখন মুষ্টিমেয় শহরবাসীর একচেটিয়া।[১১০]

বর্তমান সভ্যতার অসাম্যের নানা বিষয় তাঁকে ব্যথিত করেছে। তিনি দেখেছেন যে, 'এ যুগে এক জায়গায় একদল মানুষ খাদ্য উৎপাদনের চেষ্টায় সমস্ত শক্তি নিয়োগ করছে, আর এক জায়গায় ভিন্ন একদল মানুষ সেই অন্নে প্রাণ ধারণ করছে। একদিকে দৈন্য মানুষকে পঙ্গু করে রেখেছে, অন্যদিকে ধনের সন্ধান, ধনের অভিমান, ভোগবিলাস সাধনের প্রয়াসে মানুষ উন্মত্ত। অন্নের উৎপাদন হয় পল্লিতে, আর অর্থের সংগ্রহ চলে নগরে। ফলে আরাম, আরোগ্য, আমোদ ও শিক্ষার ব্যবস্থাও শহরেই কেন্দ্রীভূত। পল্লির নিকট এই ভোগের যা কিছু পৌঁছায় তা উচ্ছিষ্ট মাত্র।[১১১] এ কারণে শহর ও গ্রামের মধ্যে ব্যাপক ব্যবধান তৈরি হয়েছে। গ্রামের লোকের না আছে বিদ্যা, না সম্পদ, না অন্নবস্ত্র। অন্যদিকে, 'শহরের লোকেরা যারা উচ্চশিক্ষার সুফল ভোগ করে, অর্থ উপার্জন ও সঞ্চয় করে, তারা বাস করে এক ধরনের দ্বীপের মধ্যে-বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে তাদের অতলস্পর্শ বিচ্ছেদ।[১১২] এই দ্বীপবাসী শিক্ষিতজনরাই আবার যাদের ছোটলোক বলে জানে, তাদের নামে পলিটিক্স করে এবং অর্থ সংগ্রহ ও আত্মসাৎ করে।[১১৩]রবীন্দ্রনাথের মতে, শহরে ও গ্রামের মধ্যে, ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে এখন যে প্রভেদ সীমাহীন হয়ে উঠেছে-আগে এমন ছিলো না। কারণ, সেকালে ধনের সম্মান অন্য সব সম্মানের নীচে ছিলো। তাছাড়া, তখন ধনী আপন ধনের দায়িত্ব স্বীকার করতেন। ধন তখন অসামাজিক ছিলো না, তখন প্রত্যেকের ধনে সমস্ত সমাজ ধনী হয়ে উঠতো।[১১৪]

১৯০৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পাবনায় অনুষ্ঠিত কনগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সভাপতির অভিভাষণে তিনি পল্লীসমাজ ও পল্লী-অর্থনীতি সম্পর্কে যা বলেন, তা তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান। শোষিত পল্লির রূপ অল্প কয়েকটি কথায় কবি চমৎকার ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন ঃ

> ...গ্রামের মধ্যে চেষ্টার কোনো লক্ষণ নাই। জলাশয় পূর্বে ছিল, আজ তাহা বুজিয়া আসিতেছে; কেননা দেশের স্বাভাবিক কাজ বন্ধ। যে গোচারণের মাঠ ছিল তাহা রক্ষণের কোনো উপায় নাই; যে দেবালয় ছিল তাহা সংস্কারের কোনো শক্তি নাই; যে-সকল পণ্ডিত সমাজের বন্ধন ছিলেন তাঁহাদের গণ্ডমূর্খ ছেলেরা আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্যের ব্যবসায় ধরিয়াছে; যে-সকল ধনিগৃহে ক্রিয়াকর্মে যাত্রায় গানে সাহিত্যরস ও ধর্মের চর্চা হইত তাঁহারা সকলেই শহরে আকৃষ্ট হইয়াছেন; যাঁহারা দুর্বলের সহায়, শরণাগতের আশ্রয় ও দুষ্কৃতকারীর দণ্ডদাতা ছিলেন তাহাদের স্থান পুলিশের দারোগা আজ কিরূপভাবে পুরণ করিতেছে তাহা কাহারও অগোচর নাই। লোকহিতের কোনো উচ্চ আদর্শ, পরার্থে আত্মত্যাগের কোনো উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত গ্রামের মাঝখানে আর নাই; কোনো বিধিনিষেধের শক্তি ভিতর হইতে কাজ করিতেছে না, আইনে যে কৃত্রিম বাঁধ দিতে পারে তাহাই আছে মাত্র। পরস্পরের বিরুদ্ধে মিথ্যা মকদ্দমায় গ্রাম উন্মাদের মতো নিজের নখে নিজেকে ছিন্ন করিতেছে, তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিবার কেহ নাই। জঙ্গল বাড়িয়া উঠিতেছে, ম্যালেরিয়া নিদারুণ হইতেছে, দুর্ভিক্ষ ফিরিয়া ফিরিয়া আসিতেছে; আকাল পড়িলে পরবর্তী ফসল পর্যন্ত ক্ষুধা মিটাইয়া বাঁচিবে এমন সঞ্চয় নাই; ডাকাত অথবা পুলিশ চুরি অথবা চুরি-তদন্ত-জন্য ঘরে ঢুকিলে ক্ষতি ও অপমান হইতে আপনার গৃহকে বাঁচাইবে এমন পরস্পর ঐক্যমূলক সাহস নাই। তাহার পর যা খাইয়া শরীর বল পায় ও ব্যাধিকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে তাহার কী অবস্থা! ঘি দূষিত, দুধ দুর্মূল্য, মৎস্য দুর্লভ, তৈল বিষাক্ত। যে কয়টা স্বদেশী ব্যাধি ছিল তাহারা তাহাদের যকৃৎ প্লীহার উপর সিংহাসন পাতিয়া বসিয়াছে; তাহার উপর বিদেশী ব্যাধিগুলো অতিথির মতো আসে এবং কুটুম্বের মতো রহিয়া যায়। ডিপথেরিয়া রাজযক্ষ্মা টাইফয়েড সকলেই এই রক্তহীনদের প্রতি এক্সপ্লয়টেশন নীতি অবলম্বন করিয়াছে। অন্ন নাই, স্বাস্থ্য নাই, আনন্দ নাই, ভরসা নাই, পরস্পরের সহযোগিতা নাই; আঘাত উপস্থিত হইলে মাথা পাতিয়া লই, মৃত্যু উপস্থিত হইলে নিশ্চেষ্ট হইয়া মরি, অবিচার উপস্থিত হইলে নিজের অদৃষ্টকেই দোষী করি এবং আত্মীয়ের বিপদ উপস্থিত হইলে দৈবের উপর তাহার ভার সমর্পণ করিয়া বসিয়া থাকি।[১১৫]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর দীর্ঘ বক্তৃতার একটিমাত্র অনুচ্ছেদ পল্লিসমাজের অন্তর ও বাহিরের দৈন্যের অপূর্ব পরিচয় তুলে ধরেছেন। এ উপস্থাপনা থেকে তাঁর তীক্ষ্ণ সমাজসচেতনতা বোধের পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ এই সচেতনতা ও মানবিকতাবোধ নিয়ে পল্লির আরো কতোগুলো প্রাত্যহিক অভাব-অভিযোগ, দুঃখদুর্দশাকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন, নিশ্চেষ্ট পল্লির মানুষ বছরের পর বছর জলকষ্ট সহ্য করে। মেয়েরা চার-পাঁচ মাইল উত্তপ্ত বালুর মধ্যে হেঁটে গিয়ে পানীয় জল আনে।[১১৬] কখনো আগুনে গোটা পাড়া ভস্ম হয়ে যায়। তবু পল্লিবাসীরা নিজেদের বাড়ির কাছে একটা কূপ খনন করে নেয় না।[১১৭] জমিতে ফলন কমে গেলেও চাষিরা সারের ব্যবহার করে না।[১১৮] তারা খণ্ড খণ্ড জমিতে চাষ করে শ্রমের অপচয় করে। তবু সমবায়ভিত্তিক চাষাবাদ করে না।[১১৯] কোনো কোনো জেলায় চাষিরা ধান চাষের জন্যে কঠোর পরিশ্রম করে, বছরের একটা বড় সময় তারা জমি ফেলে রাখে। 'অথচ সামান্য শ্রমের বিনিময়ে পর্যপ্ত রবি-ফসল জন্মানো যেতো [১২০], সেদিকে যত্নবান হয়না। অর্থাৎ 'যে-জমিতে ধান হয় না, সে জমি অনেক চাষিই ফেলে রাখে, অন্য কোন

ফসল ফলায় না।[১২১] চাষির অবসর সময়ে অলসভাবে বসে থেকে কুটির-শিল্পের কথা ভাবে না; এবং এভাবে বাংলার এককালের বিখ্যাত কুটির-শিল্প প্রায় অবলুপ্ত-এ-ও তিনি লক্ষ্য করেছিলেন।[১২২]

চাষাবাদ,কুটির-শিল্প এবং অন্যান্য উৎপাদন পদ্ধতির ক্ষেতেই নয়, মানসিকতার দিক দিয়েও পল্লিবাসীরা নিশ্চেষ্ট। অসহায় ও অতি দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও তারা নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নে তৎপর নয়। রবীন্দ্রনাথ এই বিষয়গুলো যে গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন তা উল্লিখিত উদ্ধৃতি থেকেই বোঝা যায়। তিনি বলেছেন, পল্লীর মানুষদের একের সঙ্গে অন্যের যোগাযোগের পথ অবরদ্ধ। এক সময়ে যাত্র, গান, কথকতা ইত্যাদির মাধ্যমে যে যোগাযোগ হতো, তা বর্তমানে বিলুপ্ত।[১২৩] এমনকি, বাহ্যিক যোগাযোগের পথ পর্যন্ত বিনষ্ট।[১২৪] তার পরিবর্তে এখন অন্যের অনিষ্ট চিন্তা, অকল্যাণবোধ ও সাম্প্রদায়িকতা প্রবল হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ তখন হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে বিরোধ লক্ষ করেছেন। তিনি দেখেছেন, তাঁর জমিদারির কর্মচারীরা পর্যন্ত হিন্দু ও মুসলমান প্রজাদের এই ভেদাভেদ সযত্নে রক্ষা করতে উদ্যত। এমন কি নমশূদ্র ও মুসলমান প্রজারা কাছারিতে এলে তাঁদের বসার আসন পর্যন্ত দেওয়া হয় না।[১২৫] রবীন্দ্রনাথ স্বদেশি আন্দোলনের সময় পাবনা প্রাদেশিক রাষ্ট্রসংসদের সভাপতির অভিভাষণেও পল্লির এই অবলিত মানুষের প্রতি মানবিক দৃষ্টিদানের আহবান করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন:

> একদা আমাদের রাষ্ট্রযজ্ঞ ভঙ্গ করবার মত একটা আত্মবিপ্লবের দুর্যোগ দেখা দিয়েছিল। তখন আমার মতো অনোধিকারীকেও অগত্যা পাবনা প্রাদেশিক রাষ্ট্রসংসদের সভাপতিপদে বরণ করা হয়েছিল। সেই উপলক্ষে তখনকার অনেক রাষ্ট্রনায়কদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটেছে। তাঁদের মধ্যে কোনো কোনো প্রধানদের বলেছিলাম, দেশের বিরাট জনসাধারণকে অন্ধকার নেপথ্যে রেখে রাষ্ট্ররঙ্গভুমিতে যথার্থ আত্মপ্রকাশ চলবে না। দেখলুম সে কথা স্পষ্ট ভাষায় উপেক্ষিত হল। সেইদিনই আমি মনে মনে স্থির করেছিলুম কবিকল্পনার পাশেই এই কর্তব্যকে স্থাপন করতে হবে, অন্যত্র এর স্থান নেই। তার অনেক পূর্বেই আমার অল্প সামর্থ এবং অল্প কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে পল্লীর কাজ আরম্ভ করেছিলুম।.....আমার সে দিনকার মনের আক্ষেপ কেবল যে কোনো কবিতাতেই প্রকাশ করেছিলুম তা নয়, এই লেখনীবাহন কবিকে আকস্মাৎ টেনে এনেছিল দুর্গম কাজের ক্ষেত্রে। দরিদ্রের একমাত্র শক্তি ছিল মনোরথ।[১২৬]

রবীন্দ্রনাথ উদারপন্থী হিন্দু সমাজের উত্থান আশা করেছিলেন। তাঁর সেইপ্রত্যাশা আর পুরণ হলো না। ১৯০৪-১৯০৫ সালে এদেশে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে তা চুর্ন হয়ে গেল। গোড়ায় রবীন্দ্রনাথ স্বদেশি আন্দোলনে সর্বান্তকরণে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর বক্তৃতায়, প্রবন্ধে, ও দেশাত্ববোধক সংগীততে বাংলাদেশে এক অভুতপূর্ব দেশপ্রেমের
উদ্দীপনা সঞ্চার হয়। অথচ এই আন্দোল যখন তুঙ্গে ঠিক তখন তা পরিত্যাগ করে এবং সমস্ত জাতীয় সমিতি বর্জন করে তিনি শান্তিনিকেতনের কাজে ফিরে যান। কারণ তিনি দেখলেন যে, স্বদেশি আন্দোলনের মধ্যেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেধে গেছে। ধর্মীয় কারণে ভারতে ঐক্য ক্ষুন্ন হওয়ায় ও স্বদেশির নামে মুসলমানদের আক্রমণ করায় রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত বিচলিত হন। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন:

> জাতিমাত্রেরই শক্তি পরিমিত সে এমন কথা যদি বলে যে 'যাহা আছে এবং যাহা আসে সমস্তকেই আমি নির্বিচারে পুষিব, তবে এত রক্তশোষণে তাহার শক্তিক্ষয় না হইয়া থাকিতে পারে না। যে সমাজ নিকৃস্টকে বহন ও পোষণ করিতেছে উৎকৃষ্টকে সে উপবাসী রাখিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই।[১২৭]

১৯০৭ সাল থেকে ১৯০৯ সালের মধ্যে লেখা 'গোরা' উপন্যাসে তাঁর এই আশাভঙ্গের কথা তিনি ব্যক্ত করেছেন। এক দয়াবাণ ব্রাহ্মণ দম্পত্তি অনাথ এই আইরিশ বালক 'গোরা'কে নিজের ছেলের মতো মানুষ করেন। উপন্যাসের প্রথম দিকে 'গোরাকে আমরা গোঁড়া হিন্দুধর্মের এক প্রচন্ড দেশভক্ত যুবক হিসাবে প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু ক্রমে ' গোরা' বুঝতে পারে যে বিদেশি জন্মপরিচয় দিয়ে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজে তার স্থান হবে না। তখন সে হিন্দু সমাজের বিভেদের চেহারাটা জানতে পারে বুঝতে পারে যে জাতিধর্মের উর্ধ্বে নিজেকে প্রকৃত ভারতবাসী করে তোলাই তার প্রথম কর্তব্য। উপন্যাসের শেষে 'গোরার জবানীতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

> আমি আজ ভারতবর্ষীয়। আমার মধ্যে হিন্দু মুসলমান খ্রিষ্টান কোনো সমাজের কোনো বিরোধ নেই। আজ এই ভারতবর্ষের সকলের জাতই আমার জাত, সকলের অন্নই আমার অন্ন..... কেননা ভারতবর্ষকে আমি যে প্রাণের চেয়ে ভালোবাসি আমি তাকে যে অংশটিতে দেখতে পেতুম সে অংশের কোথাও যে আমি কিছুমাত্র

> অভিযোগের অবকাশ একেবারে সহ্য করতে পারতুম না। আজ সেই সমস্ত কারুকার্য বানাবার বৃথা চেষ্টা থেকে নিস্কৃতি পেয়ে আমি বেঁচে গেছি।[১২৮]

রবীন্দ্রনাথ 'গোরা' লিখে সম্ভবত নিজের অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে নিজেকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন। রাজনীতিতে তাঁর নিজস্ব সত্ত্বা প্রতিষ্ঠা করার বিষয়টিও এখানে লক্ষ করা যায়। তিনি এটাও হয়তো জানাতে চেয়েছেন যে, সেই যুগের বাংলার রাজনীতির সঙ্গে তিনি চলতে রাজি নন। স্বদেশি আন্দোলন তাঁর এবং তাঁর পরিবারের রাজনৈতিক সততা কাজে লাগাবার সুযোগ এনে দিয়েছিল। এ সময় হিন্দু মুসলমান সমস্যা ও স্বার্থের সংঘাত রবীন্দ্রনাথকে পীড়িত করেছিল। শুধু উপন্যাস রচনা করেই নিজেকে অব্যাহতি দেননি। উগ্র জাতীয়তাবাদের সংসর্গ ত্যাগ করে তিনি সরাসরি তাঁর মর্জি অনুসারে স্বদেশি কর্মক্ষেত্রে আত্মনিযোগ করেন। ১৮৯০ সালে পূর্ববঙ্গের জামিদারির ম্যানেজার নিযুক্ত হওয়ার কাল থেকেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর হিন্দু ও মুসলমান প্রজাদের নিয়ে শিক্ষাপ্রচারের কাজ শুরু করেন। তিনি লিখেছেন:

> জাতির সকলকে বলদান, ধনদান, জ্ঞানদান, স্বাস্থ্যদান-এই বিচিত্র কর্মচেস্টার সমন্বয় হয়েছে যেখানে সেইখানেই যথার্থ ঐক্যের রূপ দেখতে পাওয়া যায়। শুধু কবির গানে নয়, সাহিত্যের রসে নয়- কর্মের বিচিত্র ক্ষেত্র যখন সচেষ্ট হয় তখনই সমস্ত দেশের লোক এক হয়। আমাদের দেশও সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করছে। বক্তৃতার মিথ্যা উত্তেজনায় শুধু বাক্যে শুধু মুখে 'ভাই' বললে ঐক্য স্থাপিত হয় না। ঐক্য কর্মের মধ্যে।[১২৯]

এর পর রবীন্দ্রনাথ আর কখনো সক্রিয় রাজনীতিতে যোগ দিলেও মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে তিনি দেশের রাজনৈতিক ভবিষৎ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করেছেন। তিনি শেষ জন্মদিনে (৮০–তম) তাঁর শেষ লেখা 'সভ্যতার সংকট'[১৩০] (Crisis in Civilisation) প্রবন্ধে ব্রিটিশ সম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তীব্র অভিযোগ উত্থাপন করেন। ঐ সময়ে প্রকাশিত তাঁর অন্য কয়েকটি গ্রন্থ, থেকেই বুঝতে পারি যে তাঁর মন পড়েছিল দেশের সাধারণ ও পীড়িত মানুষের কাছে।[১৩১] তিনি রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

> শুধু বড়ো জিনিস কল্পনা করিলেও হইবে না, বড়ো দান ভিক্ষা করিলেও হইবে না, এবং ছোটো মুখে বড়ো কথা বলিলেও হইবে না, দ্বারের পার্শ্বে নিতান্ত ছোট কাজ শুরু করিতে হইবে। বিলাতের প্রাসাদে গিয়া রোদন করিলে হইবে না, স্বদেশের ক্ষেত্রে বসিয়া কন্টক উৎপাদন করিতে হইবে। ইহাতে আমাদের শক্তির চর্চা হইবে না, স্বদেশের ক্ষেত্রে চর্চা হইবে- সেই শক্তির চর্চা মাত্রেই স্বাধীনতা, এবং স্বাধীনতা মাত্রেই আনন্দ।[১৩২] .....
>
> পোলিটিক্যাল সাধনার চরম উদ্দেশ্য একমাত্র দেশের হৃদয়কে এক করা। কিন্তু দেশের ভাষা ছাড়িয়া, দেশের প্রথ ছাড়িয়া, কেবলমাত্র বিদেশীর হৃদয় আকর্ষনের জন্য বহুবিধ আয়োজনকেই মহোপকারী পোলিটিক্যাল শিক্ষা গণ্য করা আমাদেরই হতভাগ্য দেশে প্রচলিত হইয়াছে।[১৩৩]

ব্রিটিশ সংস্কৃতির সংস্পর্শের ফলে ভারতীয় জীবনধারায় কিছুটা পরিবর্তন হয়। যদিও ঔপনিবেশিক পরিবেশে ইংরেজি সংস্কৃতির প্রতিনিধিরাই এর কর্তৃত্ব করেছেন। ফলে ভারতীয়দে পক্ষে সাংস্কৃতিক নেতৃত্বের গুরুত্ব বলতে গেলে রাজনৈতিক নেতৃত্বেরই স্থান পায়। সাংস্কৃতিক নেতৃত্বের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর পরিবার দেশের সেবায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও পশ্চিমের উদারপন্থী মূল্যবোধ দুই কার্যকরী করা পক্ষে ছিলেন। 'নৈবেদ্যর' একটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ দেশ সম্পর্কে তাঁর উচ্চাকাঙ্খা ব্যক্ত করেছেন।[১৩৪] কবিতায় তিনি লিখেছেন:

> চিত্ত যেথা ভয়শুন্য, উচ্চ যেথা শির
> জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
> আপন প্রাঙ্গনতলে দিবসশর্বরী
> বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,
> যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসবমুখ হতে
> উচ্ছসিয়া উঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে
> দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
> অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়.....
>
> যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালিরাশি
> বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি,
> পৌরুষের করেনি শতধা-নিত্য যেথা

Dhaka University Institutional Repository

তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা-
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত কর, পিতঃ
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত।

আমরা দেখি যে,'সকল মানুষের মাঝে একজন প্রকৃত মানুষ' কাব্যলক্ষীর আরাধনায় ও বর লাভে সমর্থ হবার পর রবীন্দ্রনাথের অন্তরের মানুষটি, 'চিত্রাঙ্গদা'-র অর্জুনের মতো, আরও পূর্ণতর জীবনরে ও আরও বিস্তৃত কর্মক্ষেত্রের প্রয়োজন বোধ করল। সে চাইল সারা মানুষে মাঝে একজন মানুষের মতো মানুষ হয়ে উঠতে।[১৩৫]

১৪

শিক্ষায় ঐক্যসাধন ও বিজ্ঞানশিক্ষা

শিক্ষার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ ঐক্যসাধন করতে চেয়েছেন। তাঁর এ ঐক্য–হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, ইংরেজ প্রভৃতিকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারায় এক করে দেওয়ার ঐক্য। এ ক্ষেত্রে তাঁর চিন্তায় শিক্ষার একটা নতুন দিক উন্মোচিত হয়েছে। সমকালীন উত্তপ্ত রাজনৈতিক পটভূমিতে তিনি চেয়েছিলেন প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার গৌরবকে সবার সামনে তুলে ধরতে। তবে তা কোনো সংঘাতের পথে নয়, 'অনুভূতি কর্ষণের' মধ্য দিয়ে এবং বিশ্বের সঙ্গে, বিশ্বের সব মানুষের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের মধ্য দিয়ে। রবীন্দ্রনাথ 'বোধের তপস্যা', 'সাধনা', 'ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা', 'আত্মার সাধনা' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করে তাঁর এ সংযোগের সূত্র নির্দেশ করেছিলেন। এখানে শিক্ষার সেই দিকটির প্রতি তিনি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন যেখানে ব্যক্তিমানস বিশ্বের নানা আয়োজনের সঙ্গে সংযুক্ত। কারণ তিনি 'বিশ্বমৈত্রী'র সাধনাকেই ভারতের সাধনা বলে মনে করতেন। এ সম্পর্কে বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

> ভারতবর্ষের সত্য হচ্ছে জ্ঞানে অদ্বৈততত্ত্ব, ভাবে বিশ্বমৈত্রী এবং কর্মে যোগসাধনা। ভারতবর্ষের অন্তরের মধ্যে যে উদার তপস্যা গভীরভাবে সঞ্চিত হয়ে রয়েছে, সেই তপস্যা আজ হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ এবং ইংরেজকে আপনার মধ্যে এক করে নেবে বলে প্রতীক্ষা করছে।[১৩৬]

ভারতবাসীর শিক্ষায় ভারতীয়ত্ব থাকবে, এ কথা রবীন্দ্রনাথ কখনো অস্বীকার করেননি। এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য অত্যন্ত পরিস্কার । তিনি বলেছেন শিক্ষার সর্বমানবিক দিকের কথা। যা সব শিক্ষাতেই সত্য রূপে থাকতে হয়। সেই সর্বমানবিক সত্যকে ভারতবাসীর শিক্ষাতেও থাকতে হবে, এটাই ছিল তাঁর শিক্ষায় ঐক্যসাধনের মূলসূত্র। বিজ্ঞানকে তিনি তেমনি একটি সবমানবিক সত্য হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। কারণ বিজ্ঞানের প্রাচ্য-পাশ্চাত্য নেই, তার জাতিবর্ণ নেই। কিন্তু পাশ্চাত্যদেশে তার চর্চা বলে আপাতদৃষ্টিতে তা পাশ্চাত্য শিক্ষা। এই পাশ্চাত্য শিক্ষাকে তিনি ভারতবাসীর শিক্ষাব্যবস্থায় অঙ্গীভূত করে নেওয়ার কথা বলেছেন। তাই বিচ্ছেদ নয়, জাতিতে জাতিতে মিলনই আগামী দিনের সত্য। সেই সত্য তিনি প্রথম প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন শিক্ষার ক্ষেত্রে। রবীন্দ্রনাথের এই ঐক্য সাধনের চিন্তাটি সূত্রাকারে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

১. ..বিশ্বশক্তি হচ্ছে ত্রুটিবিহীন বিশ্বনিয়মেরই রূপ; আমাদের নিয়ন্ত্রিত বুদ্ধি এই নিয়ন্ত্রিত শক্তিকে উপলব্ধি করে। এই নিয়মকে নিজে হাতে গ্রহণ করার শিক্ষাই বিজ্ঞান। ভারতের বৈজ্ঞানিক শিক্ষা নেই, তাই সে আজ বদ্ধ, দুর্বল, রিক্ত। বিজ্ঞান শিক্ষার জোরেই পাশ্চাত্য দেশ আজ শক্তিশালী।
২. ...পশ্চিমের লোক যে বিদ্যার জোরে বিশ্ব জয় করেছে সেই বিদ্যাকে গাল পাড়তে থাকলে দুঃখ কমবে না, কেবল অপরাধ বাড়বে। কেননা, বিদ্যা যে সত্য।
৩. শিক্ষায় প্রথম ধাপ বিজ্ঞানশিক্ষা। অধ্যাত্মশিক্ষা তার পরের ধাপ। প্রথমটি না হলে কেবলই রিক্ততা, কেবলই দৈন্য। ...আমি বৈরাগ্যের নাম করে শূন্য ঝুলির সমর্থন করি না।
৪. এক ঝোঁকা আধ্যাত্মিক বুদ্ধিতে আমরা দারিদ্রের দুর্বলতায় কাত হয়ে পড়েছি। উল্টো দিকে এক ঝোঁকা বিজ্ঞানচর্চায় পাশ্চাত্য দেশ মনুষ্যত্বের সার্থকতা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।
৫. যথার্থ শিক্ষায় এ দুই-কে মিলিয়ে নিতে হবে। "এই মিলনের অভাবে পূর্বদেশ দৈন্যপীড়িত; আর পশ্চিম অশান্তির দ্বারা ক্ষুব্ধ, সে নিরানন্দ।
৬. বিজ্ঞানের কল্যাণে আজ ভুগোলের বেড়া ভেঙে গিয়েছে, জাতিরা পরস্পরের কাছাকাছি এসেছে। জাতিতে জাতিতে একত্র হচ্ছে অথচ মিলছে না। এরই বিষম বেদনায় সমস্ত পৃথিবী পীড়িত। যাঁরা নবযুগের সাধক তাঁদের সাধনা আজ ঐক্যের সাধনা।

Dhaka University Institutional Repository

৭. ন্যাশনালিজম এই ঐক্যের বাধা।
৮. মানুষ সাময়িক ও স্থানিক কারণে গন্ডীর মধ্যে সত্যকে পায় বলেই সত্যের পূজা ছেড়ে গন্ডীর পূজা করে...। পৃথিবীতে নেশন গড়ে উঠল সত্যের জোরে; কিন্তু ন্যাশনালিজম সত্য নয়। এ হল রিপু।
৯. স্বাজাত্যের অহমিকা থেকে মুক্তিদান করার শিক্ষাই আজকের দিনের প্রধান শিক্ষা। কেননা কালকের দিনের ইতিহাস সর্বজাতিক সহযোগিতার অধ্যায় আরম্ভ করবে।
১০. এই জন্যই আমাদের বিদ্যানিকেতনকে পূর্ব পশ্চিমের মিলননিকেতন করে তুলতে হবে।[১৩৭]

অসহযোগ আন্দোলনের দিনে জাতীয়তাবাদী উত্তেজনা যখন তুঙ্গে তখন রবীন্দ্রনাথের এই ঐক্য সাধনের যুক্তিকথা যথেষ্ট বিরূপতার সৃষ্টি করেছিল। বিশেষ করে–ইংরেজের সঙ্গে মিলনের, গান্ধিজীর বিরোধিতা এবং ন্যাশানালিজমের নিন্দা প্রভৃতি ছিল তাঁকে আক্রমণ করার বিষয়। রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধের প্রতিবাদে শরৎচন্দ্র ১৩২৮ সালে গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তনে 'শিক্ষার বিরোধ' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। সেই প্রবন্ধে তাঁর অনেক বক্তব্যের মধ্যে বিশেষ তিনটি কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। শরৎচন্দ্র সেই প্রবন্ধে যুক্তি দেখিয়ে বলেছিলেন:

১. এ দেশের ইংরেজ-প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা বিজিত জাতির জন্য বিজয়ী জাতি কর্তৃক প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় কোনো শিক্ষাই সার্থক হতে পারে না, বিজ্ঞান শিক্ষাও নয়। যাতে ইংরেজের বিন্দুমাত্র ক্ষতির সম্ভাবনা এমন কোনো বিদ্যাই ইংরেজ আমাদের দেবে না। ইংরেজ যা দিচ্ছে, তাতে আমাদের সর্ববিষয়ে নিজেদের প্রতি অবজ্ঞা আর ইংরেজের প্রতি শ্রদ্ধাই বেড়ে যাচ্ছে।
২. পশ্চিমের ইন্ডাস্ট্রিয়াল সভ্যতা বণিকতন্ত্রের সভ্যতা। তার শিক্ষাধর্মও তাই। তা আমাদের জীবনের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে না।
৩. রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, আমরা পশ্চিমের কাছ থেকে নেব বিজ্ঞান আর পমি্চম আমাদের কাছ থেকে নিবে অধ্যাত্মবিদ্যা, ত্যাগের মন্ত্র। কার্যক্ষেত্রে দেখা যাবে, ওদের বিজ্ঞান যথার্থ বিজ্ঞান ওরা আমাদের দেবে না, আমাদের অধ্যাত্মবিদ্যার ত্যাগের মন্ত্র ওরা নেবে না। ওদের মন্ত্র ধনলাভের মন্ত্র, তার সঙ্গে আমাদের ত্যাগের মন্ত্রের সঙ্গতি নেই। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার আসল বিরোধ এইখানে।[১৩৮]

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের এই বক্তব্যকে একেবারে যুক্তিহীন নয়। কারণ কালের যন্ত্রণা এবং অভিজ্ঞতা তাঁকে এ বক্তব্য ধারণে অধিকারী করেছিল। ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের প্রকৃতি, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মৌল স্বভাব প্রভৃতি ছিল তাঁর বক্তব্যের মূলভিত্তি। আমাদের ধারণা নিজ নিজ অবস্থান থেকে তাঁরা দু'জনই বাঙালির বৃহত্তর কল্যাণের কথাই ভেবেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যে বিজ্ঞান শিক্ষায় পূর্ব পশ্চিমের শিক্ষার মিলন প্রত্যাশা করেছেন, তা তিনি চিন্তা করেছেন বাঙালির মাতৃভাষায়। এ বিষয়ে বিজ্ঞান শিক্ষা প্রসারে নিয়োজিত সায়ান্স অ্যাসোসিয়েশের উদাসীনতার সমালোচনা করেছেন তিনি। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষাকে এদেশের জনসাধারণের কাছে সহজে পৌঁছে দিতে। তিনি বলেছেন:

> ...বিজ্ঞান যাহাতে দেশের সর্বসাধারণের নিকট সুগম হয় সে-উপায় অবলম্বন করিতে হইলে একেবারে মাতৃভাষায় বিজ্ঞান চর্চার গোড়াপত্তন করিয়া দিতে হয়। সায়ান্স অ্যাসোসিয়েশন যদি গত পঁচিশ বৎসর এই কার্যে যত্নশীল হইতেন তবে যে-ফললাভ করিতেন তাহা রাজপুরুষবর্গের সমুচ্চ প্রসাদ বাতায়ন হইতে দৃষ্টিগোচর না হইলেও আমাদের এই বিজ্ঞানদীন দেশের পক্ষে অত্যন্ত মহর্ঘ্য হইত।.....নালিশ এই যে, বিজ্ঞানসভা দেশের জনসাধারণের নিকট হইতে উপযুক্ত-মতো খোরাকি এবং আদর পায় না। কেমন করিয়া পাইবে। যাহারা বিজ্ঞানের মর্যাদা বোঝে না তাহারা বিজ্ঞানের জন্য টাকা দিবে, এমন অলৌকিক সম্ভাবনার পথ চাহিয়া বসিয়া থাকা নিস্ফল। আপাতত মাতৃভাষার সাহায্যে সমস্ত বাংলাদেশকে বিজ্ঞানচর্চায় দীক্ষিত করা আবশ্যক, তাহা হইলেই বিজ্ঞানসভা সার্থক হইবে এবং সফলতা মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় দিগন্তে বিলীন হইবে না।....পূর্বকালে ভারতবর্ষে কেবল ব্রহ্মণদের জ্ঞানানুশীলনের অধিকার ছিল। ব্রাহ্মণ্যের উচ্চ আদর্শ সেই কারণেই ক্রমে ম্লান এবং বিকৃত হইয়া যায়। ক্রমে কর্ম নিরর্থক, ধর্ম পুঁথিগত, এবং পুঁথিও মুখস্থ বিদ্যায় পরিণত হইয়া আসিতেছিল। ইহার কারণ, নিম্নের মধ্যাকর্ষণশক্তি অত্যন্ত প্রবল। যেখানে চতুর্দিক অনুন্নত সেখানে সংকীর্ণ উন্নতিকে দীর্ঘকাল রক্ষা করা দুঃসাধ্য।[১৩৯]

১৫

শিশু শিক্ষায় প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রভাব

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রকৃতি প্রেমিক। তাঁর লেখায় আঁকায় এবং চিন্তায় তার প্রমাণ ও পরিচয় স্পষ্ট হয়ে আছে। মানুষের সার্বিক বিকাশের ক্ষেত্রে তিনি শিক্ষাকে যেমন প্রধান উপায় মনে করেছেন, তেমনি প্রকৃত শিক্ষার জন্য তিনি প্রকৃতির সাহচর্যকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছেন। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, প্রকৃতির সাহচর্য ছাড়া শিশুদের শিক্ষা কখনই সম্পূর্ণ হতে পারে না। শিশুকে পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে উঠবার প্রয়োজনে বাল্য বয়সে প্রকৃতির সাহচর্য একান্ত জরুরী। তিনি লিখেছেন:

> খোলা আকাশ খোলা বাতাস এবং গাছপালা মানবসন্তানের শরীরমনের সুপরিণতির জন্য যে অত্যন্ত দরকার এ কথা বোধ হয়, কেজো লোকেরাও একেবারেই উড়াইয়া দিতে পারিবেন না। বয়স যখন বাড়িবে, আপিস যখন টানিবে, লোকের ভিড় যখন ঠেলিয়া লইয়া বেড়াইবে, মন যখন নানা মতলবে নানা দিকে ফিরিবে তখন বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ হৃদয়ের যোগ অনেকটা বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। তাহার পূর্বে যে জলস্থল-আকাশবায়ুর চিরন্তর ধাত্রীক্রোড়ের মধ্যে জন্মিয়াছি, তাহার সঙ্গে যথার্থভাবে পরিচয় হইয়া যাক, মাতৃস্তন্যের মতো তাহার অমৃতরস আকর্ষণ করিয়া লই, তাহার উদার মন্ত্র গ্রহণ করি, তবেই সম্পূর্ণরূপে মানুষ হইতে পারিব।[১৪০]

রবীন্দ্রনাথ অনুধাবন করেছেন যে,সৃষ্টির শুরু থেকেই মানুষের মন তাঁর নিজের প্রতিদিনের ভাষার সঙ্গে প্রকৃতির চিরদিনের ভাষাকে মিলিয়ে নিতে নেওয়ার চেষ্টা করে আসছে। প্রকৃতি থেকে নানা রঙ ,রেখা নিয়ে মানুষ নিজের চিন্তাকে রূপময় করে তুলছে। প্রকৃতি থেকে সুর, ছন্দ নিয়ে মানুষ নিজের ভাবকে কাব্য করে তুলছে। প্রকৃতির 'শাসন ও 'সৌন্দর্য্যে'র কারণে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছে, প্রকৃতির দুই চেহারা, বন্ধনের এবং মুক্তির। একই রূপ-রস-শব্দ-গন্ধের মধ্যে এই দুই সুর, প্রয়োজনের এবং আনন্দের। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের অন্তরের সম্পর্ক কত বড়, বিচিত্র ও গভীর সেটাও তিনি অনুভব করেছেন। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, শিশুদের ইন্দ্রিয়শক্তির সজীবতা ও সতেজতার জন্যই প্রকৃতির সান্নিধ্য থেকে তাদের বঞ্চিত করা উচিত নয়। তিনি লিখেছেন:

> বালকদের হৃদয় যখন নবীন আছে, কৌতূহল যখন সজীব এবং সমুদয় ইন্দ্রিয়শক্তি যখন সতেজ তখনই তাহাদিগকে মেঘ ও রৌদ্রের লীলাভূমি অবারিত আকাশের তলে খেলা করিতে দাও-তাহাদিগকে ভূমার আলিঙ্গন হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়ো না।[১৪১]

নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতপক্ষে বুঝেছিলেন মানবজীবনে প্রকৃতির প্রভাব কতটা গভীর। জল পড়ার শব্দ, পাতা নড়ার দৃশ্য, সকালের সূর্যোলোক, বর্ষার জল-এর সবই তাঁর ব্যক্তিত্বকে গড়ে তুলেছিল। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো প্রকৃতিই তাঁর মধ্যে সঞ্চারিত করে দিয়েছিল সামঞ্জস্যের বোধ, যা মানুষের মনে আনন্দের সঞ্চার করে। জীবনস্মৃতিতে তিনি লিখেছেন–'আমরা শিশুকালেই বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে আমার খুব একটি সহজ এবং নিবিড় যোগ ছিল। বাড়ির ভিতরের নারিকেল গাছগুলি প্রত্যেক আমার কাছে অত্যন্ত সত্য হইয়া দেখা দিত।[১৪২] তাঁর জীবনে প্রকৃতি ছিল 'রহস্য' ও 'আনন্দের' উৎস । তিনি লিখেছেন:

> ছেলেবেলার দিকে যখন তাকানো যায় তখন সব চেয়ে এই কথাটা মনে পড়ে যে, তখন জগৎটা এবং জীবনটা রহস্যে পরিপূর্ণ। সর্বত্রই যে একটি অভাবনীয় আছে এবং কখন যে তাহার দেখা পাওয়া যাইবে তাহার ঠিকানা নাই, এই কথাটা প্রতিদিনই মনে জাগিত। প্রকৃতি যেন হাত মুঠা করিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিত, কী আছে বলো দেখি। কোনটা থাকা যে অসম্ভব, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিতাম না।...তখনকার দিনে এই পৃথিবী বস্তুটার রস নিবিড় ছিল, সেই কথাই মনে পড়ে। কী মাটি, কী জল, কী গাছপালা, কী আকাশ, সমস্তই তখন কথা কহিত-মনকে কোনোমতেই উদাসীন থাকিতে দেয় নাই। মনো হইত, বড়োরা তো ইচ্ছা করিলেই সব করাইতে পারেন, তবে তাঁহারা কেন এমন অগভীরের মধ্যে থামিয়া বসিয়া আছেন-আমাদের মতো শিশুর আজ্ঞা যদি খাটিত, তাহা হইলে পৃথিবীর গূঢ়তম সংবাদটি এমন উদাসীনভাবে মাটিচাপা পড়িয়া থাকিত না।[১৪৩]

রবীন্দ্রনাথের যখন বয়স আঠারো বছর তখন একটি বিশেষ মুহূর্ত, তাঁকে এক গভীরতর বোধে পৌঁছে দিয়েছিল। কলকাতার সদর স্ট্রিটের বাড়িতে পাওয়া ওই মুহূর্তটিকে রবীন্দ্রনাথ 'সমস্ত ভিতরটাকে বিশ্বের আলোক একে বারে বিচ্ছুরিত' বলে উল্লেখ করেছেন। বিষয়টি আমরা তাঁর বর্ণনায় দেখে নিতে পারি। তিনি লিখেছেন:

> সদর স্ট্রীটের রাস্তাটা যেখানে গিয়া শেষ হইয়াছে সেইখানে বোধ করি ফ্রী-স্কুলের বাগানের গাছ দেখা যায়। একদিন সকালে বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমি সেই দিকে চাহিলাম। তখন সেই গাছগুলির পল্লবান্তরাল হইতে সূর্যোদয় হইতেছিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন

> একটা পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম, একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত। আমার হৃদয়ে স্তরে স্তরে যে একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমেষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাকে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল। সেইদিনই 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি নির্ঝরের মতোই যেন উৎসারিত হইয়া বহিয়া চলিল। লেখা শেষ হইয়া গেল কিন্তু জগতের সেই আনন্দরূপের উপর তখনো যবনিকা পড়িয়া গেল না। এমনি হইল আমার কাছে কেহই এবং কিছুই অপ্রিয় রহিল না।[১৪৪]

শিশুদের জীবনে প্রকৃতির এই প্রবল সংবেদনশীল প্রভাব ও ভূমিকার কথা রবীন্দ্রনাথ জীবন দিয়ে অনুভব করেছিলেন বলেই শান্তিনিকেতনের শান্ত প্রকৃতির কোলে প্রাচীন ভারতীয় তপোবনের আদর্শে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেখানে তিনি তাঁর শিক্ষাক্রমকে প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছিলেন। মূলত প্রকৃতির সাহচর্য ছাড়া মানুষের ব্যক্তিত্বর বিকাশ যে অভিন্ন, সেটাই ছিল তাঁর শিক্ষাভাবনার মূল কথা।

শিশুশিক্ষাকে কেন্দ্র করেই রবীন্দ্রনাথের পল্লিশিক্ষা কার্যক্রমের সূত্রপাত। আজকের শিশুরাই আগামী দিনে দেশের নেতৃত্ব গ্রহণ করবে। তাই দেশের উন্নয়নের জন্য প্রথমেই দরকার শিশু-উন্নয়ন। শিশু-উন্নয়নের জন্য শিশুদের আদর্শ শিক্ষায় দীক্ষিত করতে হবে। কেবল পুথিগত বিদ্যাচর্চা নয়, বরং বিদ্যার্জনের মাধ্যমে পরিণত মানুষের স্বপ্ন দেখেছেন রবীন্দ্রনাথ। শিশুর স্বাভাবিক মানসিক বিকাশের জন্যই তিনি পল্লির উদার প্রান্তরে গাছপালা-ঘেরা অঞ্চলে নির্মাণ করেছেন তাঁর স্বপ্নের বিদ্যালয়। তিনি লিখেছেন-'আদর্শ বিদ্যালয় যদি স্থাপন করিতে হয় তবে লোকালয় হইতে দূরে নির্জনে মুক্ত আকাশ উদার প্রান্তরে গাছপালার মধ্যে তাহার ব্যবস্থা করা চাই।[১৪৫] তাঁর ব্রহ্মাচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠানে শিশুর শিক্ষাদান পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন:

> আমি চেয়েছিলুম যে তারা অনুভব করুক যে, বসুন্ধরা তাদের ধাত্রীর মত কোলে করে মানুষ করেছে। তারা শহরের যে ইট কাঠ পাথরের মধ্যে বর্ধিত হয় সেই জড়তার কারাগার থেকে তাদের মুক্তি দিতে হবে। এই উদ্দেশ্যে আমি আকাশ-আলোর অঙ্কশায়ী উদার প্রান্তরে এই শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেছিলুম। আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, শান্তিনিকেতনের গাছপালা পাখিই এদের শিক্ষার ভার নেবে। আর সেই সঙ্গে কিছু কিছু মানুষের কাছ থেকেও এরা শিক্ষালাভ করবে। কারণ বিশ্বপ্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে যে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা আছে, তাতে করি শিশুচিত্তের বিষম ক্ষতি হয়েছে।[১৪৬]

সভ্যতার শুরু থেকেই মানুষ তাঁর প্রয়োজনে প্রকৃতির আশ্রয় প্রত্যাশা করেছে। তাঁরা নানা সমস্যা সংকটে প্রকৃতির কৃপাশ্রয়ী হয়েছে। এই বিবেচনায় প্রকৃতির হাতেই মানুষের শিক্ষার হাতেখড়ি। প্রকৃতিরি আলো, বায়ু, জল সবই মানুষের প্রয়োজনের অফুরন্ত উৎস। খোলা আকাশ,অবারিত মাঠ, সবুজ গাছপালা মানবসন্তানের শরীর-মনের সুপরিণতির জন্য একান্ত প্রয়োজন। শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের জন্য প্রকৃতির এসব দানের বিকল্প আর কিছু হতে পারে না। প্রকৃতির কাছ থেকে শেখারও শেষ নেই। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

> ....খোলা আকাশ, খোলা বাতাস এবং গাছপালা মানবসন্তানের শরীর-মনের সুপরিণতির জন্য যে অত্যন্ত দরকার এ কথা বোধ হয় কেজো লোকেরাও একেবারে উড়াইয়া দিতে পারিবেন না। বয়স যখন বাড়িবে, আপিস যখন টানিবে, লোকের ভিড় যখন ঠেলিয়া লইয়া বেড়াইবে, মন যখন নানা মতলবে নানা দিকে ফিরিবে, তখন বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ হৃদয়ের যোগ অনেকটা বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। তাহার পূর্বে যে জলস্থল-আকাশবায়ুর চিরন্তন ধাত্রীক্রোড়ের মধ্যে জন্মিয়াছি তাহার সঙ্গে যতার্থভাবে পরিচয় হইয়া যাক, মাতৃস্তন্যের মতো তাহার অমৃতরস আকর্ষণ করিয়া লই, তাহার উদার মন্ত্র গ্রহণ করি-তবেই সম্পূর্ণরূপে মানুষ হইতে পারিব। বালকদের হৃদয় যখন নবীন আছে, কৌতুহল যখন সজীব এবং সমুদয় ইন্দ্রিয়শক্তি যখন সতেজ, তখনই তাহাদিগকে মেঘ ও রৌদ্রের লীলাভূমি অবারিত আকাশের তলে খেলা করিতে দাও-তাহাদিগকে এই ভূমার আলিঙ্গন হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়ো না। স্নিগ্ধ নির্মল প্রাতঃকালে সূর্যোদয় তাহাদেও প্রত্যেক দিনকে জ্যোতির্ময় অঙ্গুলির দ্বারা উদ্ঘাটিত করুক এবং সূর্যাস্তদীপ্ত সৌম্য গম্ভীর সায়াহ্ন তাহাদের সম্মুখে ঘটিতে দাও। তাহারা গাছের তলায় দাঁড়াইয়া দেখুক, নববর্ষা প্রথম যৌবরাজ্যে-অভিষিক্ত রাজপুত্রের মতো তাহার পুঞ্জ পুঞ্জ সজলনিবিড় মেঘ লইয়া আনন্দগর্জনে চিরপ্রত্যাশী বনভূমির উপরে আসন্ন বর্ষণের ছায়া ঘনাইয়া তুলিতেছে-এবং শরতে অন্নপূর্ণা ধরিত্রীর বক্ষে শিশিরে সিঞ্চিত, বাতাসে চঞ্চল, নানা বর্ণে বিচিত্র, দিগন্তব্যাপ্ত শ্যামল সফলতার অপর্যাপ্ত বিস্তার স্বচক্ষে দেখিয়া তাহাদিগকে ধন্য হইতে দাও। হে প্রবীণ অভিভাবক, হে বিষয়ী, তুমি কল্পনাবৃত্তিকে যতই নির্জীব, হৃদয়কে যতই কঠিন করিয়া থাক, দোহাই তোমার, এ কথা অন্তত লজ্জাতেও বলিয়ো না যে, ইহার কোনো আবশ্যক নাই-তোমার বালকদিগকে বিশাল বিশ্বের মধ্য দিয়া বিশ্ব জননীর প্রত্যক্ষলীলাস্পর্শ অনুভব করিতে দাও-তাহা তোমার ইন্‌স্‌পেক্টরের তদন্ত

Dhaka University Institutional Repository

এবং পরীক্ষকের প্রশ্নপত্রিকার চেয়ে যে কত বেশি কাজ করে তাহা অন্তরে অনুভব কর না বলিয়াই তাহাকে নিতান্ত উপেক্ষা করিয়ো না।[১৪৭]

১৬

শিক্ষাচিন্তা গঠনে পারিবারিক প্রভাব ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা

ঈশ্বচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে জোড়াসাকোঁর ঠাকুর পরিবারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। রবীন্দ্রনাথও তাঁর গভীর অনুরাগী ছিলেন। বিদ্যাসাগরের শিক্ষাভাবনা যে তাই তাকে অনুপ্রাণিত করেছিল, সেকথা উল্লেখ না করলেও চলে। রবীন্দ্রনাথ শুধু বিদ্যাসাগর নন, প্রার্থনা সমাজের শিক্ষা সংস্কারের দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছিলেন। আর এ ব্যাপারে কেশবচন্দ্র সেনের (১৮৩৮-৮৪) সহযোগিতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পুনার প্রার্থনা সমাজের আদলে কেশবচন্দ্র বাংলাদেশে প্রার্থনা সমাজের (১৮৬৭) প্রবর্তন করেন। এমজি রানাডে ছিলেন পুনায় প্রতিষ্ঠিত প্রার্থনা সমাজের অন্যতম সদস্য। এই সমাজ শিক্ষাক্ষেত্রে বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বোম্বেতে নিম্নবর্ণের শ্রমজীবী মানুষের জন্য রাত্রিকালীন ক্লাশের ব্যবস্থা করা, নারীশিক্ষার বিস্তার ইত্যাদি। ব্রাহ্ম্যসমাজের প্রভাবেই এই সমাজ গঠিত হয়, যদিও একজন গবেষক বলেছেন ব্রাহ্মণ্যবাদের হিন্দুপ্রভাব থেকে এই সমাজ কখনই বিচ্ছিন্ন হতে পারেনি ।

রবীন্দ্রনাথকে সম্ভবত সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর এই জ্যোতিদাদা বিপুল প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন একই সঙ্গে সুরকার, সংগীতজ্ঞ, কবি নাট্যকার এবং শিল্পী। সেকালের প্রেক্ষাপটে স্বদেশী দ্রব্য উৎপাদন ও প্রচলনের ব্যাপারেও তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। পিয়ানো বাদক ও সুরকার হিসেবে তিনি স্বরলিপি প্রণয়ণের একটা রীতি আবিষ্কার করেছিলেন। তিনিই প্রথম বাংলা ভাষায় সংগীত বিষয়ক পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। ছোট ভাই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে প্রতিভার বিচ্ছুরণ দেখে তিনি নানাভাবে তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের চোখে তিনি ছিলেন একজন আদর্শ শিক্ষক। ঠাকুরবাড়ির মধ্যে তাঁর অবস্থান ছিল অনন্য । জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন:

> পুরনো কায়দার ভিড়ের মধ্যে জ্যোতিদাদা এসেছিলেন নির্জলা নতুন মন নিয়ে। আমি ছিলুম তাঁর চেয়ে বারো বছরের ছোটো। বয়সের এত দূর থেকে আমি যে তাঁর চোখে পড়তুম এই আশ্চর্য। আরো আশ্চর্য এই যে, তাঁর সঙ্গে আলাপে জ্যাঠামি বলে কখনো আমার মুখ চাপা দেন নি। তাই কোনো কথা ভাবতে আমার সাহসে অকুলোন হয়নি।...ছাদের ঘরে এলো পিয়ানো...এইবার ছুটল আমার গানের ফোয়ারা। জ্যোতিদাদা পিয়ানোর উপর হাত চালিয়ে নতুন নতুন ভঙ্গিতে ঝমঝম সুর তৈরি করে যেতেন, আমাকে রাখতেন পাশে। তখনই তখনই সেই ছুটে-চলা সুরে কথা বসিয়ে বেঁধে রাখবার কাজ ছিল আমার।[১৪৮]

উনিশ শতকের শেষ দিকে ভারতের শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে যেসব কথাবার্তা চলছিল, বলা হচ্ছিল যে জাতীয় শিক্ষার কথা, সেটাই ধীরে ধীরে বিকল্প এক শিক্ষাধারা সৃষ্টিতে সহায়তা করতে থাকে। রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ঐতিহাসিক ভিত্তিও এভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তিনিও নিজস্ব এক বিকল্প শিক্ষার কথা ভাবতে শুরু করেন। সমকালের বিভিন্ন শিক্ষা সংস্কারক ও শিক্ষাচিন্তাবিদদের অনেকের সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের ছিল ব্যক্তিগত যোগাযোগ। কেশবচন্দ্র সেন রবীন্দ্রনাথের বড় দাদা হেমেন্দ্রনাথকে নিজের চিন্তার দ্বারা বেশ প্রভাবিত করেছিলেন। হেমেন্দ্রনাথের মাধ্যমেই রবীন্দ্রনাথের স্বল্পস্থায়ী সূচনা ঘটে। প্রাচ্যতত্ত্ববিদ ম্যাক্স মুলার ছিলেন তাঁর পিতামহ দ্বারকানাথের বন্ধু এবং তিনি ইংল্যান্ডে রবীন্দ্রনাথের দাদা সত্যেন্দ্রনাথের শিক্ষক ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। তিনি নারীশিক্ষা ও সমাজ সংস্কারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেনায় স্বামী দয়ানন্দ জোড়াসাঁকো আসতেন এবং পরে রবীন্দ্রনাথ স্বামী মুন্সি রাম ও তাঁর গুরুকুলের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। রামকৃষ্ণ মিশন ও থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক ছিল। শিক্ষা-পরিকল্পনা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ অ্যানি বেসান্ত ও ভগ্নী নিবেদিতার সঙ্গে অনেক সময় আলাপ-আলোচনা করেছেন বলে ধারণা করা হয়। জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন গড়ে তুলবার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ প্রথম দিকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। সংক্ষেপে বললে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার ব্যাপারটি শিক্ষা সংক্রান্ত বিচ্ছিন্ন কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপার ছিল না। সমকালীন বিভিন্ন শিক্ষা ও সামাজিক আন্দোলনের মধ্যেই তার বীজ সংগুপ্ত ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

সেই আন্দোলনের দ্বারা অনেকটা অনুপ্রাণিত হয়ে এবং সমকালের প্রয়োজনে তিনি শান্তিনিকেতনে ব্রহ্ম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। রবীন্দ্রনাথ বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের শুরুতে (১৯১২) চিকিৎসার জন্য ইংল্যান্ডে যান। সেখানে সমকালীন প্রখ্যাত লেখক-শিল্পীদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। ইংল্যান্ডে থাকা কালেই তিনি সমকালীন পাশ্চাত্য শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষার গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে ব্যাপকভাবে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এই সময়ে প্রকাশিত শিক্ষা বিষয়ক অনেক বই ও প্রবন্ধ পড়েন তিনি । আমেরিকায় আসার পর মার্কিন শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কেও তাঁর মনে আগ্রহের সৃষ্টি হয়। এখানেও তিনি শিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন বই ও প্রবন্ধ পড়েছেন।

শিক্ষার সঙ্গে সুকুমার কলার যে একটা গভীর সম্পর্ক রয়েছে, সম্ভবত রবীন্দ্রনাথই বাঙালিদের মধ্যে সর্বপ্রথম সেকথা উপলব্ধি করেছিলেন। জাপান ভ্রমণের (১৯১৬) মধ্য দিয়ে শিক্ষা সম্পর্কিত তাঁর এই ভাবনা আরও দৃঢ় হয়। কে সুব্রামানিয়ম জানাচ্ছেন, সুশৃঙ্খল জাপানিদের দেখে রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়েছিলেন। বস্তুবাহুল্যের দ্বারা দৈনন্দিন জীবনকে জাপানিরা ভারাক্রান্ত করে তোলেনি বলে তিনি বিস্মিত হন। গৌতম বুদ্ধের প্রভাবে জাপানিরা এরকম হয়েছে জেনে ভারতীয় হিসেবে তিনি আরও লজ্জা বোধ করেন। জাপানিদের প্রভাবে রবীন্দ্রনাথের তখন এই ধারণা হয় যে সামাজিক সংস্কার ও মানবীয় ব্যক্তিত্ব গঠনে শিল্পকলা বা সুকুমার কলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

বাঙালি মানসের অফুরন্ত বিস্ময়ের অন্তহীন উৎস রবীন্দ্রনাথ তাঁর সৃষ্টি ও সাধনা, তাঁর মনন ও দর্শন, তাঁর বহুমাত্রিকতা ও বৈচিত্র্য তাঁর অভিঘাত ও উত্তরাধিকার, তাঁর জীবন ও কর্ম। তিনি কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, অভিনেতা, গীতিকার, দার্শনিক, বিজ্ঞানপ্রেমিক, সমালোচক, ভাষাচিন্তাবিদ, চিত্রশিল্পী, রাজনীতি-ভাবুক, দেশী-বিদেশী ভাবনার সংশ্লেষণ, সমাজ-রাষ্ট্র আন্দোলনের অগ্রণী পথিক, সর্বোপরি শিক্ষাপদ্ধতির উদ্ভাবক ও পরীক্ষক। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনা ও তার চর্চা তাই গভীর অভিনিবেশ ও বিশ্লেষণের দাবি রাখে। রবীন্দ্রনাথ আসলে এমন এক ব্যক্তিত্ব যিনি তাঁর জীবনের প্রায় চল্লিশটি বছর বিকল্প শিক্ষাব্যবস্থার কাজে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল ব্যক্তির অন্তর্গত সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটিয়ে তাকে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। সামাজিক ও পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার কাজে ওই মানুষ যাতে আত্মোৎসর্গ করতে পারে, শিক্ষাকে সেই লক্ষ্যে চালিত করতে চেয়েছেন তিনি। হুমায়ূন কবির লিখেছেন:

> রবীন্দ্রনাথের উক্তি ও কর্মে প্রতিফলিত নীতিমালার ছাঁচে স্বাধীন ভারতের শিক্ষা পুনর্গঠনের কাজ বহুলাংশে অনুকৃত হয়েছে। প্রাথমিক স্তরে, চঞ্চলতাজনিত ক্রিয়ামনস্কতা এবং হাতের কাজের প্রণাদনার নীতির উপর ভিত্তি করে মৌলিক শিক্ষার যে-নকশা তা জাতি গ্রহণ করেছিল। মাধ্যমিক স্তরে, শিশুদের বিভিন্ন প্রবণতার চাহিদা ও রুচি অনুযায়ী শিক্ষাক্রমের যে অগণিত ধারা তৈরি হল তাও রবীন্দ্রনাথের শিক্ষানীতির সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রেখে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উপরে তিনি যে গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন, তা ক্রমশ প্রতি স্তরেরই শিক্ষাক্রমের ভিবরে স্থান পেল। শিক্ষা ও জীবনের নিত্যসম্পর্ক, ভারতের প্রয়োজন পাশ্চাত্য রীতির আত্মীকরণ এবং শিক্ষার যাবতীয় ক্ষেত্রে সর্বমানবিক দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়ে তাঁর আবেদন এমনকি সে-সব ক্ষেত্রের চিন্তাধারাকেও প্রভাবান্তিত করেছে যেখানে আধুনিক ভারতের শিক্ষাবিদগণ পূর্বে কখানো প্রভাবিত হননি।[১৪৯]

রবীন্দ্রনাথ আমাদের ঐতিহ্য ও আশ্রয় । আমাদের সমস্ত শুভচেতনাজুড়ে তাঁর অবস্থান। তাঁর কালজয়ী প্রতিভার নিত্য উপহারে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে। তাঁর প্রাণের স্পর্শেই আমাদের প্রাণের জাগরণ ঘটেছে। অসম্ভব কবি খ্যাতির আড়াল থেকে আমরা যেমন প্রকৃত রবীন্দ্রনাথকে আবিষ্কার করতে পারিনি তেমনি তাঁকে বিচ্ছিন্নভাবে পাওয়ার চেষ্টা করেও অনেকখানি ব্যর্থ হয়েছি। কারণ রবীন্দ্রনাথকে সামগ্রিকভাবে পেতে হলে তাঁর প্রতিভার সর্বপরিব্যাপ্তীতায় বিষদ অনুসন্ধান দরকার হয়। তাঁর কাব্য, উপন্যাস,নাটক, প্রবন্ধ, ছোট গল্প, চিঠি-পত্র , ভ্রমণ-বক্তৃতা, জীবনস্মৃতি প্রভৃতি বিষয়ে গভীর মনোযোগী হতে হয় । আর সেগুলোর যথার্থ সমন্বয় সাধন করতে হয় সমকালের নানা ঘটনা প্রবাহের সামনে রেখে কালের প্রেক্ষিতে। আমরা সেভাবে তাঁর চিন্তার গভীরতা অনুধাবন করতে পারিনি । এই না পারার দায় তাঁর নয়, আমাদের। আমরা নিজেদের মতো করে তাঁর চিন্তার উপর এক একটা পর্দা টেনে দিয়ে তাঁর সৃষ্টিকে সাধ্যমতো আড়াল করার চেষ্টা করেছি। না হলে যতটুকু দরকার ঠিক ততটুকু গ্রহণ করেই তৃপ্ত থেকেছি,অনেকটা ওষুদের মতো করে কখনো বা বাধ্য হয়ে পরীক্ষা পাসের অনুপাতে গ্রহণ করেছি, তাঁকে সমগ্রের কল্যাণবোধের আধার হিসেবে ভাবিনি। কিংবা বৃহত্তর সমাজের কথা, মানুষের প্রয়োজনের কথা ভাববার অবকাশ আমাদের হয়নি। ফলে তাঁর কবিতা, ছোট গল্প,নাটকে আমরা যতটা আালোড়িত হয়েছি, তাঁর অন্য কোনো কর্মের প্রতি ততটা

হইনি। এ না হওয়ার কারণে তাঁর প্রতি আমাদের ধারণা অপূর্ণ থেকে গেছে। ফলে তাঁকে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্যে দ্বিধা-বিভক্তি তৈরি হয়েছে। এভাবে আমরা তাঁকে সামগ্রিকভাবে পাওয়া থেকে দূরে থেকেছি। আর তা করেছি বলেই জগতের বিচিত্র বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের বিচিত্রচিন্তার প্রতি এখনো সুবিচার করতে পারিনি।

ষষ্ঠ অধ্যায় : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাচিন্তা

তথ্যসূত্র :

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিলাইদ, ১২ই কার্তিক ১৩১৭, চিঠিটি ie»'feb msMnkvjv, wekfviZx, শান্তিনিকেতনে আছে।
২. শিপ্রা সরকার, ie»'bv‡_i wkÿv'k‡b Dbqb-fvebv ,বাংলা একাডেমি, অগ্রহায়ণ ১৪১৫/ ডিসেম্বও ২০০৮

Dhaka University Institutional Repository

পৃ.২৯,৩০

৩. কড়ি ও কোমল এবং মানসী-র যুগ থেকে সোনার তরী-র যুগে রবীন্দ্রমানসের যে-বিবর্তন তা কেবল মাত্রাগত নয়, প্রকৃতিগতও। মানসী পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ আপন হৃদয়-অরণ্যের ধূসর আলোকে দিশেহারা; তাঁর ভাবনা তখনো নীহারিকাবৎ। আবার সোনার তরী-তে এসে আকস্মিকভাবে তিনি যেন রৌদ্রকরোজ্জ্বল শক্ত মাটির বৃহৎ পৃথিবীতে উপস্থিত হয়েছেন। সম্ভবত পূর্ববঙ্গের প্রকৃতি, মানুষ ও সমাজের সঙ্গে তাঁর গভীর যোগাযোগের কারণেই রবীন্দ্রমানসে এই পরিবর্তন এসেছিল। প্রমথনাথ বিশী রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত তাঁর প্রায় প্রত্যেকটি গ্রন্থেই কমবেশি এ প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। তবে তাঁর রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্প এবং শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থেই এ প্রসঙ্গে সবচেয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে। [দ্র. গোলাম মুরশিদ, ie»'we‡k cee½ cee‡½ ie»'PPi, বাংলা একাডেমি, আষাঢ় ১৩৮৮ / জুন ১৯৮১, ঢাকা, পৃ.১]

৪. নীহাররঞ্জন রায়, ie»'-mwn‡Z¨i fwgKv, অংশে এ বিষয়ে লিখেছেন। [দ্র.গোলাম মুরশিদ, ie»'we‡k cee½ cee‡½ ie»'PPv, বাংলা একাডেমি, আষাঢ় ১৩৮৮ / জুন ১৯৮১, ঢাকা, পৃ.১]

৫. ie»'bv_ vwKi, Rxeb¯'wZ, ie»'iPbvejx, 'kg LÐ (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৬১), পৃ ৯ - ১৫। পৃ ৭-৮

৬. cwðghvÎxi Wvqwi, ie»'iPbvejx, 'kg LÐ, পৃ. ৫৭৫।

৭. ঐকতান (কবিতা), জন্মদিনে কাব্যের ১০ সংখ্যক কবিতা, ie»'iPbvejx 3, পৃ. ৮৪৫ ৮৪৭

৮. AvZ‡cwiPq, ie»'iPbvejx 10 পূর্বোক্ত পৃ. ২০৯

৯. জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্ররচনাবলী ১০, পূর্বোক্ত 'ঘর ও বাহির' অধ্যায় দ্রষ্টব্য, পৃ.৯ -১৫

১০. †Q‡j‡ejv, ie»'iPbvejx 10, পূর্বোক্ত পৃ. ১৩৫, ১৩৮ - ১৩৯, ১৪১

১১. Rxeb¯'wZ, ie»'iPbvejx 10, পূর্বোক্ত পৃ. ১১-১৫, ২৪-২৫; AvZ‡cwiPq, ie»'iPbvejx 10, পৃ. ২০৯; 'ভ্রমণী' (কবিতা), ছড়ার ছবি, রবীন্দ্ররচনাবলী ৩, পৃ. ৫৩১

১২. *R. Tagore, The Relogion of Man* (5th Impression : London : Geogre Allen & Unwing Ltd, 1958), p. 173

১৩. L.K. Elmhirst, *The Foundation of Sriniketan, Rabindranath Tagore : Pioneer Education* (2nd edn., London : Lohn Murray, 1961, p. 18; H. B. Mukherjee Education for Fulliness (Bombay : Asia Publishing, 1962, pp. 8 -12.

১৪. জীবনস্মৃতি, ie»'iPbvejx 19, পৃ. ৮, ১৮-২৪, ৩০-৩২, ৫২-৫৩। এই অপ্রীতিকর স্মৃতি কবিতায়ও ব্যক্ত হয়েছে : 'আতার বিচি,' ছড়ার ছবি, রবীন্দ্ররচনাবলী ৩, পৃ. ৫২০; 'স্কুল-পালানে,' আকাশ প্রদীপ, ie»'iPbvejx 3, পৃ. ৬৩৬

১৫. আত্মপরিচয়, রবীন্দ্ররচনাবলী ১০, পূর্বোক্ত পৃ. ২০৯

১৬. গোলাম মুরশিদ, ie»'we‡k cee½ cee‡½ ie»'PPv, বাংলা একাডেমি, আষাঢ় ১৩৮৮ / জুন ১৯৮১, ঢাকা, পৃ. ৯

১৭. দ্বারকানাথ যে উৎসাহ নিয়ে দুর্গাপূজা ও অন্যান্য দেশীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করতেন, তা থেকে এমন মনে করলে অসঙ্গত হবে না যে, এসব রীতিনীতির প্রতি তাঁর বিশ্বাস অগভীর ছিলো না। পোশাক-পরিচ্ছদেও একটি অভ্রান্ত স্বাদেশিকতা তাঁর মধ্যে লক্ষণীয়। [দ্র.গোলাম মুরশিদ, ie»'we‡k cee½ cee‡½ রবীন্দ্রচর্চা, বাংলা একাডেমি, আষাঢ় ১৩৮৮ / জুন ১৯৮১, ঢাকা, পৃ.]

১৮. এই বিষয়ে তিনি রামমোহনের সবচেয়ে সার্থক অনুসারী ছিলেন। দেশীয় বহু বিষয়ে তাঁর বিশ্বাস ও আনুগত্য আন্তরিক হলেও, প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায়, সামাজিক আচরণে, এমনকি, ধর্মীয় ক্রিয়াকর্মে তিনি পাশ্চাত্য মূল্যবোধের সঙ্গে দেশীয় মূল্যবোধের সমন্বয় করেছিলেন; অথবা বলা চলে রামমোহন যে সমন্বয় সাধন করেছিলেন তা অনুসরণ করেছিলেন। [দ্র.গোলাম মুরশিদ, রবীন্দ্রবিশ্বে পূর্ববঙ্গ পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রচর্চা, বাংলা একাডেমি, আষাঢ় ১৩৮৮ / জুন ১৯৮১, ঢাকা, পৃ.]

১৯. ইংরেজদের সঙ্গে মেলামেশা, বিলেতগমন, ইংরেজদের বহু রীতিনীতির অনুকরণ তিনি করেছিলেন। এমনকি, রামমোহনের সঙ্গে তিনি উইলিয়াম অ্যাডাম স্থাপিত ক্যালকাটা ইউনিটারিআন কমিটির (১৮২১) সদস্য হয়েছিলেন। [দ্র.গোলাম মুরশিদ, ie»'we‡k cee½ cee‡½ ie»'PPv, বাংলা একাডেমি, আষাঢ় ১৩৮৮ / জুন ১৯৮১, ঢাকা, পৃ]

২০. AvZ‡cwiPq, ie»'iPbvejx 10, পূর্বোক্ত পৃ. ২০৭

২১. পূর্বোক্ত , পৃ. ২০৮

২২. সুকুমার সেন, cwiRb-cwi‡ek ie»'-weKvk ,কলকাতা : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬২, পৃ. ১০-১১

২৩. পূর্বোক্ত ,পৃ. ৬৬,

২৪. সুকুমার সেন, cwiRb-cwi‡ek ie»'-weKvk, পৃ. ১০

২৫. জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্ররচনাবলী ১০, পূর্বোক্ত পৃ ৬৬

২৬. পূর্বোক্ত পৃ ৬৬

২৭. এই আত্মসচেতনতা ও স্বজাতিপ্রীতি অংশত হীনমন্যতাজাত, অংশত ইংরেজ প্রভুদের বৈষম্যমূলক ও উৎপীড়নমূলক আচরণজাত। B. B. Misra, The Indian Middle classes (London : Oxford University Press, 1961), pp. 371

২৮. A. Seal, *The emergence of Indian Nationalism* (Cambridge : Cambridge University press, 1986) pp. 150 -170.
২৯. শিপ্রা সরকার ,রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনে উন্নয়ন-ভাবনা, বাংলা একাডেমি অগ্রহায়ণ ১৪১৫/ ডিসেম্বর ২০০৮,পৃ.৪৩
৩০. রবীন্দ্রনাথ; কালান্তর; বিশ্বভারতী: পূনর্মুদ্রণ১৪৩০, পৃ.১৮৭।
৩১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের পুত্র: মহিসুর, ৫ জানুয়ারি ১৯২৬। রবীন্দ্রভবন সংগ্রহশালা, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন।
৩২. প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, ie»‘ Rxeb K_v, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ষষ্ঠ মুদ্রণ ১৪০৭ বাং কলকাতা. পৃ.৫
৩৩. রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: ‘আমার দাদা সোমেন্দ্রনাথ, আমার ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ [গঙ্গোপাধ্যায়] এবং আমি।’ – পাণ্ডুলিপি
৩৪. মাধবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কথা। দ্রষ্টব্য মাধব গোঁসাই– ‘পুরোনো বট,’ শিশু
৩৫. বাড়ির চণ্ডিমণ্ডপের পাঠশালায়– ছেলেবেলা, অধ্যায় -৮
৩৬. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত eYcwiPq প্রথম ভাগ দ্রষ্টব্য।
৩৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, Rxeb¯‹wZ, বেগম আকতার কামাল সম্পাদিত, প্রতীক প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি ২০১৫, ঢাকা, পৃ.১১
৩৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, Rxeb¯‹wZ, বেগম আকতার কামাল সম্পাদিত, প্রতীক প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি ২০১৫, ঢাকা, পৃ.২৬-২৭
৩৯. ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ জুন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কলকাতায় নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এ স্কুল প্রতিষ্ঠার সময় তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার আদর্শ বিদ্যাসাগরের সামনে থাকলেও উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠার পেছনে তাঁর লক্ষ্য ছিল দেশে শিক্ষাদানের জন্য উপযুক্ত শিক্ষকের দৈন্য দূর করা তথা শিক্ষক তৈরি করা। এর কারণ তখনকার দিনে নতুন কোনো আদর্শ স্কুলের যোগ্য শিক্ষক পাওয়া যেত না। শিক্ষক হতে যাঁরা প্রার্থী হন, তাঁদের বেশিরভাগই শিক্ষক হওয়ার যোগ্য নন। যাঁদেরকে পাওয়া যায় তাঁদের জ্ঞানও সমাজ-ধর্ম-ভাব-ভাষায় পরিশোধিত নয়। ‘এ দৈন্য দূর করা যায় কিভাবে তার ব্যবস্থা জানিয়ে শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর উইলিয়ম গর্ডন ইয়ং-এর কাছে বিদ্যাসাগর একটি আবেদন পত্র লেখেন। আবেদন মঞ্জুর হয়। বিদ্যাসাগর নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। নর্মাল স্কুলে পড়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে অন্যান্য স্কুলে শিক্ষকতা করবার অধিকার জন্মিত। [দ্র. wenvixjvj miKvi : we‘¨vmvMi; কলকাতা, ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানি, নভেম্বর ১৯৯১, পৃ ১৬০]
৪০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, Rxeb¯‹wZ, বেগম আকতার কামাল সম্পাদিত, প্রতীক প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি ২০১৫, ঢাকা, পৃ.২৮-২৯
৪১. রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুদর্শ খণ্ড, কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৩৯৮ পৃ ৭২১-২২
৪২. ie»‘-iPbvejx, PZ‘k LÐ, কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৩৯৮ পৃ ৭২২-২৩
৪৩. ie»‘bv_ VvKi, ÔwPwVcÎ; 1, বিশ্বভারতী: পূনর্মুদ্রণ১৪০০. পৃ. ৬২
৪৪. রবীন্দ্রনাথ; fviZcw_K ivg‡gvnb ivq; বিশ্বভারতী: পূনর্মুদ্রণ ১৩৬৬, পৃ.
৪৫. রবীন্দ্রনাথ; Rxeb¯‹wZ; wekfviZx: পূনর্মুদ্রন ১৩৬৩, পৃ.৭৭
৪৬. প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্র জীবন কথা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড,আষাঢ় ১৪০৭ কলকাতা- পৃ.১
৪৭. রচনাটি ১৮৭৭ সালে ‘ভারতী’ পত্রিকার শ্রাবণ ১২৮৪ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ষোল বছর। উদ্ধৃত, সত্যেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎ: শিক্ষাচিন্তা [রবীন্দ্ররচনা-সংকলন]কলকাতা,১৩৮৯, পৃ.৬১ রবীন্দ্র-রচনাবলী,পশ্চিম বঙ্গ সরকার, ১৫শ খণ্ড, পৃ.১৯৯
৪৮. উদ্ধৃত, সত্যেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত ie»‘bv‡_i wPšÍvRMr: wkÿwPšÍv, পূর্বোক্ত ,পৃ., পৃ.৬২-৬৩
৪৯. পূর্বোক্ত, পৃ.৬৪
50. ‘শিক্ষার হেরফের’ পৌষ ১২৯৯, ইং ১৮৯২, রাজশাহী এসোসিয়েশন পঠিত; পরে ঈষৎ সংক্ষিপ্তভাবে, পৌষ ১২৯৯, সাধনা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ এটি লিখেছিলেন শিলাইদহ পর্বের গোড়ার দিক, ‘সোনার তরী’ ‘চিত্রা’র কবিতা রচনার সময়ে।
৫১. ie»‘-iPbvejx 11k LÐ, শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, কলিকাতা, ২৫ বৈশাখ ১৩৬৮, পৃ.৫৩৮
৫২. পূর্বোক্ত, পৃ.৫৩৭–৫৪৫
৫৩. প্রাক্-শান্তিনিকেতন পর্বকে যদি রবীন্দ্রনাথের প্রস্তুতির কাল বলে গণ্য করি, তাহলে এই প্রস্তুতির পরিমাপের-এর গভীরতা ও ব্যাপ্তিরা পরিচয় পাওয়া যাবে এ পর্বেও সব থেকে উল্লেখযোগ্য রচনা ‘শিক্ষার হেরফের’ । এই প্রবন্ধটি বাংলাদেশে সর্বত্র সমাদৃত হয়। যাঁরা্ প্রবন্ধের প্রশংসা করে রবীন্দ্রনাথকে পত্র লিখে সমর্থন জানান তাঁদের মধ্যে জাস্টিস গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ভারতীয় র‍্যাংলার আনন্দমোহন বসু এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁরা রিখেন যে, ‘প্রতি ছত্রে আপনার সঙ্গে আমার মতের ঐক্য আছে।’
৫৪. উদ্ধৃত, সত্যেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত ie»‘bv‡_i wPšÍvRMr: wkÿwPšÍv পূর্বোক্ত, পৃ.৭১–৭২ [রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১২শ খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৩৪৯ গ্রন্থপরিচয়, পৃ.৬১৮
৫৫. পূর্বোক্ত, পৃ.২
৫৬. ie»‘bv‡_i wPšÍvRMr: wkÿwPšÍv পূর্বোক্ত, পৃ.৩০
৫৭. পূর্বোক্ত, পৃ.৯৯
৫৮. সত্যেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত ie»‘bv‡_i wPšÍvRMr: wkÿwPšÍv পূর্বোক্ত, পৃ.১৯২

৫৯. ie» ‘-iPbvejx 11k LÐ, শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, কলিকাতা, ২৫ বৈশাখ ১৩৬৮, পৃ.৭০৫
৬০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর , Rxeb¯§wZ, wekfviZx ১৩৬৬, পৃ ৩৩
৬১. ie» ‘-iPbvejx, 11k LÐ, পৃ.৬৮০
৬২. পূর্বোক্ত, পৃ.৬৯৩
৬৩. ie» ‘-iPbvejx, wØZxq LÐ, cÂg ms¯‹iY, কলকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৯৩ পৃ.৭০৯
৬৪. সত্যেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত ie» ‘bv‡_i wPšÍvRMr: wkÿvwPšÍv ,পূর্বোক্ত, পৃ.১৬
৬৫. পূর্বোক্ত, পৃ.১৬-১৭
৬৬. রবীন্দ্রভবন সংগ্রহশালা, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন। দ্রষ্টব্য: প্রশান্তকুমার পাল (সম্পাদিত), ÔKj¨vYx‡ql ckvšÍÕ, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৬, পৃ.৮-৯
৬৭. সত্যেন্দ্রনাথ রায়, ie» ‘bv‡_i wPšÍvRMr wkÿvwPšÍv , পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৫
৬৮. ie» ‘-iPbvejx 11k LÐ, শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, কলিকাতা, ২৫ বৈশাখ ১৩৬৮, পৃ.৬২৮
৬৯. ie» ‘-iPbvejx, PZ‘k LÐ, কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৩৯৮ পৃ ২৫৪
70. Himangshu Mukherjee Bhushan , Education for fullness: *A study of the Educational Thought and*
Experiment of Rabindranath Tagore, Bomby, Asia Publishing House , 1962 : 71
৭১. উদ্ধৃতি, শিপ্রা সরকার ,ie» ‘bv‡_i wkÿv ‘k‡b Dbqb-fvebv, বাংলা একাডেমি অগ্রহায়ণ ১৪১৫/ ডিসেম্বর ২০০৮,পৃ.৪১
৭২. পূর্বোক্ত, পৃ.৪১
৭৩. মাসুদুজ্জামান, ie» ‘bv_ I Zvi wkÿvfvebv, মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৬, ঢাকা,পৃ.১০১
৭৪. সরোজ চ্যাটার্জী, AvawbK wkÿvZ‡Ëi i|cvqY,নিউ সেন্টাল বুক এজেন্সি (প্রা.) লিমিটেড,পুনর্মুদ্রণ ২০০০, কলকাতা,পৃ.৪৫৬
৭৫. Supriyo Tagore, *Rabindranath’s Philosophy od Education’ in Patha bhavana: A poet’s School* Shantiniketan:Visva-Bharati, 1994),P.18
৭৬. প্রশান্তকুমার পাল, iweRxebx, PZ_ LÐ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৯৫, কলকাতা,পৃ. ৭০২
৭৭. উদ্ধৃতি, শিপ্রা সরকার ,ie» ‘bv‡_i wkÿv ‘k‡b Dbqb-fvebv, পূর্বোক্ত, পৃ.৪৪
৭৮. পূর্বোক্ত, পৃ.৪৫
৭৯. মাসুদুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নম্বর ১৬, পৃ. ১৩৪
৮০. Himangsu Mukherjee Bhusan, Education for Fulness: *A Study of the Educational Thought and Experiment of Rabindranath Tagore*, Bombay Asia Publishing House, 1962, P. 441.
৮১. ie» ‘bv‡_i wkÿv ‘k‡b Dbqb-fvebv, পূর্বোক্ত, পৃ.৪৪-৪৫
৮২. ie» ‘-iPbvejx, PZ‘k LÐ, কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৩৯৮ পৃ.৩০২
৮৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৩
৮৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৩-৪
৮৫. ie» ‘-iPbvejx, lô LÐ, ১৩৯৫ পূর্বোক্ত, পৃ ৮১২
৮৬. রবীন্দ্রভবন সংগ্রহশালা, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন
৮৭. ie» ‘-iPbvejx, lô LÐ, ১৩৯৫ পূর্বোক্ত, পৃ ৭০৩
৮৮. ie» ‘-iPbvejx, 1393, পূর্বোক্ত, পৃ ৩০২–৩০৮ (দ্র.মাসুদুজ্জামান, পূর্বোক্ত পৃ ৪৮–৫৭)
৮৯. Kshitis Roy, *Rabindranath Tagore*: *A Life Story, tarns*. By Lila Roy, New Delhi: Menistry of Information and Broadcasting, Government of India.1980*,* পৃ.৫৪
৯০. প্রশান্তকুমার পাল, iweRxebx, cÂg LÐ, ১৯৯০ পূর্বোক্ত, পৃ ১২৮)।
৯১. রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মচর্যাশ্রম পরিচালনার জন্য রবীন্দ্রনাথ যে বিস্তৃত পরিকল্পনা করেছেন, তার কিছুটা তাঁর ভ্রাতুস্পুত্র বলেন্দ্রনাথ প্রস্তাবিত খসড়া নিয়মাবলী তেকে গ্রহণ করেছিলেন। বলেন্দ্রনাথের অন্য নিয়মগুলি ছিল: (১) শান্তিনিকেতন আশ্রমের ট্রস্টীগণ ব্যতীত আরও চারজন সভ্যকে লইয়া বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ-সমিতি গঠিত হইবে। প্রথম অধ্যক্ষ নির্বাচনে আশ্রমের ট্রস্টীগণের কর্তৃত্ব থাকিবে। তৎপরে কোনো অধ্যক্ষ অবসর গ্রহণ করিলে অবশিষ্ট অধ্যক্ষেরা মিলিয়া অধ্যক্ষ নির্বাচন করিয়া লইবেন। (২) অধ্যক্ষ-সমিতি ব্রাহ্মধর্মানুমোদিত শিক্ষাপ্রণালী এবং শান্তিনিকেতন আশ্রমের নিয়মাবলী সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিয়া বিদ্যালয়ের কার্য পরিচালনা করিবেন। (৩) শান্তিনিকেতন আশ্রমের ট্রস্টীগণের মধ্যে একজন এই বিদ্যালয়ের সম্পাদক হইবেন। সম্পাদক অধ্যক্ষ-সভার অনুমতি লইয়া বিদ্যালয়ের কার্য পরিদর্শন হিসাব পরীক্ষা শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগ ও পরিবর্তন ছাত্র-নির্বাচন পুস্তক শিক্ষাপদ্ধতি নির্ধারণ করিবেন। (৪) বিদ্যালয়ের অন্যান্য পাঠগ্রন্থের সঙ্গে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম এবং চতুর্থ বার্ষিক পরীক্ষা হইতে প্রবেশিকা পর্যন্ত ব্রহ্মধর্ম ও ব্যাখ্যান অধ্যাপন হইবে। (দ্র. প্রশান্তকুমার পাল, iweRxebx , ১৩৯৫ পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৭)
৯২. সত্যেন্দ্রনাথ রায়, ie» ‘bv‡_i wPšÍvRMr wkÿvwPšÍv , পূর্বোক্ত, পৃ.২২১
৯৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫১

৯৪. (রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুদর্শ খণ্ড, কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৩৯৮ পৃ ৩০২ (মাসুদুজ্জামান, ieÜ'bv_ I Zvi wkÿv fvebv, মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৬, ঢাকা,পৃ.৪৭-৪৮)
৯৫. উদ্ধৃতি, শিপ্রা সরকার ,ieÜ'bv‡_i wkÿv'k‡b Dbqb-fvebv, পূর্বোক্ত, পৃ.৪০
৯৬. সত্যেন্দ্রনাথ রায়, ieÜ'bv‡_i wPšÍvRMr wkÿwPšÍv , পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৬
৯৭. ieÜ'-iPbvejx 11k LÐ, শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, কলিকাতা, ২৫ বৈশাখ ১৩৬৮, পৃ.৬৩৩
৯৮. পূর্বোক্ত, পৃ.৬৩৩
৯৯. পূর্বোক্ত, পৃ.৩৬৪
১০০. পূর্বোক্ত, পৃ.৩৬৫
১০১. ieÜ'bv‡_i wPšÍvRMr wkÿwPšÍv , পূর্বোক্ত, পৃ.৬৪
১০২. প্রাচীন ভারতের বর্ণগত অসাম্য এবং তজ্জনিত ক্ষতিকে বঙ্কিমচন্দ্র যেমন তীব্রভাবে সমালোচনা করেছেন, রবীন্দ্রনাথ তা করেননি। তাঁর কল্পনার প্রাচীন ভারতকে তিনি যথাসম্ভব শোধিত রূপেই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু প্রাচীন ভারতে উচ্চশিক্ষা এবং লোকশিক্ষার মধ্যে বিদ্যালয়ের বাইরেই যে সব সংযোগের সূত্র ছিল, যেমন রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত-পাঠ, যাত্রা, কথকতা, কীর্তন ইত্যাদি, বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ দুজনেই এই সংযোগসূত্রগুলির কথা খুব জোর দিয়ে বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ এগুলিকে বলেছেন জনশিক্ষার সহজ পথ। ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থায় এই পথগুলি লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। [দ্র.ieÜ'-iPbvejx 11k LÐ, শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, কলিকাতা, ২৫ বৈশাখ ১৩৬৮পৃ ৩৯৩-৪]
১০৩. ieÜ'-iPbvejx 11k LÐ, শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, কলিকাতা, ২৫ বৈশাখ ১৩৬৮ পৃ ৬৯১–২
১০৪. রবীন্দ্রভবন সংগ্রহশালা, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন
১০৫. রবীন্দ্রনাথ রাশিয়া থেকে ১৯৩০ সালের ২০ সেপ্টেম্বর পুত্র রথীন্দ্রনাথকে এক পত্রে জানিয়েছিলেনঃ (দ্র. রবীন্দ্রভবন সংগ্রহশালা, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন।
১০৬. বিশ্বভারতী বুলেটিন ২০ নং, ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৬, অংশবিশেষ 'শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণে'র পুনশ্চ' রূপে প্রকাশিত
১০৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ছিন্নপত্র'; বিশ্বভারতীঃ পূনর্মুদ্রণ ১৩৮২, পৃ-১৬৩
১০৮. ieÜ'-iPbvejx, 13 LÐ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১২
১০৯. ieÜ'-iPbvejx, 13 LÐ, 'পল্লী সেবা', পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১৭
১১০. পল্লীর উন্নতি', পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০২
১১১. উপেক্ষিতা পল্লী', পূর্বোক্ত,, ৫২৯
১১২. পল্লীসেবা', পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১৮
১১৩. পল্লীসেবা', পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১৯
১১৪. পল্লীপ্রকৃতি', পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১৩
১১৫. ieÜ'-iPbvejx, ১২ LÐ, 'সভাপতির অভিভাষণ : পাবনা প্রাদেশিক সম্মেলন,' আত্মশক্তি ও সমূহ, পৃ. ৮২১
১১৬. ieÜ'-iPbvejx, 13 LÐ, 'সম্ভাষণ,' পল্লীপ্রকৃতি, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬৮
১১৭. ieÜ'-iPbvejx, 13 LÐ 'পল্লীর উন্নতি' পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০৩; (দ্রষ্টব্য 'শ্রীনিকেতনের ইতিহাস ও আদর্শ, পূর্বোক্ত, ' পৃ. ৫৩৭)
১১৮. ieÜ'-iPbvejx, 13 LÐ 'ভুমিলক্ষ্মী,' পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০৬
১১৯. cÎvejx,0 cÎmsL¨v 3, পূর্বোক্ত,, পৃ. ৫৭৮ (দ্রষ্টব্য 'শ্রীনিকেতনের ইতিহাস ও আদর্শ,' পূর্বোক্ত, পৃ.৫৩৯)
১২০. রথীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠি, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত, wcZ¯§wZ (কলকাতা : জিজ্ঞাসা,.১৯৬৬) গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ২৪৯
১২১. পূর্বোক্ত, পিতৃস্মৃতি, পৃ ২৪৬
১২২. ieÜ'-iPbvejx, 13 LÐ, 'বাঙালির কাপড়ের কারখানা ও হাতের তাঁত,' পল্লীপ্রকৃতি, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬২
১২৩. ieÜ'-iPbvejx, ১২ LÐ, 'সভাপতির অভিভাষণ,' আত্মশক্তি ও সমূহ , পৃ ৮২১
১২৪. ieÜ'-iPbvejx, 13 LÐ, 'ম্যালেরিয়া,' পল্লীপ্রকৃতি, পৃ. ৫৫৪
১২৫. পূর্বোক্ত, 'হিন্দুমুসলমান,' কালান্তর পৃ. ৩৫৭; 'স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, পূর্বোক্ত, পৃ ৩৬০ পূর্বোক্ত, 'হিন্দুমুসলমান পৃ. ৩৬৭
১২৬. রবীন্দ্রনাথ, পল্লীপ্রকৃতি,বিশ্বভারতীঃ পূর্ণমুর্দ্রণ ১৩৯৩, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৯–৯০
১২৭. রবীন্দ্রনাথ; ইতিহাস; বিশ্বভারতীঃ পূনর্মুদ্রণ ১৩৯৫, পৃ.৫৮
১২৮. রবীন্দ্রনাথ; গোরা; বিশ্বভারতীঃ পূনর্মুদ্রণ ১৪০৭, পৃ.৫০০-৫০১
১২৯. রবীন্দ্রনাথ; পল্লী প্রকৃতি; বিশ্বভারতীঃ পূনর্মুদ্রণ ১৯৬২, পৃ.১৪৩
১৩০. রবীন্দ্রনাথ; সভ্যতার সংকট; (১৩৪৮)। ইংরাজি অনুবাদ 'Crisis in Civilisation' (১৯৪১)
১৩১. রবীন্দ্রনাথ; গল্পসল্প; (১৯৪১), জন্মদিনে, (১৯৪১) ও 'ছেলেবেলা' (১৯৪০)
১৩২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'শিক্ষা; বিশ্বভারতীঃ পূনর্মুদ্রণ ১৩৯৭. পৃ. ২৮
১৩৩. রবীন্দ্রনাথ; স্বদেশী সমাজ; বিশ্বভারতীঃ পূনর্মুদ্রণ ১৩৬৯, পৃ.১১-১২
১৩৪. রবীন্দ্রনাথ; নৈবেদ্য;'নৈবেদ্য' কবিতাসংখ্যা ৭২, বিশ্বভারতীঃ পূনর্মুদ্রন ১৪০০, পৃ.৭৯
১৩৫. কৃষ্ণ কৃপালনী, Rabindranath Tagore : A Biography, অক্সফোর্ড ক্ল্যারেন্ডন প্রেসঃ ১৯৬২, পৃ.১৪৬
১৩৬. প্রশান্তকুমার পাল, iweRxebx, PZ_ LÐ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৯৫, কলকাতা,পৃ. ৭০৩-৭০৪

১৩৭. সমস্ত উদ্ধৃতি : ie›‘-iPbvejx, 11 LÐ, পৃ. ৬৬৪-৭৮ [দ্র. সত্যেন্দ্রনাথ রায়, ie›‘bv‡_i wPšÍvRMr wkÿvwPšÍv, পৃ.২৪]
১৩৮. kirP›‘ iPbvejx, Rb¨kZevwlK ms¯‹iY, 5g LÛ, শিক্ষার বিরোধ, স্বদেশ ও সাহিত্য, পৃ. ৫১৯-২৭
১৩৯. সত্যেন্দ্রনাথ রায়, ie›‘bv‡_i wPšÍvRMr wkÿvwPšÍv, পূর্বোক্ত, পৃ.-৭৭-৭৮
১৪০. প্রশান্তকুমার পাল, iweRxebx, PZ_ LÐ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৯৫, কলকাতা,পৃ. ৫৮১
১৪১. ie›‘-iPbvejx, ১৩৯৫, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮১
১৪২. ie›‘-iPbvejx, beg LÐ, ১৩৯৬, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯৫
১৪৩. পূর্বোক্ত, পৃ.৪১৮
১৪৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯২
১৪৫. শিপ্রা সরকার ,রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনে উন্নয়ন-ভাবনা, পূর্বোক্ত, পৃ.৫০
১৪৬. পূর্বোক্ত, পৃ.৫০
১৪৭. সত্যেন্দ্রনাথ রায়, ie›‘bv‡_i wPšÍvRMr wkÿvwPšÍv, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৭
১৪৮. রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুদর্শ খণ্ড, কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৩৯৮ পৃ ৭২৮
১৪৯. হুমায়ূন কবির, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অনুবাদ, ভূমিকা ও টীকা হায়াৎ মামুদ, একুশে পাবলিকেশন্স লিঃ, ২০০০, ঢাকা, পৃ ৮৮

Dhaka University Institutional Repository

Dcmsnvi

উনিশ শতকের শুরুতেই বাংলায় সমাজে বড় রকমের একটা পরিবর্তন দেখা দেয়। এ বাংলাদেশে নতুন পাশ্চাত্যবিদ্যায় শিক্ষিত একদল মধ্যবিত্ত যুবকের আবির্ভাব ঘটে। নবযুগের বাংলার এটাকে কেউ কেউ যুগান্তকারী ঘটনা বলে উল্লেখ করেছেন।এই মধ্যবিত্ত তরুণদলের যিনি নায়ক, বয়সে তিনিও তরুন। বাংলার নব্যশিক্ষিত তরুণদলের চিন্তানায়ক রূপে ডিরোজিওর আবির্ভাবকে সেকালের বাংলাদেশে চিন্তা বিপ্লবের সূচনা বলা যায়। কারণ শিক্ষার দিক থেকে পাশ্চাত্যবিদ্যায় সুশিক্ষিত, সামাজিক শ্রেণির দিক থেকে মধ্যবিত্ত এবং বয়সের দিক থেকে তরুণ-এই তিনটির সমন্বয়ে তাঁরা বাংলার সমাজ ব্যবস্থায় প্রথম বৈপ্লবিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন। ফলে সে যুগটি ডিরোজিয়ানদের যুগ বলে চিহ্নিত হয়েছিল। রামমোহনের সময় উচ্চবিত্ত ও মধ্যবয়স্কের জড়তা ও মন্থরতা তরুণ ডিরোজিয়ানদের মধ্যে একেবারেই ছিল না। আর তা না থাকায় ,তাঁদেও সংগঠন 'একাডেমিক এসোসিয়েসন' যে বিপ্লব সৃষ্টি করেছিল, সামাজিক পরিবর্তনে যে তোলপাড় এনেছিল 'আত্মীয় সভা' তা পারেনি। আত্মীয় সভার সদস্যরা সবাই ছিলেন পৌঢ়, মধ্যবয়স্ক ধনী এবং বিত্তবান। আর ডিরোজিওর একাডেমিক এসোসিয়েসনেই এদেশের শিক্ষিত তরুণেরা একত্রিত হতেন। ডিরোজিওর বয়সের সঙ্গে তাদের তেমন পার্থক্য ছিল না। যুগে যুগে যত সামাজিক পরিবর্তন এসেছে তা তরুণদের বৈপ্লবিক চেতনার মধ্য দিয়েই এসেছে। এই তরুণেরাই ডিরোজিওর সংস্পর্শে এসেছিলেন। রামমোহনপন্থীদের পক্ষে তা কখনো সম্ভব হয়নি।
আত্মীয় সভার মূল ও মুক্ত কণ্ঠে আলোচনার বিষয় ছিল-একেশ্বরবাদ, নিরাকার ঈশ্বর, জাতিভেদ, পৌত্তলিকতা, বাল্যবিবাহ, সহমরণ, সামাজিক কুসংস্কার এবং ধর্মীয় অনাচার।

ইয়ংবেঙ্গলরা পাশ্চাত্য যুক্তিবিজ্ঞান ও জন লকই শুধু পড়েননি নিজের জীবনেও তা প্রয়োগ করেছেন। তাই আদালতে দাঁড়িয়ে রসিককৃষ্ণ যখন বলেছিলেন যে, 'আমি গঙ্গা জলের পবিত্রতা মানি না' এটা তাঁর আবেগ বা উচ্ছাস নয়, সত্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা । সংবাদপত্রে তখন এই ঘটনা নিয়ে খুবই তোলপাড় হয়েছিল। এমন কি ডিরোজিও সম্পর্কে একথাও বলা হয়েছিল যে তিনি ঈশ্বর মানেন না, ধর্ম মানেন না। এর প্রতিবাদ করে তিনি লিখেছিলেন:

> ...আমি স্পষ্ট করিয়া বলিতে চাই যে, কোন ধর্মেই আস্থা নাই, এ কথা আমি বলি নাই। অন্যপক্ষে আমি বিচারপতির নিকট স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছিলাম-"ঈশ্বরের কাছে আমার পবিত্র দায়িত্ব আছে এই জ্ঞানেই আমি এ জগতের কার্য করি"। উইলসনকে লেখা চিঠিতেও তাঁর এ মানসিকতা প্রকাশ পেয়েছে-"ছাত্ররা যদি কেউ নাস্তিক হয়ে থাকে তাহলে তার জন্য সাধুবাদও আমার প্রাপ্য।[১]

ডিরোজিওর ছাত্র দক্ষিনারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও রসিককৃষ্ণ মল্লিক ১৮৩১ সালে ১৮ জুন বাংলা ভাষায় 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকার মুখবন্ধে বলা হয়–'এক প্রয়োজনে এই যে এতদ্দেশীয় বিশিষ্ট বংশোদ্ভব অনেক মহাশয়েরা লোকের প্রপঞ্চ বাক্যতে প্রতারিত হইতেছেন তাহাতে তাঁহারদিগের কোনোরূপেই ভাল হইবার সম্ভাবনা না দেখিয়া খেদিত হইয়া বিবেচনা করিলাম নানা দেশ প্রচলিত বেদ-বেদান্ত প্রভৃতি গ্রন্থের আলোচনা দ্বারা তাঁহারদিগের ভ্রান্তি দূর করিতে চেষ্টা করিব। দ্বিতীয়তঃ এই যে এতদ্দেশনিবাসী অনেকেই আপন জাতিবিহিত ধর্মের প্রতি জিজ্ঞাসা করিলে যাথাশাস্ত্রানুসারে কহিয়া থাকেন কিন্তু সেই মহাশয়েরা এমন কর্ম করেন যে তাহা কোন বিশিষ্ট লোকেরই কর্ত্তব্য নহে। ইহার কারণ কি তাহাও বিবেচনা করিতে হইবে। তৃতীয়ত, এই যে ভূগোল প্রভৃতি গ্রন্থ যদ্যপি এতদ্দেশে দেশান্তরীয় ও বঙ্গদেশীয় ভাষায় নানা প্রকারে প্রকাশ তথাপি যে অতিবিস্তারিত রূপে প্রচার হয় নাই এতএব সকলের আশুবোধের নিমিত্তে সেই সকল গ্রন্থ আমরা বঙ্গদেশীয় ভাষায় ক্রমে (ক্রমে) প্রকাশ করিব। এবং অন (অন্য) বিষয়ে যাহা প্রকাশ করা আবশ্যক তাহাও উপস্থিতানুসারে প্রকাশ করিতে ক্রটি করিব না'।[২]

পরবর্তীতে রসিককৃষ্ণ 'জ্ঞানান্বেষণের' সম্পাদনার দায়িত্বভার গ্রহণ করলে এ মন্তব্যের আবহ অনেকটাই পাল্টে গিয়েছিল। তখন 'জ্ঞানান্বেষণ' সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় বিচার বিষয়েও সুষ্ঠু বক্তব্য পেশ করত। এ পত্রিকার লেখকদের মধ্যে বলিষ্ঠভাবে কলম চালনা করেছেন রামাগোপাল ঘোষ, গোবিন্দ চন্দ্র বসাক, মাধবচন্দ্র মল্লিক, তারকচন্দ্র বসু, প্যারীচাঁদ মিত্র ও রামচন্দ্র মিত্র। ডিরোজিওর এসব শিষ্যদের সম্পাদনা ও লেখায় জ্ঞানান্বেষণ সেকালে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

Dhaka University Institutional Repository

মাতৃভাষায় প্রথম বিজ্ঞান চর্চার পথ প্রদর্শক এই ইয়ংবেঙ্গলরাই। ১৮৩৩ সালে ডিরোজিওর শিষ্য হিন্দু কলেজের একদল ছাত্র বাংলা ও ইংরেজিতে দ্বিভাষিক 'বিজ্ঞান সার সংগ্রহ' নামে একটি মাসিক পত্রিকা বের করেন। এ পত্রিকায় প্রথম সংখ্যার উৎসপত্রে উদ্যোক্তারা লিখেছিলেন:

> ইউরোপের বিজ্ঞানচর্চার শ্রেষ্ঠ জ্ঞানকে বাংলাদেশের মানুষদের মধ্যে প্রচার করাই এ পত্রিকার প্রধান উদ্দেশ্য। যাতে করে মানুষের সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য তারা সোৎসাহে কাজে নামেন।... আমাদের প্রধান লক্ষ্য পাঠকদের আনন্দ দেয়া নয়, তাদের শিক্ষা দেয়া। তাদের আত্মসন্তুষ্ট করা নয়, তাদের মহত্তর কর্মযজ্ঞে উদ্দীপিত করা।[৩]

১৮৪০ সালে 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেলে ১৮৪১ সালের এপ্রিল মাসে ডিরোজিওর ছাত্ররা 'বেঙ্গল স্পেকটেটর ('BENGAL SPECTATOR') নামক একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। এ পত্রিকাটির দ্বিভাষিক ছিল। এই পত্রিকাটি যথার্থভাবেই বাংলাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনার উত্তাপ বুকে ধারণ করে আত্মপ্রকাশ করেছিল। কিন্তু পত্রিকাটি বেশিদিন স্থায়ী হতে পারেনি। বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলনকে এই পত্রিকা প্রত্যক্ষভাবে সমর্থন করেছিল।

উনিশ শতকে বাংলাদেশে যে নবজাগরণ ও নবযুগ এসেছে এবং চিত্তজাগরণ ও আত্মজাগরণের যে জোয়ার এসেছে তা ধর্মীয় সংস্কারের মাধ্যমেই এসেছে। একমাত্র ডিরোজিও ছাড়া রামমোহন-বিদ্যাসাগর এবং এমনকি মধুসূদনও ধর্মীয় সংস্কারের মাধ্যমেই নবযুগের দিক নির্দেশক ছিলেন। তবে বাংলাদেশে তখন মধ্যবিত্ত শ্রেণির নেতৃত্ব যে একটা নতুন আন্দোলন ও নবজাগরণ এসেছিল তা সেকারের বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী কার্লমার্কসের দৃষ্টিতেও ধরা পড়েছিল। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন:

> কোলকাতায়, ইংরেজদের তত্ত্বাবধান, অনিচ্ছাসহকারে ও স্বল্প পরিমাণে শিক্ষা প্রদানে ভারতের দেশীয় অধিবাসীদের মধ্যে নতুন একটি শ্রেণী গড়ে উঠেছে যারা সরকার পরিচালনায় যোগ্যতাসম্পন্ন এবং ইউরোপীয় বিজ্ঞানে সুশিক্ষিত।[৪]

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতদের মধ্যে যে বিষয়টি সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তা হলো তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতেই প্রথম সামন্ততান্ত্রিক শাসনের নেতিধর্মিতা ধরা পড়ে এবং এর বিরুদ্ধে তারা সাহসী আন্দোলনের মানসিকতাও গড়ে তুলেছিল। দেশপ্রেম, শিক্ষার দাবি এবং মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার উন্নতি বিধানের বোধও তাঁদের মাধ্যমেই প্রথম জাগ্রত হয়েছিল। শুধু তাই নয়, জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষও তাঁদের মাধ্যমেই সঞ্চারিত হয়। তাঁরা দেশকে প্রথম নতুনভাবে উপলব্ধি করেন। তাঁদের অনুভূতিতে সক্রিয় হয় যে, ইংরেজ বিদেশি শাসক, এ দেশ একটি পরাধীন দেশ। ইউরোপীয় রেনেসাঁর বীজমন্ত্র হতেই তাঁরা দীক্ষা পেয়েছিলেন যে, সামন্ততান্ত্রিক সমাজের খোলসে নয়-নতুন ধরনের স্বাধীন দেশ হোক তাঁদের দেশ।

আমরা দেখি, ইউরোপীয় রেনেসাঁস যে-মানবীয় বোধ-বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত,অক্ষয়কুমার দত্তের মানবতাবাদ দর্শনও সেই শুভবুদ্ধির উপর আস্থাশীল। অক্ষয়কুমার দত্ত আমাদের মানবধর্মের প্রথম প্রবক্তা।'[৫] 'উনিশ শতকের শাস্ত্রীয় বিচারের ধারা সম্পূর্ণভাবে পরিত্যক্ত হয়ে অক্ষয়কুমারের হাতে মানবধর্মের জয়পতাকা প্রথম উত্তোলিত হয়। শাস্ত্র ও আচারের দানবত্বকে অস্বীকার করে তিনি খাঁটি মানবত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তাঁর দর্শন ও বিজ্ঞান-চর্চা এই মানবমুখী চিন্তারই সর্বপ্রধান অঙ্গ।'[৬] তিনি ঈশ্বর ভাবনা ছেড়ে মানব প্রকৃতির সঙ্গে বাহ্যবস্তুর কী সম্পর্ক থাকতে পারে তা নিয়ে ভাবতে শুরু করলেন। জর্জ কুম্বের 'কনসটিটিউশন অব ম্যান' গ্রন্থ অবলম্বনে লিখলেন-'evn¨e¯i mwnZ gvbe cKwZi m¤Ü wePvi' গ্রন্থ।[৭] কুম্বের গ্রন্থের অবলম্বন হলেও এতে অক্ষয়কুমারের নিজের চিন্তার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। মূল গ্রন্থের বক্তব্যকে গ্রহণ করে তিনি নিজস্ব ভঙ্গিতে ভারতবর্ষীয় লোকের উপযোগী করে তা পরিবেশন করেছেন। এটা করতে গিয়ে তিনি এত বেশি পরিমাণে নিজস্বতা প্রয়োগ করেছেন যে, সাধারণ পাঠকের পক্ষে বুঝা সহজ ছিল না এটি কোনো গ্রন্থ অবলম্বনে লেখা। অক্ষয়কুমার যখন 'evn¨e¯i mwnZ gvbe cKwZi m¤Ü wePvi' লিখেছেন তখন পর্যন্ত বাংলা গদ্যের আদর্শ রূপ তৈরি হয়নি। 'এমনকি সাধারণ জ্ঞানের গ্রন্থেরও তখন দৃষ্টান্ত ছিল না। সোজা কথায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোনো আদর্শ গ্রন্থ এর আগে প্রকাশিত হয়নি। এরকম নিষ্ফলা মাঠে যে evn¨e¯i mwnZ gvbecKwZi m¤Ü wePvi-এর মতো একটি অসাধারণ জ্ঞান সমৃদ্ধ গ্রন্থ সুশোভিত হয়ে ফলিয়ে ওঠা সম্ভব, অক্ষয়কুমার দত্তের আগে কেউ তা কল্পনাও করতে পারতেন না। সম্ভবত তাঁর পরে পঞ্চাশ বছরের মধ্যেও কেউ ভাবেননি। বইটি বাংলা গদ্য ভাষার প্রথম যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রথম নিদর্শন এবং

Dhaka University Institutional Repository

সেটা বাঙালি মনীষার একটা বড় নিদর্শনও বটে। বাংলা গদ্য ভাষা এবং সে ভাষায় রচিত চিন্তা—বলা চলে জন্মেই যে সাবালক হয়ে উঠেছিল, গ্রন্থটি তারও দৃষ্টান্ত।'[৮] এ গ্রন্থের মাধ্যমে বাঙালি যুবকেরা ক্রমশ অক্ষয়কুমারের আধুনিক চিন্তাভাবনার দিকেই আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে ভবতোষ দত্ত লিখেছেন:

> অক্ষয়কুমার দত্ত ছিলেন বাংলা সাহিত্যের প্রথম চিন্তাশীল প্রবন্ধকার যিনি মানুষের জীবন ও অস্তিত্ব নিয়ে ভাবতে শুরু করেছিলেন। দীর্ঘ নিবন্ধে আলোচনা করে তিনি দেখালেন এ জীবন কীভাবে পরিচালিত হয়, বস্তুজগতের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কি। তাঁর মনে এই জিজ্ঞাসা ও কৌতূহল দেখা দিয়েছিল যে সময়ে, তখন সেটা ছিল অভিনব, কারণ মানবপ্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ বিচার করার কোনো প্রয়োজন আছে, এ কথা আমাদের দেশে পূর্বে কখনও কারও মনে হয়নি। বরং আমাদের স্মৃতিশাস্ত্র থেকে মনে হয় এ জগৎ অপরিশুদ্ধ, একে নানাভাবে শুদ্ধ করে নিয়ে বাঁচতে হবে। অক্ষয়কুমার দেখালেন বাহ্যজগতের রীতিনিয়মকে যথাযথভাবে জানতে হবে, তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মানুষকে বাঁচতে হবে। এই নীতিনিয়ম স্থির করে মানুষ তার বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে। বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি প্রয়োগ করে মানুষকে সুস্থভাবে জীবনযাপনের আদর্শ নির্ণয় করতে হয়।[৯]

অক্ষয়কুমার দত্ত এভাবে বাঙালি মানসে মানবতাবাদের আধুনিক চিন্তা এনে দিলেন। কিন্তু বাঙালি তা বুঝতে পারেনি। কারণ তা বোঝার মতো মন ও মনন বাঙালির তখনো প্রস্তুত হয়নি। বাঙালি মানস চণ্ডীদাসের সহজ ভাষ্যেই এক রকম তৃপ্ত ছিল। অথচ অক্ষয়কুমার এমন মানুষের কথা বলেছেন, 'যাঁকে চণ্ডীদাসের 'সবার উপরে মানুষ সত্য' এই উক্তির মধ্যে পাওয়া যাবে না।'[১০] অক্ষয়কুমারের বক্তব্যের সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের যোগ যত গভীর ও দৃঢ়ছির, চণ্ডীদাসের কথায় তা ছিল না। 'চণ্ডীদাসের কথা যে ভারতীয় ভাববাদী ধারার মানবতাবাদের সঙ্গে সম্পর্কিত, সেটা অনেক সময় অতি বড় পণ্ডিতও ভুলে যান।'[১১] সেই বিবেচনায় অক্ষয়কুমারের মানবিকবাদ পাশ্চাত্য মানবিকবাদীদের সঙ্গে তুলনীয়। চণ্ডীদাস কথিত এবং বাউল নারী যোগমায়ার মান্যতা দেওয়া দেশিয় মানবিকবাদীদের সঙ্গে তুলনীয় নয়।'[১২] অক্ষয়কুমার দত্তের আগে উনিশ শতকের বাঙলায় চিন্তার যে কাঠামো ছিল, তাতে একটি মৌলিক পরিবর্তন নিয়ে আসেন তিনি। evn¨e¯i mwnZ gvbeckwZi m¤Ü wePvi' কথা কয়টির মধ্যে 'অক্ষয়কুমার-ব্যবহৃত 'মানবপ্রকৃতি' কথাটা এই নতুন মানবত্ববোধের ইঙ্গিতবহ।'[১৩]

অক্ষয়কুমার দত্তের সেকালের ভারতবর্ষীয় লোকের আচার ধর্মে আস্থা ছিল না। কারণ যে ধর্ম মানুষে মানুষে বিদ্বেষ সৃষ্টি করে, মানুষের চিত্তের শক্তিকে ক্রমশ হ্রাস করে তাকে দুর্বল ও অলস করে দেয়, চিন্তাশীল মন নিয়ে তিনি তা কখনো মানতে পারেননি। অক্ষয়কুমার মানবতাকে গুরুত্ব দিতেন, তাঁর বিদ্যা-চর্চার প্রধান কথা ছিল মানবতাবাদ। তিনি লিখেছেন:

> কি আক্ষেপ! ইহা বিবেচনা করে না, যে যাঁহাকে তাবৎ সংসারের পিতা বা মাতারূপে তাহারা অঙ্গীকার করে, তিনি কি তাহারদিগের কুকর্ম্মে উৎসাহ দিবার নিমিত্তে পক্ষপাত আচরণ করিবেন এবং ন্যায়কে কি অন্যায় করিবেন? এই সকল ব্যক্তি যদি পরমেশ্বরের যথার্থ স্বরূপ জ্ঞাত হইত,যদি জানিতে পারিত যে তিনি পূর্ণ জ্ঞান এবং পূর্ণ ন্যায়বান হয়েন, রাগ দ্বেষ লোভ পক্ষপাতাদি মানবধর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণরূপে বিবর্জ্জিত, পাপের দণ্ড এবং পুণ্যের পুরস্কার তিনি অনন্যথারূপে বিধান করেন, যদি ক্ষমা করেন, তবে তৎকালে, যখন সেই পাপ জন্য আপনার প্রতি অত্যন্ত গ্লানিবোধ করে এবং তাহা হইতে নিবৃত্ত থাকিতে সাবধান হয়, এই সমুদয় যদি তাহারদিগের হৃদয়ঙ্গম হইত, তবে তাহারা শাস্তি ভয় প্রযুক্ত দুষ্কর্ম্মে কদাপি মগ্ন হইত না।[১৪]

মাতৃভাষায় জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা এবং সাহিত্যের সমৃদ্ধি সাধনে বিদ্যাসাগর ছিলেন অক্লান্ত সংগ্রামী। তাঁর দৃঢ় মত ছিল সর্বজনীন আধুনিক শিক্ষার বিস্তারে প্রথমেই চাই মাতৃভাষার শ্রীবৃদ্ধি। শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বসাধারণ লোকের কাছে আধুনিক শিক্ষার সুফল পৌঁছে দেওয়া যাবে । বাংলা ভাষার পথ সযত্নে খনন করে দেবার কঠিন কাজে বিদ্যাসাগর হাত দিলেন। বিরুদ্ধতা ছিল যথেষ্ট; বিরুদ্ধ আক্রমণের অধিকাংশই ছিল ব্যক্তিগত বিদ্বেষপ্রসূত। তিনি শুভকর্মপথে তা গ্রাহ্য করেননি। তিনিই প্রথম বাঙালি জাতিকে লেখাপড়া শেখাবার জন্য পরিকল্পিতভাবে বই লিখলেন। বিদ্যাসাগরের সেই শ্রেষ্ঠ কীর্তি হলো বর্ণপরিচয়। বিদ্যাসাগরই আমাদের জাতিভাষা-শিক্ষক। শিক্ষার জগতে বিদ্যাসাগরের অবদান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

> সংস্কৃত কলেজের কর্ম ছাড়িয়া দিবার পর বিদ্যাসাগরের প্রধান কীর্তি মেট্রোপলিটন ইনস্টিটুশান। বাঙালির নিজের চেষ্টায় এবং নিজের অধীনে উচ্চতর শিক্ষার কলেজ-স্থাপন এই প্রথম। আমাদের দেশে ইংরাজি শিক্ষাকে স্বাধীনভাবে স্থায়ী করিবার এই প্রথম ভিত্তি বিদ্যাসাগর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইল।...একাকী সর্বপ্রকার বিঘ্নবিপত্তি হইতে রক্ষা করিয়া তাহাকে সগৌরবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত

Dhaka University Institutional Repository

> সংযুক্ত করিয়া দিলেন...'যেখানে বিদ্যাসাগর পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য বিদ্যার মধ্যে সম্মিলনের সেতুস্বরূপ হয়েছিলেন সেখানেও তাঁর বুদ্ধির ঔদার্য প্রকাশ পেয়েছে। ...তিনিই বর্তমান য়ুরোপীয় বিদ্যার অভিমুখে ছাত্রদের অগ্রসর করবার প্রধান উদ্যোগী হয়েছিলেন... ।[১৫]

বাংলার নবজাগরণ আন্দোলনের যে তেজস্বী পুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রগাঢ় ভক্ত ছিলেন আশুতোষ।[১৬] তাঁদের দু'জনের মধ্যে কর্ম প্রচেষ্ঠায় মিল ছিল। দু'জনেই ছিলেন স্বাধীনচেতা, অদম্য সংগ্রামী। কঠিন প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে চরিত্রের মৌলিক শক্তিতে নিজেদের জেদ রক্ষা করে শুভ সংকল্প-সাধনে এঁরা কখনো পিছ পা হননি। কাজ হাসিলের জন্য সুবিধাবাদী কোনো নীতির আশ্রয় ও প্রশ্রয়ও তাঁদের চরিত্রে ছিল না। তাঁরা দু'জনেই কাজ আরম্ভ করে শেষ করতে জানতেন। যা করতেন বিশ্বাস নিয়ে করতেন। যা বিশ্বাস করতেন তা পালন করতেন। সরকার, কর্তৃপক্ষ, সংকীর্ণমনা আমলা ও বিরুদ্ধশক্তির ষড়যন্ত্র, রক্তচক্ষু ন্যায়সংকল্পের সংগ্রামে তাঁদের দমাতে পারেনি।

সমাজসংস্কার-সংগ্রামের সমান্তরালে বিদ্যাসাগর কী ভীষণ প্রতিবন্ধকতার মধ্যে শিক্ষার সংস্কার করে আধুনিক শিক্ষার আলোকে কেবল মধ্যবিত্ত ও ধনীর ঘরের বাইরে এনে সবার মধ্যে পৌঁছে দিতে কী ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন, তা আশুতোষ অনুভব করেছিলেন। তিনি জেনেছিলেন বিদ্যাসাগরের কী অভ্রান্ত বিশ্বাস নিয়ে দেশজুড়ে নারীশিক্ষা,জনশিক্ষা বিস্তারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এই অসাধারণ কর্মশক্তিসম্পন্ন বিদ্যাসাগরের অজেয় পৌরুষ যুবক আশুতোষকে প্রেরণা ও শক্তি জুগিয়েছে তাঁর নিজের প্রধান কর্মক্ষেত্র শিক্ষাজগতে আত্মনিয়োগ করতে।

তখন ইংরেজ সরকার ক্রমশই শিক্ষার সংকোচন-নীতির পথে চলছিল। সংকীর্ণমনা ইংরেজ আমলারা উচ্চশিক্ষার বিস্তারে নানাভাবে বাধা সৃষ্টি করছিল। আশুতোষ তাঁর আদর্শপুরুষ বিদ্যাসাগরের কণ্ঠ থেকে কণ্ঠ নিয়ে বললেন -'আমি চাই সারা দেশে শিক্ষার বিস্তার। ম্যাট্রিক পাশ করেনি বাংলাদেশে এমন একটি মানুষও যেন না থাকে। দেশের ঘরে ঘরে সুদূর পল্লিতেও শিক্ষাবিস্তার করতে হবে।'[১৭] দেশবাসীর মধ্যে আধুনিক শিক্ষার প্রসারে, শিক্ষাসংকোচনের বিরুদ্ধে তিনি দৃঢ় অবস্থান নিলেন। উচ্চশিক্ষার পীঠস্থান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ও পরিকল্পনার গনতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সরকারের আক্রমন থেকে মুক্ত রেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার পতাকা উচ্চে তুলে ধরতে আশুতোষ আন্দোলনের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে নেতৃত্ব দিয়েছেন। শিক্ষার জগতে এই আন্দোলনে বিজয়ী হতে বিদ্যাসাগর ছিলেন তাঁর অক্ষয় প্রেরণা। জয়ন্ত সেনগুপ্ত লিখেছেন:

> এক ইংরাজিমনস্ক শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশজ ভাষার চর্চা সম্ভব করেছিলেন স্যার আশুতোষ। অসহযোগ আন্দোলন যখন তুঙ্গে তখন দ্বিতীয় দফায় কলকাত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য থাকার সময় (১৯২১-১৯২৩) চালু করেছিলেন বাংলা ভাষায় স্নাতকোত্তর পাঠক্রম। অল্পদিনের জন্য হলেও বাংলা হেড-একজামিনার হতে রাজি করিয়েছিলেন খোদ রবীন্দ্রনাথকে। তাঁর উদ্যোগেই চালু হয় ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, যার দরুন শিক্ষিত বাঙালী ভদ্রলোকের মনে প্রাচীন গ্রিক ও রোমান সাম্রাজ্যের পাশাপাশি জায়গা করে নিতে শুরু করেন অশোক, সমুদ্রগুপ্ত, ধর্মপাল, শীলভদ্র বা অতীশ দীপঙ্কর। এই সব চরিত্রকে নিয়ে গড়ে উঠবে ভারতীয় ইতিহাসের এক জাতীয়তাবাদী পাঠ ও চর্চা।[১৮]

আশুতোষ তাঁর সন্তান শ্যামাপ্রসাদকে বাংলায় এম.এ পড়িয়ে ছিলেন। এই ঘটনার তাৎপর্য সুদুরপ্রসারী। কারণ ছেলেকে বাংলায় এম. এ পড়িয়ে তিনি যে শুধু সমাজের চোখে বাংলায় উচ্চশিক্ষা গ্রহণের চেষ্টাকে গৌরবময় করে তুলতে চেয়েছিলেন তাই নয়। শিক্ষাক্ষেত্রে মাতৃভাষার প্রয়োগ সম্পর্কে তাঁর অসমাপ্ত কাজকর্মকে পুত্রের মাধ্যমে সম্প্রসারিত করার পথও তৈরি করে দিয়েছিলেন। তাই শ্যামাপ্রসাদ যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসাবে যোগ দেন (১৯৩১) তখন বাংলা ভাষার উন্নতিকল্পে তিনি যেসব পরিকল্পনা গ্রহণ করেন তাতে আশুতোষের মাতৃভাষা চেতনারই সম্প্রসারণ লক্ষ করা যায়। যেমন:

১. ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় বাহনরূপে মাতৃভাষা তথা বাংলাভাষা প্রবর্তন।
২. সমাতর্বন উৎসবে বাংলায় অভিভাষণ দানের জনী রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রন। বাংলায় প্রণীত গ্রন্থের জন্য বিজ্ঞান ও কারিগরি শিল্পের বাংলা পরিভাষা প্রণয়ণের উদ্দেশ্যে পরিভাষা কমিটি গঠন।
৩. বাংলা বানানোর শৃঙ্খলা বিধানের জন্য 'বানান কমিটি ' গঠন (১৯৩৫ - ৩৬)।
৪. বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান ও কলাবিষয়ে গ্রন্থ প্রকাশের পরিকল্পনা।

৫. বাংলা ভাষা-সাহিত্যের উপর বাংলা ভাষায় ও বাংলা হরফে লিখিত গবেষণাপত্র জমা দেওয়ার অনুমতি।
৬. বাংলা ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ রূপকার হিসাবে রবীন্দ্রনাথকে পি এইচ-ডি গবেষণাপত্রের পরীক্ষক হিসাবে নিয়োগ।

আশুতোষের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে শ্যামাপ্রসাদ শিক্ষাক্ষেত্রে মাতৃভাষা প্রয়োগের যে নীতি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন শ্যামাপ্রসাদের পরও বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই নীতিই অনুসৃত হয়েছে।

আশুতোষের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আর রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে মাধ্যম করে এই দুই শিক্ষানায়ক বহুমুখী সবার্থসাধক কর্মযজ্ঞে মাতোয়ারা হয়েছিলেন। মননে চিন্তনে দু'জনে একই বিন্দুতে অবস্থান করতেন, মূলত উচ্চশিক্ষার বিস্তারের লক্ষ্যে। রবীন্দ্রনাথ এই উদ্দেশ্যে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আশুতোষ ও রবীন্দ্রনাথ এই দুই জ্ঞানতপস্বী শিক্ষাঙ্গনকে ভারতজননী রূপে দেখতেন। তার সেবার মাধ্যমে দেশসেবার তৃপ্তি ও গৌরব অনুভব করতেন। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধমে ভারতীয় ভাষা ও সংস্কৃতির উন্নয়ন আশুতোষের আর এক অনন্য কীর্তি। বিশেষ করে মাতৃভাষার প্রতি তাঁর প্রবল অনুরাগ ছিল। তিনি জানতেন এ দেশে মাতৃভাষা ছাড়া বাংলার ঘরে ঘরে শিক্ষার আলোকবর্তিকা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব নয়। যতক্ষণ ইংরেজ উপাচার্য ছিলেন তাঁরা মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগী বুদ্ধিজীবী শ্রেণির জন্য ইংরেজি ভাষা ছাড়া অন্য কোন ভারতীয় ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন না। বরং পদে পদে বাংলা ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। আশুতোষ নিজে এদের বাধাদানকে সাপের ফনার সঙ্গে তুলনা করেছেন। আশুতোষের আগে মাতৃভাষকে মর্যাদা দান করেছিলে অক্ষয়কুমার দত্ত ,বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র। শান্তিনিকেতনকে তিলতিল করে গড়ে তুলতে কবি যে একসময় কতখানি অর্থসংকটে পড়েছিলেন তা জানা যায় অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভির শান্তিনিকেতনে বক্তৃতাদান প্রসঙ্গে আশুতোষকে লিখিত একটি পত্র থেকে। আশুতোষ কবিকে নিরাশ করেননি। সেই চিঠি পড়ে সঙ্গে সঙ্গে চিঠির উত্তর দিয়ে কবিকে আশ্বস্ত করেছিলেন। চিঠি দুটি পড়লে বোঝা যায় দুজনে দুজনের প্রতি কতখানি নির্ভরশীল ছিলেন।

বাংলা ভাষাকে তাঁদের চিন্তা প্রকাশের মাধ্যম করায় বাঙালির হৃদয়ে জ্ঞানের আলো ছড়িয়েছে। সেই পথ ধরে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এসেছেন, ইতিহাসের সত্য দিয়ে বাংলা ভাষার ডালা সাজিয়ে। বাংলা ভাষায় মানুষের মন ভাবতে প্রস্তুত হল, কিছু শুনতে কান সতর্ক হলো। অক্ষয়কুমারের ‡e'¨v'K‡bi আদলে বাংলায় e½'kb এলো তাঁর হাত ধরে, বাঙালি পড়ল মুগ্ধ হলো। বালক বয়সে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও সে মুগ্ধতা থেকে বাদ পড়েননি। এক কথায় বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালিকে বাংলা গদ্যের আসল স্বাদ পাইয়ে দিলেন। গদ্যশিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অক্ষয়কুমার দত্তের চিন্তাকে শ্রদ্ধা করতেন। তাঁরও অক্ষয়কুমার দত্তের মতো মনে হলো লোক শিক্ষা ছাড়া লোকের উন্নতির নাই। বাংলা ভাষায় লোক শিক্ষার আবশ্যকতা নতুনভাবে প্রমাণিত হলো। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা ভাষায় শিক্ষাচিন্তার অগ্রজদের ঋণ স্বীকার পূর্বক, নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বললেন- 'শিক্ষায় মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধ, জগতে এই সর্বজনস্বীকৃত নিরতিশয় সহজ কথাটা বহুকাল পূর্বে একদিন বলেছিলাম, আজও তার পুনরাবত্তি করব।[১৯]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমসাময়িক আচর্য প্রফুল্ল রায় বললেন মাতৃভাষায় বিজ্ঞানের কারিগরি জ্ঞান না হলে বাঙালির অন্ন সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। স্বামী বিবেকান্দ প্রায় একই সুরে বললেন ক্ষুধার্তের প্রার্থনার প্রয়োজন নেই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বন্ধু আচার্য আশুতোষ ভাবলেন শিক্ষা সংস্কার ও বাংলা ভাষায় উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা না করতে পারলে বাঙালি উন্নতি আশা নেই। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা প্রসার কল্পে রীতিসম্মত উপায়ে পরিভাষার বিধিবদ্ধ নিয়ম তৈরির কাজে মনেযোগ দিলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী । প্রমথ চৌধুরী চাইলেন ব্যাকরণ শাসিত ভাষাকে মানুষের প্রতিদিনের ব্যবহারিক ভাষায় রূপান্তর করতে, তাতে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নসহ সাহিত্যের উন্নতি সহজ হয়। এঁরা বহুজ্ঞানে, বহুগুণে, জীবনের নানা অভিজ্ঞতায় বাংলা ভাষায় শিক্ষা বিস্তারে পক্ষে জোরালো সমর্থন দিলেন তাঁদের কথায় লেখায়। বিশেষ করে অক্ষয়কুমার দত্ত থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় শিক্ষা চিন্তার যে ধারা প্রবাহমান, সে ধারাকে তাঁরা আরও গতিশীল করলেন। শ্রীপ্রহলাদকুমার প্রামাণিক বলেছেন:

> এই সমস্ত প্রতিভাদীপ্ত কর্মবীরদের চেষ্টাতেই জীবনের বহু বন্ধুরপথ আজ এত মসৃন। 'বাঙ্গালী যে এক সময় তাহার শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান ও ধর্মসাধনা, অতুলনীয় সাহিত্যপ্রতিভা এবং সর্বস্বপণ দেশসেবা-ব্রতের জন্য কেবল ভারতবর্ষেই নয়, সমগ্র বিশ্বে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল, তাহার মূলে রহিয়াছে এই-সব ক্ষণজন্মা

> পুরুষের বহুবিচিত্র কর্মসাধনার অবদান। ইঁহাদের মনীষা দীপ্ত বহুমুখী কর্মসাধনা অজস্র ধারায় উৎসারিত হইয়া জাতীয়তাবোধের উন্মেষ-সাধন করিয়াছে, শিক্ষা ও সাহিত্যের নবগতিপথ নির্দেশ করিয়াছে এবং দেশের সুপ্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে নবরূপ দান করিয়া তাহাকে নবতর বৈচিত্র্য ও জীবনীশক্তিতে পুষ্ট ও ঋদ্ধ করিয়াছে। ইঁহারাই উনিশ শতকে বাঙ্গলাদেশে রেনেসাঁস বা নবজাগরণের যুগ-প্রবর্তক। বাঙ্গলাদেশে এই নবজাগরণের প্রাণস্পন্দননেই ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশে নবজাগরণের সারা পড়িয়াছিল।[২০]

উনিশ শতক ছিল বাংলার নবজাগরণের উন্মেষ ও উদ্বোধনের কাল। এ শতকে সামগ্রিকভাবে পুরানো সমস্তের পরিবর্তনের ধারায় বাঙালির ভাষা, সাহিত্য শিল্প -সংস্কৃতি ও শিক্ষার প্রবোধ উন্নতি সাধিত হয়েছে। এর কারণ এসময় বাংলার নরম মাটিতে শক্ত মেরুদণ্ডের বহুসংখ্যক মানুষের জন্মে হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩), অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১), দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪), সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯-১০২৮), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), প্রফুলচন্দ্র রায় (১৮৬১-১৯৪৪), স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২), রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯), প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯), প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁরা সেচ্ছায় বাঙালির সার্বিক মুক্তির জন্য তাদের শিক্ষার দায়ভার গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের 'অপূর্ব প্রতিভা, ক্ষুরধার মনীষা, অপরিমেয় কর্মনিষ্ঠা ও অনমনীয় দৃঢ় চরিত্রবলের অধিকারী, সমুজ্জ্বল জ্যোতিষ্কপুঞ্জের মতো এতগুলি অসাধারণ শক্তিধর পুরুষের এক শতাব্দীতে আবির্ভাব কেবল বাঙ্গলাদেশের নয়, সম্ভবতঃ যে-কোন দেশের ইাতহাসে বিস্ময়কর ঘটনা।'[২১] এঁদের বিচিত্রচিন্তা ও বহুমুখী প্রতিভার দিকে দৃষ্টিপাত করলে মনে হয় উনিশ শতকের বাংলায় প্রতিভার একটা শোভাযাত্রা চলছিল। উনিশ শতক থেকে বাঙালি কল্যাণকর যা কিছু অর্জন করেছে তা এই অগ্রযাত্রীদের কর্মপ্রচেষ্টাতেই করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

Dcmsnvi

Z_¨mÎ :

১. উইলসনকে লেখা ডিরোজিওর চিঠি।

2. সুরেশচন্দ্র মৈত্র, জ্ঞানান্বেষণ, যোগেশ চন্দ্র বাগল স্মারক গ্রন্থ

3. বিজ্ঞান সার সংগ্রহ, ২য় সংখ্যা, ১৮৩০

৪. নবজাগরণ প্রসঙ্গ ও রবীন্দ্রনাথ ঃ নরহরিরাজ, পৃ.৯১

৫. ভবতোষ দত্ত, ev0vjxi gvbeÁ, পূর্বোক্ত, পৃ ৩০

৬. মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম: Aÿ qKgvi 'Ë I Dbk kZ‡Ki ev0jv, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা ,আগস্ট ২০০৯, পৃ-২৯৬

৭. George Combe -এর 'Constitution of Man' ইংরেজি গ্রন্থ অবলম্বনে 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' লেখার কথা অক্ষয়কুমার নিজেই স্বীকার করেছেন। বইটির প্রথম ভাগের তৃতীয় মুদ্রণের 'বিজ্ঞাপনে' তিনি লিখেছেন -''শ্রীযুক্ত কুম্ব সাহেব...'কনসটিটিউশন অব ম্যান' নামক গ্রন্থে...নিরূপণ করিয়াছেন যে পরমেশ্বরের নিয়ম প্রতিপালন করিলেই সুখের উৎপত্তি হয়, এবং লঙ্ঘন করিলেই দুঃখ ঘটিয়া থাকে। জগদীশ্বর কি প্রকার নিয়মপ্রণালী সংস্থাপন করিয়া বিশ্বরাজ্য পালন করিতেছেন, এবং কোন্ নিয়মানুসারে চলিলে কিরূপ উপকার হয়, এবং কোন্ নিয়ম অতিক্রম করিলে কি প্রকার প্রতিফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, ঐ গ্রন্থে তাহা স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত ইয়াছে। ঐ গ্রন্থের অভিপ্রায় সমুদায় স্বদেশীয় লোকের গোচর করা উচিত ও আবশ্যকবোধ হওয়াতে, বাঙ্গালা ভাষায় তাহার সারসঙ্কলনপূর্ব্বক 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' নামক এক এক প্রস্তাব তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। ঐ সমস্ত প্রস্তাব পাঠ করিয়া অনেকেই অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন, এবং স্বতন্ত্র পুস্তকে প্রকটিত করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। তদনুসারে, পুনর্ব্বার মুদ্রিত ও প্রচারিত হইতেছে। ইহা ইংরেজি পুস্তকের অবিকল অনুবাদ নহে। যে সকল উদাহরণ ইউরোপীয় লোকের পক্ষে সুসঙ্গত ও উপকারজনক, কিন্তু এদেশীয় লোকের পক্ষে সেরূপ নহে তাহা পরিত্যাগ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে যে সকল উদাহরণ এদেশীয় লোকের পক্ষে সঙ্গত ও হিতজনক হইতে পারে, তাহাই লিখিত হইয়াছে। [PviæcvV -১, 'শারীরিক স্বাস্থ্যবিধান' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য.]

৮. মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম: Aÿ qKgvi 'Ë I Dbk kZ‡Ki ev0jv, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা ,আগস্ট ২০০৯, পৃ-২৯৮

৯. ভবতোষ দত্ত, ev0vjxi gvbeag, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., পৌষ ১৪০৬, পৃ ৪৫

১০. মানবতাবাদ বা হিউম্যানিজম প্রসঙ্গে অন্নদাশঙ্কর রায় লিখেছেন :আমাদের দেশেও এক প্রকার হিউম্যানিজম ছিল। চণ্ডীদাস বলেছিলেন, 'শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।' বাউলরা সেই মানুষের সন্ধানে ফেরেন। তাঁদের মতে, 'এই মানুষে আছে সেই মানুষ।' বাউল নারী যোগমায়া আমাকে বলেছিলেন, 'বাবা, এই মানুষই কৃষ্ণ, আর এই মানুষই কংস।' .... এই যে মানবিকবাদ এর সঙ্গে বিজ্ঞানের কোনো সম্পর্ক নেই। অপরপক্ষে পাশ্চাত্যের মানবিকবাদ বিজ্ঞানের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। যাঁরা থিয়োলজি বিশ্বাস করতেন না তাঁরা ফিলোজফিকে তার সঙ্গে স্বতন্ত্র করেন। সেই ফিলোজফির এক ভাগের নাম ন্যাচারাল ফিলোজফি, যার অপর নাম সায়েন্স। পরে সায়েন্স বহু শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত হয়। পাশ্চাত্য হিউম্যানিস্টরা বৈজ্ঞানিকভাবে চিন্তা করেন।[২০] [দ্র. অন্নদাশঙ্কর রায় : 'প্রসঙ্গ শিবনারায়ণ রায়'; gb¯x wecøex wkebviwqY ivq (স্বরাজ সেনগুপ্ত সম্পাদিত), কলকাতা, শিবনারায়ণ রায় অশীতিতম জন্মদিন উদযাপন সমিতি, ২০ জানুয়ারি ২০০১, পৃ ১১]

১১. মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম: Aÿ qKgvi 'Ë I Dbk kZ‡Ki ev0jv, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা ,আগস্ট ২০০৯, পৃ-৩০৩

১২. মানুষের বড়ত্ব কোথায়ড়্কী অর্থে মানুষ বড়, সরল মানুষের মনে এসব প্রশ্নের উদয়-বিলয় কিছুই হয় না। কতিপয় শিক্ষিত চালাক লোক ধর্মের বাণীর মতো কথাটা আওড়িয়ে সত্য গোপন করে যান। .... অক্ষয়কুমার দত্তের এই মানবিকবাদ আমাদের দেশে যে ফলপ্রসু হতে পারেনি, এমনকি কেউ তা পরিপ্রেক্ষিত সমেত বিস্তারিত আলোচনা করে দেখার গরজও বোধ করেননি। তার কারণ, তাঁর মানবিকবাদ যতটা দায়িত্ব ও পরিশ্রম দাবি করে, আমাদের মানস-চেতনা ততটা উচ্চতা স্বীকার করেনি। এজন্য চণ্ডীদাসের কথাটির যত গুরুত্ব এবং বাউল নারী যোগমায়ার মানবিকবাদ যত প্রচারিত ও জনপ্রিয়, অক্ষয়কুমার দত্তের মানবিকবাদ ততটাই মৃত। এর পেছনে আছে এক গভীর মনস্তাত্ত্বিক কারণ। [দ্র. মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম: Aÿ qKgvi 'Ë I Dbk kZ‡Ki ev0jv, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা ,আগস্ট , ২০০৯, পৃ-৩০৩ ও ৩০৪]

১৩. এ প্রসঙ্গে ভবতোষ দত্ত লিখেছেন- উনিশ শতকে বাঙালির চিন্তায় যে প্রায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল, সাহিত্যে তার প্রথম প্রকাশ অক্ষয়কুমার দত্তের এই বইতে। তার সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মানুষের স্বাধীন স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তির প্রচেষ্টা করা, যে বুদ্ধির প্রমাণ প্রাকৃতিক নিয়মতত্ত্বে বিশ্বাস অর্জন। আমাদের মনের জগৎ থেকে সব রকম ধোঁয়াটে ভাব ও অলৌকিক ভাবনাকে দূরীভূত করে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকেই প্রামাণ্য হিসাবে গ্রহণ করা। এই প্রবণতা উনিশ শতকের মনীষীদের চিন্তার সাধারণ প্রকৃতি হয়ে উঠেছিল, অক্ষয়কুমার দত্তেই তার প্রথম অভিব্যক্তি।

অক্ষয়কুমার-ব্যবহৃত 'মানবপ্রকৃতি' কথাটা এই নতুন মানবত্ববোধের ইঙ্গিতবহ। অক্ষয়কুমার এমন মানুষের কথা বলেছেন, যার আভাস চণ্ডীদাসের 'সবার উপরে মানুষ সত্য' এই উক্তির মধ্যেও নেই। এই মানুষের কথা বলেই, ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক পর্যায়গুলি বিশদভাবে তিনি বলেছেন। প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসরণেই মানুষের প্রাত্যহিক এবং সামাজিক কর্তব্য করতে হবেঈশ্বরের ইচ্ছা, স্বর্গলাভের আকাঙ্ক্ষা, শাস্ত্রীয় নিত্যকর্মের অন্ধ অনুষ্ঠানের কথা তিনি বলেননি। অক্ষয়কুমারের বইটি থেকে আধুনিক মানবধর্মের একটা সূত্র পাই।[১৭] [ভবতোষ দত্ত, e\0\jxi g\beag, পৃ ২৬-২৭]

১৪. ZË‡e\abx c\ÎKv, 'শারদীয় দুর্গোৎসব', ২৭ সংখ্যা, ১ কার্তিক ১৭৬৭ শক, পৃ ২৩০

১৫. শুভংকার চক্রবর্তী ,বিদ্যাসাগর ও আশুতোষ এবং রবিনসন ক্রুসো (প্রবন্ধ), বিদ্যার সারথি আশুতোষ ,পৃ. ১০৬

১৬. বিদ্যাসাগর বালক আশুতোষের হাতে রবিনসন ক্রুসো বইখানা নিজের নাম সই করে তুলে দিলেন। শিক্ষক বিদ্যাসাগরের চোখ আশুতোষের মধ্যে বড়ো-হবার প্রচ্ছন্ন সম্ভাবনা দেখেছিল। সুপ্ত সম্ভবনাকে বিকশিত করতে ক্রুসোর চরিত্র-বৈশিষ্ট্য সহায়ক হবে বিচার করে বালকের হাতে বইখানা দিয়ে বললেন– 'মন দিয়ে পোড়ো'। আশুতোষ বইখানা শুধু মন দিয়ে পড়লেন না, রবিনসন ক্রুসো বইখানাকে মনে করতেন তাঁর গ্রন্থাগারের অতি মূল্যবান উপহার [দ্র. পূর্বোক্ত, পৃ.১০৪

১৭. শুভংকার চক্রবর্তী ,বিদ্যাসাগর ও আশুতোষ এবং রবিনসন ক্রুসো (প্রবন্ধ), বিদ্যার সারথি পৃ. ১০৫

১৮. অংশুতোষ খাঁ, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও তাঁর সময় (প্রবন্ধ), পূর্বোক্ত, পৃ.১৭৬

১৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'শিক্ষার সাঙ্গীকরণ', রবীন্দ্রনাথ রচনাবলী, ১১শ খণ্ড (জন্ম শতবার্ষিকী সংখ্যা), পৃ.৭০৫

২০. শ্রীপ্রহলাদকুমার প্রামাণিক,সম্পাদকের নিবেদন, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী চরিত কথা, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, সুবর্ণ জয়ন্তী সংস্করণ নববর্ষ ১৪০০, কলকাতা, পৃ-৫

২১. পূর্বোক্ত পৃ-৫

MšcwÄ:

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর স্মৃতিপুস্তকের জন্য'; nicmv` kv¯¿x ¯§viKMÖš', (সত্যজিৎ চৌধুরী, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত সম্পাদিত) কলকাতা, সান্যাল প্রকাশন, আষাঢ় ১৩৮৬

মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম : AÿqKgvi `Ë I Dwbk kZ‡Ki evOjv, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, আগস্ট ২০০৯।

ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : evsjv mvwn‡Z¨i m¤úY© BwZeË, নতুন পরিবর্ধিত সংস্করণ, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ২০০৮।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : Ebwesk kZvãxi c_gva© I evsjv mvwnZ¨; বুকল্যান্ড প্রাইভেট লি. কলকাতা, ১৯৬৫।

মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম সম্পাদিত : weÁvb-ewË PPvi AMcw_K AÿqKgvi `Ë I evOwj mgvR, রেনেসাঁস, কলকাতা, ৩১ জানুয়ারি ২০০৬।

সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর : AvZ¥Rxebx, , কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৯৬২।

প্রমথনাথ বিশী ও বিজিতকুমার দত্ত সম্পাদিত : `evsjv M‡`¨i c`v¼, কলকাতা, ১৯৬১।

আশীষ লাহিড়ী, অক্ষয়কুমার দত্ত : আঁধার রাতে একলা পথিক, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা জুলাই ২০০৭।

মহেন্দ্রনাথ রায় : শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার বাবুর জীeb-eË©všÍ, কলিকাতা, ১২৯২।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা সাময়িকপত্র-১, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পুর্নমুদ্রণ, মাঘ ১৪১০।

কেদারনাথ মজুমদার : বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য-১, কলিকাতা, প্রকাশক,নরেন্দ্রনাথ মজুমদার, জুলাই ১৯১৭।

বিনয় ঘোষ : সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র-৩, কলকাতা, প্যাপিরাস, জানুয়ারি ১৯৮০।

বিনয় ঘোষ : বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ, কলকাতা, ওরিয়েন্ট লংম্যান, ১৯৯৩।

বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় : জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন-স্মৃতি, কলকাতা, সুবর্ণরেখা, ২০০২।

শিবনাথ শাস্ত্রী : শিবনাথ রচনাসংগ্রহ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, ৫ জুলাই ১৯৭৯।

মনোমোহন ঘোষ : বাংলা সাহিত্য, কলকাতা, ইন্ডিয়ান পাবলিসিটি সোসাইটি, ১৯৫৫।

যোগেশচন্দ্র বাগল : দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর; (সাহিত্য-সাধক চরিতমালা-৪৫, তৃতীয় খণ্ড) কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, চতুর্থ মুদ্রণ বৈশাখ ১৩৮৪।

নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস : অক্ষয়-চরিত; আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীকালিদাস চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত-প্রকাশিত, ভাদ্র ১২৯৪ বঙ্গাব্দ।

বিনয় ঘোষ : সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র-৫, কলকাতা, প্যাপিরাস, নভেম্বর ১৯৮১।

মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম সম্পাদিত : অক্ষয়কুমার দত্তের শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধাবলী; ঢাকা, মে ২০০৭।

সাইফুল ইসলাম ও তপন বাগচী সম্পাদিত : বাঙলাদেশে উচ্চশিক্ষার দুশো বছর, সূচীপত্র, ফেব্রুয়ারি ২০০৬, ঢাকা।

প্রমথ চৌধুরী : 'আমাদের শিক্ষা ও বর্ত্তমান জীবন-সমস্যা'; meRcÎ, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, আষাঢ় ১৩২৬।

অসিতকুমার ভট্টাচার্য : A¶qKgvi `Ë Ges Dwbk kZ‡Ki evsjvq ag I mgvRwPšÍv; কলকাতা, কে পি বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানী, প্রথম প্রকাশ--২০০৭।

সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় : evOvjxi iv‡ówPšÍv-১, কলকাতা, জি.এ.ই. পাবলিশার্স, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৯১।

গোলাম মুরশিদ : mgvR ms¯‹vi Av‡›`vjb I evsjv bvUK; ঢাকা, বাংলা একাডেমী, প্রথম সংস্করণ,১৯৮৪।

অশীন দাশগুপ্ত : ceÜ mg_MÖ; কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ, ২০০১।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য : e½mvwn‡Z¨ weÁvb, কলকাতা, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, জানুয়ারি ১৯৬০।

বিনয়ভূষণ রায় : Dwbk kZ‡Ki evsjvq weÁvb mvabv, সুবর্ণরেখা, ১ বৈশাখ ১৩৯৪।

দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায় : iex›`ªbv_ I weÁvb, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, জানুয়ারি

২০০০।

রমাকান্ত চক্রবর্তী : ''উনিশ শতকের 'কলিকাতা-সভ্যতা'এবং 'বাঙাল'', PZi½, ৩৫ বর্ষ, শ্রাবণ-পৌষ ১৩৮০।

প্রফুল্লচন্দ্র রায় : AvZ¥PwiZ, কলকাতা, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, দ্বিতীয় সংস্করণ, শ্রাবণ ১৩৬৮।

তপন চক্রবর্তী : শতবর্ষে বাঙালির বিজ্ঞানচর্চা,বাংলা একাডেমি, চৈত্র ১৪০৭/ মার্চ ২০০১, ঢাকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : wekcwiPq, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, অগ্রহায়ণ ১৩৮৭।

শ্যামল চক্রবর্তী (সঙ্কলন ও সম্পাদনা) : AvPvh cdjøP‡›`i ceÜ, কলকাতা, আজকাল, বইমেলা ২০০১।

নবেন্দু সেন : evsjv M`¨ : ÷vBwjmwUKm, সাহিত্য প্রকাশ, ৩১ মার্চ ১৯৯০।

রামগতি ন্যায়রত্ন : ev½vjv fvlv I ev½vjv mvwnZ¨welqK c¯Íve; (অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত), কলকাতা, সুপ্রীম বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, নতুন সংস্করণ—১৯৯১।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী : nicmv` iPbvejx-২ খণ্ড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ডিসেম্বর ১৯৮১।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : gvB‡Kj gam`b `Ë; কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, এপ্রিল ১৯৯৮।

সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় : evOvjxi ivóªPšÍv-১, কলকাতা, জি. এ. ই. পাবলিশার্স, তৃতীয় সংস্করণ—১৯৯১।

ভবতোষ দত্ত : evOvjxi gvbe ag, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, প্রথম প্রকাশ, পৌষ ১৪০৬, কলকাতা।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর : আত্মজীবনী' ১৯৬২।

কাজী আবদুল ওদুদ : evsjvi RvMiY, কলকাতা, বিশ্বভারতী, ডিসেম্বর ১৯৫৬।

ড.দীনেশচন্দ্র সিংহ সম্পাদিত : cm½: KjKvZv weKwe`¨vjq, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,২০০৭।

অমিয়কুমার সামন্ত : প্রসঙ্গ বিদ্যাসাগর,ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানি, জানুয়ারি ১৯৯৪ কলিকাতা।

বিনয় ঘোষ : উদ্ধৃত, evsjvi mvgwRK BwZnv‡mi avivi, ঢাকা , বুক ক্লাব, নভেম্বর ১৯৬৮।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : A¶qKgvi `Ë (চরিতমালা-১২),কলকাতা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ১৩৮৮।

কাশীনাথ রায় : সত্যের দ্বিভাজনঃ এস.এম.লুৎফর রহমান সম্পাদিত, সাহিত্য পত্রিকা, ৪৫ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, কার্তিক ১৪০৮,অক্টোবর-২০০১, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ।

বিহারীলাল সরকার : we`¨vmvMi; কলকাতা, ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানি, নভেম্বর ১৯৯১।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : নোটস অব সংস্কৃত কলেজ, বিনয় ঘোষ অনুদিত, প্যারা- ১৬,মিজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকা, বিদ্যাসাগর সংখ্যা, ত্রয়োদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, এপ্রিল-জুন,১৯৯৭,ঢাকা।

খোন্দকার সিরাজুল হক : evsjvi wk¶ve¨e¯’v I wk¶veZx we`¨vmvMi চতুর্বিংশ বর্ষ : ৩য়-৪র্থ সংখ্যা/জিজ্ঞাসা; শিক্ষাঃ বিশেষ সংখ্যা।

নমিতা চক্রবর্তী : e½‡`‡k wkÿv cmvi, কলকাতা, ১৯৮০।

অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর , দে'জ পাবলিশিং , কলকাতা পুনর্মুদ্রণ,২০০৫।

স্বপন বসু : বাংলার নব চেতনার ইতিহাস, পুস্তক বিপণি,কলকাতা অক্টোবর ২০০০।

অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর পূর্বোক্ত, ভূমিকা-নতুন সংস্করণ।

শিপ্রা সরকার : ie›`bv‡_i wkÿv`k©b Dbqb-fvebv ,বাংলা একাডেমি, অগ্রহায়ণ ১৪১৫/ ডিসেম্বর ২০০৮।

গোলাম মুরশিদ : ie›`¦we‡k cee½ cee‡½ ie›`PPv, বাংলা একাডেমি, আষাঢ় ১৩৮৮ / জুন ১৯৮১, ঢাকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্ররচনাবলী, দশম খণ্ড (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৬১) ।

সুকুমার সেন : cwiRb-cwi‡ek ie›`-weKvk ,কলকাতা : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬২।

প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় : ie»‘ Rxeb K_v, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ষষ্ঠ মুদ্রণ ১৪০৭ বাং, কলকাতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : Rxeb¯§wZ, বেগম আকতার কামাল সম্পাদিত, প্রতীক প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি ২০১৫, ঢাকা।

সত্যেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত : রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎ: শিক্ষাচিন্তা, কলকাতা, ১৩৮৯, রবীন্দ্র-রচনাবলী,পশ্চিম বঙ্গ সরকার, ১৫শ খণ্ড।

প্রশান্তকুমার পাল (সম্পাদিত) : ÖKj¨vY‡ql ckvšÍÎ, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৬।

মাসুদুজ্জামান : ie»‘bv_ I Zvi wkÿvfvebv, মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৬, ঢাকা।

সরোজ চ্যাটার্জী : AvawbK wkÿvZ‡Ëi iƒcvqY,নিউ সেন্টাল বুক এজেন্সি (প্রা.) লিমিটেড,পুনমূদ্রণ ২০০০, কলকাতা।

প্রশান্তকুমার পাল : iweRxebx, PZ_ LÐ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৯৫, কলকাতা. নিখিলেশ গুহ:শিক্ষাব্রতী আশুতোষ, (প্রবন্ধ), আশুতোষ: বিদ্যার সারথি, পূর্বোক্ত

সুকুমার সেন : দিনের পর দিন যে গেল, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮২, কলকাতা

আবুল কাসেম ফজলুল হক সম্পদিত : বঙ্কিমচন্দ্র সার্ধশত জন্মবর্ষে, বাঙালাদেশ উপন্যাস পরিষদ সংকলন, জাগৃতি প্রকাশনি,ফেব্রুয়ারি, ২০০১,ঢাকা

সম্পাদক শ্রী প্রহলাদকুমার প্রামাণিক : রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী চরিত কথা , ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা-১৪০৬, বাংলা।

ভবতোষ দত্ত : বঙ্কিমচন্দ্র সেই সময়ে,দীপ প্রকাশন,বইমেলা ২০০৯, কলকাতা।

ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়-২ : কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, আষাঢ় ১৪০৬।

শাশ্বত বঙ্গ : কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৩৫৮।

বঙ্কিম রচনাসমগ্র : দ্বিতীয় খণ্ড (সাহিত্যসমগ্র), সালমা বুক ডিপো, ৩৮/২, বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০, জানুয়ারী ২০০৭।

রবীন্দ্ররচনাবলী ৩ : ঐকতান (কবিতা), জন্মদিনে কাব্যের ১০ সংখ্যক কবিতা

রবীন্দ্ররচনাবলী, দশম খণ্ড : পশ্চিমযাত্রীর ডায়রি,

রবীন্দ্র-রচনাবলী ১১শ খণ্ড : শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, কলিকাতা, ২৫ বৈশাখ ১৩৬৮।

রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১২শ খণ্ড : বিশ্বভারতী, ১৩৪৯ গ্রন্থপরিচয়।

রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড : পঞ্চম সংস্করণ, কলকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৯৩.

রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুদর্শ খণ্ড : কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৩৯৮।

অক্ষয়-চরিত : কলিকাতা, আদি ব্রাক্ষসমাজ যন্ত্র, ভাদ্র ১২৯৪।

আত্ম-জীবন-চরিত : কলিকাতা, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রা. লি., ১৩৬৩।

বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য : কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটিড, জানুয়ারি ১৯৯৮।

ধর্মনীতি : কলিকাতা, কলিকাতা সুচারু যন্ত্র, ১৭৭৭ সন

মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত : কলকাতা, দে'জ, পঞ্চম সংস্করণ ১৯২৫।

ভূগোল : তত্ত্ববোধিনী সভা, ১৭৬৩ শক।

পদার্থবিদ্যা : কলিকাতা, সংস্কৃত প্রেস, চতুর্থ মুদ্রণ–১৮৬১, দ্র 'বিজ্ঞাপন'

ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য : কলকাতা, জিজ্ঞাসা, দ্বিতীয় মুদ্রণ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৬,জুন ১৯৬৯।

ইন্দ্র মিত্র করুণাসাগর বিদ্যাসাগর : আনন্দ পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৯৭১।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের পুত্র : মহিসুর, ৫ জানুয়ারি ১৯২৬। রবীন্দ্রভবন সংগ্রহশালা, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা : ১৬ সংখ্যা, ১লা অগ্রহায়ণ ১৭৬৬ শতাব্দ।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা : ৬০ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৭৭০ শতাব্দ।

মীজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকা : ত্রয়োদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, এপ্রিল জুন, ১৯৯৭, ৪৮ খণ্ড।

সাধনা পত্রিকায় প্রকাশিত হয় : 'শিক্ষার হেরফের' পৌষ ১২৯৯, ইং ১৮৯২, রাজশাহী এসোসিয়েশন পঠিত; পরে ঈষৎ সংক্ষিপ্তভাবে, পৌষ ১২৯৯,

বাংলার বাঘ স্যার আশুতোষ, অপরাজিত, বিশেষ সংখ্যা: সম্পাদক ড. রীণা ভাদুড়ী ,ড. সমর ঘোষ, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় বর্ষ ২৭ সংখ্যা ১–২ জানুয়ারি ২০০৭।

ব্রহ্মানন্দকে লেখা বিবেকানন্দের চিঠি থেকে উদ্ধৃত : মনোতোষ দাশগুপ্ত, পূর্বোক্ত.

ইংরেজি :

Romesh Chunder Dutt : The Literature of Bengal, Calcutta, Thacker Spink & Co. 1895.

J. C. Ghosh : Bengali Literature, London, Oxford University press, 1948.

Bengali Prose Style : Calcutta, Calcutta University, 1921.

The Bengal Spectator : July 1842, Ges January15, 1843.

R. Tagore : The Relogion of Man (5th Impression : London : Geogre Allen & Unwing Ltd, 1958).

L.K. Elmhirst : The Foundation of Sriniketan, Rabindranath Tagore : Pioneer Education (2nd edn., London : Lohn Murray, 1961.

Mukherjee Education for Fulliness : Asia Publishing, 1962.

B. B. Misra : The Indian Middle classes (London : Oxford University Press, 1961).

A. Seal : The emergence of Indian Nationalism (Cambridge : Cambridge University press, 1986).

Himangshu Mukherjee Bhushan : Education for fullness: A study of the Educational Thought and Experiment of Rabindranath Tagore, Bomby, Asia Publishing House 1962.

Supriyo Tagore : Rabindranath's Philosophy od Education' in Patha bhavana: A poet's School Shantiniketan:Visva-Bharati, 1994).

Bankim Rachanavali : Edid by Joges Chandra Bagal Forth Print- September-2011, Sahitya Samsad.

প্রবন্ধ :

কবীর চৌধুরী : AZjbxq we‘¨vmvMi (প্রবন্ধ), নিবন্ধমলা, দ্বাদশ খণ্ড, উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,২০০৩।

সুনীল আচার্য : CkiP› ‘ we‘¨vmvMi (প্রবন্ধ), সম্পাদক নান্টুরায়, ভারত বিচিত্রা, জুলাই ২০১১, ঢাকা।

মনোতোষ দাশগুপ্ত : তোমারি রাগিণী জীবনকুঞ্জে (প্রবন্ধ), আশুতোষ: বিদ্যার সারথি,সার্ধশত–জন্মবর্ষে শ্রদ্ধার্ঘ্য, মূখ্য সম্পাদক ড. রীণা ভাদুরী , আশুতোষ কলেজ প্রকাশনা বিভাগ, কলকাতা

ভাস্কর মৃধা : বাংলা ভাষার প্রতিষ্ঠা ও স্যার আশুতোষ, (প্রবন্ধ), আশুতোষ: বিদ্যার সারথি,সার্ধশত–জন্মবর্ষে শ্রদ্ধার্ঘ্য, মূখ্য সম্পাদক ড. রীণা ভাদুরী , আশুতোষ কলেজ
প্রকাশনা বিভাগ, কলকাতা ৭০০ ০২৬

নিখিলেশ গুহ : শিক্ষাব্রতী আশুতোষ, (প্রবন্ধ), আশুতোষ: বিদ্যার সারথি, পূর্বোক্ত, পৃ.৯

চিত্তব্রত পালিত : আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের শিক্ষাদর্শ (প্রবন্ধ), পূর্বোক্ত, পৃ.১৫

অশীন দাশগুপ্ত : ceÜ mgM; কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ, ২০০১,

ফুলরানী চক্রবর্তী : শিক্ষাব্রতী আশুতোষের গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার-প্রীতি (প্রবন্ধ) [C.U. Convocation Address– 1908]

রবীন্দ্র রচনাবলী,একাদশ খণ্ড : প্রবন্ধ, শিক্ষার হেরফের,বিশ্বভারতী, ২৫ বৈশাখ ১৩৬৮